তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, (২২০০) ভাদ্র ১৩৬৩

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিন্ট শপ প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

হীরা পান্না	...	১
অভিনেত্রী	...	৯৫
গুরুদক্ষিণা	...	২১৩

ভা. র.- ১৯শ

এক

কাজ করছিলাম। বই ওল্টাচ্ছিলাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার। একটি কাহিনীর উপাদানের জন্ম ইতিহাসের অধ্যায় খুঁজছিলাম। টেলিফোনটা বেজে উঠল। তিক্ত মনেই টেলিফোন তুললাম। একটি কাহিনী যেন মনে মনে বীজ ফেটে অঙ্কুরের মত দুটি দল মেলছিল। বিবর্ণ দুটি দল তাও মাটির তলায়। আবার যেন মাটি চাপা পড়ে গেল।

—হ্যালো।—

—ফাইভ সিক্স থ্রি জিরো সেভেন সিক্স?

—হ্যাঁ।

…এঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

—আমিই কথা বলছি।

—দেখুন আমি…হাসপাতাল থেকে কথা বলছি।

একটু চমকে উঠলাম। হাসপাতাল থেকে কথা বলছে! কই পরিচিত আত্মীয়রা কেউ হাসপাতালে যে আছেন বলে তো জানি না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। এ্যাক্সিডেন্ট? এ্যাক্সিডেন্ট কথাটাই স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে একটা নখওয়ালা ছোট জন্তু লাফিয়ে পড়ার মত যেন ঝপ করে লাফিয়ে পড়ল। নখ ফুটে গেল। পরক্ষণেই মনে হল—না—! এ তো টি-বি হসপিটাল। মন অধিকতর চঞ্চল হয়ে উঠল। আমার আপনজনের মধ্যে কেউ—? চিন্তাটা শেষ হবার আগেই ওদিক থেকে কথা ভেসে এল—আপনি কি সুরূপা ব্যানার্জীকে জানেন?

—সুরূপা ব্যানার্জী? কে?

—ফিল্ম এ্যাকট্রেস!

—ফিল্ম এ্যাক্ট্রেস—সুরূপা ব্যানার্জী? হ্যাঁ—একবার তিনি আমার কাছে একটা গল্প লেখাবার জন্যে কয়েকদিন এসেছিলেন!

—হ্যাঁ; তিনি হাসপাতালে রয়েছেন অবস্থা খারাপ। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন—বারবার বলেছেন। আমরা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ঘুম ভাঙলেই বলছেন—আপনার কথা। ঘণ্টা দুয়েক পর ঘোরটা কাটার সম্ভাবনা আছে। আপনি কি আসবেন?

ফোনটা ধরেই চিন্তা করে নিলাম। বছর দুয়েক আগে সুরূপা এসেছিল আমার কাছে। কয়েকদিনই এসেছিল। একটু চেষ্টাও করেছিল আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ হবার জন্য। কিন্তু আমার নিস্পৃহতার জন্য সেটা সম্ভবপর হয়নি, উৎসাহ সে বজায় রাখতে পারে নি।

—আপনি কি আসবেন? ফোনের ওদিক থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

—দু-ঘণ্টা পর?

—হ্যাঁ। অবশ্য আড়াই ঘণ্টাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটু বসতে হবে। উনি খুব ব্যগ্র কিন্তু।

দ্বিধার মধ্যেই বললাম—আচ্ছা যাব!

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সুরূপা ফিল্ম অভিনেত্রীর কি কথা আমার সঙ্গে থাকতে পারে? ভেবে পেলাম না। সে আমার কাছে এসেছিল গল্প কিনতে নয়, বরাত মত গল্প লেখাতে। আমি লিখিনি। কয়েকদিনই এসেছিল, সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল—কিন্তু সে অনুরোধ রাখা তো সম্ভবপর হয়নি আমার পক্ষে। প্রথম দিন প্রত্যাখ্যান করেছিলাম সস্নেহ মিষ্ট কথায়। তবু সে নিরস্ত হয়নি। একটু আবদারের সুরেই বলেছিল—না, না; বললে আমি শুনব না। সম্ভবত সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র—এই সত্যটা সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী ছিল।

ঘটনাটা মনে পড়ছে। বছর দুয়েক আগে—যথানিয়মে সকালবেলা লিখতে বসেছি—এমন সময় ছোট নতুন একখানা মোটরকার এসে থামল বাড়ীর সামনে দেবদারু গাছটার ছায়ায়। জানালাটার মধ্য দিয়ে তাকিয়েছিলাম মোটর থামার শব্দে। কে এল?

দেখলাম দুটি পুরুষ ও একটি সুন্দরী তরুণী। পুরুষদের মধ্যে একজন প্রবীণ একজন তরুণ। মেয়েটির বেশভূষায় প্রসাধনে পারিপাট্যে একটা ঝলমলে দীপ্তি রয়েছে, যা সচরাচর বা সাধারণ নয়। সব থেকে যেটা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেটি তার শ্যাম্পুকরা রেশমের মত চুলে একটা এলোমেলো অবিন্যস্ততার পরিপাটি বিন্যাস এবং তার চোখ ও নাক। নাকটির গড়ন বাঁকা! যেটা রূপের ব্যাকরণশাস্ত্রে মস্ত একটা খুঁত। এবং ও নাকের বাঁকা ভাবের জন্যই চোখ দুটি ডাগর। টানা নয়—গোলালো। এটাও খুঁত। কিন্তু এই দুটোই তাকে যেন অধিকতর আকর্ষণীয়া করে তুলেছে। পেঁচিয়েপরা ফিকে নীলরংয়ের আঁটোছাঁদো শাড়ীর আঁচলখানি। আলগা হয়ে পিঠের দিকে ঝুলছে ব্রোচ বা পিন দিয়ে আঁটা নেই এর জন্য শাড়ীর আঁচলখানা কোমরে বেড় দিয়ে সামনে এনে গুঁজে গিঁঠ দিয়ে বাঁধা। যাতে মেয়েটিকে একটু শক্তপোক্ত কাজের মেয়ে বা একটু উদ্ধত মনে হচ্ছিল।

পুরুষদের দুজনেই প্যাণ্ট এবং সার্ট পরা। একজনের হাফসার্ট অন্যজনের হাওয়াই সার্ট। তাও বেশ ছাপছোপ দেওয়া। এসে বাড়ীর ফটকে ঢুকলেন। আমার ঘরের সামনে বসবার ঘরে। মাঝে একটা দরজা বন্ধই থাকে। ভাইপো এসে খবর দিলে ফিল্ম ডিরেক্টর মহিমবাবু আর সুরূপা ব্যানার্জী ফিল্ম এ্যাক্ট্রেস এসেছেন। দেখা করবেন।

বললাম—ভিতরে নিয়ে এস।

বাইরের ঘর আর আমার লেখবার ঘরের মধ্যের দরজাটা খুলে দিলে ভাইপো এবং ওঁদের বললে—ভিতরে আসুন।

তাঁরা দরজার মুখে থমকে দাঁড়ালেন। আমার ঘরের ভিতরের ব্যবস্থাটা আধুনিক নয় পুরোনো কালের মত আমি নিজে আসনে বসে ডেস্কের উপর লিখি। সামনে গদীর উপর চাদর পেতে ফরাস করা আছে। তার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে একখানা বেঞ্চির মতও আছে—কোটপ্যাণ্টধারীদের জন্য। কিন্তু তার জন্য বোধ হয় তাঁরা থমকে দাঁড়াননি। দাঁড়িয়েছিলেন ঐ মেয়েটির জন্য। কারণ মেয়েটি দাঁড়িয়ে আমাকে একদৃষ্টে দেখছিল।

আমার মধ্যে দেখবার কিছু নেই। আমি প্রায় বৃদ্ধ তার উপর শীর্ণদেহ কালো মানুষ।

তার দেখার যদি কিছু থাকে তবে আমার আসল চেহারা আর তার মনে গড়ে নেওয়া চেহারার মধ্যে যেটা গরমিল সেইটি যাচাই করে দেখা। এমন হয়। অনেকের আশাভঙ্গ হয়ে থাকে। চুরি করে পেয়েই থাকি আর সত্য প্রাপ্য হিসেবে পেয়েই থাকি—প্রতিষ্ঠা তো কিছুটা পেয়েছি। তার ফলে অনেকেই নামের মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। এবং একটা ছবিও কল্পনায় তৈরী করে নেন। কাগজে-পত্রে যে সব ছবি বেরিয়ে থাকে—সেগুলিও এই ভুল ছবি গড়তে সাহায্য করে। কারণ ফটোগ্রাফ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঘটন ঘটাতে পারে। সত্যকে সে বিকৃত করে না কখনও, কিন্তু ওই সত্যকে রেখায় রেখায় ঠিক রেখেও রূপে লাবণ্যে সুন্দর করে তুলতে পারে। মানুষেরও মোহ আছে। তারা কাগজে ছাপার জন্যে ছবি দেবার সময় বেছে বেছে লাবণ্যময় ছবিগুলিই দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে।

আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বললাম—আসুন, ভিতরে আসুন।

মেয়েটি স্লীপার খুলে আমার দিকে তাকাতে তাকাতেই ঘরের ভিতরে এসে সামনের ফরাসে বসল। তার পিছন পিছন ভদ্রলোক দুটি।

প্রবীণ ব্যক্তিটিই পরিচয় করে নিলেন, বললেন—নমস্কার। আমার নাম—মহিমচন্দ্র বোস। ফিল্ম ডিরেক্টারী করি। আমার ছবি···

আমি প্রতিনমস্কার আগেই করেছিলাম—বললাম—হ্যাঁ, কয়েকখানা ছবি আপনার দেখেছি।

—হ্যাঁ। আগে ছবি সেন্সরের সময় একবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—ইনি হলেন—ফিল্মস্টার স্বরূপা ব্যানার্জী; উনিই ছবি করবেন।

মেয়েটি তখন মুখ নিচু করে বসে জাজিম চাদরের সুতোর ছকে ছকে তর্জনী বুলিয়ে যাচ্ছিল। লক্ষণটা নার্ভাসনেসের। যেন আমার দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করছিল। সে এবার মুখ তুলে তাকালে—একটু হাসলে। কিন্তু যেটা করা উচিত সেটা করলে না—অর্থাৎ নমস্কারটা করলে না। আমিই নমস্কারটা করলাম, বললাম—নমস্কার।

মেয়েটির মুখ কেমন হয়ে গেল। সে চঞ্চল হয়ে উঠল। চঞ্চলতার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি আপনাকে প্রণাম করব!

বয়স হয়েছে, প্রণাম নেওয়া বয়সের একটা ধর্ম। সম্ভবতঃ ওটা কালের অধিকার। তার উপর কালের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা যোগ হলে, ও-অভ্যাসটা খানিকটা কায়েমী স্বার্থভোগীদের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। আমি বললাম কেন—প্রণাম কেন?

কিন্তু মেয়েটি এসে আমার ডেস্কের পাশে দাঁড়াল। হাতখানি উদ্যত হল দেহখানি নত হল। আমিও পা না বাড়িয়ে পারলাম না।

সে প্রণাম করে যেন খানিকটা সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে সামনে গিয়ে বসল। তারপর বললে—কতদিন থেকে যে আপনাকে দেখতে—প্রণাম করতে আমার ইচ্ছে। কিন্তু আসতে

পারি নি! কেমন ভয় হয়েছে, লজ্জা হয়েছে।

আমি বললাম, ভয়ের বা লজ্জার তো কিছু নেই। অন্য দাবী নেই আমার, বয়সের দাবীই আমার দাবী। তুমি বয়সে ছোট, সেই দাবীতে এলেই পারতে।

—আমি আপনাকে কিন্তু দাদা বলবো।

মনটা খুব প্রসন্ন হল না। কারণ প্রথমেই যেন একটু বেশী এগিয়ে অন্তরঙ্গ হতে চাচ্ছে বলে মনে হল। বোধ হয় সেটা ভ্রূভঙ্গীতে এবং মুখভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সে বলেছিল, রাগ করবেন না তো!

—না না। রাগ করব কেন। আমার ছোট মেয়ে তোমার থেকে অনেক বড়। আমার বড় নাতনী খুকু তার বয়স আঠারো হল। সুতরাং দাদা থেকে দাদু পর্যন্ত যা বলবে তাতে আপত্তির অধিকারই নেই আমার।

পরিবেশটা সহজ হয়ে উঠেছিল এবার।

সে বলেছিল—আমি মনে মনে অনেকদিন থেকেই আপনাকে দাদা বলি।

—বেশ তাই বলো। কথা বলতে বলতে কখন যে তাকে তুমি বলতে সুরু করেছি সে খেয়াল আমার ছিল না। খেয়াল যখন হল তখন আপনি আজ্ঞে ফিরিয়ে এনে দুজনের ব্যবধানটা বাড়িয়ে দুস্তর করে রাখবার উপায় ছিল না আর।

মহিমবাবুর হাতে সিগারেটের টিন ছিল সেটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—আর ইনি হলেন সুধীর ঘোষ। ইনিও রাইজিং স্টার।

সুধীর নমস্কার করলে। আমিও প্রতিনমস্কার করলাম।

মহিমবাবু বললেন, আপনার সময়ের অনেক দাম। বেশী নেব না। এখন আসল কথা বলি। সুরূপা দেবী একখানা ছবি করতে চান। ওঁর ঝোঁক আপনার গল্প নেবেন। আমারও অনেক দিন থেকে ইচ্ছে আপনার গল্প নিয়ে ছবি করি।

আমি বললাম—কোন্ গল্প বলুন?

সুধীর এবার বলল—মানে, গল্প একটা লিখে দিতে হবে।

—লিখে দিতে হবে?

—হ্যাঁ। সুরূপা দেবী আইডিয়াটা বলবেন। কথাটা মহিমবাবু বললেন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম—সে তো আমি কখনও করিনে!

সুরূপা ওই গদীর উপরেই দুখানা হাত বাড়িয়ে বললে—এটা আপনাকে আমার জন্যে করতেই হবে।

—মাপ কর। তা আমি করিনে—করব না।

কণ্ঠস্বর আমার একটু বেশী কঠিন হয়েই বোধ হয় উঠেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গিতেও প্রকট হয়েছিল—মাথা নেড়েও অস্বীকার করেছিলাম। যার ফলে অস্বীকৃতিটুকু একটা আঘাতের মত হয়ে উঠেছিল, যার ফলে ওরা সকলেই নির্বাক হওয়ার মত চুপ করে গিয়েছিল।

সুধীর এবং মহিম এ-ওর কানের কাছে ফিসফিস করে কথা বলেছিল কিছুক্ষণ। সুরূপা জাজিমের ছকের উপর দৃষ্টি রেখে বসেছিল।

সুধীর এবং মহিমের পরস্পরের মধ্যে কথা শেষ হ'লে মহিম বলেছিল—আমরা কোন হিরোইন-প্রধান বই খুঁজছি। সে রকম বই আপনার—

—আছে। পড়ে দেখতে পারেন।

—আপনি একখানা পছন্দ ক'রে দিন।

আমি দু-তিনখানা বইয়ের নাম করলাম। সুরূপা অকস্মাৎ মাথা তুলে বলে উঠল—না। উঠুন। আচ্ছা আসি।

বলে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—প্রণাম করব।

—আবার কেন?

—এইটেই তো নিয়ম! আর আমারও ইচ্ছে বটে। নইলে মনে হবে আপনিও রাগ ক'রে রইলেন। আমিও রাগ ক'রে চলে গেলাম।

—বেশ প্রণাম কর।

প্রণাম ক'রে চলে গিয়েছিল। জানালা দিয়ে দেখছিলাম সুরূপা নিজেই মোটরখানা ড্রাইভ ক'রে চলে গেল।

এইখানেই শেষ নয়। আরও দিন দুয়েক সে এসেছিল। টেলিফোনও করেছিল।

কথা সেই এক কথা। গল্পটা লিখে দিতে হবে।

আমি "না" বলে থাকি, এমন ক্ষেত্রে ধরেও থাকি, ধরেই ছিলাম। "না"-ই বলেছিলাম।

টেলিফোনে শেষ পর্যন্ত বলেছিল—আপনি অন্ততঃ শুনুন!

—না।

—কেন? একটা কাহিনী শুনে লিখবেন—। লেখেন না?

—লিখি। শোনা কাহিনী নিয়ে নিশ্চয় লিখেছি। কিন্তু ছবির জন্তে লিখি না—লিখব না।

—শুনবেনও না?

—না!

—আপনি যা—। থেমে গেল সে।

—কি? যা চাই তা দেবে? অর্থ তোমার হয়েছে—থাক। আমি চাইনে। তুমি আর টেলিফোন করো না।

আর টেলিফোন সে করেনি। দেখাও করেনি। আমিও সুরূপার কথা মনে রাখিনি। সুরূপা ছবির ক্ষেত্রে এমন কিছু করতেও পারেনি—যাতে সে তার কথা আমাকে মনে করাতে পারে। তবে মধ্যে মধ্যে কাগজে সিনেমা পত্রিকায় সাপ্তাহিকে সুরূপার ছবি দেখেছি। অনেক ছবি বেরিয়েছে। তা থেকে তার সঙ্গে সেদিনের কথাগুলি কোনক্রমেই জেগে উঠেনি। মনেও হয়নি যে সেদিন তার অনুরোধটা রাখলেই হত।

আজ দু-আড়াই বছর পরে টেলিফোন পেয়ে একটু চঞ্চলই হলাম। এই দু-আড়াই বছরের মধ্যে মেয়েটি নিশ্চয় খুব জোর দৌড়েছে জীবনে। জুয়ো খেলতে যে সব ঘোড়া রেসে দৌড়োয় তাদের মত। অনেক যত্ন অনেক পরিচর্যা অনেক খরচ করেও এই ভাগ্যবান ভাগ্যবতী অশ্ব ও অশ্বিনীকুল যেমন রেসে নেমে··· মুখ থুবড়ে পড়ে মরে—তেমনি ভাবেই দৌড়ুতে গিয়ে স্বরূপা বোধ হয় মুখ থুবড়ে পড়েছে। টি. বি. হয়েছে। হাসপাতালে মরছে। স্বরূপাও ওই রেসের ঘোড়া। টি. বি. অনাহারের রোগ, অনাচারের রোগ। অনাহার স্বরূপার নিশ্চয় ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য! আমাকে স্মরণ করেছে শেষ সময়ে।

কেন?

মেয়েটিকে মনে পড়ছে। রূপশাস্ত্রের যে ব্যাকরণ সে অনুযায়ী মেয়েটি সুন্দরী নয়; কিন্তু একটি শীর্ণ ক্লান্ত লাবণ্য আছে। রঙটি উজ্জ্বল মাজা। মাঝারি মাথায়, মেয়েটির লাবণ্যের সব দিক থেকে বেশী মাধুর্য তার সর্বাঙ্গব্যাপী একটি বিষণ্ণ ক্লান্তিতে।

চোখ দুটি আশ্চর্য স্বচ্ছ।

টি-বি হয়েছে। তবে কী বীজ তখনই তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল? করে থাকলেও তা মনে হয়নি। কোন সন্দেহ হয়নি।

গত দু-বছরের মধ্যে খবর আমি না রাখলেও কিছু কিছু খবর আপনি আপনি কানে এসে পৌঁছেছে। ওই রেসে দৌড়ুনোর মত দৌড়ুনোর খবর। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় সে আমাকে স্মরণ করলে কেন? বিস্ময়বোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই বিষণ্ণ ক্লান্তিটুকু স্মরণ করে বেদনাও অনুভব করছি।

দুই

সেই স্বরূপা মৃত্যুশয্যায় টি. বি. হসপিটালে আমাকে স্মরণ করেছে। কেন? আমাকে সে স্মরণ করবে কেন? জীবনে একবার মাত্র পরিচয়। তাকে পরিচয়ই বা বলব কি করে? আমার কাছে নিছক বেচাকেনার কারবারে ক্রেতার মত এসেছিল। সে কারবারে তার সঙ্গে আমার বনেনি, ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তা নিয়ে কি কিছু বলবার আছে তার? কি বলবে? ডাক্তার বললে—স্বরূপা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব ব্যগ্র।

কেন?

প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই আমার মনকে আলোড়িত করছিল। জীবনে অনেক মানুষ, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে, লেখকদের আপনার জন ভাবেন। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটা জেনেছি। অন্য লেখকদের কাছ থেকেও শুনেছি। গুণমুগ্ধেরা সই চান—ছবি চান—পত্র লিখে উত্তর চান, দূর থেকে আলাপ করতে চান, কাছে আসতেও চান; অনেকের কাছে শুনেছি—অনেক লেখকের জীবনী পড়ে পেয়েছি যে এর মধ্যে থেকে প্রেমও হয়েছে। অনেক মেয়ে

আজীবন ভালবেসে গেছে। আমার জীবনে আমি এ বিষয়ে একটু সতর্ক। আজ বার্ধক্যের কোঠায় পা দিয়েছি কিন্তু একদিন প্রেমের বয়স ছিল। সে বয়সেও আমার সতর্কতা ছিল। তার কারণ আমার নিজের ছিল পরিপূর্ণ সংসার। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে, তখন স্ত্রীর বয়স ছিল দশ। যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রতিষ্ঠা হয় তখন আমার বয়স বিয়াল্লিশ, স্ত্রীর বয়স ছত্রিশ। বড় ছেলে এম-এ পড়ত, কুড়ি বছর পার হয়েছে। ছোট বা মেজ আই এস-সি পাস করেছে। বড় মেয়ের বিবাহ দিয়েছি পনের বছরে; বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান জামাই। ছোট মেয়ে বছর দশেকের। নিজের মনকে নিজেকে শাসন করতে হত না; চারিদিকে পরিবারের স্নেহের জনতা সতর্ক প্রহরীর মত প্রহরা দিত। তাছাড়া আর এক শাসনকর্তা আমার ছিলেন, অভিভাবক ছিলেন—আমার ঈশ্বর, তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মা আমার দিকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন।

এ সত্ত্বেও মনের মধ্যে স্নেহেরই হোক বা প্রেমেরই হোক ক্ষুধা একটা ছিল। আজ সে ক্ষুধা নেই কিন্তু একদিন ছিল—নিশ্চয় ছিল; তাই কোন মুগ্ধ পাঠিকা নিয়মিত পত্রালাপ সুরু করলে দু-চারখানা সতর্ক গাম্ভীর্যপূর্ণ পত্রে সাহিত্য জীবন ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নোত্তরের পর যে মুহূর্তে ব্যক্তি জীবনের দরজায় সে করাঘাত করত—এবং আমি দরজা খুলতাম—সেই মুহূর্তেই তাকে মা বোন বলে সম্বোধন করে একটা এমন সম্পর্ক পাতিয়ে নিতাম যেটায় স্নেহ শ্রদ্ধায় শোধন করা দেহ-সম্পর্কহীন ভালবাসার আদান-প্রদানে কোন বাধা নেই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বোন সম্পর্কটাও আজ উঠিয়ে দিয়েছি। পুরানো কালের দু-চারজন বোন আছেন। কখনও কখনও হয়তো তাদের দিক থেকেই তাঁরা স্মরণ করেন ভাই-ফোঁটায় ফোঁটা দিয়ে যান। এখন সেকালও বিগত। এখন মেয়েরা শুধু মা আর কন্যা।

শোভাবাজারে আমার মা আছে অপর্ণা। বরানগরে মেয়ে আছে বুলু। তবুও সে যৌবন-কালে সম্পর্ক না-পাতানো দু-একজনকে পত্র লেখবার সময় এক-আধবার অসতর্ক মুহূর্তে গাঢ় কথা দু-চারটে লিখেছি কিনা হলপ করে বলতে পারব না। কিন্তু সুরূপার সঙ্গে কোন পত্রালাপই করিনি। যদি করতামও তা'হলে এমন কথা লিখেছে কিনা সন্দেহ করতাম না। কারণ তার সঙ্গে আমার দেখা যখন হয়েছে তখন আমার বয়স বাষট্টি পার হয়ে গেছে।

ঠিক বুঝতে পারলাম না সুরূপা কি সূত্র ধরে বা কি কারণে আমার সঙ্গে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেখা করতে চেয়েছে। মনে নানা কল্পনা একটার পর একটা এল গেল, কিন্তু কোনটাই ঠিক বলে মনে হল না। শুধু একটা কথা মনে কিছুটা সম্ভবপর বলে মনে হল।

হয়তো, মৃত্যুর আগে সে তার জীবনের কথা বলে যাবে। এ আকাঙ্ক্ষা অনেকের মনে আছে ও থাকে। জীবনের দুঃখ বেদনা জানিয়ে যেতে চায়। জীবনে যতকাল বাঁচল ততকাল যারা ভালবাসা পেলে না—স্নেহ পেলে না—সহানুভূতি পেলে না—তাদের অনেকেই চায় নিজের কথা বলে যেতে—উদ্দেশ্য সেটা লেখকের কলমে প্রকাশিত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজ দেশ এবং মানুষকে তিরস্কার করে যাবে। এবং লোকসমাজ দেশ তার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে, বলবে অন্যায় করেছি; পরলোক মানুক বা না-মানুক, এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তার

মনে এই কথাই থাকে যে মৃত্যুর পরও তার এতে পরিতৃপ্তি হবে।

অনেক জনের এমন চিঠি আমার কাছে আছে। এইভাবে দেখা করে মানুষ বড় একটা নিজের কথা বলে যায় না—অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিঠি লিখেই জানায়। তার মধ্যে পত্র-লেখকের ওই মনটাই অর্থাৎ মনের ওই আকাঙ্ক্ষাটাই বড় হয়ে ওঠে। সে পৃথিবীকে ভালবেসেছে, মানুষকে ভালবেসেছে, দেশকে ভালবেসেছে, বিনিময়ে অল্প কিছুটা ভালবাসা স্নেহ সহানুভূতি চেয়েছে, কিন্তু নিষ্ঠুর পৃথিবী নিষ্ঠুর মানুষ তাও তাকে দেয়নি। জীবনে সে পেয়ে গেল শুধু অবজ্ঞা অবহেলা উপেক্ষা।

অনেকে লেখে এ কথাও যে তবু সে এই শেষকালেও পৃথিবীকে হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা দিয়ে যাচ্ছে। চিঠিগুলি সুদীর্ঘ হয়; জীবনের কাহিনী সবই লেখা থাকে। তবুও এসব নিয়ে লিখতে পারিনি, লেখা যায় না বলেই ধারণা হয়েছে আমার। কারণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই জীবনের সব ভালবাসাটা সে নিজের উপর ঢেলে লিখেছে। পৃথিবীকে মানুষকে ভালবাসার কোন প্রমাণ কোন চিহ্ন বা অভিব্যক্তি তার মধ্যে পাইনি। মনে হয়েছে অনেক কথা ঘুরিয়ে লিখেছে, অনেক কথা লেখেনি গোপন করে গেছে।

দু-একজনের অকপট অভিব্যক্তি পেয়েছি। কিন্তু তাও অসমাপ্ত। যে জীবন বাস্তব যার প্রতি ঘটনাটি অকপট সত্য তার সমাপ্তি কল্পনা করতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছি। ভয় হয়েছে। হয়তো অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলব? কারণ এ যুগে জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে—সে ধারণা বাস্তবে কতটা সত্য তা জানি না, তবে নানান দেশের লেখা পড়ে, নানান মতবাদের প্রভাবে ধারণাটা মনে মনে সত্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে লেখক-মনে। মহাযুদ্ধের কাল থেকে সে ধারণা বা থিসিস অনুযায়ী—মানুষের সততা নাই, মানুষ সৎ নয়—জীবন জীবদেহাশ্রয়ী দেহবাদ এবং লোভ এই দুটোই শ্রেষ্ঠ এবং আসল নিয়ামক। সতী বল লক্ষ্মী বল ধার্মিক বল কর্মী বল—সব মানুষই অর্থমূল্যে অর্থাৎ লোভে অভাবে ক্ষোভে আত্মবিক্রয় করে অবলীলাক্রমে। অথচ আমার ঘরে আমার স্ত্রী রয়েছেন, কন্যা রয়েছেন, পুত্রবধূ রয়েছেন, ছেলেরা রয়েছেন। তাঁদের অহরহ দেখছি। শুধু আমিই বা কেন অন্য যাঁরা লেখেন, যাঁরা এতেই বিশ্বাস করেন—দেখছি তাঁরাও তো সুখে ঘর করছেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে; অগাধ বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত সুখ-নিদ্রায় রাত্রিযাপন করেন, পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাঁদের রান্না করা আহার্যে দিন দিন পরিপুষ্টিতে শ্রীমান হন; উল্লাসে হাসেন, নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কেউ নিন্দা করলে, সে নিন্দাকে অসত্য মিথ্যা বলেই তাতে ক্ষুব্ধ হন, রুষ্ট হন।

আমাদের গ্রামের গায়ত্রীকে চোখে দেখছি আজীবন। দরিদ্রের কন্যা কালো রঙ হলেও কুশ্রী নয়। বাপ মারা গেল। মেয়ে বিবাহযোগ্যা। মা বহু কষ্টেই বিবাহ দিলেন। কিন্তু পাত্র চরিত্রহীন। সে তাকে নিলে না। গায়ত্রী চোদ্দ বছর বয়স থেকেই গ্রামে পাড়ায় এর বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ রান্না ক'রে, এর ওর বাড়ীর জল তুলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মা ভাইদের মুখে আহার যুগিয়ে এল। ভাইকে গ্রামের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করালে। কিন্তু গায়ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে অতি সন্দেহবাদীও কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, একটি

ক্ষেত্রে গায়ত্রীর নিন্দা করতে পারে আধুনিক যুগের মানুষ। গায়ত্রীর মাথা নত হয়ে আছে ভগবানের চরণধূলার তলে নয়—মানুষের পায়ের দিকে। সে বিনত। নম্রতার মধ্যে দীনতার দৈন্য আছে। তার হাত শুধু আশীর্বাদের জন্যই অঞ্জলিবদ্ধ হয় না—বস্তুর জন্যেই অঞ্জলি পাতে সে। অভাবের তাড়নায় কাঙালপনাটা তাকে আশ্রয় করেছে। তবে সে ভিক্ষাই চায়; কখনও নিজেকে বিক্রি করে উপার্জন করে না। যে সমাজের বিধিব্যবস্থায় মানুষকে এমন কাঙাল করে সে সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যাক। গুঁড়ো হয়ে ধুলো হোক। সে গুঁড়ো করবে এই মানুষেরাই। সুতরাং সব মানুষ লোভে ক্ষোভে অর্থমূল্যে বিক্রি হয়ে গেল—এ কথা সত্য বললে তার থেকে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না। গায়ত্রী মাত্র একটা নয়। গায়ত্রী অনেক আছে। এই ধারণা বা থিসিস্ সত্য বলব কি করে! বরং আশঙ্কা হয়—হয়তো বা এই থিসিসটাকে আগামী কালে সত্য করে তুলব আমরাই।

তাই এমন কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে যা অসমাপ্ত তাকে সমাপ্ত করতে চাইনে।

সুরূপার জীবনে সে যেখানে এসে পড়েছে এবং তার সম্পর্কে নানানজনের মুখে এই জগতের সংবাদ পরিবেশকদের মাদকতাশ্রিত সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে যে তথ্য পেয়েছি তাতে তার জীবনে উত্তেজনাত্মক বিস্ময়কর অনেক কিছু আছে। কিন্তু যারা দারিদ্র্যের মধ্যে, অভাবের মধ্যে প্রাণপণে লড়াই করে যায় তাদের সঙ্গে কোন মিল নেই। বড় জোর পাব দুটোর একটা। নিষ্ঠুর ক্ষোভে সে অধঃপতিত স্বামীর কাছ থেকে বিদ্রোহ করে এসে এই পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে; যার ফলে অভিনয় শুধু সে পর্দার বুকেই করে গেল না। নিজের জীবনটাকেও অভিনয় করে ফেললে। অথবা কাউকে ভালবেসে তারই প্ররোচনায় এসে এই ভাবে সব দিয়ে বাইরের জীবনটাকে মিথ্যা করে ভিতরের জীবনে বিচিত্রভাবে সত্যকে পেয়ে গেল।

* * * *

ভাবতে ভাবতেই গিয়ে পৌঁছুলাম হাসপাতালে। ডাক্তার সেন—বয়সে সবে যৌবন পার হয়েছেন—বিদেশী ডিগ্রিধারী বিচক্ষণ চিকিৎসক এবং অমায়িক ভদ্রলোক। তিনি আমার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলেন। নইলে এটা তাঁর বিশ্রামের সময়। তাঁর নিজের ঘরে বসিয়ে হেসে বললেন—আপনার কষ্ট হল—এই দুপুরে আসতে, কিন্তু আমার লাভ হয়েছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলাম। সৌভাগ্য তো বটেই। অন্য সময়ে এলে আবার নিজের সময় মিলত না।

এ সব কথা সচরাচর অত্যন্ত ফর্মাল হয়ে থাকে। কিন্তু ডাঃ সেনের কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। আমি বিব্রত হলাম বললাম—এ ভাবে বললে লজ্জা পেতে হয়। আলাপ করার সৌভাগ্য বলতে গেলে তো আমারও। আপনার নাম আপনার খ্যাতি তো কম নয়!

তার উত্তরে তিনি নিজেকে আরও বিনীত করতে চাইলেন, কিন্তু সে কথা থাক; এ পর্বটা শেষ করেই তাঁকে বললাম—সুরূপা মেয়েটি কি সত্যিই বাঁচবে না? এমন অবস্থা খারাপ হয়ে

গেল—অথচ ওর তো অবস্থা খারাপ নয়—সময়ে চিকিৎসা করাতে পারত। এবং করালে তো একালে রোগটা সেকালের মত দুঃসাধ্য দুরারোগ্য নয়—ভাল হয়ে যেত। তা করায়নি কেন?

ডাক্তার বললেন—ওঁর একটা অপারেশন হয়েছে। সেটা যেন ঠিক স্ট্যাণ্ড করতে পারছেন না। সেটা স্ট্যাণ্ড করতে পারলে বেঁচে যাওয়ার কথা! সকালের দিকে যখন আপনাকে ফোন করি—তখন পর্যন্ত অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। সবথেকে বড় কথা ছিল রেস্টলেস্‌নেস। জানেন কিনা জানি না অপারেশনের পর—একটা সময় পর্যন্ত পেসেণ্ট অজ্ঞান হয়ে থাকে—জ্ঞান হবার উপক্রম হলে আমরা ইনজেকশন দিয়ে গাঢ় ঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। হাত পা বাঁধা থাকে। ওঁর সে সময়ের পরও ব্লিডিং হয়েছে; এবং রেস্টলেস্‌নেস। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো বাঁচাতে পারব না! তারই মধ্যে বারবার আপনার নাম করেছিলেন। এবং—। একটু হাসলেন ডাক্তার।

হেসে বললেন—খ্যাতি আছে সমাদর আছে মানুষের কাছে—এ সব ক্ষেত্রে মরব মরব একটা বাতিকও থাকে। সেটা মরবার ভয় খানিকটা বটে। কিন্তু তার থেকেও লোকের কাছে সমাদর সহানুভূতির আবদারও বটে। সেইটেই বেশী।

কথাটা হয়তো অনেকটা সত্য! কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। সুরূপা ফিল্ম-এ্যাক্‌ট্রেস্‌, তার পক্ষে এটা হয়তো সত্য হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মৃত্যুতত্ত্ব-সন্ধানী অনেকে আছেন তাঁদের পক্ষে কথাটা সত্য নয়। সে কথা থাক। তর্ক ডাক্তার সেনের সঙ্গে করলাম না, বললাম—ওকে তা হলে একটা খবর দিন; যদি জেগে থাকে—

—খবর দেওয়া আছে। ঘুমুচ্ছে এখন। জাগলেই নার্স আমাকে খবর দেবে। একটু বসতে হবে আপনাকে।

—বসতে হবে? কতক্ষণ বলতে পারেন?

—তা একঘণ্টা হতে পারে। তার বেশী হবে না।

—তাহলে ও আরও একটু সুস্থ হোক না। তারপর একদিন আসব।

—না তাহলে হয়তো উত্তেজিত হবেন। চেঁচামেচি করবেন। বলবেন আমাকে জাগালেন না কেন? জানেন তো এরা এমন আবদেরে হয়! অনিষ্ট হত বললে মানবে না, বলবে হোতো তো হোতো। আমার হোতো। অন্য পেসেণ্টকে ধমক দিয়ে রাখা যায়, এদের যায় না। লীডার-টিডার বা আপনাদের মত যাঁরা হন তাঁরা গার্জেনের মত আমাদেরই হুকুম করেন, মানে দৃপ্তভঙ্গিতে আইন অমান্য করেন—আর এঁরা আদুরে ছেলের মত আবদার ধরে আইন ভাঙেন—আমাদের চুপ করতে হয়।

কথাগুলো একান্তভাবে সময়ক্ষেপের জন্যই ডাক্তার সেন বলে যাচ্ছিলেন তা যে-কেউ হোক বুঝতে পারত। এবং তিনি তা গোপন করতেও চাননি। চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। এসেছি যখন তখন সত্যিই কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে অধীরতা প্রকাশ করে চলে যাওয়ার অর্থ হয় না। আমার আপনার জন হলে পারতাম না।

বাইরের বাড়ী-ঘরগুলি দেখছিলাম। আগেও একবার এখানে এসেছি। পরাধীনতার সময় অনেক দৈন্য এবং অভাবের মধ্যে জনসাধারণের বদান্যতায় এবং কয়েকজন অক্লান্ত কর্মী মহাপ্রাণ চিকিৎসকের চেষ্টায় ও প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল হাসপাতালটি। বাংলাদেশে তখন একমাত্র এই একটি টি-বি হাসপাতাল ছিল। ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। তারপর এখন এই স্বাধীন দেশে এর অনেক উন্নতি হয়েছে। নানান দাতার নামাঙ্কিত ওয়ার্ডগুলির নাম পড়ছিলাম। ওদিকে কটেজগুলি দেখা যাচ্ছে।

আমাকে বাইরের বাড়ী-ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার বললেন—চলুন না দেখে আসবেন একটু ঘুরে। আগে একবার দু'বার এসেছিলেন সেটা শুনেছি। কিছু আপনার দেওয়া বইও দেখেছি লাইব্রেরীতে। একবার কখন বিজয়া সম্মেলনীতেও এসেছিলেন, মুখে মুখে কথাটা এখনও বেঁচে আছে। তখন কি দেখেছিলেন সব ঘুরে?

—দেখেছিলাম। তখন অবশ্য অনেক ছোট ছিল।

—তাহলে চলুন। একবার ঘুরে দেখুন।

—চলুন।

বেরিয়ে পুরনো সাবেক আমলের ওয়ার্ডটিতে নিয়ে গেলেন ডাক্তার সেন। মনে পড়ে গেল এই ওয়ার্ডে একটি রোগীর কথা। বড় কষ্ট হয়েছিল দেখে। বুকের পাঁজরা কেটে অপারেশন হয়েছিল তার। হাত পা খাটের সঙ্গে বাঁধা ছিল। হাতে রবারের টিউব শিরায় ঢুকিয়ে রক্ত দেওয়া হচ্ছিল। অজ্ঞান রোগীটির মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছিল। তার সঙ্গে একটা যন্ত্রণা-কাতর গোঙানি। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। ডাক্তারবাবু যিনি সেদিন সঙ্গে ছিলেন তাঁকে বলেছিলাম—চলুন—ডাক্তারবাবু। চলুন।

চলে শুধু ওই ঘর থেকেই যাইনি—আর কোন ঘর দেখিনি, দেখতেও চাইনি।

—স্যার!

কে পিছন থেকে স্যার বলে ডাকল। ডাক্তার সেন পেছন ফিরে তাকিয়ে একজন হসপিটাল স্টাফকে দেখে বললেন—কি?

—ঘুম ভেঙেছে। নার্স খবর দিতে বললেন।

—ও! আচ্ছা বলগে—আমরা আসছি। ওঁকে একটু দেখাচ্ছি সব। হয়ে গেলেই যাচ্ছি।

—খুব ব্যস্ত হয়েছেন স্যার। নার্স বললেন—এক্ষুনি আসতে।

—এখুনি আসতে হবে—

আমি বললাম—তাই চলুন।

কটেজের মধ্যে বিছানায় শুয়েছিল স্বরূপা। তার বিছানার পাশে রক্ত দেওয়ার যন্ত্রটা এখনও খাড়া হয়েই রয়েছে। ঘণ্টা কয়েক আগে পর্যন্ত রক্ত দিতে হয়েছে। তার ছিল মাজা রঙ—সে রঙ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলগুলি বাতাসে উড়ছে। শরীর শীর্ণ হয়ে

গেছে। ঠোঁট দুখানি শুকনো নীরস এবং তামাটে রঙের হয়ে গেছে। চোখ দুটিতে ঘোর রয়েছে। পাতা যেন থাকতে থাকতে নেমে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু চোখের সাদা অংশটা আশ্চর্য দীপ্ত এবং কালো তারা দুটি যেন তরল হয়ে টলটল করছে মনে হচ্ছিল। ঘরের দরজার দিকেই সে তাকিয়েছিল আমার প্রত্যাশায়। আমি ঢুকতেই চোখের পাতা দুটি ক্ষণেকের জন্য ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল মনে হল। চোখ দুটি জ্বলে উঠল প্রদীপের বাড়িয়ে দেওয়া শিখার মত। মধ্যে মধ্যে ইলেকটিক লাইনে হঠাৎ ভোল্টেজ বেড়ে গেলে বাল্বের আলো যেমন উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে তেমনিভাবেই দীপ্ততর হয়ে উঠল মনে হল।

সামনে একখানা চেয়ার রাখা ছিল আমি সেইটেতে গিয়ে বসলাম। দেখলাম, স্বরূপা স্তব্ধ হয়েই আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

—আমি বললাম—আমাকে—

সে মৃদু স্বরে বললে—হ্যাঁ ডেকেছি। দেখতে চেয়েছি।

উত্তরে কি বলব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেন? এ প্রশ্ন করতে বাধছিল। মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা রূঢ় হবে। অবশেষে একটা কথা খুঁজে পেলাম।—বল। তারপরই বললাম—বয়সে তুমি আমার ছোট মেয়ের চেয়েও ছোট। তুমি বললাম। কিছু মনে করো না।

একটু হেসে উঠল তার মুখ। সেই হাসিমাখা মুখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কি যেন একটা রহস্যের কুয়াসা ওই দৃষ্টির আলোয় আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠতে সুরু হল। আমি এর অর্থ যেন শীতের ভোরে কুয়াসার মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। শীতের সকালে কুয়াসা জাগে—ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে যেমন চোখের সামনে যা-কিছু দৃশ্যমান সব ঢেকে ফেলে—তেমনিভাবে আমার মনের সব অনুমান ঢাকা পড়ে গেল। এমন কি ওই মেয়েটিও যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল।

একটু অসহিষ্ণু হয়েই বললাম—কি বলছ বল?

সে বললে—আমার গল্পটা দিলেন না তো?

খুব মিষ্ট করে বললাম—সংসারে পরের গল্প কি পরে লিখতে পারে? শুনে কি জানা হয়? না—সে জেনে কি লেখা হয়?

—কল্পনা করে তো লেখেন।

—লিখি। কিন্তু সে কল্পনা নিজের। কল্পনা তখন বাস্তব থেকেও সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পরের কল্পনা—নিজের করা যায় না।

—আমি মরে গেলে আমার জীবন নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লিখবেন—বলুন।

সহজে হ্যাঁ বলতে পারলাম না। আজ কাল অনেক সিনেমা স্টার নিজের জীবনকথা লিখছেন। তার মধ্যে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি—তাতে কতকগুলো ঘটনাই পাই, জীবন পাই নে এবং তার মধ্যে দিনের আলোর উত্তাপও পাইনে—রাত্রির অন্ধকারের বেদনার্ত হিমস্পর্শও পাইনে। আকাশে নক্ষত্রের ঝিকিমিকিও থাকে না—গাছের তলার ছায়ার মধ্যে চিরন্তনকালের আভাসও নেই। থাকে স্টুডিয়োর বা সাজানো ঘরের মধ্যে ঝকমকে ফ্লাস

লাইটের আলো অথবা রাত্রিকালে নীলাভ আলোর কৃত্রিম অন্ধকার। এ নিয়ে লেখবার প্রতিশ্রুতি দিতে মন সায় দিচ্ছিল না। অথচ একটি মরণপথযাত্রিণীর শেষ অনুরোধ তাই বা উপেক্ষা করি কি করে!

আমার দৃষ্টি চিন্তায় মধ্যে বাস্তবকে হারিয়ে ফেলেছিল। সুরূপার মুখও আমি দেখছিলাম না।

হঠাৎ সুরূপা বললে—সুতপা বলে একটি ছোট মেয়ে—ভাল অভিনয় করত, খুব প্রগল্‌ভা ছিল। নাচত, গান করত ভাল, তাকে মনে পড়ে? দশ বছরের সুতপা—পাটনা—

চমকে উঠলাম।

তিন

সুতপা? পাটনা? পাটনার সুতপা দশ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি। সাজগোজে প্রসাধনে সেই দশ বছর বয়সেই সে হয়ে উঠেছিল পটিয়সী। নাচে গানে তখনই সে বাঙালী সমাজে খ্যাতিমতী। আমিই তাকে একদিন বলেছিলাম তোমার নাম সুতপা না হয়ে সুরূপা হওয়া উচিত ছিল। সেই নামেই সে নিজেকে পরিচিত করেছে পরবর্তী জীবনে! আশ্চর্য, কথাটা আমার মনেই হয়নি। আমি ওকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

ভুলে যাবারও কোন দোষ নেই—আক্ষেপও নেই সেজন্য। পনের বছর আগে দেখা দশ বছরের মেয়ে—তাকে মনে থাকার কথা নয়। জীবনে রূপ দিয়ে লাস্য দিয়ে হাস্য-কটাক্ষ দিয়ে পুরুষের মনে রেখাপাত করবার কোন শক্তিই থাকে না—দশ বছরের মেয়ের। ওখানে নারীর আসল মূলধন পূর্ণ নারীত্ব;—যৌবন—, অন্তত কৈশোর অতিক্রম করবার অবস্থা না এলেও মূলধনের উপর অধিকার বর্তায় না।

এতকাল পরে—মনে পড়ানোয় মনে পড়ছে। পাটনায় সরকারী চাকুরে ছিলেন—সুতপার বাবা সৌরীন চক্রবর্তী। আপার গ্রেডের ক্লার্ক হয়ে বেহার সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছিলেন। ওখানে কয়েক পুরুষ ধরেই প্রবাসী। ছাত্র হিসেবে খ্যাতি ছিল; তরুণ হিসেবে অতি আধুনিক বলত লোকে; প্রবাসী বাঙালীদের জীবনধারায় ইংরিজীর প্রতি অনুরাগের স্রোতটা চিরদিনই খরস্রোতা; সেটা নিশ্চয়ই চাকরির জন্য। সেজন্য দোষ তাঁদের নেই। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববন্দিত হওয়ার পর থেকে তরুণ সমাজ বাংলা সাহিত্যের উপর ঝুঁকেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও আধুনিকতমদের ইংরিজী ও কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের আদর্শ অনুকরণের ঝোঁকটা ছিল প্রবলতর। সৌরীন চক্রবর্তী বি-এ পড়তে পড়তে আধুনিকতম ইংরিজী সাহিত্যের বড় পড়ুয়া বলে ছাত্র সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই নাক হয়ে গিয়েছিল উঁচু বা ওল্টানো। লোকে ব্যঙ্গ করত—কিন্তু মনে মনে একটু সপ্রশংস বিস্ময়ও অনুভব না করে পারত না। ভাবত এবং বলাবলি করত—ছেলেটি জীবনে একটা

কেউকেটা হবেই। সৌরীন চক্রবর্তী নিজেও তাই ভাবত। তার বাক্য ছিল বড়শীর মত বাঁকা এবং সূঁচের মত চোখা। উনিশশো আটত্রিশ উনচল্লিশ সালে—সে মনে মনে নিজেকে শেষের কবিতার অমিট রায়ের কল্পনার নিবারণ চক্রবর্তী মনে করত। বন্ধুবান্ধবেরা ওই নামটাই তাকে দিয়েছিল—সে সেটা সূক্ষ্ম মুখে হাস্য টেনে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণও করেছিল।

পাটনা আমার মামার বাড়ী। শীতের সময় সেখানে বছরে একবার করে যেতাম। সাহিত্যিক হিসেবে তখন আমার খ্যাতি সদ্য সদ্য হচ্ছে। ছেলেদের মহলে সমাদর পাচ্ছি। আমি সেখানে গেলে ছোট ছোট দলে ছেলেরা আসত। ১৯৩৭।৩৮ সাল—আমারও বয়স তখন চল্লিশ-একচল্লিশ। তরুণদের সঙ্গে মিশতে ছন্দপতন ঘটত না। এসব কথা আমি ছেলেদের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। সৌরীনের সঙ্গে আলাপ তখন হয়নি। সে আসত না। ছেলের দলের পাণ্ডা গুণীন্দ্র আমাকে বলেছিল তার কথা। শুভেন্দু বলে তরুণ লেখকটি আমার ভক্ত ছিল। সে একদিন আমাকে বলেছিল—'এখানে একটা দল আছে—তারা আপনাকে গ্রাম্য বলে ;—লাউড বলে।' মধ্যপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে গুণী হেসে বলেছিল —ও নিবারণ চক্কোত্তির কথা ছাড়।

—নিবারণ চক্কোত্তি—?

আমরা নাম দিয়েছি। ওর আসল নাম—সৌরীন চক্কোত্তি।

গুণীর কাছ থেকেই সবিস্তার শুনেছিলাম—সৌরীন চক্কোত্তিও একদিন এসেছিল আমার কাছে। কথা খুব বলেনি। প্রায় চুপচাপ বসে সিগারেট টেনেছিল এবং আমার সঙ্গে অন্যদের কথাগুলিই শুনে গিয়েছিল। বুঝতে আমার বাকী থাকেনি যে, আমার সামনে অন্য ছেলেরা সিগারেট খায় না কিন্তু ও খাচ্ছে আমাকে অবজ্ঞা করবার জন্য এবং আমার কথাগুলি নীরবে শুনে যাচ্ছে আমাকে তার মনের কষ্টিপাথরে যাচাই করবার জন্য।

তারপর দু-বৎসর আর সৌরীনের সংবাদ বিশেষ রাখিনি। কেউ দেয়ওনি। কারণ দেওয়ার মত সংবাদ ছিল না সৌরীনের বা নিবারণ চক্রবর্তীর। কারণ এর পর এম. এ. পরীক্ষায় পাসের খবরটা তার পরিচিত মহলে উল্টো বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ পরীক্ষায় সে আদৌ অসাধারণ বলে নিজেকে প্রমাণিত করতে পারেনি। মুড়ি-মিছরির মধ্যে মিছরি না হয় বলা যায় কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এবং মিছরির দামও সেকালে গণ্য করার মত ছিল না। সংসারে মানুষের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ সবই আছে, অস্বীকার করা যায় না এ কিন্তু তাকেই মানুষ বড় করে তোলে না। তুললে মানুষ হত না। সৌরীন চক্রবর্তীর পরীক্ষার ফলে সমাজে যে উল্টো বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে এই কারণেই উল্লাসের পরিবর্তে বেদনাই অনুভব করেছিল সকলে। কথাটা কেউ কাউকে উৎসাহের সঙ্গে দেয়নি, দিতে চায়নি। চল্লিশ সালে, আমার তখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখন আর আমার বছরে বছরে শীতকালে পাটনা যাওয়া ঘটে না। সে সময় গুণীর সঙ্গে সৌরীন কলকাতায় এসে একবার আমার কাছে এসেছিল। সেবার আর সে আমার সামনে সিগারেট খায়নি বা স্বপ্নালু নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখেনি কি নীরবে কথাবার্তা শুনে যায়নি।

কথাবার্তা নিজেই বলেছিল। আমি তাকে আপনি বলে কথা বলতে সে হেসে সবিনয়েই বলেছিল—গুণীকে আপনি তুমি বলে কথা বলছেন—আমাকে আপনি বলছেন কেন ?

এতে খুশী হওয়া স্বাভাবিক। খুশী হয়েছিলাম। অনেক কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গে। আমার লেখা তার ভাল লেগেছে একথা বারবার করে বলেছিল। আলোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত কুশল এবং অন্য প্রশ্নও আসে, সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কি করছ এখন ?

হেসে বলেছিল—কিছু না!

গুণী বলেছিল বেচারীর বি-এ, এম-এ পরীক্ষার ফল ভাল হল না। মানে যা expect করেছিল—তেমন কিছুই হল না। কি করবে ভাবছে। আমরা বলছি ও university পরীক্ষার ফল কিছু নয়। তুমি Competitive examination দাও। I. C. S.। তাও বলছে—না।

বলেছিলাম—কেন ?

সৌরীন হেসে বলেছিল—এটাকে মানতাম না এখন মানি। বলে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপাল স্পর্শ করেছিল।

এরপর কিছুদিন সৌরীনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে চেয়েছিল যেন। কিছুদিন ধরে সে পত্রালাপ চালিয়েছিল। পত্র লিখত নিয়মিত। প্রথম পত্রটা আজও মনে পড়ছে। সম্বোধনে শ্রীচরণেষু, লিখে প্রথম ছত্রেই লিখেছিল—কাকা আমার প্রণাম নেবেন। আমার পত্র পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হবেন এবং সম্বোধন ও প্রথম ছত্র পড়ে খুবই বিস্ময় অনুভব করবেন। বিস্ময় আমারও কম হয়নি। লিখবার সময় সানন্দ কৌতুক অনুভব করছি। কলিকাতা থেকে জীবনে বিফলতার হতাশার মধ্যে যখন আপনার কথা মধ্যে মধ্যে আমার মনে হচ্ছিল তখনই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলাম যে, আপনি এবং আমি একই বংশোদ্ভূত এবং সম্পর্কে আপনি আমার কাকা হন। অবশ্য তফাত অনেক পুরুষের। আমরা ঢাকা বিক্রমপুর থেকে এখানে এসেছি তিনপুরুষ আগে। সেখানে এখনও আমার পিতামহের সহোদরদের বংশধরেরা বাস করেন। আমার ঠাকুর্দার ছোট ভাই বেঁচে আছেন সত্তর বছর বয়সেও সক্ষম মানুষ। তিনি গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে এসে আমাদের বাড়ীতে উঠেছেন। জন্মেছেন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীতে কিন্তু বাঁচাটা তো পুরো বিংশ শতাব্দীতে। তবু লোকটি এইটিন্থ সেঞ্চুরীর শেষ ভাগ কিম্বা নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীর প্রথমার্ধের লোক। গোঁড়া হিন্দু। মনে মনে বঙ্কিমচন্দ্রেরও আগের মানুষ। ইংরিজী জেনেও জানেন না। পড়েন না। ভুলেই গেছেন। সকাল থেকেই ধর্মের আচার আচরণ নিয়ে থাকেন। গায়ে জামা পরেন না। দারুন শীতেও না। নিজে হাতে রান্না করে খান। তাঁর উনোন পর্যন্ত রান্না চড়াবার আগে গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিতে হয়। আমাদের উনোনেও রান্না করে খাবেন না। আমার মা একটা তোলা উনোন দিয়েছেন। স্নান না করে তিনি শ্বশুরের কোন কিছু ছোঁন না।

শুধু এই নয়, কথায়বার্তায় তাঁর সব সেকাল এবং পরকাল। বাবার সঙ্গে বসে সে-কালের কথাই আলোচনা করেন। কৌতুক এবং কৌতূহল বলেই আমি তাঁর কাছে বসে

গল্প শুনি। একটা সত্য উপলব্ধি করলাম এই যে, মানুষটি বড় শান্ত এবং ততোধিক শক্ত। সহ্যশক্তি অসীম বলে শোনা যায় কিন্তু দেখা যায় না। এঁর মধ্যে সেটা দেখলাম। মুখে একটি প্রসন্ন স্মিত হাসি আছে সেটি শিবের কপালের এককলা চন্দ্ররেখার মত লেগেই আছে তার উদয় বা অস্ত নেই।

এই এঁর কাছে একদিন একটি বিচিত্র জিনিস দেখলাম। প্রকাণ্ড বড় ম্যাপের মত সাইজের একখানা কাগজ। পুরানো অনেকদিনের জিনিস, তলায় আটা দিয়ে কাপড় সাঁটা। ইতিহাসের পৃষ্ঠার বংশ-বিবরণীর মত বংশ-বিবরণী। উনি নাম বললেন কুর্শীনামা। কথাটা আমিও শুনেছি কিন্তু মনে ছিল না। জিনিওলজি এবং তার বাংলা প্রতিশব্দ বংশ-বিবরণী কথাটাই মনে ছিল। বললেন—আমাদের রামেশ্বর চক্রবর্তীর কুর্শীনামা। উনি দেখাচ্ছিলেন বাবাকে সেই আমাদের গোত্রের আদি ঋষি শাণ্ডিল্য থেকে আরম্ভ। একে একে অন্য শাখাকে বাদ দিয়ে রামেশ্বর চক্রবর্তীতে এসে তাঁর থেকে গোটা বংশটির একটা পূর্ণ বিবরণ।

বৃদ্ধ এই কর্মটিকে আজীবন নাকি নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছেন। শুনলাম সংবাদ রাখতে উনি অনেক টাকার পোস্টেজ খরচ করে থাকেন। রিপ্লাই পোস্টকার্ডে পত্র দেন রামেশ্বর চক্রবর্তীর সন্তানদের—। অনুরোধ করেন তাঁদের সন্তানাদির বিবরণ যেন অনুগ্রহ করে জানান। একবার দুবার তিনবারও লেখেন। উত্তর সব ক্ষেত্রে পান না; না পেলেও যাঁরা উত্তর দেন তাঁদের কাছ থেকেও নিরুত্তর জ্ঞাতিদের সংবাদ সংগ্রহ করেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত জ্ঞাতিদের বাড়ী গিয়ে এসেও খবর নিয়ে কুর্শীনামা সম্পূর্ণ করেন।

বিস্তৃত বা বিপুল বিস্তার ব্যাপার। জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেস থেকেও বিস্তার বেশী। বংশ তো এক থেকে দুই থেকে চার নিয়ম মেনে চলে না। আমার ঠাকুর্দার চার ছেলে। আমার বাবার পাঁচ। অবশ্য নিঃসন্তান নির্বংশও অনেক হয় কিন্তু তার চেয়ে বংশবৃদ্ধির সংখ্যা বেশী। আমি বিস্ময়ের এবং কৌতূহলের বশে বেশ মন দিয়েই দেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নিচের দিকে একটা নাম দেখে থমকালাম। নামটা আপনার নাম। পাশে লেখা (নবগ্রাম বীরভূম বড় লেখক)। কিছুক্ষণ, লেখা শব্দ কয়েকটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, ইনি আমাদের বংশের লোক? তিনি বললেন, কে? বললাম এই যে! ঝুঁকে পড়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ গো! ভদ্রলোকের আজও চশমা লাগে না।

তারপর বললেন—এদের সঙ্গে তো বেশী ছাড়াছাড়ি নয় আমাদের। পাঁচ পুরুষ আগে শিব চক্রবর্তী। তার বারো জন সন্তান। চার বিবাহ। তার মধ্যে বাড়ীতে যে পত্নী থাকতেন তার তিন পুত্র। একজন কৃষ্ণচন্দ্র একজন রামচন্দ্র একজন ইন্দ্রচন্দ্র কনিষ্ঠ রাজচন্দ্র। আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ। আমার পিতামহ। তিনিই ভিটেতে ছিলেন। রামচন্দ্র কুলীন সন্তান হিসেবে বিবাহ করেছিলেন পাঁচটি। তার মধ্যে নবগ্রাম সরকার জমিদারদের বাড়ীতে একটি আর কুঞ্জঘাটায় একটি আর একটি বাঘডোলায়। সেও ওই রাঢ় অঞ্চলে। এই তিন শ্বশুর বাড়িতেই তাঁর স্থান ছিল অধিকাংশ সময়। এই নবগ্রামে তাঁর দুই পুত্র। সম্পর্কে আমার তোমার পিতামহের খুল্লতাত। তাঁরা দুই ভাই মাতুলালয়ে বাংলা এবং ফরাসী পড়ে

সে আমলে উকিল হন। জমিদারী জমি পুকুর কিছু মাতামহ দিয়েছিলেন। তারপর এঁরা নিজেরা উপার্জন করে বেশ সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। এই দুই ভাইয়ের কনিষ্ঠ যিনি তাঁর নাম দীনদয়াল। তাঁর একটি পুত্র, নাম হরিদাস। হরিদাস সম্পর্কে তা হলে আমার দাদা। তোমার বাবার জ্যেঠা বা কাকা হবেন। তাঁর ছেলে ইনি। এখন বড় লেখক হয়েছেন। সম্পর্কে তোমার বাবার ছোট ভাই। তোমার খুল্লতাত।

সত্য কথা বলতে ভারী আনন্দ হল এবং হয়েছে আমার। যখন আপনি এখানে এলেন আপনার সঙ্গে আমি প্রথম দেখা করি তখন অতি আধুনিকতার নেশায় ইংরিজীয়ানার অহঙ্কারে দম্ভে আপনাকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিলাম; সজ্ঞানেই। ঠিক স্বভাব বা অন্যমনস্কতা বশে নয়। আপনি তা লক্ষ্য করেছিলেন তাও আমি জানি, গুণীদের দু'এক জনের কাছে তা' বলেওছিলেন, তাদের কাছ থেকে সেও শুনেছিলাম। তারপর আপনার হল অভ্যুদয়। স্বীকৃতি পেলেন প্রায় সকলজনের। পরপর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আমারও ভাঙল অহঙ্কার। এবং সত্য বলব আপনার লেখা ভাল করে পড়ে দেখে ভালও লাগল। ওটা অবশ্য হয় এটা আপনিও মানবেন। যা নতুন, যা অভ্যস্ত স্বাদ ও গন্ধের থেকে পৃথক, তার স্বাদ গন্ধে অভ্যস্ত না হলে ঠিক তাকে ভাল লাগানো যায় না। একদিন একজন অধ্যাপক ভারী ভাল কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন দেখ "অবনীন্দ্রনাথ যখন ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রবর্তন করলেন তখন তার সুকুমার রূপটি অতি অল্প লোকের চোখেই ধরা পড়েছিল। অধিকাংশ লোকই তাকে খারাপ বলেছিল তাকে ব্যঙ্গ করেছিল। ক্রমে লোকে দেখে দেখে যখন অভ্যস্ত হল তখন তার রূপকে আবিষ্কার করলে! এঁর সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা। আজ যা বলছ বা যে মত পোষণ করছ সেটা হল তোমার এতকালের গল্প উপন্যাসের সে স্বাদ গ্রহণে তুমি অভ্যস্ত সেটা থেকে তৈরী। ক্রমে নতুন স্বাদে অভ্যস্ত হলে দেখবে যে, মত পালটাবে। তখন সঠিক বিচার করতে পারবে।"

আমার সত্যি সত্যিই তাই ঘটেছিল। নইলে পরীক্ষার ব্যর্থতায় লজ্জা যতই হোক, দম্ভে যতই আঘাত লাগুক আপনার কাছে বিনত বা বিনীত হবার মত মানুষ আমি নই। মত বদ্‌লেছিল সেই জন্য। সেই কথাটা বলতেই গিয়েছিলাম সেদিন গুণীর সঙ্গে। কিন্তু বিনয় প্রকাশ করেও ঠিক মনের কথাটা বলতে পারি নি। আপনার মনের কাছেও ঠিক যেতে পারি নি। আপনিও কি কাছে পৌঁছুবার মনের দরজাটা খুলেছিলেন? মনে হয় খোলেন নি। অন্ততঃ আমি যেন খোলা পাই নি। ভিতর থেকে খিল হয়তো দেওয়া ছিল না, ততখানি ছোট আপনি নন; হয়তো ভেজানোই ছিল কিন্তু আমি ওই দেখেই নিরস্ত হয়েছিলাম—সে দরজায় হাত দিই নি। বাইরে থেকেই ফিরে এসেছিলাম। মনে এ নিয়ে একটা কিছু কাঁটার মত খচখচ করছিল। তাই হঠাৎ এই সংবাদ বা তথ্যটা জেনে আনন্দের আর শেষ নেই আমার। আপনি আমার কাকা। আমার জ্ঞাতি, এক বংশে আমাদের জন্ম। গৌরবও বোধ করছি মনে মনে। আমার পিতামহটি বললেন—পাঁচ পুরুষ তফাত তোমার সঙ্গে, এখনও তাঁদের সঙ্গে আমাদের দশরাত্রি অশৌচ হয় শাস্ত্র অনুযায়ী।

চিঠি অনেক বড় হয়ে গেল। মনের আবেগে লিখে ফেললাম। প্রণাম জানাচ্ছি। ইতি—

প্রণতঃ

সৌরীন।

* * * *

স্বরূপার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ওর মুখে ওই সুতপা নাম শুনে সৌরীনের কথাই বেশী ক'রে মনে পড়েছিল। সুতপাকে যতটুকু জানি আর স্বরূপাকে যেটুকু সেদিন টি-বি হসপিটাল পর্যন্ত দেখেছিলাম—তাতে সৌরীনকেই মনে পড়বার কথা। এবং সুতপার স্বরূপা হওয়ার কাহিনী যাই হোক যত বিচিত্র এবং বিস্ময়কর হোক—সৌরীনকে না জানলে না বুঝলে কার্য-কারণ ঠিক বোঝা যায় না। কার্যকারণ দূরেই থাক—জীবনে ওটা খুব বড় নয়। বড় যেটা ঘটে সেইটে। স্বরূপার কথা যখন লিখতে বসেছি তখন ঘটনা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখতে গিয়েও সেই ঘটনার টানেও সৌরীন এসে পড়ছে। ফাইল থেকে খুঁজে সৌরীনের চিঠিগুলি বের ক'রে দেখছি। প্রথম চিঠিখানা আগাগোড়াই তুলে ধরলাম।

এ পত্রের উত্তর আমিও দিয়েছিলাম। নকল নেই—তবে খুসী হয়েই পত্র দিয়েছিলাম। এরপর সৌরীন—বছর দুয়েক নিয়মিত পত্র লিখেছে। তার মধ্যে সাহিত্যের আলোচনা—সমাজের সমালোচনাই বেশী। কাকা এবং ভাইপোর মধ্যে পত্রালাপ ঠিক নয়—। সম্বোধনে শ্রীচরণেষু থাকলেও—পত্রালাপ প্রকৃতপক্ষে দুই প্রীতিভাজন ব্যক্তির তত্ত্বালোচনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিগত খবরও থাকত। একবার বছর খানেক পর দেখছি—নিজের ব্যর্থতা সম্পর্কে আক্ষেপ ক'রে পত্র লিখেছিল—জীবনের আশা ভরসা বলতে গেলে নির্মূল হয়ে গেল। আপনাকে জানাই নি—দুটো পরীক্ষা এবার আমি দিয়েছিলাম। খুব খেটেছিলামও। কিন্তু দুটোতেই ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আই-সি-এসেও ফেল করেছি। পি-সি-এসেও খুব নিচে প্লেস, তাতে চাকরি হবে না। এমন কি—সার্কেল অফিসারিও ভাগ্যে জুটবে না। ভাবছি এমনটি কেন হল? অথচ পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আলাপ করে নিজে বুঝেছিলাম—তাদের থেকে আমি সব দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। শুধু আমিই ভাবি নি। সব পরীক্ষার্থীরাও ভেবেছিল। কারণ এক হ'তে পারে কপাল—আর একটা হতে পারে—সেটা বললে—পরীক্ষকদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে হয়। কথাবার্তা আমি ভাল বলি—সে জানেন—অথচ মৌখিক পরীক্ষাতেই ফেল করেছি শোচনীয়ভাবে। এখন ভাবছি কি করব! বাড়ীতে মা বাপ বিরূপ হয়ে উঠছেন আমার ব্যর্থতায়। মধ্যে মধ্যে ভাবছি—ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে যা হোক সামান্য একটা কিছু অবলম্বন ক'রে সাহিত্যের কাজ করব। কিন্তু তাতেও ভরসা কোথায়? আমার নিজের মনই নিজেকে ব্যঙ্গ করে বলছে—সেখানেও তুমি ফেল করবে। জিজ্ঞাসা কয়েকবারই করেছি—কেন এমন কথা বলছ উত্তর পেয়েছি—যে দেশের জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ হল ভক্তির চ্যাটচেটে কাদার পথ, দেশের সাহিত্যে মূল্য নির্ণয় হয় পাঠকের দীর্ঘনিশ্বাসের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে এবং পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়-বেদনা

উদ্গত লোনা চোখের জলের পাউণ্ড বা সের মাপ করে—সে দেশে তুমি কি লিখবে? তোমার লেখা সে তো শুকনো বুদ্ধিবাদের লেখা। যে দেশে বুদ্ধির পরিমাণ মোটমাট এক আনা—আধ আনা—হয়তো বেশীই বলা হল, সে দেশে ষোল আনা মূল্য দিতে তারা পাবে কোথায়? নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধি, অগাধ পণ্ডিত কিন্তু তাতে তাঁকে কেউ মানে নি। কিন্তু যেই ক উচ্চারণ করতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চোখের জলে বুক ভাসালেন—সেই ম্যাজিক হয়ে গেল। নবদ্বীপ তো নবদ্বীপ—বাংলা দেশ লুটিয়ে পড়ল পায়ের তলায় চোখের জলে নবদ্বীপ ভেসে গেল—শান্তিপুরেরও ডুবু ডুবু অবস্থা।

থাক এ সব কথা। এসব কথা সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগবে না। আজকে চিঠি শেষ করছি। প্রণাম নেবেন।" প্রণতঃ সৌরীন।

এর আটমাস পরের চিঠি একখানায় সৌরীনের পরিণতির খবর রয়েছে। মস্ত বড় চিঠি। ছ-সাত পৃষ্ঠা। সংবাদ দুটি। একটি হ'ল—সে আপার ডিভিসন ক্লার্কের চাকরিতে ঢুকেছে এবং সে বিয়ে করেছে। দুটি প্রায় একসঙ্গে। চাকরিতে ঢুকেই বিয়ে করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে সংসার পেতেছে।

বিবাহ অসবর্ণ, প্রেম তাদের হয়েছিল, চাকরির অপেক্ষায় বিবাহ করতে সাহস করছিল না। কিন্তু আর ধৈর্য ধরা সম্ভবপর হয় নি; ওই ক্লার্কশিপ চাকরি নিয়েই বিয়ে করেছে।

লিখেছিল—বাবা মা—ক্ষমা করেননি। তা নিয়ে কোন দুঃস্বপ্ন বা দুর্ভাবনা আমার নেই। অভিসম্পাতে বিশ্বাস করি না। আশীর্বাদেও না। তবে অভিসম্পাত কটু মনে হয় সহ্য করা যায় না। আশীর্বাদ বড় মিষ্টি লাগে। আশীর্বাদ করবেন আপনি—এ আশা আমি করি।

আশীর্বাদ আমি করেছিলাম। এরপর দু-চারখানা পত্র সে লিখেছিল—তারপর লেখা বন্ধ করেছিল। আমিও উদ্বিগ্ন হইনি। সংসারের নিয়মে যেমন ভুলে যায় তেমনিই ভুলে গিয়েছিলাম। এটা উনিশশো একচল্লিশের কথা।

এর এগারো বছর পর—১৯৫২ সালে পাটনা গেলাম। এ এগারো বছর পাটনা যাইনি। ১৯৫২ সালে পাটনা গিয়ে দেখলাম—সুতপাকে। দশ বছরের সুতপা।

চার

১৯৫২ সালে পাটনায় গেলাম প্রায় এগার বছর পর। এর মধ্যে আর যাইনি। যাওয়া ঘটেও ওঠেনি; এবং আকর্ষণও কমে গিয়েছিল। মামাদের স্নেহ কমেছে বললে পাপ হবে। অর্থাৎ অপরাধের চেয়েও বেশী কিছু হবে। তবে তাঁদের সংসার বেড়েছে এবং আমার জীবনেও কাজ বেড়েছে। সে কালের মত সাহিত্যক্ষেত্রে যশোপ্রার্থী নই আমি যশে নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। এবং কোনখানে ঠিক নিজের ইচ্ছেতে যাইনে, তার মনও নেই অবসরও নেই। অনেকে অপবাদ দিয়েছিল পেশা সভাপতিত্ব হয়েছে আমার। তাঁরা খুব যে মিথ্যে বলেছিলেন

তা নয়। এ নেশা পেয়ে বসলে এবং নেশা করবার মত মূল্য সম্বল থাকলে নেশায় মজতেই হয় এবং ক্রমে পেশাই দাঁড়িয়ে যায়। জীবনের সায়াহ্ন অনেক দেরি বয়স অনুসারে কিন্তু যেখানে রোগ এবং জীর্ণতা অকালে ধরে সেখানে বয়সের হিসেব চলে না। শীত বা বর্ষার বাদলের দিনের মেঘের ঘটায় বিকেলেই সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বালার পালা এসে যায়। আমার অবস্থা বর্তমানে তাই। সেই হিসেবেই এই অকাল সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে অকপট চিত্তেই সেদিনের কথা স্বীকার করে যাচ্ছি। তখনও ফুলের মালা সম্বর্ধনা গুরুর মত সমাদর, মঞ্চে বসার অধিকার একটা মোহ বিস্তার করত। একা আমারই উপর করে তা নিশ্চয়ই নয়, অনেকের উপরই করে। এইটে যেখানে থাকত না সে সময়ে সেখানে যাওয়ার জন্যে মনে ঠিক তাগিদ থাকত না। এমন কি নিজের স্বগ্রামে যাওয়াও কমে গিয়েছিল তখন।

এতে সুখ কি তা আজ ভেবে দেখি। ভেবে দেখবার মন একটা এসেছে আমার এ কথা বলতে পারি। আজও ডাক আসে কিন্তু শরীর ভেঙেছে বলেই যে যাইনে তা নয়, ওই মালাপরা সম্বর্ধনার কল্পনায় মন বিব্রত হয়। কিন্তু সে কথা যাক। তার সঙ্গে সুতপার কথার কোনই সম্পর্ক নেই। বলছি আমি সুতপার কথা।

১৯৫২ সালে পাটনায় একটা বেশ সমারোহের আহ্বান পেয়েছিলাম। বেশ সমারোহ বলছি এই কারণে যে, একসঙ্গে কয়েকটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান এবং হিন্দী সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

উঠেছিলাম গিয়ে মামাদের ওখানেই। আমাকে নিয়ে তাঁদের ঝঞ্ঝাট হয়েছিল অনেক। আমার ঝঞ্ঝাট তো বেশী নয় ঝঞ্ঝাট আমার কাছে যে সব লোকেরা আসছিলেন তাঁদের নিয়ে।

আমি নিজে থেকেও দু-তিন জায়গায় গিয়েছিলাম। প্রথম আমার শচী মামার কাছে। পাটনার বাঙালী সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতীক। তাঁকে শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি নিজের মামার মত। গুরুর মত সম্ভ্রম করি। বিরাট মানুষ। তাঁর অনেক বয়স হয়েছে তখন; জীবন যুদ্ধে হার মানবার মানুষ নন, কিন্তু ক্লান্ত নিঃসন্দেহে। তবু তিনি আসবার আগেই আমি ছুটেছিলাম। শচী মামা পাটনায় সর্বজনমান্য ব্যক্তি। দেহে বয়সে ক্লান্ত কিন্তু আমি জানতাম যে, তিনি নিজেই এসে মোটা ভরাট গলায় ডাকবেন—ভাগ্নে। কখন এলে—কেমন আছ? মামাদের সব ভুলে গেলে নাকি? সে আমি হতে দিই নি। প্রথম দিনই গিয়েছিলাম সেখানে।

সেখান থেকে ফিরে এসে দেখলাম গুণীরা দল বেঁধে বসে আছে। গুণীও তখন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েছিল, রাজনীতিতে নাম করেছিল; পাটনায় পি-এস-পি দলের ভি-আই-পি না হলেও নামীকর্মী।

গুণীই বললে সৌরীন এইমাত্র চলে গেল।

সত্য বলতে সৌরীনকে ঠিক মনে আমার ছিল না। ৪০।৪২ সালের কয়েক মাসের পত্রালাপের মধ্য দিয়ে যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল জ্ঞাতিত্বের কাঠামোর উপর যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল সে এই কয়েক বছর প্রায় এগার বছরের উপর সময়ের মধ্যে বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়েছিল।

এর মধ্যে পাটনার লোক মামার বাড়ীর লোক এসেছেন, কিন্তু সৌরীনের নাম ওঠেনি। একেবারে গোড়ার দিকে নাম তার উঠত। মনে আছে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ সালে ন-মামা এসেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হ্যাঁ হে, সৌরীন নাকি তোমাদের জ্ঞাতি, সম্পর্কে নাকি ভাইপো ?

প্রশ্ন করেছিলাম, বলেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ। এখন আমাকে দাদু বলে তোমার সম্পর্ক ধরে। ডেকে কথাবার্তা বলে। ও তো খুব নাক-উঁচুই ছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাউকে ও বড় বলে স্বীকারই করত না। যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা সে সবই ইউরোপের উপর।

—জানি।

—তোমাকে তো লেখক বলে স্বীকারই করত না। জান তো ?

—তাও জানি।

হেসে ন-মামা বলেছিলেন—এখন কিন্তু খুব ভক্তি তোমার উপর। আমি সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার এ মত তো ছিল না হঠাৎ সম্পর্ক বের হতে মত বদলালো নাকি। তা বললে, না। সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্ক কি মতামতের ? এই তো বাবার সঙ্গে মার সঙ্গেই বনেনি আমার। মতে বনল না, আমি পৃথক হয়ে গেছি। জান তো ও অসবর্ণ বিয়ে করেছে। একটি বস্তির মেয়েকে বিয়ে করেছে।

বলেছিলাম, তাও জানি। সৌরীনের মত সেজন্যে বদলায়নি। সে ধরনের ছেলে ঠিক নয় সে।

—হ্যাঁ ছেলে ভাল। বরাবর ছেলে ভাল। কিন্তু শেষের দিকটায় পরীক্ষাগুলোতে কি করলে ? একটাতে দাঁড়াতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আপার গ্রেড ক্লার্কের চাকরি নিয়ে ঢুকেছে বেহার সেক্রেটেরিয়েটে। আলাদা বাসা করেছে। একটি মেয়ে হয়েছে।

এই পর্যন্ত। না তারপরও বোধ হয় ফণি একদিন সৌরীনের কথা বলেছিল—একদিন একটা সভায় একজন অধ্যাপক আপনাকে আক্রমণ করেছিল। সৌরীন তাকে নাজেহাল করেছে সভায়।

এই সঙ্গেই শুনেছিলাম তার চাকরি জীবনের কথা। চাকরি নাকি সে খুব মন দিয়ে করছে। এবং উপরের কর্তাদের নজর পড়েছে তার উপর। উন্নতি ওর হবেই।

বলেছিলাম—বাঃ।

ফণি বলেছিল—হ্যাঁ সেদিকে বাঃ বলতেই হবে। বেহারে বাঙালীর ছেলের বেহারী কর্মচারীদের ছাড়িয়ে নজরে পড়া চাড্ডিখানি কথা নয়। কিন্তু ওর যে একটা কেরিয়ার হবে আশা করেছিলাম—সে আর হবে না। বললে বলে কি জানেন—হাসে। বলে—ওসব হল ভাগ্যবানদের জন্য। আমাদের জন্য নয়।

কথা ওইখানে চাপা পড়েছিল।

তারপর থেকে চাপাই পড়ে রইল—আর কোনদিন কোন সূত্রে উপরের বিস্মৃতির মাটি

ধুলো পড়ল না—নড়ল না। ক্রমে ক্রমে ভুলেই গিয়েছিলাম—সৌরীনের কথা। সেদিন হঠাৎ সৌরীনের নাম শুনেও এক মুহূর্তে মনে পড়েনি সৌরীনকে। একটু ভাবতে হল। সৌরীন? মুহূর্ত পরেই পাটনা বসে আছি—ফণি কথা বলছে সুতরাং মনে পড়ে গেল সৌরীনকে।

বললাম—ও—আচ্ছা। সৌরীন এসেছিল?

—হ্যাঁ মেয়েকে সঙ্গে করে এসেছিল কিন্তু আপিস বেরুবে—চলে গেল—বলে গেল পরে দেখা করবে।

সেদিনটা শনিবার এবং একটা ছুটির দিন ছিল। শনিবার ছুটির সুযোগ নিয়ে শনি, রবি দুদিনের মধ্যে অনুষ্ঠানগুলি শেষ হওয়ার কথা। বললাম—আজ তো ছুটি না? আজ আপিস?

ফণি বলেছিল—সৌরীনের ছুটি নেই। ও ছুটির দিনেও কাজে যায়। এখন ও প্রোমোশন পেয়ে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর কাজ করছে। মিনিস্টারের ওকে না-হলে চলেই না। মানে একটা জেদ আছে ওর। অন্ততঃ ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে তবে ও রিটায়ার করবে। আপনার কাছে এসেছিল—এটাই আশ্চর্য।

মনে আমারও একটু আবেগ স্পর্শ করলে। মনে পড়ে গেল সৌরীনকে। প্রশ্ন করলাম কখন আসবে বলে গেছে? আবার এসে ফিরে যাবে?

ফণি হেসে বললে—সে ঠিক আসবে। সময় করে নেবে। সে তার বাড়ীতে একটি অনুষ্ঠান করবে। রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ, ঘরোয়া ব্যাপার যদিও—। আমাকেও বলে গেছে। সময়ের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। ওর ঘরের ফাংশন খাওয়াদাওয়া সে একটা ভারী লোভের ব্যাপার।

—খাওয়ায় বুঝি ভাল? কিন্তু খাওয়া ভাল হলে আমার বিপদ যে!

—নিশ্চিন্ত থাকুন। সৌরীনের বাড়ীতে খেয়ে কারুর অসুখ করে না। ওর স্ত্রী দুর্লভ মেয়ে। নিজে হাতে রান্না করেন। আর বিলিতী মুঘলাই থেকে বাংলা দেশের সুক্তো এবং দইইলিশ পর্যন্ত নিখুঁত রাঁধেন। আর তেমনি গান করেন। মেয়েকে নাচ শিখিয়েছেন। চমৎকার নাচে মেয়েটি। সুন্দর। আমাদের ফাংশনেও ও নাচবে। পাটনার যে-কোন ফাংশনে সে বাঙালী হিন্দী যাদের হোক—সুতপাকে ডাকবেই এবং সুতপা যাবেই। মানে সুতপা পাটনায় বিখ্যাত। এমন কি ওর ফ্যানও বিস্তর। বাড়ীতে গেলেই দেখতে পাবেন সুতপা নেচে এর মধ্যে কত ট্রফি পেয়েছে। একটা সুন্দর কাঁচের শোকেসের মত আলমারীতে সাজিয়ে রেখেছে। দেওয়াল ভরা সুতপার নানান পোজের ফটোগ্রাফ। তাছাড়াও কোনটিতে চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে কোনটাতে অন্য মিনিস্টারের সঙ্গে তোলা ছবিও আছে।

সেই দিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে একটি সুন্দর লাবণ্যময়ী মেয়ে আমার গলায় মালা দিয়ে কপালে চন্দন দিয়ে আমাকে বরণ করলে। নাচের সাজে সেজে রয়েছে, হাতে থালায় মালা চন্দনের বাটী ধান দূর্বা একটি প্রদীপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। যে ভঙ্গীতে এল তাকে ঠিক চলার

ভঙ্গি বলা চলে না, নাচের ভঙ্গিই বলতে হয়। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। বাঁ হাতের তালুর উপর থালা বসিয়ে একটু বঙ্কিমঠামে এসে দাঁড়াল। এত ছোট মেয়ে বছর দশেকের মেয়েকে ছোটই বলতে হয়—কিন্তু তার হাত এতটুকু কাঁপছিল না।

ফণি পিছনের দিকে ছিল সে এসে পিছন থেকে কানে কানে বললে—এই সৌরীনের মেয়ে সুতপা।

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম তাকে। হ্যাঁ মেয়ে রূপসী মেয়ে হবে। এবং নৃত্য-কলায় ওর একটা সহজ অধিকার আছে। তার দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসলাম। সেও একটু হাসল। মালা নিয়ে চন্দন পরিয়ে মাথায় ধান দুর্বা দিয়ে সে চলেই যাচ্ছিল আমি ডাকলাম, শোন!

সে দাঁড়াল। আমি উঠে আমার গলা থেকে মালাটি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিলাম। সভার সমবেত জনতার মধ্য থেকে খুব করতালি উঠল। মেয়েটি খুসী হয়ে চলে গেল।

আমি ফণিকে প্রশ্ন করলাম—সৌরীন কোথায়?

সভার দ্বিতীয় সারির একটা কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ফণি দেখিয়ে দিলে সৌরীন বসে আছে তার পাশে একটি ভদ্রমহিলা। বুঝলাম সৌরীনের স্ত্রী। আমি বললাম—ওকে ডাক। বল আমি ডাকছি।

হেসে ফণি বললে—ও আসবে না।

—কেন?

—না। ও আসে না ডায়াসের উপর। কিছুতেই আসে না। অথচ থাকে সব কিছুর মধ্যেই। অবশ্য জড়ায় না। তবে থাকে। এতেও সে অনেক কাজ করে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানের শেষে একটি কর্মসূচী ছিল আনন্দ পরিবেশন। সাধারণতঃ এটিকে অন্যত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান বলা হয়, কোথাও কোথাও আনন্দানুষ্ঠান বলেও থাকে। শব্দটি একটু নূতন। বাকী সবই সেই সঙ্গীত নৃত্য যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি। আমরা বাইরে এসে বসলাম। প্রথম সারিতে আসন, পাশে ফণি এবং আরও কয়েকজন কর্মকর্তা। সৌরীনের সঙ্গে চোখাচোখি হল—সে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে হেসে অভিবাদন জানালে কিন্তু উঠে এল না। প্রথম আইটেমেই ছিল সৌরীনের মেয়ের নাচ।

সত্যিই ভাল নাচলে মেয়েটি। আমার দেওয়া মালাখানি গলায় দুলছিল। নাচলে আধুনিক নৃত্য নয়। ক্লাসিক্যাল কথক নৃত্য। জমিয়ে অনেক প্রশংসা কুড়িয়ে চলে গেল। এর পর দু'একখানা গান শুনেই ফিরলাম। বেরিয়ে আসছি সৌরীন দরজার বাইরে এসে সকলের পিছনে দাঁড়াল। আমি দেখছিলাম। ডেকে বললাম এই যে সৌরীন। কেমন আছ?

এবার সৌরীন এগিয়ে এল সস্ত্রীক। প্রণাম করে বললে—কাল সকালে যাব। আটটার সময়। বলে আবার চলে গেল।

পরদিন আটটার সময় এল সঙ্গে মেয়ে। আরও কজন লোক ছিলেন। প্রণাম করে এক-

পাশে বসল। আমি ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম—কাল খুব চমৎকার নেচেছ। এই বয়সে ভাল শিখেছ। বাঃ—!

সৌরীন বললে—এক মিনিট সময় হবে আপনার? একটা কথা বলেই চলে যাব। বেরুচ্ছি আপনার কাছে, হঠাৎ ফোন পেলাম মিনিস্টার ডাকছেন।

উঠে গেলাম। সৌরীন বললে—আমাকে ভুলে গেছেন, না?

বললাম—ভুলিনি নিশ্চয়—কিন্তু যোগাযোগ না থাকলে তো আকর্ষণ থাকে না। লাটাইয়ে বাঁধা ঘুড়ি। ঘুড়ি মাটিতে পড়ে লাটাইও মাটিতে পড়ে—টানটা কোথায়? টান থাকলে ঘুড়ি বোঝে লাটাই আমার আপন জন, লাটাইও বোঝে ঘুড়িই আমায় টানছে—ওই আমার স্নেহের ধন।

হেসে সৌরীন বললে—বেশ বলেছেন খাসা বলেছেন—ঠকে গেছি আমি। আমার একটা কথা। রাখতে হবে কিন্তু।—আমার বাড়ীতে একদিন খেতে হবে। রাত্রে নয় দিনে। সকাল বেলা নিয়ে যাব; সন্ধ্যেবেলা চা খেয়ে ছুটি।

ভেবে বললাম—কাল পর্যন্ত তো সময় নেই—সে তুমি জান। কারণ ফণি আমাকে বলেছে তুমি বাইরে এ সবের সঙ্গে যুক্ত এটা দেখাও না বটে তবে ভিতরে তুমি আছ, এবং তুমি না থাকলে হয় না।

—Thats good of Phani, ফণি এমন বাড়ছে, লীডার হয়ে উঠবে। যোগ্যতা আছে, তার উপর এইটে আছে যার জন্যে সে স্বীকার করতে পেরেছে। একটু থেমে বললে—কিন্তু আমি যা বলছি তার কি বলুন? আমার জন্যে একদিন বেশী থাকুন। এইটে আমার দাবী। সারা দিন থাকবেন সন্ধ্যের পর মেলে আমি আপনাকে তুলে দিয়ে আসব। সেদিন এক্সক্লুসিভলি আপনি আমার। আমার কাকা। আমরা এক বংশের ছেলে। এক রক্ত রয়েছে আমাদের মধ্যে। রক্ত শুনেছি সব থেকে গাঢ় তরল পদার্থ। আমার সংসারের মধ্যে আপনাকে পেতে চাই।

আমি ভাবছিলাম। সে বলেই যাচ্ছিল—দেখুন প্রথম যৌবনে আমাকে দেখেছেন। আমার সে মন নিশ্চয় খানিকটা আছে। বংশগৌরবটৌরব আমার জন্যে নয়। তবু আপনার আত্মীয় বলে দাবী করতে পারি এই জন্যেই বংশের কথা ভেবে আনন্দ পাই।

আমি বললাম—বেশ। কথা রইল—মঙ্গলবার। তবে টিকিট বার্থ রিজার্ভেশন এ সবের ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

—সে আমি করব। আমার বস্ মানে মিনিস্টারকে বলে করিয়ে দেব। দরকার হয় স্টেট প্রায়রটি নিয়ে দেব। এবং মিনিস্টারও খুব আনন্দের সঙ্গে করবেন। আপনার এ্যাডমায়ারার—সব বই পড়িয়েছি আমি। বাড়ীতে কিনে সাজিয়ে রেখেছেন। সে বিষয়ে আমি আপনার মস্ত দালাল।

বলে হাসতে লাগল সে। তারপর চলে গেল।

সেদিন বেলা দুটো থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান এক নাগাড় এক জায়গায় নয়,

দু জায়গায়।

হিন্দি সাহিত্যিকদের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে গিয়ে সৌরীনকে দেখলাম তার মিনিস্টার ছিলেন। আলাপ করিয়ে দিলে। সেখানেও সুতপা ছিল। আবার সন্ধ্যায় বাঙ্গালীদের অনুষ্ঠান সেখানে সেদিন নাটক ছিল, সুতপা সে নাটকেও ছিল। দুই পুরুষ অভিনয় ছিল—তাতে সুতপা একটি ছেলে শ্যামা এবং বরুণের প্রথম সিনের পার্ট করলে। দেশ দেশ বন্দিত করি গানটি ও গাইলে। অভিনয় মন্দ করলে না।

* * *

এটা সৌরীনের বাইরের দিক। মঙ্গলবার বাড়ীতে গেলাম ওর। বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম সৌরীনের ভিতরের দিকটা।

বাড়ীর মধ্যে তিনখানা ঘর। সুন্দর করে সাজানো। চোখ জুড়িয়ে যায়। কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই। স্বল্প সাধারণ বস্তুর আয়োজন সজ্জাকে অসাধারণ এবং বহুমূল্য বস্তুর প্রাচুর্যকে লজ্জা দেওয়া মনোরমতায় মণ্ডিত করে তুলেছে।

বললাম—বাঃ!

সৌরীন বললে—এটি আমার স্ত্রীর দান আমার জীবনে।

ও বলছে ঠিক এই সময়েই এসে দাঁড়াল সৌরীনের স্ত্রী। দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণা মেয়ে, চোখ ডাগর। তবে ঘরের সজ্জার সঙ্গে অঙ্গসজ্জা তার বিপরীত। লিপস্টিক পাউডার মেখে ভুরু আঁকা পর্যন্ত বাদ নেই। সেদিন সভায় দেখেছিলাম কিন্তু সভায় সেজে যাওয়া আর বাড়ীতে এইভাবে সেজে থাকা এটা আর এক জিনিস। চুলগুলো পর্যন্ত কেটে সিঙ্গল করে ফেলেছে।

তবে প্রণাম করলে। সুতপা এল। সেও দেখলাম প্রসাধন করেছে মায়ের মত, রুজলিপস্টিক শ্যাম্পু করা চুল সাদা-ফ্রক প্রভৃতিতে তাকে দেখাচ্ছিল প্রায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মত।

সেও প্রণাম করলে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সৌরীন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল। এই প্রগল্‌ভতার মধ্যে সেই তার প্রথম জীবনের সৌরীন আত্মপ্রকাশ করলে। এবার সে সিগারেট খাচ্ছিল আমার সামনে। আমি যখন কথা বলছিলাম তখন সেই প্রথম দেখা হওয়ার সময় সে যেমন নিস্পৃহভাবে সিগারেট টানছিল—ঠিক তেমনি ভাবেই সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙ ওড়াচ্ছিল।

সে তীক্ষ্ণতর বাক্যবিন্যাসে সকলকে কেটে কেটে চলেছিল। সাহিত্যে শিল্পে রাজনীতিতে সব ক্ষেত্রের সব প্রতিষ্ঠিত মানুষকে। কেবল আমার কথা বাদ দিয়ে।

আমাকে ডেকে এনেছে নিমন্ত্রণ করে এ কথাটা সম্ভবত তীক্ষ্ণভাবে সজাগ ছিল। সুতপা এবং তার মা উঠে গিয়েছিল। কথা চলছে এমন সময় টেলিফোন বাজল। সুতপা এসে ডাকলে—পা, মিনিস্টারের কল।

—মরেছে। বলে উঠে গেল সে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে বললে—আমাকে একটু দৌড়ুতে হচ্ছে। এই মিনিস্টারটি

আমার এমন যে এর কাছে মরেও নিষ্কৃতি নেই। পরলোকের টেলিফোন নেই, ও ঠিক শ্মশানে গিয়ে হাঁকবে—সৌরীন-সৌরীন আধঘণ্টা only for half an hour, come immediately. Very urgent. তবে আমাকে ভালবাসে। আমাকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীতে অফিসিয়েট করতে নিয়েছে বলেছে—পার্মানেণ্ট করবই আমি নিশ্চিন্ত থাক।

পোষাক পরাই ছিল। সৌরীন স্যুটপরেই থাকে চব্বিশঘণ্টা। শুধু জুতোটা পাল্টে চলে গেল। সুতপা এসে বসল এবার।

এর মধ্যে সুতপা বেশ বদলেছে। এবার পরেছে সালোয়ার পাঞ্জাবি। গলায় ওড়না ফেলতেও ভোলেনি।

বলতে সুরু করলে ওর নাচের গল্প। দেখাতে লাগলো ওর ট্রফিগুলো। চাবি বন্ধ ছিল। ডাকলে—মামি, মামি, চাবিটা দাও না। দাদুকে ট্রফিগুলো দেখাই।

—আমি যাচ্ছি।

ওর মা এসে ট্রফিগুলো দেখাতে লাগল এবং সে-ই এবার মেয়ের গল্প করতে লাগল। বাকী কিছু রাখলে না, ছবিগুলো পর্যন্ত দেখালে।

সুতপা ছুটে গিয়ে এ্যালবাম নিয়ে এল। দেওয়ালে কতগুলি ছবি ধরবে? এ্যালবামে অসংখ্য ছবি। নৃত্যের অভিনয়ের। বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে। প্রায় একশোর উপর ছবি। ওর মা একবার রান্নার দিকে যাচ্ছিল আবার এসে কথা বলছিল। এর মধ্যে একটা কথা বার বার পুনরাবৃত্তি করলে। সেটা হল এখানে নাচ শেখানো সে এক অসম্ভব ব্যাপার। কার কাছে শিখবে? একটা লোক নাই। মানে টিচার। একটা ইনস্টিটুশন নেই। অথচ ওঁর আমার দুজনের ইচ্ছে—ইচ্ছেটা অবশ্য ওঁর। নাচে জন্মগত দখল দেখে, ওকে নাচ শেখাই। আর ওঁর আমার দুজনেরই মত হচ্ছে যে নাচই হচ্ছে ফাইন আর্টের সেরা ফাইনেস্ট থিং।

—এখন কার কাছে শিখছে।

সুতপা বললে—মায়ের কাছে। মা খুব ভাল নাচেন। খুব ভাল।

সুতপার মা হাসলে। লজ্জিত একটু হল। বললে—নাচ ভালবাসেন আপনি?

উত্তর দিলাম—সন্দেহ হচ্ছে কেন তোমার?

এবার বেশী লজ্জিত হল। এবং উঠে চলে গেল।

সুতপা আবার আরম্ভ করলে পা-মামি দুজনেই বলে—নাচ শিখিয়ে হোল ইণ্ডিয়া টুর করব। তারপর ইয়োরোপ যাব। ইয়োরোপ থেকে এ্যামেরিকা।

আমি বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক এমন আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ব জানা ছিল না আমার। হঠাৎ সুতপা বললে—আপনি তো আমার পার আঙ্কল-কাকা!

—হ্যাঁ।

—আমার তা হলে Grandpa দাদু!

—হ্যাঁ তাই হয় তা হলে।

—হ্যাঁ বাবা বলেছেন দাদু বলতে।

—ঠিক বলেছেন।

—তা হ'লে তো আমাদের খুব আপনজন ?

—নিশ্চয়।

চুপ করে থেকে বললে—তাহলে আপনি আমাকে কিছু দেবেন না ? আপনার লোককে লোকে কত জিনিস দেয়।

—কি চাই বল ?

—চুপি চুপি বলব। ওঘরে মা নইলে শুনে ফেলতে পারে। সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে—একখানা টক্‌টকে লাল রঙের বেনারসী শাড়ী দেবেন আমাকে। কেমন ? নাচবার সময় যে সব পোষাক বাবা মা করে দিয়েছে সেগুলো ভালো না ! দেবেন ? দেবেন না ?

ওর চোখের দিক চাইলাম। দেখলাম আশ্চর্য একটি করুণ দীনতা সেখানে ফুটে উঠেছে, হয়তো আরও কিছু ছিল। দুরন্ত লোভের একটা পরিচয় ছিল। কিন্তু তা সঠিক দেখবার জন্যে ততক্ষণ তাকিয়ে থাকিনি আমি।

আবার ও বললে—আপনি বাজারে চলে যাবেন, হ্যাঁ, বলবেন একটু আসছি আমি। দোকানে গিয়ে বললে দেবে। বড় নেবেন না—ছোট নেবেন। হয়তো দুশো আড়াইশো টাকা দাম নেবে। তা আপনি বই লিখে অনেক টাকা পান। তাছাড়া আমি তো আপনার ভাইপোর মেয়ে, নাতনী। নাতনীকে দেবেন না ? কাল গলার মালাটাই খুলে দিলেন। নয় ? তারপর ফিরে এসে দেবেন আমাকে ডেকে। আমি 'না' বলব। মা 'না' বলবে। আপনি শুনবেন না। কেমন ? বলবেন না যেন আমি চেয়েছি। বলবেন আমার ইচ্ছে হল। এমন সুন্দর চেহারা, এমন সুন্দর নাচে, আমি দাদু, আমি দিচ্ছি। কেমন ?

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়েছিলাম। দশ বছরের মেয়ে সুতপা তখন !

—এই সময়ে চলে যান, নইলে বাবা এসে পড়বেন আর সঙ্গে যেতে চাইবেন। কিনতে বাধা দেবেন। ডাকব চাকরটাকে ? একটা টাঙ্গা কি এক্কা এনে দেবে ?

বলেছিলাম—ডাক।

পাঁচ

দোকানে আমি গিয়েছিলাম। ঠিক যেমনটি সুতপা বলেছিল—তেমনটিই বলে বেরিয়ে গিয়ে দোকান থেকে বেনারসী ঠিক নয়, নকল বেনারসী বা কমদামী ছোট বেনারসীশাড়ী ব্লাউসপিস কিনে এনেছিলাম। এবং ওই ভাবেই দিয়েছিলাম।

সুতপার মা অবশ্যই মুখে কয়েকবার আপত্তি করেছিল—এ কি, এ আপনি কিনে আনলেন কেন ? না-না-না। এ-এ। এ যে কি ? অর্থাৎ অন্যায় বা অশোভন বা কি-যেন সে

খুঁজে পায় নি!

সুতপা গাড়ীর অর্থাৎ টাঙ্গার শব্দের জন্ম কান পেতে বসে থাকেনি, পথের দিকে একটা জানলায় চোখ রেখে বসেছিল। আমি নামতেই ছুটে এসে আমার হাতের বাক্সটা টেনে নিয়ে খুলতে গিয়েও খোলে নি। বাক্সটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল—আমি ঘরে যাচ্ছি—আপনি আমাকে দেবেন, আমি মুখে বলব, নেব না। এঁ্যা? তখনি আপনি মাকে ডাকবেন। বলবেন, বউমা—এটা আমি সুতপার জন্যে এনেছি। এঁ্যা?

তাইই করেছিলাম। আমার মনে যত তিক্ততা জমেছিল—তার মধ্যে খানিকটা ঘেন্নাও ছিল—টাকা খরচের জন্ম কিছুটা গ্লানিও ছিল কিন্তু তার সঙ্গে সমপরিমাণে তো বটেই, হয়তো কিছুটা বেশীই ছিল—বিস্ময় এবং কৌতূহল। মনে মনে ভাবছিলাম এ মেয়ে বড় হলে হবে কি? যার জীবনে ও নিজের স্থান করে নেবে তার জীবন যে বিষজর্জর করে দেবে। আরও ভাবছিলাম—এ প্রবৃত্তি ও পেলে কোত্থেকে? মা বা বাপ কোন্ দিক থেকে?

সুতপার মাকে যা বলতে হবে—সে কথাও সুতপা আমাকে আগে থেকেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। কথাটা আমি নিজে খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে বলেছিলাম—এর মধ্যে তুমি কথা বলছ কেন বউমা? ওর তুমি মা। আমি ওর দাদু, আমি যদি ওকে কোন কিছু কিনেই দিই—তবে তোমার আপত্তি অন্যায় এবং অশোভন দুইই হয় না কি? আমাকে তাহলে ঠিক আপনার ভাবছ না!

শেষ কথাটা আমার নিজস্ব। ওটা সুতপার শেখানো নয়। তবে ওইটেই মোক্ষম অস্ত্র! ওর মা চুপ করে গিয়েছিল। একটু পরে হেসে বলেছিল—তা হ'লে আজ তুমি কাপড় পরে রাধার অভিসার নাচটা দাদুকে দেখিয়ে দাও। জানেন লাল বেনারসীর ওপর ওর ঝোঁক অনেক দিনের! ছেলেমানুষ তো, টকটকে রঙের উপর ঝোঁক। ওর রঙ বিচার করে ওই নাচের জন্যে ওর বাপ ওকে ফিকে নীল বেনারসী ছাপ দেওয়া ছাপানো শাড়ী কিনে দিয়েছে। কাল যেখানা পরেছিল। কিন্তু লাল বেনারসীর কথা বললেন—জানলেন কেমন করে?

আমি ভাবলাম ধরা পড়ে গেল বুঝি সুতপা! কিন্তু ওর মা দেখলাম ধরেও ধরলে না। আমি কৌতুক করে বললাম, দেখ মা, প্রেমে পড়লে মানুষ বোকা হয়, এইটেই একালের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভায়, গোড়ায় গলদ বা শেষরক্ষায় এ সত্যটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু আমি আবার বীরভূমের লোক, নান্নুর আমার বাড়ীর পাশে, চণ্ডীদাসের পড়শী আমি। আমাদের ওদিকের লোক প্রেমে পড়লে বোকামি নিশ্চয় করে কিন্তু তার সঙ্গে প্রিয়ার মনের কথাও জানতে পারে। বুঝছ না? তখন প্রিয়ার তেষ্টা পেলে নিজের তেষ্টা পায়। আমার মনটায় ওর গোলাপী রঙ দেখে বার বার মনে হচ্ছিল ওকে একখানি রাঙা টকটকে বেনারসীর আবরণে লক্ষ্মীঠাকুরুনটির মত মানায় বোধ হয়। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রাঙা টকটকে শাড়ী আনতে। পরিয়ে দেখব আমার প্রেম সত্য কি না।

সুতপার মা আধুনিকা। এতে লজ্জা সে পেলে না! কিন্তু সুতপা দেখলাম লজ্জা পেলে। রাঙা হয়ে উঠল ওর গোলাপী গাল দুটো।

ঠিক এই সময়েই ফিরে এসেছিল সৌরীন। সে সমস্ত শুনে খুব খুসী হয়ে বলেছিল, তা হলে ঠিক হয়েছে···বাবু আজ আর আপনার যাওয়া হবে না। সন্ধ্যেতে এখানে ছোট্ট একটি আসর হবে, তাতে আপনিই বলতে গেলে প্রধান, এবং একমাত্র অতিথি হবেন। তবে আপনি আর কাউকে বলতে চান অবশ্যই বলতে পারেন। আসরে সুতপা নাচবে। ওই লাল বেনারসী পরে।

কথাটা অবশ্যই আমি রাখি নি। চলে এসেছিলাম পূর্ব বন্দোবস্ত মত। কিন্তু ওই দুপুর থেকে সন্ধ্যের মধ্যেই সুতপা তার নৃত্যবিদ্যার সকল কলা প্রকাশ করে আমাকে দেখিয়ে তবে নিরস্ত হয়েছিল। কলা-কৌশল ছন্দ-গতির উপর ওর কতটা পারঙ্গমতা তার সঠিক বিচারক আমি নই। তবে এটা ঠিক যে, ওই সবগুলিতেই সে নিজেকে আশ্চর্যভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। এবং যা সেজেছিল তাতেই ওকে অপরূপা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ও সৌরীনের কন্যা বিংশ শতাব্দীর সুতপা না হয়ে এইটি হলেই ভাল হত। আর তেমনি তার নিজের সাজবার জ্ঞান ছিল সেই বয়সে। মিলনে বিরহে প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় যে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ওর চোখে মুখে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা আশ্চর্য মনে হয়েছিল আমার। মিলন বিরহ এগুলির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করে এর এমন প্রকাশ কি করে সুতপা করেছিল তা বোধ করি সকলকেই বিস্মিত করত।

সবশেষে ও পোষাক-টোষাক ছেড়ে সেই অতি আধুনিক ফ্রক পরে মাথায় চুলগুলিকে যথাযথ বিন্যস্ত ক'রে মায় মোজা সমেত স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো পায়ে হেসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। দেখলাম মুখের প্রসাধনেও বদল করতে ভোলে নি। অলকা-তিলকা থেকে সব মুছে মুখে পাউডারের পাফ দিয়ে এসেছে।

সৌরীনের সঙ্গেই কথা বলছিলাম। বলছিলাম নয়, সৌরীন উৎসাহভরে বলে যাচ্ছিল—আমি শুনছিলাম।

সৌরীন বলছিল ওই মেয়ের কথাই। বলছিল, এটা কি আপনি প্রতিভা বলে মনে করেন না? অন্ততঃ ট্যালেণ্ট। তাই বলাই ভাল। ট্যালেণ্ট বললে আশ্চর্য ট্যালেণ্ট বলতে দ্বিধা করব না। ওর মা নাচ জানত, গাইতও ভাল। এখনও গায়। মন্দ গায় না। তবে এখন লজ্জা করে। সুতপা ওর কাছ থেকে পেয়েছে এই গুণটা। মন আমার পেয়েছে। নট এ্যাট অল শাই। খুব ফ্রি। খুব মডার্ন। ছেলেবেলা থেকেই নাচে, ছেলেবেলায় সব মেয়েই নাচে, কিন্তু ওর নাচে ছন্দ এবং যতি এগুলো নিখুঁত ছিল। একদিন গ্রামোফোন বাজনার রেকর্ড বাজছিল, ও নাচছিল এ ঘরে। হঠাৎ ওর মা এ ঘরে ও কি করছে দেখতে এসে ওর নাচ দেখে ফিরে গিয়ে আমাকে ডেকে বললে—দেখ! মজা দেখ! সুতপা নাচছে, কিন্তু তালে মানে একটুও খুঁত নেই। আশ্চর্য। আমিও দেখলাম এবং দেখলাম—তাই বটে। স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয়ের একটুও অতিরঞ্জন নেই। বললাম—শেখাও ওকে। ও শেখাতে সুরু করল। এখানে একটা ছোটখাটো মিউজিক কম্পিটিশন হয়, সেখানে প্রথম বছরেই ছোট মেয়েদের নাচে ফার্স্ট হয়ে

গেল। ওর উৎসাহ খুব বেড়ে গেল। আমি নিরুৎসাহিত করিনি—উৎসাহ দিয়েছি। ওর মা মাঝে মাঝে বরং বলে, বেশী হয়ে যাচ্ছে। আমি বলি, না। মানুষের ট্যালেণ্ট সব নয়, এমন কি যদি সাধারণ প্রতিভা হয় তাও সব নয় ওর সঙ্গে বীজের উপর জল পড়া চাই নিয়মিত, ফার্টিলাইজার দেওয়া চাই। নইলে ওই কিছুটা হয়, তারপর আর হয় না। আমি ভুক্তভোগী যে! আমি ওকে ফুল স্কোপ দেব। গ্রামোফোন রেকর্ড কিনে দিই নিয়মিত। একজন ব্রজবাসী আছেন মানে মণিপুরী ডান্সার—তিনি সপ্তাহে দুদিন আসেন। ড্রেস করিয়ে দিয়েছি। ওর মা বলে শান্তিনিকেতনে দিতে। আমি তার ঘোরতর বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ নেই, বাংলা সাহিত্যই অনুর্বর হয়ে গেল। আপনারা ক'জন গ্রামজীবন গ্রাম্য চিত্র নিয়ে ভ্যারাইটি এনেছেন কিন্তু তার দাম কি? আমাদের নেমন্তন্ন খাওয়ার আসরে—পাঁপর দিয়েও বৈচিত্র্য আনি। সেই তিক্ত কষায় লবণ অম্লের পর হিং-এর গন্ধ-ওলা পাঁপর লাগে খুব ভাল—মুচমুচও করে। কিন্তু তার দামটা কি? তবুও ওই পেঁপের-চাটনির দামও আছে এখানে। কিন্তু ওখানে রবীন্দ্রনাথের পর কি আছে বলুন? হ্যাঁ ছবি আঁকলে—নন্দলাল আছেন—সেখানে নিশ্চয় দিতাম।

তারপর হঠাৎ বললে—কিছু মনে করলেন না তো?

—কি মনে করব?

—এই পাঁপর-চাটনির সঙ্গে আপনাদের কালের সাহিত্যের তুলনা করলাম। হেসে বললাম—কেন মনে করব? তোমার মত বলেছ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এক সময় ভাবি ভারী অন্যায় করেছি। সংসারের দায়ে চাকরি নিলাম, লিখলাম না।

চুপ করে রইলাম। বুঝলাম—আবার বদলেছে সৌরীন, জীবনে চাকরিতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। অথবা সেই পুরানো সৌরীন যাকে সে মাটি চাপা দিয়েছিল ঘা খেয়ে, সে আবার কবর ঠেলে উঠেছে। আশ্রয় করেছে মেয়েকে। যে সাধ তার নিজের জীবনে পূর্ণ হয় নি, তা সে পূর্ণ করতে চায় মেয়েকে দিয়ে।

আমি তবু বললাম, বেশ তো, বেটার লেট দ্যান নেভার। এখন আবার সুরু কর না।

সৌরীন বললে—নাঃ। ও আর হয় না। এখন আমার একটা ঝোঁক আছে। এখানে প্রোমোশন পেয়ে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে উঠেছি। কোনরকমে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে যেতে চাই। জানেন ওতে সুতপার খুব উৎসাহ। খুব!

ওদিকে কথায় কথায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল—ট্রেন আটটায়; সুতপার মা তাগিদ দিলে—সাতটা বেজে গেল। ওঁর পুজো আছে।

উঠলাম। মুখ-হাত ধুয়ে পুজোয় বসেছি, এমন সময় সুতপা আবার ফ্রক ছেড়ে সেই লাল বেনারসী পরে এসে দাঁড়াল। পুজোর মধ্যেও একটু হাসি এল। পুজো শেষ করে বললাম, তোমার নাম সুতপা হওয়া উচিত ছিল না। তুমি তপস্যা ভাঙাতে জন্মেছ। পুজো করতে করতে তোমায় দেখে হেসে ফেললাম। মনে হল কোন মোহিনী এসে দাঁড়াল। তোমার

নাম তাই মোহিনী—

সে বললে, না, অত্যন্ত বিশ্রী। দাদু—

বললাম, তাহ'লে নাম দিচ্ছি সুতপার বদলে সুরূপা। যদি বল, তবে অপরূপা বা বহুরূপাও রাখতে রাজী আছি।

সে দীপ্ত হয়ে উঠল। বললে, সুরূপা—সুরূপা নামটা আমি নেব দাদু। সুতপা—আমার ভাল লাগে না। তপস্যা আবার কি? না-খেয়ে, না-দেয়ে, না-হেসে, না-নেচে, পোষাক-পরিচ্ছদ না পরে, গাছের বাকল পরে। কেন?

বললাম—বরের জন্যে।

আবার সে বললে—না-দাদু, বাবা মিছে বলেন না। বলেন আপনার কথায়—উনি রাষ্টিক!

সৌরীন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি ওঘরে চলে গেল—খাবার দেওয়া হয়েছে কিনা দেখবার অছিলায়।

সুতপা বললে—আমি তো বিয়েই করব না।

তারপর আবার বললে—এই নামটা কিন্তু আমার ভারী পছন্দ হয়েছে দাদু, সুরূপা!

সুরূপা পাটনা ষ্টেশনে আমাকে সী-অফ করতে এসেছিল ওই শাড়ী পরে। শাড়ীখানা সে ওইজন্যেই পরেছিল তখন মডার্ন ছাঁদে।

এই সুতপা। সুরূপা নাম ওর আমিই দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ভুলে যাবারই কথা। এরপর আর আমার সঙ্গে সুতপা কেন—সৌরীনের সঙ্গেই দেখা হয় নি। আমি পাটনায় গিয়েছি মাত্র এক আধবার। কিন্তু পাটনায় সৌরীন ছিল না।

সৌরীনের বাসনা অপূর্ণ থাকে নি। সে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে ঢুকেছিল এবং প্রথম গিয়েছিল বার্মায়—তারপর ওখান থেকে হংকঙে। ওই হংকঙেই সে মারা যায়। হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছিল সৌরীন। খবরটা পেয়েছিলাম অনেক পরে। যেবার চীন যাই, সেবার চীন থেকে ফিরে হংকঙে যখন ট্রেন থেকে নামলাম তখন ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন নারানবাবু। যাবার সময় ভারতীয় হাইকমিশন অফিস হয়ে যাবার সময় পাই নি। বলেছিলাম ফিরবার সময় আপনার ওখানে যাব-খাব। নেমন্তন্ন নিয়ে রাখলাম।

ওখানেই খেতে বসে নারানবাবুর কাছে সৌরীনের মৃত্যুসংবাদ পেলাম। নারানবাবু বললেন—সৌরীন আপনার খুব নাম করত। আপনার কে যেন হতেন।

—কে?

—সৌরীন চক্রবর্ত্তী! পাটনার!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। সে এখন কোথায়?

—সে তো নেই, সে মারা গেছে। এখানেই মারা গেছে—হার্ট ফেল করে।

—কতদিন ?

—দু বছর আগে।

—তার স্ত্রী আর একটি কন্যা ছিল—

—দেশে গেছে। কি করবে ? মেয়েটি খুব অ্যাকম্‌প্লিশড ছিল। এখানে আমাদের ফাংশন হলেই নাচত। বিউটিফুল মেয়ে। নামটিও ভাল। সুতপা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম।

নারানবাবু বলেছিলেন, সৌরীনের মৃত্যুর জন্যে দায়ী একরকম নিজেই। ড্রিংক করতে ধরেছিল—বেশী পরিমাণেই খেত। এবং ফাস্ট লাইফ লীড করত। দুঃখের কথা। একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—ডাইনিং টেবিলে মিসেস চক্রবর্তী, এমন কি সুতপাকেও অভ্যাস করিয়েছিল। আমি বলেছিলাম তাতে বলত, আমার ওসব সুপারষ্টিশন নেই। এরপর ইয়োরোপে যাব, সেখানে যদি স্ত্রী জুজুবুড়ি সেজে থাকে তবে চলবে কি করে ?

সুতপার জন্যে বলত, ও যদি ফরেনারকে বিয়ে করে আমি খুশী হব। না-হলে ওর কেরিয়ার একটা তৈরী হোক। নাচের ট্রুপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে পৃথিবীময়। ঘর-সংসারে কি আছে ? ওতে কতটুকু পায় মানুষ ? প্রেম-স্নেহ সব কথার কথা। আসলে দরিদ্রের ঘরে অভাবের জন্য কলহের তিক্ততা, দুঃখ। আর অভাব না-থাকলে—চিরন্তন মানব স্বভাব যা—দু-চার দিনের বা দু-দশ মাসের বা দু-চার বছরের তৃপ্তির পর অতৃপ্তির দুঃখ আসবেই।

রহস্য করে বলত, জানেন মদ্যপান করেও যখন পা ষ্টেডি থাকে তখনই বুঝতে হবে যে, হ্যাঁ, দুঃখ আনন্দে অনাহারে প্রচুর আহারের পর অনায়াসে সহজ পদক্ষেপে পথ চলতে পারবে।

বলে হা হা করে হাসত।

মারা গেল একেবারে অকস্মাৎ।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম। তারপর প্রশ্ন করবারও আর কিছু পাই নি। অনেকক্ষণ পর খুঁজে পেয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—স্ত্রী কন্যার জন্য রেখে-টেখে কিছু গেছে!

—তা গেছে। কিন্তু সে খুব বেশী কিছু নয়। শুনেছি পাটনায় একটা ছোটখাটো বাড়ী করেছিল ওখানকার চাকরিতে থাকতে। তারপর ফরেন সার্ভিসে এসে উপার্জন করেছে যেমন তেমনি খরচ করেছে দুহাতে। তবে হাজার কতক টাকা রেখে গেছে নিশ্চয়। সে তো দিল্লি থেকে পাবে এবং তার অনেক হিসেব-নিকেশ! সময়ও লাগে অনেক। এ-জির কবল এবং শম্বুক গতি।

কলকাতায় ফিরে এসেও কথাটা মনে ছিল। একখানা পত্র লিখেছিলাম পাটনায় ফণির এক সহচরকে। ফণিও তখন মারা গেছে। ফণির জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছিলাম। দুঃখ সৌরীনের জন্যও পেয়েছিলাম। কারণ অনেক কটু কথা বলেও সে আমার সঙ্গে জ্ঞাতিত্বে ও

সম্পর্কের জন্য গৌরব অনুভব করত। সুতপাকেও মনে পড়েছিল। সুন্দর রূপসী মেয়ে হবার কথা তার। তখন হিসেবমত বয়স তার চৌদ্দ-পনের। কৈশোর থেকে যৌবনে প্রবেশ করছে। চিন্তা ঠিক হয়েছিল তাকে নিয়ে তা বলতে পারব না তবে একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম।

ফণির বন্ধু উত্তর দিয়েছিল, সৌরীনের স্ত্রী-কন্যা সম্ভবত দিল্লীতে রয়েছে। লোকে নানান কথা বলে—তার স্ত্রীর সম্পর্কে। কন্যাটিও বড় হয়েছে। আল্ট্রা মডার্ন। এখানকার বাড়ী বিক্রী করে গেছে। শুনছি, ওদের ইচ্ছে—ওরা এদেশে থাকবে না, বিদেশ চলে যাবে।

তারপর আর কি করবার ছিল আমার? করবার যা ছিল তা প্রকৃতির নিয়মে হয়েছে। ওদের ভুলেই গিয়েছিলাম। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এতকাল পরে বলতে গেলে ষোল বছর পর—যক্ষ্মা হাসপাতালে—মৃত্যু আশঙ্কা করে ফিল্ম এ্যাকট্রেস সুরূপা বললে, পাটনার সুতপাকে মনে আছে? সুতপা?—

মনে পড়ল বই কি। সুতপার সুরূপা নাম যে আমিই দিয়েছিলাম। ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ছয়

সেই সুতপা! মিলছে বই কি! চেহারাতে ঠিক মেলাতে পারছিনে। দেখেছিলাম একটি বালিকাকে আর এ দেখছি—এক যুবতীকে। ক্ষয়রোগগ্রস্তা যুবতী। যৌবন তার রোগের শোষণে নিঃশেষিত নয়—শীর্ণ। তার আভাস রয়েছে। এবং সে এই অবশেষটুকুকেই অশেষ যত্নে যথাসাধ্য প্রস্ফুট রাখতে চেষ্টা করেছে।

নিউমোথোরাক্স হয়েছে। বুকে ব্যাণ্ডেজ রয়েছে। তার উপর সর্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢাকা। মুখে ক্লেশের চিহ্ন। শুকনো ফুলের মত জীবনের সজীবতা এবং যৌবনশ্রী ম্লান হয়ে রয়েছে। তবু এরই মধ্যে তার সুকুমার লাবণ্য ও শ্রীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঠোঁটে লিপষ্টিক নেই। চুলের বিন্যাস নেই। কিন্তু ঠোঁট দুটির মধ্যে সুন্দর মুক্তোর পাঁতির মত সাজানো দাঁতগুলির সৌন্দর্য যায় নি। চুল অবিন্যস্ত এবং শ্যাম্পুর প্রসাধন অভাবে বেশী রুক্ষ তবু প্রাচুর্য এবং কোমলতার পরিচয় রয়েছে। চুলগুলি প্রাচুর্যের জন্যে বেশী ফুলে উঠেছে রুক্ষতার কারণে, মুখ বিশীর্ণ হয়েছে—তাতেই যা বিসদৃশ দেখাচ্ছে কিন্তু তার রূপকে করুণ করে তুলেছে। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম—তুমি একদিন সুরূপা নামের আড়ালে নিজে লুকিয়ে চোখে গগলস পরে সিনেমা স্টারের পরিচয় দিয়ে আমার কাছে গিছ্‌লে আমি চিনতে পারি নি। সৌরীনের মেয়ে তুমি—ফরেন সার্ভিসে তোমার বাপ চাকরি নিয়েছিল—তুমি সিনেমা ষ্টার হবে ভাবি নি। কিন্তু আজ যখন সুতপা এবং পাটনা বললে তখন নিশ্চয় তোমাকে চিনতে পারছি। হংকংয়ে নারানবাবুর কাছে শুনেছিলাম তোমার বাবার মৃত্যুর

পর দেশে ফিরেছ। তারপর পাটনাতেও খবর করেছিলাম—ফণি লিখেছিল—তোমার মা, তুমি বাড়ী বিক্রী করে চলে গেছ। লিখেছিল, বোধ হয় সুতপাকে নিয়ে তার মা ফরেন সার্ভিসে চাকরির চেষ্টা করতে গেছেন দিল্লীতে।

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

নার্স, ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার বললে—কথা বলবেন না। আপনার পাগলের মত আগ্রহে ওঁকে ফোন করে আজ আনিয়েছি। আপনি ভেবেছিলেন, রিব কেটে অপারেশন, হয়তো বাঁচবেন না। চেতন হয়ে পাছে আবার উতলা হন তাই ওঁকে আনিয়েছি। উনি এসেছেন—আবার আসবেন। স্যার আপনি বলুন।

আমি ওর মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। মনে মনে বিচলিতও হয়েছিলাম। ওদের অতীত স্মৃতি নিরঙ্কুশ প্রীতি ও মাধুর্যময় নয়, কাঁটা তাতে যথেষ্ট ছিল। তবুও সৌরীনের আত্মীয়তাবোধের আপনাবোধের স্মৃতি এবং এই সুতপার সেদিনের শাড়ী চাওয়ার স্মৃতি এই মুহূর্তটিতে অত্যন্ত মধুর মনে হল। মনে হল—আমারই সেদিন ভুল হয়েছিল হয়তো। একান্তভাবে আপনার জন মনে করেই সৌরীনও সমালোচনা করেছে আমার এবং সুতপাও দাদু বলেই শাড়ী চেয়েছে। না হলে ভদ্রতা বজায় রেখে সৌরীনও বলতে পারত আমি খুবই ভাল লিখি এবং সুতপাও শাড়ী নিশ্চয় চাইত না। না হলে আজ এই সময়ে সে এমন করে আমাকেই বা স্মরণ করবে কেন?

সুতপা বললে, একটা—

ডাক্তার বললে—না। আজ নয়, কাল সন্ধ্যেতে উনি আসবেন। নিশ্চয় আসবেন।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম—আসব, নিশ্চয় আসব।

সুতপা হেসে তিনটি আঙুল তুলে দেখিয়ে ভ্রূ-ভঙ্গিতে যে ইঙ্গিত করলে তা অন্য কেউ সঠিক বুঝবার আগেই আমি বুঝলাম। হেসে বললাম—আসব, আসব, আসব।

বাঙালীর মেয়ে ইংরিজী শিখে বিদেশ ঘুরে এলেও ওগুলো মনের মধ্য থেকে মুছে যায় না। একান্ত অন্তরঙ্গতার মধ্যে যেখানে শিক্ষা-সভ্যতার খোলস আপনি একের পর এক খুলে ফেলে সহজ সাদাসাপ্টা মানুষটি হয়ে দাঁড়ায়—তখনই 'মাথা খাবেন' দিব্যি বেরিয়ে যাবে মুখ থেকে এবং শপথ করার প্রয়োজন হলে তিন সত্যি করবার কথাই মনে হবে। তখন আর give me your word বা কথা দিন—শপথে মন উঠবে না।

এবার সে হাসলে। আমি তার কপালে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলাম—তারপর বললাম—কাল। এমনি সময়। কেমন?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে—বেশ।

বিষণ্ণ মনেই বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ডাক্তার বললেন—চলুন এবার; খানিকটা আমাদের সব দেখুন। বিশেষ করে যারা বেশ ভাল আছে, অনেকটা বা পুরোটাই সেরে গেছে তারা তো বেশ একটি দঙ্গল বেঁধে রয়েছে। তারা শুনেছে আপনি এসেছেন। আপনার কিছু বই আপনি একবার দিয়েছিলেন—একবার ওদের সোস্যাল ফাংশনে এসেছিলেন—তখন

আমি ওখানে ছিলাম না। কিন্তু সে কথা এসে অবধি মধ্যে মধ্যে শুনি। ওরা ভোলে নি। সে সময়ের কয়েকজন ওখানেই একরকম থেকে গেছে। ওইটেই ওদের পৃথিবী, এইটেই ওদের সমাজ, সংসার—দিদি-ভাই মাসী-পিসী সম্পর্ক পাতিয়ে কোন রকমে হেসে-খেলে কাটায়। ওরা বলে রেখেছে আমাকে।

কথাটা অজানা নয়। এবং কারুরই অজানা নয়। সেরেও যারা যায়, হাসপাতাল পরীক্ষা করে যাদের রোগমুক্ত বলে ছেড়ে দেয়, তারা বাইরে গিয়ে আবার ওখানেই ছুটে পালিয়ে আসতে চায়। বাড়ীতে ওদের ঠাঁই হয় না। তারা দূরে দূরে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকে। ওদের অবস্থা হয় অস্পৃশ্যের মত। এক অপরাধ করে ধরা পড়ে যারা জেল খেটে দাগী হয় তারা আর এরা বলতে গেলে এমনি অবস্থার মধ্যে পড়ে বাড়ী থেকে উর্ধশ্বাসে পালাতে চায়। জেলখাটা দাগী আবার অপরাধ করে জেলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়—এরা আবার অসুখ হয়েছে বলে ফিরে এখানে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

সেবারই এটা শুনে গিয়েছিলাম। মানুষের মনে যত মমতা—তত মৃত্যুভয়। মা যে মা—সেও যে ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে—তার কাছ থেকে অন্য ছেলেকে বাঁচাতে তাকে এমন অস্পৃশ্যের মত করে তোলে যে রোগাক্রান্ত ছেলের সহ্য হয় না। সে তার থেকে মরে বাঁচতে চায়। এ আমি জানি। দেখেছি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। ডাক্তারবাবুকে বললাম—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন?

—ধরুন কোন ছেলে কোন মেয়েকে ভালবাসে—কি কোন মেয়ে কোন ছেলেকে ভালবাসে—তাদের একজনের রোগ হল—ভাল হল—তখন কি হয়? তাদেরও কি এমনি হয়?

—আগে তো তাই-ই হতো। ভালবাসা মারাই যেত। এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। স্বামীর হলে কথাই নেই—সে ফিরে যায় নিজের ঘরে—স্ত্রীর তাকে না নিয়ে উপায় কি? অবশ্য স্বামী-স্ত্রীর সংসারের কথা বলছি। অবস্থাপন্ন ঘরেও ছেলেরা বিবাহিত হলে ফিরে গিয়ে নিজের ভাগ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে সংসার বাঁধে। স্ত্রীর হলেই বিপদ। আজকাল দু-পাঁচটির সৌভাগ্য হয় ফিরে যাবার। বাকীর হয় না। তবে রোমান্সের মধ্যে যে সব ছেলেমেয়ে রোমান্স অর্ধ-সমাপ্ত রেখে এখানে আসে তাদের শতকরা পঁচাত্তর জন ফিরে গিয়ে সংসার পাতে।

কথাটায় মনে পড়ল, কিছুদিন আগে বিখ্যাত সাহিত্যিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন আমার ওখানে। কথাপ্রসঙ্গে আজকের ছেলেমেয়ের পূর্বরাগ ক'রে বিয়ের কথা উঠেছিল। একটি মেয়ে তার মা-বাপের কথা না শুনে তার ভালবাসার জনকে বিয়ে করেছে তার থেকেই কথাটা উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন এসব হল পাশবিক আচার। দেহের আকর্ষণে এরা এমনই উন্মত্ত যে, মা-বাপ সমাজ সংসার ধর্ম এরা কিছুই মানে না। এরই নাম মডার্নিজম।

আমি তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারি নি। বলেছিলাম বড় নিষ্ঠুর কথা বললেন।

—কেন ?

—ভেবে দেখুন আমরা যখন বই লিখি সেখানে বড়লোকের মেয়ে গরীবের ছেলেকে ভালবেসেছে, বড়লোক মেয়ের বাপ মেয়েকে কিছুতেই গরীবের হাতে দেবেন না। এমন ক্ষেত্রে মেয়ে মা-বাপ, তার ধন-সম্পদ, সাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়ে ওই গরীব ছেলেকে বিয়ে করে এই দেখাই। এটা যে দেখাই সেটা মানুষ চায় বলেই দেখাই। এইটেকেই আদর্শ মনে করি। সেটা কেবল একালের আদর্শ ই নয়—চিরকালের আদর্শ। এত বড় সতী আমাদের পুণ্যশ্লোকা সাবিত্রী—তিনি সত্যবানকে পছন্দ করে এসে বাপকে বললেন, ওই রাজ্যহারা বনবাসী অন্ধরাজার ছেলে সত্যবানকে আমি পতিত্বে বরণ করতে চাই। এবং মনে মনে করেছি। নারদ সেখানে ছিলেন, তিনি বললেন, সে কি ? তুমি করেছ কি ? সে স্বল্পায়ু, আজ থেকে মাত্র আর এক বৎসর তার পরমায়ু। তার পরেই সে মরবে। এ সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ কর সাবিত্রী। বাপ বললেন, মা বললেন, কিন্তু সাবিত্রী শুনলেন না। তাকেই বিয়ে করলেন। এটাও কি তাই নয়! তিনি বলেছিলেন, এরা সাবিত্রী নয়। মরা স্বামীকে এরা তপস্যাবলে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে না। চুপ ক'রে গিয়েছিলাম। আজ মনে হল—এই যক্ষ্মারোগ থেকে সেরে ওঠা প্রেমাস্পদকে বিয়ে ক'রে বিপদের সম্ভাবনা মাথায় করে এবং প্রাণপণ সেবায় যারা তাকে বাঁচিয়ে রাখে তারা তো সাবিত্রীর পুণ্য এবং মহিমা অর্জন করেছে। আজ সুতপার এই অবস্থা না দেখে যদি এমনি অবস্থা দেখতাম তবে বড় খুশী হতাম। সুতপা আলাদা। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র!

ভাবতে ভাবতে এসে পড়েছিলাম ওই সব রোগীদের মহলে। তারা একখানা চেয়ার মাঝখানে রেখে চারিপাশে ঘিরে বসেছিল।

কথাবার্তা আর কি ? কথাবার্তার মধ্যে—

—এই বইটার গল্পের কথা সত্যি বাস্তব না কল্পনা ?

—এই চরিত্রটা এমন করলেন কেন ?

—ওই বইটা ভারী চমৎকার সুন্দর।

—আচ্ছা যক্ষ্মারোগী নিয়ে বই লেখেন না কেন ?

ঝপ ক'রে আমার মনে পড়ে গেল গতবার যখন এদের মধ্যে এসেছিলাম তখনও এই অনুরোধ শুনেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল একটি মেয়ের কথা। জয়া মুখার্জী। বছর কয়েক আগে থেকেই সে আমাকে পত্র লিখছে। মেদিনীপুরে আরোগ্যোত্তর আশ্রম, আফটারকেয়ার কলোনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলার পরম প্রিয় বাঙালী গভর্নর স্বর্গত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মশায়। এই এদের বেদনা তিনি যেমন হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন তা আর কেউ করলে না। করলে অনেক সমস্যার এদের সমাধান হ'ত। তিনি এদের জন্যে অঞ্জলি পেতে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন নি মোটা মোটা অঙ্কের চেক, তিনি ভিক্ষুকের মত ভিক্ষাঝুলি কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁকে বলতাম আমি রাজভিক্ষুক।

মেদিনীপুর আফটারকেয়ার কলোনী, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, তাঁর আরও কয়েকটি

হাসপাতাল আফটারকেয়ার কলোনীর অন্যতম। সেখানে থেকে জয়া মুখার্জী আমাকে পত্র লিখেছিল। বিশেষ শিক্ষিতা মেয়ে নয়। চিঠিতে হাতের লেখা বাঁকাচোরা এবং বর্ণাশুদ্ধিতেও অশুদ্ধ কিন্তু মনের আবেগটা সে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছিল। আমার কোন একখানি বই পড়ে সে আমাকে তার ভাললাগার কথা জানিয়েছিল এবং তারই সঙ্গে অনুরোধ করেছিল যে তাকে নিয়ে আমি বই লিখি।

চিঠির উত্তর আমি দিয়েছিলাম—এবং করুণা করে আর দুখানি বইও তাকে পাঠিয়েছিলাম। উত্তর কিছুদিন পর পেয়েছিলাম একখানা মলাট-ছেঁড়া একসারসাইজ বুকে ভর্তি করে লেখা তার জীবন-কথা।

ওখানকার ডাক্তারকে চিঠি লিখে ওর কথা জেনেছিলাম। জানিয়েছিলাম, যদি কোন বিশেষ দামী ওষুধ লাগে যা হয়ত ওখানে দেওয়া সম্ভব হয় না তার দাম আমি তাঁকে পাঠাতে প্রস্তুত আছি। সেটা যেন তিনি আমাকে লেখেন।

ডাক্তার লিখেছিলেন। কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। মনের মধ্যে ভাল না হওয়ার একটা বাসনা আছে মেয়েটির নিজের জীবনের বেদনার জন্য। আরও লিখেছিলেন, ওকে এর পর কলকাতায় একবার শেষ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে এবং সেখান থেকেই ওকে সমাজ-জীবনে সহজ মানুষের মত চলাফেরার অনুমতি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে।

তারপর সে অনেক চিঠি লিখেছে আমাকে। তার মধ্যে তার জীবন নিয়ে বই লেখার কথা লিখতে ভোলে নি।

আরও একজনের কথা মনে পড়ল, আমার আত্মীয়া ভবানীর কথা। এমন মিষ্ট স্বভাবের মেয়ে আমি দেখি নি। স্বামী ডাক্তার, আত্মীয় আমার সে-ই। তার স্ত্রী হিসাবেই আমার সঙ্গে আত্মীয়তা। বিয়ে হয়েছিল বারো-তের বছর বয়সে। একটি কন্যা হবার পর তার অসুখ ধরল। তখন তারা থাকত বর্মন স্ট্রীটের মোড়ে, তেতলার উপর। আনন্দবাজার, দেশ পত্রিকায় যাতায়াতের পথে ওদের ওখান হয়ে আসতাম। বছরখানেক পর হঠাৎ ওর জ্বর হল। সেই জ্বর আর ছাড়ল না। কিছুদিন যেতে-না-যেতে দেখলাম তার সুন্দর শান্ত দুটি চোখকে ঘিরে যেন একটি গোল কালো ছাপের ছায়া পড়েছে। ক্রমশ সে ছায়া গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে সেই সুন্দর মেয়েটিকে একটি ভয়াল রূপে ফুটিয়ে তুললে। ওর ডাক্তার স্বামী বললে—টি বি হয়েছে।

স্বামী তার করেছিল অনেক। প্রচুর করেছিল। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চাকরি নিয়ে যুদ্ধে গেল টাকারই জন্য। স্ত্রীকে রেখে গেল পুরীতে সমুদ্রের ধারে ছোট একটা বাড়ী কিনে।

যাবার দিন ভবানী আমাকে বলেছিল—চলছি।

বলেছিলাম—ভাল হয়ে ফিরে এস।

সে বলেছিল—আসব না।

—কে বললে?

—আমি বলছি, আমি জানতে পেরেছি।

—মনের ভুল তোমার।

—না মনের ভুল নয়। তা ছাড়া যেতেই চাই জামাইবাবু।

ভবানীর স্বামী আমার সম্পর্কে শ্যালক।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন, যেতে চাইবে কেন? যেতে চাইবার মত হয়েছেটা কি। তোমার স্বামী তো তোমাকে অবহেলা করে নি।

—না তা করে নি। তবে ভেবে দেখুন—ওই মেয়েটা রয়েছে—ও রয়েছে—ওদের যদি কোন ক্ষতি হয় আমার থেকে; তবে তখন আমার নিজের কাছে কি বলবার থাকবে বলুন তো!

এ কথার উত্তর দিতে পারি নি।

ভবানী বলেছিল—দেখুন—ও যুদ্ধে চাকরি নিয়েছে। ভাল হয়েছে আমার। মেয়েটাকে ভাসুর নিয়ে যাবেন। আমি ঝাড়া হাত-পা। এইবার এই ফাঁকে আস্তে আস্তে ওই সমুদ্রের ধারে চলে যাওয়াই ভাল নয় কি, ভাগ্যের কথা নয় কি?

কথাগুলির সাধারণ মানের সীমানা পার হয়ে আরও একটা মানে যেন আমার কানে আমার মনে ধরা পড়েছিল। চুপ করেছিলাম।

ভবানী শেষ কথা বলেছিল—একটা কথা বলব!

—বল।

—আমার হতভাগ্যের কথা নিয়ে একটা গল্প লিখবেন?

—কি লিখব? ধর—ভবানীকে আমি জিজ্ঞাসা করছি—তোমার কিছু থাকে তো বল! কোন ইচ্ছে কোন সাধ?

ভবানী একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—লিখবেন ভবানী বললে, সাধ বাঁচতে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়েছিল।

সেদিন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী আসতে আসতে এই সব কথাই মনে হয়েছিল। বাড়ী এসে জয়ার চিঠিগুলি খুঁজেছিলাম—কিন্তু পাই নি। বেশ মনে পড়ছিল একটা বড় খামের মধ্যে স্বতন্ত্র করে জমা করে রেখেছি। এই কয়েক মাস আগে সে পর পর-খান দুই চিঠি দিয়েছে। একখানা নীলরতন হাসপাতাল থেকে, একখানা একটা বাসার ঠিকানা থেকে। সে পত্র ভয়ানক পত্র। এবং সেই সময়টা আমার জীবনের গাঢ়তম দুঃসময়। আমার বড় জামাই দুরন্ত ক্যানসার রোগে মারা গেলেন। আমার কন্যা তার পুত্র-কন্যাদের বুকে ধরে মুখ ম্লান করে পড়ে আছে। উত্তর দেওয়া হয় নি। হয়তো একটু বিরক্ত হয়েছিলাম পত্র লিখে বিরক্ত করবার জন্য। সে সময় বাংলার এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ ডিরেক্টার আমার বই থেকে একখানি ছবি করেছিলেন। দেখানো হচ্ছিল, তাও দেখতে যাবার মত মানসিকতাও আমার ছিল না, আজও সে ছবি আমার দেখা হয় নি, কিন্তু তাতেও আমার আক্ষেপ নেই। যারা বেদনা, শোক—বিশেষ ক'রে পরমপ্রিয়ের শোককে—তুলে রেখে বা

সরিয়ে রেখে কর্মজগতে কর্তব্য ক'রে যান তাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়তো। কিন্তু আমি তা পারি নি; এমন অভিপ্রায় হওয়া মাত্র—সেই প্রিয়ের মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ভুলে যাচ্ছ আমাকে? এতই সামান্য ছিলাম আমি তোমার কাছে? আর তো কিছুই চাইব না। আমার চাওয়ার মধ্যে তো দু'ফোঁটা চোখের জল। তা থেকেও বঞ্চিত করবে? তা হলে কি প্রয়োজন কাব্যের?

যাক এ সব কথা। কিন্তু খুঁজতে বসেও সেই কথা মনে হচ্ছে। মনের সেই অবস্থার মধ্যে কোথায় যে রেখেছি খামখানি তা খুঁজে পেলাম না।

পরদিনও পেলাম না। থাক, তাহলে জয়ার কথা থাক। সুতপাই আজ সামনে—সুতপার কথা বড় হোক।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আবার গেলাম সুতপার কাছে। সুতপা আজ সুস্থ অনেকটা। বালিশ হেলান দিয়ে বসে আছে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে।

আমি ঘরে ঢুকে বললাম—ত্রিসত্য পালন করেছি। এসেছি আমি।

আকাশের দিকে তাকিয়েই রইল সে। কিন্তু স্মিতহাস্যে মুখ ভরে উঠল তার।

বললাম—আকাশ দেখছ?

সে বললে—চিল উড়ছে। বেশ লাগছে।

—কেমন আছ বল?

—আপনি বলুন।

—আমার তো ভাল লাগছে। ডাক্তারও বললেন ভাল আছ।

—কালকের থেকে ভাল আছি। এটা ঠিক।

একটু রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। উত্তরে আমি বললাম, না। ডাক্তার বললেন, সত্যই ভাল আছ, দিন দিন এইবার সেরে উঠবে।

—একটু ভাল হয়ে উঠলে তো ইয়োরোপ চলে যাব আমি।

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমাকে ডেকেছ; মানে কোন প্রয়োজনে, না এমনি? দেখতে?

কৌতুকময়ী হয়ে উঠল সুতপা। দুটোই বটে। বললে সে।

চুপ করে অপেক্ষা করে রইলাম। সে বললে—ধরুন যদি বলি—বলবার জন্যে ডেকেছিলাম যে শেষ কথাটি যাই বলে গো কানে কানে—তোমায় ভালবেসেছিলাম মনে মনে প্রাণে প্রাণে। তাহলে দেখার সাধটা অবশ্যই থাকবে!

হেসে উঠলাম। বললাম—আমি তাহলে বলব—"এবারে নয় এবারে নয়, ফিরে বারে—তোমার তরে আসব আমি বারে বারে। এই ভুবনে।"

সে বললে—ওটা আমার অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়ে যান। আগেরটার তলায়।

আগের লাইন দুটো পাটনায় ওকে লিখে দিয়ে এসেছিলাম। সেই লাইন দুটো বলেই সে আমার সঙ্গে কৌতুক করেছিল। জবাবে হঠাৎ মাথায় এসে গেল ওই লাইন দুটো বলে জবাব

দিলাম।

বললাম, কেন, ওটা বিধাতার দরবারে খত বলে হাজির করবে ?

—না, গান দুটো সম্পূর্ণ করতে হবে আপনাকে। এবং আমার এই খাতা নিন—এতে আমি লিখে রেখেছি আমার জীবনের ঘটনা। সব লিখেছি। এ থেকে আপনি বই লিখুন। এবং তা থেকে—। না, সে এখন থাক।

একখানা খাতা তার বালিশের তলা থেকে সে বের করে দিলে।

সাত

আগষ্ট মাস ; দিল্লীতে বর্ষা নেমেছে। গতকাল, পরশু, পর পর দুদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেছে। তার আগেও হয়েছে। আকাশ আজকে ঝক্‌ঝকে নীল। ধুলো-ঝড়ের পালা আর একশো ষোল থেকে বিশ ডিগ্রী গরমের পালা শেষ হয়েছে। বাতাসে জলের স্পর্শ লেগে আবহাওয়াটি হয়েছে চমৎকার। আরাম লাগছে।

বিনয়নগর কলোনীর ছোট ফ্ল্যাটে জানালা খুলে বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে আমার মনের রোমান্স লেগেছে আকাশে বাতাসে।

কদিন পর সুতপার দেওয়া খাতাখানা খুলে পড়েছিলাম।

মা বাড়ী নেই। সকালেই বেরিয়েছে ; রৌশেনারা গার্ডেন ক্লাবে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় নাচ আছে আমার।

আমার বুকটা ধকধক করে উঠছে মধ্যে মধ্যে। নাচব ; নাচ কেমন হবে ? সমস্ত লোকের মনে আমার ক্রিমসন রেড শাড়ী থেকে যে-ছটা ইলেক্‌ট্রিক লাইটের প্রতিফলনে ছিটকে পড়বে সে-ছটায় সারা হলের সব লোকের চোখে রঙ ছড়াবে তো ? আমার নাচের তালে তালে ওদের মন দুলবে তো ? টিকিট অনেক টাকার বিক্রি হয়েছে। মনে মনে হিসেব করে দেখেছি আমরা, প্রায় পাঁচশো টাকা পাব।

বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর পৃথিবী প্রায় অন্ধকারই হয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা এ দুনিয়ায় অন্তত এই দারিদ্র্য আর কুসংস্কার আচ্ছন্ন দেশে অন্তত পঞ্চাশ বছর ভবিষ্যতের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের সেই পঞ্চাশ বছর পরের কালে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাস করেছি সেই পঞ্চাশ বছর পরের কালের দেশে। এ দেশে সেটা যতটা বাস্তব হয়ে উঠুক বা না-উঠুক অন্য দেশে গিয়ে তা অনুভব করতে পারতাম। তাঁর মৃত্যুতে হঠাৎ পিছিয়ে এসে পড়লাম পঞ্চাশ বছর পিছনে।

পাটনায় ফিরে এসে কি অবস্থা যে হয়ে উঠেছিল—সে যখন মনে পড়ে তখন শিউরে উঠে ভাবি—উঃ—ওই কয়েকটা মাস কি ক'রে বেঁচেছিলাম। কিন্তু মা আমার বাবার শিক্ষার

আর তাঁর যোগ্যতায় সে অবস্থাকে জঞ্জালের মত ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। লোকে বলেছিল, দুর্দশার এবং লাঞ্ছনার আর শেষ থাকবে না!

মায়ের নামে অপবাদ যে যেমন পেরেছে দিয়েছে। মা গ্রাহ্য করেন নি।

ইংরেজ আমলে বেহারে কংগ্রেস মিনিষ্ট্রিতে যে মিনিষ্টারের অধীনে বাবা তাঁর পি-এ ছিলেন তাঁকে পাকড়ে মা যাত্রা সুরু করেছিল। মা ভুল করে নি। মিনিষ্টার খুব সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন; মাকে একটা চাকরি আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই আর মিনিষ্টার ছিলেন না। চাকরির চেষ্টা করে কিন্তু করতে পারেন নি। তবে মাকে স্বাধীন আমলের কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়েছিলেন এবং টাকাও কিছুখানি দিয়েছিলেন মাকে।

এই সময় এল রবীন্দ্র জন্মোৎসব।

মা বললেন—চল।

বললাম—কোথায়?

—উৎসব কমিটির কাছে। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ফাংশন তো হবেই, তাতে তোকে কিছু করতে হবে।

রবীন্দ্র জন্মোৎসবে চান্স পেলাম গর্দানীবাগের ফাংশনে। বাবার নাম পাটনায় সুপরিচিত। বাবার বন্ধুরা এখন হোমরা-চোমরা—তাঁরা সাহায্য করতে না করলেন না। অবশ্য সাহায্য না করলেও ক্ষতি হ'ত না। আমাকে কেউ চাকরি দিক বা না-দিক, কালচারাল ফাংশনে পার্ট দেবে না এ হতেই পারে না। সেবার শ্যামা হয়েছিল, আমি শ্যামা করেছিলাম। এবং রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই বা কেন—যেদিন প্রথম গেলাম কমিটির কাছে বলতে গেলে সেই দিন থেকে।

বাবার পরিচয়ে চিনতে কারুর দেরি হয় না। মাকেও অনেকে চিনতেন। আমি যুবতী। আমি ওদের কাছে বিস্মৃত পরিচয়ের কেউ হলেও ছেলেবেলার পরিচয় আমারও ছিল। আমি তো প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলাম তখন। মাকে ক'টি তরুণ এসে প্রণাম করেছিল। একজন বলেছিল, চিনতে পারছেন না খুড়ীমা আমি বুলবুল সেন! অমর সেন—ব্যারিষ্টার—

—ওমা! মা সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে হেসে বলেছিলেন, তুমি বুলবুল! তুমি কতবড় হয়েছ। এ্যাঁ? একেবারে ভদ্রলোক বনে গেছ। তা তুমি ভাল আছ? কি করছ? তোমার বাবা মা এঁরা ভাল আছেন?

সে একগাদা প্রশ্ন।

বুলবুল সেন দেখতে "স্মার্ট ইয়ংম্যান', পোষাক পরিচ্ছদের খুব বাহার। কিন্তু বোকা বোকা। আমার চোখে। বলতে গেলে এদেশের নব্বুইটা ছেলে যারা নিজেদের খুব আপটুডেট, প্রগতিশীল বলে সমাজে বলে তারা আমার চোখে কিন্তু বোকা-বোকারই সামিল। বিশেষ করে বিদেশ ঘুরে আসার পর এইটুকু আমি হলপ ক'রে ব'লতে পারি। ওদের গায়ের উপর যে রঙটা সেটা এমন কাঁচা আর এমনি লাগাবার ধরন যে একটু আঁচড় পড়লেই সেটা

চটে গিয়ে আসল রঙটা বেরিয়ে পড়ে।

বুলবুল সেন এতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছিল। ওদিকে ওর পিছনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কথা বলবার সুযোগের জন্যে বুলবুলকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

একজন তো, বুলবুলের কথার মাঝখানে কয়েক সেকেণ্ডের ফাঁক পেয়ে বলে উঠল, আমি মণ্টু চ্যাটার্জী বউদি!

মা বললে, হ্যাঁগো হাঁ, তোমাকে আমি অনেকক্ষণ চিনেছি। কথা বলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। বড়লোকের ছেলে মোটরে চড়ে বেড়াও। দেখলে গরীব বউদিকে তো চিনতেও পার না।

—না না বউদি, আমি ঠিক দেখামাত্র চিনেছি। আপনি বুলুকে জিজ্ঞাসা করুন—আমি ঘরে ঢুকেই বলেছি—আরে বুলু—মিসেস চক্রবর্তী আমাদের সৌরীন বউদি নয়?

—তাই নাকি? তবে বোধ হয় আমারই ভুল। এই পরশু আমি স্টেশনে গিছলাম, ফিরবার সময় একখানা গাড়ী আমার রিকশার পাশ দিয়ে চলে গেল—যে ড্রাইভ করছিল তাকে ঠিক তোমার মত মনে হল। আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। আমি তোমাকে ভেবে একটু হাসলাম—কিন্তু দেখলাম হুস্ করে চলে গেল গাড়ীখানা। নতুন ফিয়াট গাড়ী। ভাবলাম, মণ্টু আমাকে চিনতে পারলে না! এখন দেখছি আমারই ভুল।

মণ্টুর মুখখানা কেমন হয়ে গেল। বোকা মুখ—বেহদ্দ বোকা হয়ে গেল; চিরকুমার সভার পূর্ণ যেমন নির্মলাকে সেদিন কেমন বেলুন উড়েছিল দেখেছিলেন—বলবার সময় ইডিয়ট হয়ে যায় ঠিক তেমনি। তেমনি ভাবেই—ওই রসিকবাবু বলছিলেন—ফ্যাকাসে মুখে বলে উঠল—ও—। —ও—। এঁ্যা—হ্যাঁ। মানে সে তো আমিই বটে। পরশু তো আমি স্টেশনে গিছলাম বটে। ফিয়াট গাড়ীই বটে। একখানা রিকশায়—হ্যাঁ, মানে, হ্যাঁ, দেখেছিলাম—। হ্যাঁ। কিন্তু। ঢোক গিলে মণ্টু বললে—মানে আমার মাথায় তখন এমন একটা প্রবলেম—মানে বিজনেসের চিন্তা, মানে—আমি বিজনেস করি তো—তা ঘুরছিল। বলে দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

মা কিন্তু তাকে আর অপ্রস্তুত করেন নি। বলেছিলেন—ও—তাই। হ্যাঁ—তা না হলে কি আমাকে চিনতে না পার!

—কিন্তু সেটা আমার অপরাধ হয়ে গেছে নিশ্চয়। কিছু যেন মনে করবেন না বউদি।

—না—না। তাই আবার করে নাকি। বেশ তো তার প্রায়শ্চিত্ত করে আজই আমাদের বাড়ী পৌঁছে দাও গাড়ী করে। সুতপাকে চিনতে পারছ তো?

—নিশ্চয়! সুতপাকে দেখে তাই তো বলছিলাম—হাউ ওয়াণ্ডারফুলি শী হ্যাজ গ্রোন! এখনও নাচে সুতপা?

—নাচে মানে? হংকং জাকার্তা, পাকিস্তানে ঢাকায় এই তিন জায়গায় উনি ছিলেন—তা আমাদের ওখানে যত ফাংশন হয়েছে ও তাতে নেচেছে। জান বাণীতে ওখানকার ড্যান্স

শিখে এসেছে। এখানে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কালচারাল ফাংশনে পার্ট করবে বলে এসেছে। তা শ্যামাতে ও শ্যামা করবে ঠিক হল।

মণ্টু কৃতার্থ হয়ে গেল। গাড়ীতেই বাড়ী ফিরলাম। মা বললে—মণ্টু তোমার এ পানিশমেণ্ট পর্যাপ্ত হল না।

গাড়ী চালাতে চালাতে মণ্টু বললে—কেন বউদি?

মা বললে—অন্ততঃ আমার মন তাই বলছে। এখানে থাকতে তুমি এই বউদির একটু হাসি-প্রসাদের জন্যে বোখারা সমরকন্দ দিয়ে দিতে পারতে। আর তুমি সেই বউদিকে চিনতে পার নি দেখে এটা কি কম অপরাধ?

মণ্টু এবার আর ফ্যাকাসে হয়ে গেল না। কারণ বুঝতে পেরেছে মায়ের কথার মধ্যে খোঁচা নেই। এবং গরজের সুরটা স্পষ্ট। সে বললে, বেশ তো বউদি, দিন দণ্ড।

মা বললে—তা যদি অধিকার দিচ্ছ তাহলে বলি এই রিহারশ্যালে আমাদের নিয়ে যাওয়া—নিয়ে আসাটার ভার তোমাকে নিতে হবে। ঠিক বিকেল ছটার পর আসবে। চা খাবে আমার ওখানে, আবার রিহারশ্যাল শেষে পৌঁছে দিয়ে এক কাপ কফি খেয়ে বাড়ী যাবে। সুতপা কফি খুব ভাল করে। আমার থেকে অনেক ভাল। চল, আজই তোমাকে খাইয়ে পরীক্ষা দিয়ে দেবে। মণ্টু চ্যাটার্জী বিগলিত হয়ে গেল। গাড়ীর ড্রাইভিং সিটের সামনে যে আয়নাটা থাকে সেটাতে মণ্টুর মুখ দেখবার চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না। রাত্রিকাল, গাড়ীর ভিতরটায় অন্ধকার হয়ে রয়েছে। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে—ওর চিত্তের বিগলন যেন আমি উনোনের উপর তপ্ত কড়াইয়ে দালদা গলার মত দেখতে পাচ্ছিলাম।

মার মুখের দিকে তাকালাম। মণ্টু নিজে ড্রাইভ করছিল, আমরা মা-মেয়েতে পিছনে বসেছিলাম। মায়ের পাশে বসে মায়ের মুখ অন্ধকার হলেও বেশ নজর হচ্ছিল। মা মুখ টিপে টিপে হাসছে আর কথা বলছে।

মা আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়। এখন বয়স আটত্রিশ পার হচ্ছে। কিন্তু দেখতে মাকে আরও কম বয়সের মনে হয়। মণ্টু চ্যাটার্জী বাবার আমলে প্রায় আসত। বাবার খুব ভক্ত ছিল। বাবার থেকে বছর দশেকের ছোট। মার থেকে বছর চারেকের। লোকে বলত, মধ্যে মধ্যে বাবাও মাকে ঠাট্টা করে বলতেন—মণ্টুর ভক্তি কিন্তু আমার থেকেও তোমার ওপর বেশী।

মা হেসে বলত—সে তোমার ওই কুকুরটাও আমার অনুগত বেশী। হিংসের কারণ নেই। ওকে আমি খাটিয়ে নিই। এটা এনে দেয়—ওটা এনে দেয়। এ বরাতটা শোনে—

বাবা হাসতেন।

হঠাৎ আমার মনে হল—মায়ের আমার বিয়ের বয়স আজও আছে। খুব কৌতুক বোধ করলাম আমি।

সেদিন কফি খেয়ে মণ্টু চ্যাটার্জী যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে তাতে আমি যে আমি নানান দেশঘোরা মেয়ে—সে পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কথার উত্তর পর্যন্ত জোগাল

না।

মণ্টু চ্যাটার্জী চলে গেলে মা খুব হাসতে লাগল। বললে, ওটা একটা নাম্বার ওয়ান ইডিয়ট। উল্লুক একটা।

তারপরই গম্ভীর হয়ে বললে—কিন্তু খুব সাবধান সুতপা, এরা হল ডেঞ্জারাস টাইপ অফ ইয়ংমেন। ওদের একটা দল আছে—সে দলের এই ইডিয়টটাই পাণ্ডা। এদের কাজ হল যে সব বাড়ীতে মেয়েরা মডার্ন আর আইবুড়ো হয়ে আছে তাদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা জমায়। মেয়েদের মাকে বলে মাসীমা। খুড়ীমা। প্রেজেণ্ট নিয়ে যায়। খুব কালচারের কথা বলে। আর হৈ হৈ করে। সব বড়লোকের ছেলে—লেখাপড়াও মোটামুটি জানে। মেয়েদের মায়েরাও ভাবে টোপে গেঁথে ফেললে—মেয়ের হিল্লে হয়ে যাবে। তারাও প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ওদের মতলব অন্যরকম। শুনলাম একটি গরীব টীচারের মেয়ে ওদের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের টেবিলে মরেছে। কলকাতায় ব্যাপারটা ঘটেছিল—বাপকে হাজার দুয়েক টাকা দিয়ে চাপা দিয়েছে।

পড়তে গিয়ে কেমন যেন শরীর মন দুইই অসুস্থ হয়ে পড়ল। এ কি পড়ব? এ নিয়ে কি লিখব? বিশ্বজগতে এতকাল ভগবানের দোহাই পেড়ে মানুষ পশুত্ব মোচনের একটা নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করে এসেছে—আজ ভগবানকে নিয়ে অনেক তর্ক। আছে কি নেই এ নিয়ে কলহ কোলাহলের শেষ নেই। ভারী হয়ে উঠেছে সেই দলটাই যে দল বলছে নেই। ভগবান থাক বা না থাক মানুষ তো আছে। তারা তো ভগবান নেই বলে মনুষ্যত্ব নেই এ কথা বলে না। ভগবান নেই যারা বলে, তাদের মধ্যে বড় বড় মানুষ, বিরাট মনুষ্যত্বের তো অভাব নেই। নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে সব বিতর্ক বাদ দিয়ে যেখানে ঐ সম্পর্কের মধ্যে বেচা-কেনার লেন-দেনের সম্পর্ক আসে, হৃদয়ের সব সংস্পর্শ বাদ দিয়ে দেহ সম্পর্কটাই এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে ওঠে সেখানে ভগবানের কথা সমাজের কথা চুলোয় যাক—মনুষ্যত্বও যে সেই চুলোতেই পুড়ে খাক হয়ে যায়। আদিকাল থেকে সব দেশে এই পাপ রয়েছে কিন্তু তাতে মানুষ লজ্জা পাক বা না পাক মনুষ্যত্ব লজ্জা পায়। তাই এই ধরনের কথা নিয়ে কথাসাহিত্য মানুষ গোপনে পড়ে। সুতরাং এ পড়ে কি করব?

ভাবলাম কাল বা পরশু সুতপাকে খাতাখানা তাকে ফেরত পাঠিয়ে বলব, সুতপা তোমার জীবন-কথা তুমি লিখো, এ নিয়ে লেখার মত শক্তি আমার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল জয়ার কথা।

সেই এক মেয়ে—। আশ্চর্য! সুতপার ঠিক বিপরীত।

আমি খুঁজতে লাগলাম তার পাঠানো খাতা আর চিঠিগুলো কোথায়! সে খাতাখানা এমন সুন্দর খাতা নয়। একটা অতি সস্তা এক্সারসাইজ বুকে লেখা। এমন সুন্দর হস্তাক্ষরও নয়, কথার এমন গাঁথুনিও নেই। অনেক বানান ভুল আছে কিন্তু সে আশ্চর্য! কিছুটা শুচিবায়ুগ্রস্ত বটে কিন্তু বিচিত্র এবং বিস্ময়কর।

আট

জয়ার খাতাগুলো খুঁজে বের করবার একটা তাগিদ অনুভব করলাম। করলাম সুতপার কাহিনীর ওই পর্যন্ত প'ড়ে। সুতপা এর পর খ্যাতি অর্জন করেছে—করেছে পাটনার ওই মণ্টু সেনদেরই সাহায্যে। এ এক দড়ি টানাটানির খেলা। এ খেলা সংসারে চিরকাল আছে। চিরকাল থাকবে। থাকবে কেন—ওই খেলাটাই সব থেকে বড় হয়ে দাঁড়াবে তাতে সন্দেহ নেই। এবং আমার মত সেকালের মানুষ এ খেলাকে পছন্দ করুক বা না করুক তাতে এ কালের কিছু আসে যায় না। আমার মত সে কালকে বিগত ক'রে সে আসবে এবং মানুষকে ভাসিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলবে।

এ সংসারে ধ্যান ধারণা, ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দের নিরিখ নিত্য পাল্টায়, হয়তো প্রতিক্ষণে পাল্টায়। পাল্টাতে পাল্টাতে এমন একটা সময় আসে যখন অকস্মাৎ একদিন শিউরে উঠি, সামনেই যে সংসার দেখি সে সংসারটা সম্পূর্ণ বদলানো সংসার।

জয়ার খাতা তার চিঠি সব আমি সঞ্চয় ক'রে রেখেছি। কোথায় রেখেছি ঠাহর নেই। খুঁজতে খুঁজতে বের করলাম।

ছোট এক্সারসাইজ বুকের খাতা ছিঁড়ে লিখেছে এগার পৃষ্ঠা। গোড়ার পাতাতেই লিখেছে "শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক চন্দ্রশেখরের করকমলে আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটি অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিলাম। ইতি। জনৈকা যক্ষ্মারোগিনী জয়া।"

পাতা ওল্টালাম। জয়ার লেখা সুতপার লেখার পাশেই রাখলাম। বানান ভুলে ভরা টেরা বেঁকা অক্ষরে লেখা।

(১)

জয়া লিখেছে আমার বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গ। আমার বাবা কাকারা দরিদ্র (দরীদ্র লিখেছে জয়া) স্কুল মাষ্টার হলেও আমাদের সংসারে দারিদ্র্য কখনও ছিল না। কারণ আমার বাবার ঠাকুরদাদা ছিলেন জমিদার ; জমিদারির অবশিষ্ট কিছু কিছু ছিল। বিজয়া দশমীর দিন জন্ম বলে আমার নাম জয়া।

লোকের মুখে শুনি—আমি খুব আদুরে ছিলাম ছোটবেলায়। বাবা কাকার সংসারে আমি প্রথম সন্তান।

পার্টিশনের পর আমরা দেশ ছেড়ে নদীয়া জেলায় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসি। নতুন বাড়ী ও দোকান করে বাবা নতুন জীবন আরম্ভ করবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু হঠাৎ তাঁর হল টি বি। মা একা সংসারে ছোট ভাইকে নিয়ে সংসার চালিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারতেন না বলে আমাকেই করতে হ'ত বাবার সেবাযত্ন।

বাবা মারা গেলেন চিকিৎসা অভাবে। চিকিৎসা হয় নি পথ্য জোটে নি। বাবার মৃত্যুর

কুড়িদিন পর মাও মারা গেলেন। বোধ হয় মায়েরও টি বি হয়েছিল। কিন্তু মা সে প্রকাশ করেন নি। মায়ের মৃত্যুর আগের রাতের দৃশ্য আজও ভুলতে পারি নি। দেড় বছরের ভাই ঘুমিয়ে আছে মায়ের পাশে। আমি ন বছরের মেয়ে, সারারাত মায়ের মাথার কাছে বসে আছি। তিনি জড়িত (জয়া লিখছে জরিত) স্বরে কত কথা বলেছিলেন কিন্তু আমি তার কিছু বুঝি নি। মায়ের মৃত্যুর দিন বাড়ি ভর্তি প্রতিবেশী। একজন ডাক্তারও এসেছিলেন শেষকালে। সবার চোখে জল দেখেছিলাম। বাবার চেয়ে মাকে বেশী ভালবাসতাম। তবুও মায়ের মৃত্যুতে আমি কাঁদিনি।

মায়ের মৃত্যুতে পাষাণ হয়ে গিয়েছিলাম কি না জানি না। তবে মনে পড়ছে আমার সব চেয়ে বড় চিন্তা হয়েছিল আমি রাত্রে ঘুমাবো কার কাছে? মাকে ছাড়া কিছুতেই আমার ঘুম হত না। সেই থেকে আমি একলা শুই। কারুর কাছে শুলেই মনে পড়ে যায় মায়ের কথা, তখন আর ঘুম আসে না।

বাবার মুখাগ্নি করেছিলেন মা।

মার মুখাগ্নি করেছিলাম আমি। আমার ছোট ভাই আমার কোলেই ছিল সে সময়। দেড় বছরের ভাই।

ছোটবেলা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মরা মানুষকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে কি করে? তিনি বলতেন বড় হলে বুঝতে পারবে।

ন বছর বয়সেই বোধ হয় বড় হয়েছিলাম। ন' বছর বয়সে মা'র মৃত্যুর পরেই দেখলাম সে-দৃশ্য।

মায়ের মৃত্যুর পর যে ক'দিন ওই বাড়ীতে ছিলাম সে কয়দিনই সুযোগ পেলেই ভাইকে নিয়ে চ'লে যেতাম শ্মশানে।

তারপর স্থানান্তরিত হ'তে হল। কোথায় থাকব সেখানে? কার কাছে? আমার পাঁচ মামা, তাঁরা বিরাট বড়লোক, কিন্তু তাঁরা কিছুতেই রাজী হন নি আমাদের ভাইবোনের দায়িত্ব নিতে।

বলতে পারব না কেন? তবে নেন নি। অথচ এককালে খুব আত্মীয়তা দেখাতেন তাঁরা।

কাকা ফেলতে পারেন নি। কাকা কলকাতায় থাকতেন। প্রথম তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে আমাদের রাখলেন ওইখানেই—টাকা দিয়ে। কিন্তু তাঁরা করতেন ঠিক ঠিকেঝিয়ের মত ব্যবহার। আমাদের সেই দুরবস্থা দেখে কাকা আমাদের কলকাতায় নিয়ে এলেন। সংসারের সমস্ত কাজ আমিই করতাম। দেড় বছরের ভাইকে নিয়ে আমারই ছিল সব চেয়ে কষ্ট। সে ছিল রুগ্ন। তার সব আবদার আমাকে সহ্য করতে হ'ত। কাকাকে পেয়ে বাবার অভাব ভুলেছিলাম। মায়ের অভাব ভোলা যায় না। কাকা আমাদের মানুষ করবার জন্য পিতৃমাতৃহীনা এক গরীবের মেয়ে বিয়ে করলেন, সেই কাল হল। কাকীমা গরীবের মেয়ে হয়েও পিতৃমাতৃহীনা হয়েও আমাদের ভাইবোনের দুঃখ বুঝলেন না। তাঁর কাছে পেয়েছি

শুধু লাঞ্ছনা। এই কষ্টের মধ্যে এগার বছর বয়সে আমি হলাম পাগল। পাগল হয়ে আমার একমাত্র কথা ছিল চিৎকার ক'রে বেড়াতাম 'ভারতমাতা! তুমি সত্যই সন্তানদের মত ভালোবাসো তবে যেন কারুর মা বাবা মারা না যায়।

কাকা ভাল পাগলের চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করানোতে কিছুদিনের মধ্যে সেরে যাই।

এরপর কাকীমার পালা।

আমার পাগল ব্যাধি সারল, কাকীমাকে ধরল। কাকীমা পাগল হয়ে গেলেন। কাকা তাঁরও চিকিৎসা করলেন। ছ মাস। ছ মাস পর কাকীমা সারলেন। এই ছ মাসের মধ্যে কাকার একমাত্র বাচ্ছা মেয়ে মায়ের দুধ মায়ের যত্ন না পেয়ে মারা গেল। এবার কাকা হ'লেন পাগল, কাকীমা ভাল হয়ে পাগল স্বামীকে ফেলে চলে গেল দূর-সম্পর্কের ভাইয়ের কাছে। কলকাতা সহরে পাগল কাকা আর সাড়ে তিন বছরের অবুঝ রুগ্ন ভাইকে নিয়ে, শুধু আমি রইলাম সুস্থ প্রকৃতিস্থ। উন্মাদ কাকা আর রুগ্ন ভাইকে নিয়ে সে যে আমার কি বিপদ!

একদিন ধৈর্যহীন হয়ে গিয়েছিলাম ট্রামের তলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা দিতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বড় ভয় লাগল। পারলাম না, ছুটে পালিয়ে এলাম।

এর মধ্যে সব কিছু দুঃখ কষ্ট উপেক্ষা করে লেখাপড়ার জন্যে চেষ্টা করেছি। কাকারও একান্ত ইচ্ছা ছিল আমাদের ভাই-বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলে দায়িত্ব শেষ করবেন। কিন্তু তা হল না।

এর মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলাম আমি। তার পর সব বন্ধ হয়েছিল। কাকা ভাল হয়ে ওঠেন নি। তিনি কোথায় চলে গেলেন একদিন।

আমরা ভাইবোন দুজনে দুজনের হাত ধরে পথে বের হলাম। আমার বয়স তের, ভাইয়ের ছয়। কোথায় যাব?

পথে পথে ঘুরে ঠাঁই আমি যোগাড় করেছিলাম।

দুটো পয়সা দাও বলে হাত পেতে ভিক্ষে করতে পারি নি।

ঠাঁই যোগাড় করেছিলাম অনাথ আশ্রমে।

আশ্রমের নাম জাহ্নবী-শিল্পাশ্রম। শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ প্রভৃতির দিক দিয়ে জাহ্নবী অনাথ আশ্রমের খুব নাম, খুব ডাক, অনেক প্রশংসা। কিন্তু ভিতরের রূপ সে চোখে দেখেও দেখা যায় না, সে অনুভব করে বুঝতে হয়। সে অনুভূতি তারই হয় যে বা যারা ওখানকার ভুক্তভোগী। তারা ওই যারা অনাথ আশ্রমে যায়, বাস করে—অন্যেরা নয়।

কিছুদিনের মধ্যে প্রাণ হাহাকার করে উঠল।

সেখানে স্নেহ ভালবাসা মায়া দয়া শিক্ষা আদর্শ কর্তব্য কোনটাই নেই। আছে শুধু নিষ্ঠুর শাসন আর অনাথ পিতৃ-মাতৃহীনদের শোষণ করে কাজ আদায়ের ব্যবস্থা। আধপেটা খাইয়ে ছেলেমেয়েদের অমানুষিক (জয়া লিখছে 'অমানুসিক') পরিশ্রম করায়। যদি কেউ অবাধ্য হয়—তবে তার শাস্তি অতি মর্মান্তিক। প্রতিদিন রাত্রে নিয়মিত ছেলেমেয়েদের

ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। রাত্রে বাথরুমে যাবার নিয়ম নেই, উপায় নেই, জলতৃষ্ণা পেলে জল নেই। সে কি ভীষণ কষ্ট অন্যে বুঝবে না। ঘরে যখন তালা পড়ে তখন মনে হয় পরের দিন সকাল আর আসবে না। এইটেই শেষ রাত্রি।

ছেলেমেয়েরাও কিন্তু হার মানে না। তারা ভীষণ দুর্দান্ত, সুযোগ পেলেই পালিয়ে যায়। দেওয়াল ডিঙোয়। পথে ভিক্ষে করে গাছতলায় শুয়ে থাকে কিন্তু এখানে আর ফেরে না।

আমি পালাতে পারি নি, চেষ্টাও করি নি। আমার ভাইটি যে ছোট।

সব থেকে মর্মান্তিক কি হয়েছিল জানেন?

আশ্রমের দেড়শো ছেলেমেয়ে সকলেরই পরিচয় ছিল জারজ সন্তান। আমার মাকে মনে পড়ত বাবাকে মনে পড়ত। নিজের বেঁচে থাকার ওপর ঘেন্না হত। শুধু আমি নই—আশ্রমের দেড়শো ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়েরই—এই পিতৃমাতৃ পরিচয় ছিল—সুস্থ পরিচয় যে পরিচয়ে লজ্জা নেই সেই পরিচয় তবু অনাথ বলে ওই জারজ পরিচয়ই মাথায় করে নিতে হয়।

সংসারে মা বাপ মরে যে কেউ অনাথ হয় এ আশ্রমের কর্তারাই শুধু নয়—বাইরের যারা দেখতে আসতেন, আসেন—তাঁরাও কেউ বিশ্বাস করেন না। সেখানকার শিক্ষয়িত্রীদের মা বলে ডাকতে হয়; কত প্রত্যাশা করেই তাই ডেকেছি—মায়ের মতই শ্রদ্ধা করেছি—ব্যগ্র হয়ে খুঁজেছি—মায়ের স্নেহ ভালবাসা কিন্তু ক্ষণেকের তরেও পাই নি।

এরই মধ্যে নিত্যকারের সূর্যোদয় সূর্যাস্তের মধ্যে দিন রাত্রি পার হয়ে গেল—আমার বয়স বাড়ল। তখন পনেরোতে পা দিয়েছি।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি—সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠা—বয়সে প্রবীণ বৃদ্ধ—তিনি একদিন আশ্রমে এসে আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

আশ্রমের ছেলেমেয়েরা তাকে বাবা বলে ডাকত। কিন্তু শুনেছি তিনি তাঁর চোখে ধরলে বড় মেয়েদের নিয়ে যান সন্ধ্যায়।

তাঁর দৃষ্টি দেখে আমি ভয় পেলাম।

চলে যাচ্ছিলাম—তিনি ডাকলেন—এই শোন্।

ফিরে এসে দাঁড়াতে হল। তিনি আপাদমস্তক আমাকে দেখে বললেন—যা। আমি পালিয়ে বাঁচলাম।

আমার একটি বল ছিল। কারণ আমি কখনও অবাধ্য হই নি—আমার ভদ্র নম্র ব্যবহারে আমাকে ভাল না বাসুক—আমার উপর খুশী ছিলেন সকলে।

খাওয়ার সময় আশ্রমের প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমাকে বললেন—কর্তা—কর্তা বলে গেছেন তোমাকে আর এখানে রাখা হবে না।

বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাব? আমার তো—

—না না। সে ভয় করতে হবে না। এ আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে পাঠানো হবে তোমাকে।

—সে কোথায়?

—বর্ধমান জেলায় একখানা গ্রামে মেয়েদের জন্যে আশ্রম আছে। সেখানে যাবে তুমি।

—আমার ভাই?

—সে এখানে থাকবে।

—এখানে সে থাকবে—আর আমি—

নিষ্ঠুর ধমক দিলেন বড় দিদিমণি। সেখানে সে কোথায় যাবে?

কি করব। তাই হল। ভাইয়ের বয়স সাড়ে ন বছর। সে রইল অনাথ আশ্রমে। আমি গেলাম বর্ধমান মেয়েদের আশ্রমে।

পাড়াগাঁয়ে শক্ত কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা অনেকটা জমি। কাঁটাতারের গায়ে গায়ে গাছের বেড়া; একটা ফটক দিয়ে ঢুকতে হয়।

সামনেই লেখা নারী কল্যাণ আশ্রম।

খড়ের চাল মাটির দেওয়াল ঘর। নানান বয়সের চল্লিশটি মেয়ে। শুনলাম এরা সবাই সমাজপতিতা।

অবাক হয়ে গেলাম ভাগ্যের খেলায়।

অনাথ আশ্রমে গিয়ে জারজ সন্তান বলে পরিচিত হয়ে কলঙ্কিত করেছি—বাবা মাকে—নিজের জন্মকে। এবার পরিচয় হল আমি সমাজপতিতা—এবার নিজেই কলঙ্কসায়রের কালীজলে স্নান করে উঠলাম—কালো রঙ হয়ে গেল আমার—জন্ম কলঙ্কিত হয়েছিলো অনাথ আশ্রমে। জীবন কলঙ্কিত হল নারী কল্যাণ আশ্রমে পতিতা পরিচয়ে।

পড়তে কষ্ট হচ্ছিল আমার।

পড়া বন্ধ করে মুখ তুললাম।

বিচিত্র ব্যাপার। হঠাৎ জয়ার সমস্ত করুণ ঘটনাকে পিছনে রেখে মনশ্চক্ষের সামনে দাঁড়াল এসে সুতপা।

সুরূপা এখন।

শ্যাম্পু করা চুল, লিপষ্টিক মাখা ঠোঁট—আঁকা ভুরু চোখের কোণে টানা কাজল। কপালে ছোট্ট একটি মটর দানার মত কুমকুমের টিপ। রুগ্না সুতপা নয়। সুস্থ উল্লাসময়ী রূপসী সুরূপা।

সে যেন হাসছিল।

কিছু বললে সে। সুতপা বা সুরূপা নিশ্চয়ই নয়। আমার মন, যে কল্পনায় সুতপার আত্মা—সে-ই বললে—দাদু ওইটে নিয়ে গল্প লিখে দিলে ওই জয়ার পার্টটা আমি করব।

বললাম—ও ভূমিকায় তুমি জীবন দিতে পারবে না।

সে হেসে বললে—দাদু তুমি ওকে বল ও স্টেজে দাঁড়িয়ে নিজের এ কাহিনীটা বলে যাক। দেখ কত লোক শুনতে আসে। শতখানেকেরও বেশী হবে না। এবং পঞ্চাশ জনেরও

বেশী গল্পটা শেষ হবার আগেই উঠে যাবে। আর আমি যদি ওই পাটটা করি ছবিতে তবে লোক ভেঙে পড়বে। হপ্তার পর হপ্তা হাউস-ফুল যাবে। তখনও যদি কোনদিন শোয়ের শেষে ওকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বল যে—এই আসল জয়া, তখন সিটি পড়বে, চীৎকার করবে—বলবে ওকে হঠাও—সামনে থেকে হঠাও।

আমি অস্বীকার করতে পারলাম না।

আবার সামনে, আমার মনের সামনে এসে দাঁড়াল জয়া। স্বরূপা সুতপাকে আড়াল করে দাঁড়াল। জয়াকে কোন দিন চোখে আমি দেখি নি। তার চিঠি থেকে তার মনকে দেখেছি সেই জীবনকে দেখেছি যা কায়ার অন্তরের মধ্যে বাস করে। এ একটি মেয়ে—অতি সাধারণ বাঙলা দেশের শ্যামবর্ণ মেয়ে, দেহ শীর্ণ। চোখ দীপ্ত আর একরাশ চুল। সাধারণ মিলের আধ-ময়লা শাড়ী পরা, গায়ে নিজে হাতে কাটা সেলাই করা ছিটের ব্লাউজ। সায়াও তাই। পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল। মুখে কোন প্রসাধন নেই। বিষণ্ণতার মধ্যেও তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে।

সে বললে, স্বরূপার কথা শুনেছি দাদা। ও তোমার নাতনী আমি তোমার বোন। আমি তোমার মত সে-কেলে এ যুগে বলতে হয় সে-কালিনী আর ও হল এ-কালিনী। ওর জীবনটায় অভিনয় বড়, আমার জীবনে 'অভিনয় নয়' বড়। আমি শিখি নি। দুঃখ যখন সফল হয় তখনই সে প্রমোদের হয় দাদা। তাই লোকে পয়সা দিয়ে ভিড় করে দেখতে আসে। নকল দুঃখের জন্যে চোখের জল ফেলতে ভালো লাগে, সুখ আছে তাতে। সংসারে দুঃখ যেখানে সত্যি সেখানে মানুষের বড় ভয়। যেখানে গিয়ে দেখতে গেলে পয়সা লাগে না তবু লোকে যায় না। আমার জীবনের অভিনয় স্বরূপা তোমার করতে পারে, তা দেখতে লোকও আসবে ভিড় করে, বিলাসিনী উল্লাসিনী স্বরূপা বিষণ্ণ হলে কেমন লাগে দেখে মোহিতও হয়। কিন্তু ওই স্বরূপাকে বল না কেন আমার সঙ্গে দুদিন একসঙ্গে থাকতে তা সে পারবে না।

কথাটার প্রতিবাদ খুঁজে পেলাম না। এমন কি পিছন থেকে স্বরূপা কথা জুগিয়ে প্রম্‌ট করে দেবে ভেবে পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। সে সরে গেছে। যে নিয়মে আলো এলে অন্ধকার দূরে গিয়ে দাঁড়ায় কোন আশ্রয় ক'রে সেই নিয়মে স'রে গেছে।

আমার মনের কথা বুঝে জয়া হেসে বললে—যে নিয়মে স্বরূপা তোমার আজ হটে গেল—সেই নিয়মে অভিনয়ের আসর থেকে আমিও হটে আসি দাদু। তবে সে পরের কাছে লজ্জা পেয়ে নয় নিজের কাছে লজ্জা পেয়ে। আমি অভিনয় করতে পারিনে—সেটা স্বরূপা পারে। সেটা তার বড় একটা গুণ। ও গুণে হয়তো নিজের দুঃখকে হাল্কা করে নেওয়া যায়। আমার জীবনে দুঃখই বোঝা হল আর সে বোঝা দিন দিন ভারীই হয়ে চলেছে। ঘাড় আর তুলতে পারলাম না কোন দিন। ভুল বুঝবেন না আমাকে। স্বরূপাকে আমি মন্দ বলছিনে। লজ্জা পায় না বলে নির্লজ্জ বলছিনে। সে লজ্জাকে জয় করেছে। আমি পারি নি।

বললাম—তা হলে বল তোমার দুঃখের কথাই বল। যে পর্যন্ত বলেছ তার পর থেকে সুরু কর। মিলিয়ে দেখি তোমার অকৃত্রিম পাথরের বোঝার মত দুঃখের বোঝা বেশী সত্য—না সুরূপা যে দুঃখের পাথর কেটে—একটি সুন্দর বিগ্রহ তৈরী করেছে সেই বিগ্রহটি বেশী ভারী বেশী সত্য।

জয়া বললে—না দাদা—আমার দুঃখ বেশী ভারী বেশী সত্য এ বলে আমার কোন দাবী নেই।

অতি প্রসন্ন অথচ উদাস হাসি তার মুখে ফুটে উঠল।

আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

* * *

আমার কল্পনার জয়া মানসচক্ষের সামনে থেকে সেই দীর্ঘশ্বাসটুকু কুড়িয়ে নিয়ে মিলিয়ে গেল। এর চেয়ে বেশী পাওনা তার নেই সে তা জানে!

আমার চোখের সামনে তার যে চিঠিগুলি পড়েছিল তাই তুলে নিলাম। প্রথম চিঠি ঠিক চিঠি নয়—তার নিজের হাতে লেখা অসংখ্য বানান ভুলে ভরা তার নিজের জীবনকাহিনী।

কৈশোরে এসে ভাইকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অনাথ আশ্রমে। অনাথ আশ্রমে যারাই আশ্রয় নেয়—তাদের সব পূর্বপরিচয় মুছে যায়, আশ্রমের কর্তৃপক্ষ থেকে সাধারণ লোক—সবাই তাদের ভাবে এবং তাদের কাছে তাদের পরিচয় হয় তারা জারজ সন্তান।

এটা কিশোরী জয়ার বুকে কঠিন ভাবে বেজেছিল। কিন্তু তখনও জানত না যে তার আবার একটা নূতন পরিচয় তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে।

যুবতী হতেই তাকে কর্তৃপক্ষ অনাথ আশ্রম—যেখানে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দেন সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র, পতিতা উদ্ধার আশ্রমে।

জয়া এই কেন্দ্রে এল—দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করেছিল—পতিতা পরিচয়। সেই পরিচয় নিয়েই তাকে প্রবেশ করতে হল আশ্রমে।

আশ্রমের মেয়েগুলির সকলেই প্রায় প্রৌঢ়া। সাধারণতঃ লেখাপড়া না-জানা মেয়ে, কয়েকজনের তিন কুলে কেউ নেই। কয়েকজন সত্যই সমাজপতিতা—তারাও পতিতজীবনে সমৃদ্ধির বয়স পার হয়ে এখানে এসে জুটেছে।

এদের আশ্রয় দেওয়ার মূল্যে সত্যকারের করুণা কতখানি—তা ঠিক বুঝতে পারে নি জয়া। ওরা হাতে কলমে কিছু কাজ করতো—বলতে গেলে মজুরিণীর কাজ, গাছে জল দেওয়া গাছের গোড়া পরিষ্কার করা, কিছু সব্জী উৎপাদন করা—এই নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল। খোলা ডাঙ্গার মধ্যে খানতিনেক ঘর। একখানা বেশ লম্বা। খড়ের চাল—দু পাশে খুঁটি দেওয়া মাটির বারান্দা। মধ্যখানে পাশাপাশি খানকয়েক ঘর; তার মধ্যে থাকতো এই সব মেয়েরা, আর একখানা এমনি ধরণের ছোট বাংলো তার মেঝে বাঁধানো: সেটা আপিস এবং ওখানকার যিনি ভারপ্রাপ্ত মহিলা প্রতিভাদি থাকতেন। প্রতিভাদির শক্তসমর্থ দেহ, পুরুষালি গলা, তেমনি ভঙ্গি; বেশ আধুনিক ঢঙে ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে সকাল থেকে রাত্রি আটটা নটা পর্যন্ত শুধু

শাসনই করে বেড়ান! আপিসে বসে দু'চারখানা চিঠি লেখেন। দুজন দারোয়ান বা রক্ষক আছে—তারা খানিকটা দূরে একখানা ছোট ঘরে থাকে। সমস্ত আশ্রমটার চারিদিকটাই উন্মুক্ত, শুধু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। পাশ দিয়ে চলে গেছে কয়েকটা পায়ে চলা রাস্তা, একটা উত্তর দিক থেকে, একটা পূর্ব দিক ঘেঁষে একটা গাড়ী চলা কাঁচা রাস্তা পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে মিশেছে—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে। আগে পায়ে চলা রাস্তাগুলো কিছু দূরে দূরে ছিল—কিন্তু আশ্রম হওয়ার পর থেকেই পথচারীরা সম্ভবতঃ আশ্রমবাসিনীদের একটু ভাল ভাবে দেখতে পাওয়ার বাসনায় কাছ ঘেঁষে চলে রাস্তাটাকে কাছিয়ে এনেছেন। পুরানো পথরেখার উপর ঘাস জন্মে গেছে।

প্রথম দিন এসে পৌঁছেই—তাকে প্রথম যেতে হয়েছিল—রমাদির কাছে। ষ্টেশনে গিয়েছিল একজন দারোয়ান—ওদিক থেকে সঙ্গে এসেছিল কলকাতা অনাথ আশ্রমের লাবণ্যদি। দুটো আশ্রমই—সুরমাদি'র অধীনে। অনাথ আশ্রম এবং পতিতা আশ্রম দুটোই।

সুরমা দিদি সম্পর্কে অনাথ আশ্রমেও সে অনেক কথা শুনেছিল। সুরমাদি ছিলেন বিজয়ার কাছে বিস্ময়ের মানুষ।

অনাথ আশ্রমের সর্বেসর্বা। প্রতিষ্ঠাতা মস্ত নামকরা একজন মানুষ, অনেক প্রতিপত্তি অনেক অর্থ—মজুমদার; এই মজুমদার পর্যন্ত তার কথায় উঠতেন বসতেন। সুরমাদি নিজের মনে কাজ করে যেতেন কিন্তু যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন তখন প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার পর্যন্ত ভয় পেতেন।

অনাথ আশ্রম থেকে আসবার কিছুদিন আগে ওখানকার একজন শিক্ষয়িত্রী বিন্দুদি তিনি মেয়েদের সেলাই উলের কাজ এবং গৃহস্থালীর কাজ শেখাতেন; জয়াকে তখন তাঁর সহকারিণী করে নেওয়া হয়েছিল। ওই ষোল সতের বছর বয়সেই সে পারঙ্গমা হয়ে উঠেছিল। বিন্দুদি জয়াকে ভালবাসতেন এবং তার সঙ্গে অনেক প্রাণের কথা বলতেন। বয়সে প্রায় পঞ্চাশের কাছে পৌঁছেছেন বিন্দুদি। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরতেন কাঁচাপাকা অল্পচুলে গুছি জুগিয়ে মানানসই খোঁপা বাঁধতেন। পান দোক্তা খেতেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, জানিস জয়া, ওই সুরমাদি'ই সব। মজুমদার ঢাক, ওকে বাজায় সুরমাদি। যেমন বলায় তেমনি বলে। কেন জানিস?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীরবে সে—বিন্দুদির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

কথা হচ্ছিল রাত্রিবেলা ঘরে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে। আলোটা জ্বলছিল—জয়া একখানা বই পড়ছিল। জয়া বই থেকে দৃষ্টি তুলে বিন্দুদির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বিন্দুদি দি বলেছিল—ভালবাসা।

—ভালবাসা? বিস্ময়ের অবধি ছিল না জয়ার।

বিন্দুদি বলেছিল ওই কর্তার সঙ্গে মানে মজুমদারের সঙ্গে সুরমাদি'র নাকি ছেলেবয়সে ভাব হয়েছিল। প্রেম, প্রেম। তা মজুমদার ছিল গরীব, আর সুরমাদি'রা বড়লোক।

বিয়ে হয় নি। মজুমদার মনের দুঃখে গ্রাম থেকে চলে এসেছিল। তারপর ব্যবসা করেছিল। ছোট থেকে বড় ব্যবসা। অনেক বড়। তারপর যুদ্ধের সময় লাখ লাখ টাকা পেয়েছে। এই সময়ে হঠাৎ খবর পায় যে সুরমাদি বিধবা হয়েছে। শুধু বিধবা নয়, ওর স্বামী বার্মাতে বড় চাকরি করতেন। আসবার সময় মারা যান। একটা ছেলে একটা মেয়ে ছিল, তারা ওই আসবার পথে হারিয়ে যায়। এখানে কোন রকমে যখন এসে উঠলেন—তখন বাপ-মা মারা গেছে। ভাইরা জায়গা দিলে কিন্তু সে অনেক অপমান ক'রে দিলে। সুরমাদি'র স্বামী ছিলেন লেখাপড়া জানা লোক, তিনি সুরমাদিকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বারো বছরের ঘর করার কালের মধ্যে ম্যাট্রিক আই-এ পাশ করিয়েছিলেন। আর সুরমাদির বাবার গুষ্ঠী পাড়াগাঁয়ের জমিদারগুষ্ঠী। জমিজমা জমিদারী এই নিয়ে ব্যাপার, গ্রামে দাপট। সুরমাদি'র স্বামী ওদের খুব ঠাট্টা করতেন। ওদের বলতেন "কুয়োর ব্যাঙ"। সুরমাদি নিজে লেখাপড়া শিখেও স্বামীর মতটাই নিজের মত করে নিয়েছিলেন। ভাইভাজদের খুব উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখতেন। লিখতেন "মেয়েদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর পাট তোমাদের নেই। তোমরা ভাব তোমাদের গ্রামের বাইরে যাবার দরকার নেই কারণ চাকরি করতে হবে না। জেলার সদরে সায়েবদের সেলাম করতে জানলে আর মামলা সেরেস্তা বুঝলেই হয়ে গেল। আমার অবস্থা যা হয়েছিল প্রথম প্রথম এখানে এসে—সে আমি জানি। আজ লেখাপড়া শিখে সব বুঝছি। কুয়োর ব্যাঙ বলেন উনি তোমাদের। সে কথা মিথ্যে নয়।"

এখন সব হারিয়ে যেদিন সুরমাদি বাপের বাড়ী ফিরলেন তখন ভাইভাজেরা তার শোধ নিলেন। ভাঁড়ার আর রান্নার তদারক রাখতে দিলেন। মধ্যে মধ্যে রাঁধতেও হত। মজুমদার গ্রামে দুটো ইস্কুল করেছিল। একটা ছেলেদের হাইস্কুল অন্যটা উচ্চ প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়। মাস দু'তিন পর অবস্থা অসহ্য হলে সুরমাদি মজুমদারকে পত্র লিখেছিলেন। সব কথা জানিয়ে লিখেছিলেন—বালিকা বিদ্যালয়ে আমাকে তুমি যদি একটি চাকরি দাও তবেই তো বাঁচতে পারি—নইলে এই কষ্ট অপমান সইবে না—আমাকে বিষ খেয়ে মরতে হয়ে।

মজুমদার তখন খুব বড়লোক হয়েছেন। তাঁর খাতির অনেক কিন্তু সে গ্রামে বড় একটা যেতেন না। তিনি ছুটে গেলেন গ্রামে। গিয়ে সুরমাদি'কে চাকরি দিয়ে এলেন। ইস্কুলের কর্তা সুপারিন্টেডেন্ট করে দিলেন। আলাদা কোয়ার্টার করে দিলেন। সুরমাদি সেখানে এলেন। কিন্তু গাঁয়ে দুর্নাম রটালে ভাজেরা। গ্রামের লোকেরা সায় দিলে। বললে, পুরনো ভালবাসা নতুন করে জাগিয়ে উঠেছে।

সুরমাদি লিখলেন মজুমদারকে সব কথা। মজুমদার তখন এই অনাথ আশ্রম খুললেন। বললেন—তোমার ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেছে তুমি এই নিয়ে থাক। তোমার মন খুসী হবে এতে। কে বলতে পারে হয়তো এখানেই কোনদিন তোমার হারানো ছেলেমেয়ে ফিরে আসতে পারে।

খুব ভাল লাগল সুরমাদির। তারপর—।

জয়া জিজ্ঞাসা করেছিল—তারপর কি ? পেলেন ছেলেমেয়েকে ?

হেসে বিন্দুদি বলেছিলেন—তুই নেকা রে। সত্যকারের নেকী।

—কেন ?

—মরণ, হারালে পায় আর মলে জীয়ায় এসব সেই ষষ্ঠীর আর মঙ্গলচণ্ডীর কথায় আছে। এ করলে কি হয়—না হারালে পায়, মলে জীয়ায়। জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করত কথা শুনত আর শেষে বলত এ ব্রতে কি হয় না মলে জীয়ায়, হারালে পায়। তার কথা সত্যি কিনা পরখ করতে, তার ছেলেকে তার স্বামীই গলা টিপে মেরে পুকুরের পাঁকে পুঁতে দিল। জয়াবতী—রান্না করছিল, সে গেল পুকুরে জল আনতে, যেমন পুকুরে ঘড়াটি ডুবিয়েছে অমনি মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় মরা ছেলে বেঁচে উঠে একেবারে পায়ের কাছে এসে তার আঁচল ধ'রে উঠে পড়ল। তবে হ্যাঁ—পেল বৈকি কিছু সুরমাদি।

—কি ? প্রশ্ন করতে ভরসা পেলে না জয়া। আন্দাজে সে অনুভব করতে পারলে, বয়সে সে আর বালিকা নয়, তা ছাড়া এই অনাথ আশ্রমে ছন্নছাড়া ছেলেদের মধ্যে মানুষ হয়েছে। এসব ছেলে অল্প বয়সে পৃথিবীর ভালোর দিকটা বুঝুক বা না বুঝুক মন্দর দিকটা প্রায় সব বুঝে ফেলে।

বিন্দুদি বলেছিলেন—হাঁ করে চেয়ে রইলি যে ? কোনদিন দোতলায় সুরমাদির ঘরে গিয়েছিস ?

—গিয়েছি তো।

—দেওয়ালে ছবি দেখেছিস মজুমদারের ? রঙীন ছবি ?

—হ্যাঁ কিন্তু তাতে কি—উনি তো আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। সুরমাদিকেও যে উনি পিতিষ্ঠে করেছেন। নেকী ছুঁড়িটা। সন্ধ্যে থেকে কতক্ষণ ওখানে আড্ডা চলে দেখেছিস। আসবাবপত্র বিছানা বালিশের পরিপাটী দেখেছিস্। ফুলদানীতে ফুলের বাহার দেখেছিস। সুরমাদি কত রকমারি শাড়ী পরে দেখেছিস। যার স্বামী মরেছে—ছেলে মেয়ে সব হারিয়েছে—তার এত বাহার কেন লা ? মজুমদারের উপর হুম্‌কি দেখ্‌ছিস ? যে মাইনে নিয়ে কাজ করে তার এত হুমকি খাটে মনিবের উপর।

সেদিন সারারাত্রি ভেবেছিল জয়া। ঘুম হয় নি। কিন্তু এর কয়েক দিনের মধ্যেই বিন্দুদির কথা যে কত সত্য তা বুঝতে পেরেছিল। সে আশ্রমে কাজ করতে করতেও মজুমদার এবং সুরমাদির প্রতি পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল। যে পদক্ষেপগুলির কোন অর্থই ছিল না—তার কাছে তার বিচিত্র অর্থ এবার যেন পথে পড়ে-থাকা একটা লতার টুকরো—অকস্মাৎ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে হিস্ হিস্ করার মত সজীব এবং সরস হয়ে উঠল।

এর পরেই হঠাৎ সুরমাদি তাকে একদিন ডেকে বললেন—দেখ, তোমাকে আর তো এ আশ্রমে রাখতে পারব না—তুমি বড় হয়ে উঠেছ। বুঝেছ।

চোখে অন্ধকার দেখছিল জয়া, সে কোথায় যাবে ?

—আমাদের এখানে একটা নির্দিষ্ট বয়সের বেশী বয়সের মেয়েদের রাখার নিয়ম নেই।

এবার জয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলেছিল—আমি কোথায় যাব? আমার তো কেউ নেই। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এসেছিল।

সুরমাদি বলেছিলেন, না না সে জন্যে ভেবো না তুমি। সে ব্যবস্থা আমরা করব। তুমি এখানে কাজকর্ম ভাল করেছ, কাজ শিখেও ফেলেছ অনেক। তোমাকে দিয়ে কাজও আমরা পাব। আমাদের নারী উদ্ধার আশ্রমের কথা তো শুনেছ। আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতে চাই। সেখানে অনেক গেঁয়ো মেয়ে আছে যারা লেখাপড়াটড়া কিছুই জানে না। কি রাঁধুনীর কাজ ছাড়া কোন কাজও করতে পারে না। সেখানে পাঠাব তোমাকে। থাকবে সেখানে, তাদের সেলাইয়ের কাজ উল বোনার কাজ শেখাবে; লেখাপড়া কিছু কিছু শেখাবে। নাম তোমার সেখানে থাকবে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে।

খুসী হয়েছিল জয়া। এখানকার চারিদিক ঘেরা পাঁচিলের বাইরে বেরুতে পারলে সে বাঁচে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়েছিল। মনে পড়েছিল ভাইয়ের কথা। যাকে সে তিন বছর বয়স থেকে বুকে করে মানুষ করেছে। যে এই আশ্রমেই মাঝের পাঁচিলটার ওপারে থাকে। মাঝে পাঁচিলটা থাকলেও এখানে সে এটা অনুভব করে যে সে কাছেই আছে। কোলের কাছে সে?

সুরমা বলেছিল—সে এখানে থাকবে। তাকে ছাড়ব কি করে?

কথাটা শুনে বিন্দুদি বলেছিলেন—ভাবছিলাম তাই। বলে—সে হেসেছিল।

—হাসলে কেন বিন্দুদি?

—হাসলাম।

—কেন, তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

—আমার বলতে মানা আছে। বলে কি চাকরিটি খোয়াব!

—কেন?

—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে—ওই সুরমাদির ঘরে যা কোন ছুতো করে, সেখানে—সুরমাদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখিস—জবাব পাবি!

আঁচে সে বুঝেছিল। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল বিন্দুদির মুখের দিকে। বিন্দুদি কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল—যা চলে যা। কত্তার যত বয়স বাড়ছে—সুরমাদি পুরনো হচ্ছে তত। থাক ভাই—বুঝে নিস। চলে যা—ভাল হবে।

নিজে সুরমাদি তাকে নিয়ে মস্ত বড় এই শড়কটার ধারে গ্রাম থেকে দূরে—শ'দুয়েক বিঘে প্রান্তরের মধ্যে এই আশ্রমটায় নিয়ে এলেন। কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা ফটকে বাঁশ দিয়ে তৈরী একটা ফটক। চারিপাশ অবাধ উন্মুক্ত। স্টেশন থেকে সাইকেলরিকশায় আসবার পথে এই খোলামেলা অবাধ প্রান্তর তার ভারী ভাল লেগেছিল। আশ্রমের মাঝখানে একটা সুন্দর পুকুর তার পাড়ে বাড়ী খান তিন চার।

মনটা ঘা খেলে—ফটকের মুখে, মাথায় টাঙানো কাঠে-লেখা আশ্রমটার নাম দেখে। পতিতা উদ্ধার আশ্রম, নারী কল্যাণ কেন্দ্র। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করেই আশ্রমে ঢুকেছিল। মনকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিল—যে সে এখানে শিক্ষয়িত্রী হয়ে এসেছে। কিন্তু সুরমাদি আপিসের বাংলোটায় উঠে কর্তৃপক্ষের জন্ম নির্দিষ্ট ঘরটায় ঢুকতেই—এখানকার ভারপ্রাপ্ত দিদিমণি প্রতিভাদি—তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—একে কোত্থেকে আনলেন সুরমাদি? এ যে জলন্ত খাপরা গো! বয়স যে গন্ গন্ হয়ে উঠেছে।

—তুমি বড় নোংরা কথাবার্তা বল প্রতিভা!

—না, তা বলি না। বলছি বয়সটার কথা! আদালত থেকে নিয়ে এলেন বুঝি? ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল?

—না। আমাদের আশ্রমের মেয়ে। এসেছিল বারো তেরো বছর বয়সে। এখন বড় হয়েছে। কাজকর্ম ভাল শিখেছে। সেলাই খুব ভাল করে, জামাটামার কাটও ভাল। উলও ভাল বোনে। কিছু লেখাপড়াও জানে। এখানে ও তোমার সঙ্গে এইসব শেখাবে, মেয়েদের! যাও ওকে তুমি তোমার ঘরে জায়গা ক'রে দাও। সেখানে থাকবে ও।

—না। সে হবে না।

—কেন?

—ওটা আমার ইচ্ছে। আপনি নিজের কপাল বাঁচাতে—আমার কপাল খাবার জন্যে—এখানে নিয়ে এলেন—না?

—প্রতিভা! ধমকে উঠলেন সুরমাদি।

—আমি আপনাকে ভয় করিনে সুরমাদি!

—বুঝেছি। অনেক দূর এগিয়েছ। না? খুব বেড়ে গেছ! তোমাকে আমি—কথাটা শেষ করলেন না সুরমাদি। প্রতিভাও চুপ করে রইল।

একটু পর সুরমাদি বললেন—বেশ ওকে মেয়েদের সঙ্গেই থাকতে দিয়ো। ওখানেই থাকবে সে। চেঁচিয়ো না বেশী। মেয়েটা বাইরে রয়েছে শুনতে পাচ্ছে সব।

তবুও প্রতিভার কোনো কথা শোনা যায় নি। প্রতিভা বেরিয়েও আসে নি।

সুরমাদি'র কথাই শোনা গিয়েছিল আবার। শোন প্রতিভা, মাথা খারাপ করো না। মেয়েটি বড় ভাল। এত ভাল যে—ওর সঙ্কোচ হয় ওর দিকে মন্দ দৃষ্টিতে তাকাতে। না-হলে ওকে ওখান থেকে বের করে এখানে আনতে আমি সহজে পারতাম না। তোমার মন্দ করবার জন্যে আমি ওকে আনি নি। এনেছি—ওকে দিয়ে সত্যকারের কাজ এখানে কিছু পাব বলে। ওকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখো না। ওকে বাঁচিয়ো। তুমি বাঁচবে, ও বাঁচবে, আশ্রমের উপকার হবে। নইলে কিছুদিনের মধ্যে আশ্রমের কেলেঙ্কারিতে দেশে কান পাতা যাবে না। আশ্রম উঠে যাবে। হাতে দড়ি পড়বে।

শিউরে উঠেছিল জয়া।

কখন যে চিঠি থেকে চোখ তুলে জয়ার লেখা কটা লাইনকে আশ্রয় ক'রে কল্পনায় ঘটনার এবং কথাবার্তার গিঠ দিয়ে দিয়ে জাল বুনতে সুরু করেছিলাম খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই চোখ নামিয়ে লাইন কটা আবার পড়ে দেখলাম। আশ্বস্ত হলাম যে, আমার কল্পনায় আমি জয়ার লেখা তথ্যকে বিকৃত করি নি।

সে লিখছে, আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য প্রবলপ্রতাপ মজুমদার সাহেবের সঙ্গে সুরমাদি'র সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর মত। শুনেছি বার্মা থেকে রেফুজি হয়ে এসেছিলেন সুরমাদি। পূর্ব পরিচয়সূত্রে মজুমদার সাহেবের কাছে চাকরির প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর অসীম প্রভাব ছিল মজুমদার সাহেবের উপর। তিনি আমাকে মজুমদার সাহেবের সামনে থেকে সরাবার জন্যে ওখানে পাঠালেন। কারণ আশ্রমের যুবতী মেয়েরা নিরাপদ ছিল না তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে।

জয়া লিখেছে কিন্তু ভদ্র ব্যবহারের—নম্রজীবনের একটা আত্মরক্ষার শক্তি আছে বোধ হয় ওই ভদ্রতা আর নম্রতার মধ্যে। তার উপর সততা থাকলে তার দর অনেক বেড়ে যায়। এটা আমি অনুভব করেছি। বোধ হয় সবটা ঠিক বলা হয় নি। তার সঙ্গে সাহস চাই। চোখে চোখ রেখে কথা বলবার মত একটা অসঙ্কোচ সাহস এবং সততা চাই। ওইটেই আমার জীবনের মূলধন। এই মজুমদার সাহেব যে মজুমদার সাহেব তিনিও কোনদিন আমাকে কোন কুৎসিত কথা বলতে পারেন নি।

আর যদি বলেন ওইটে আমার সৌভাগ্য তবে অমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে ওটাই আমার পরম সৌভাগ্য। যার মাথার বোঝার ভারে ঘাড় ভেঙে যাচ্ছে তার চলার পথে কাঁটা যদি না থাকে তবে সে কি কম সৌভাগ্য ?

* * *

জয়ার চিঠিতে আছে এই সৌভাগ্যের জোরেই আমি চরম দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম।

এখানকার নিয়ম ছিল কোন মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে কোন রকম অপবাদ রটলে তার বিয়ে দেওয়া হ'ত জোর ক'রে। দিতেন স্বয়ং মজুমদার সাহেব। এখানে কাছেপিঠে ব্রাত্যপল্লী অনেক আছে। আমাদের পূর্ববঙ্গের নমশূদ্রের মত। আমি থাকতে থাকতেই একটি তিরিশ বছর বয়সী সদ্‌জাতির মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক বুড়ো অক্ষরপরিচয়হীন ব্রাত্যজনের সঙ্গে। সে কেঁদেছিল অনেক কিন্তু কোন রকমেই রেহাই পায় নি।

অপবাদের কাদা আসত বাইরে থেকে। আশ্রমের চারদিকে তিনটে পায়ে-চলা পথ, একটা গরুগাড়ী চলা পথ। যারা সব এই পথে হাঁটত তারা যেত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরতে। আশ্রমটা হওয়া অবধি আশপাশ গ্রামের লোকজন বিনা কারণেও এদিক দিয়ে ঘুরেফিরে যেত।

গান গাইত, অশ্লীল ইঙ্গিত ক'রে কথা বলত, শিস দিত, হাডু-ডু-ডু খেলত। মেয়েরাও উঁকিঝুঁকি মারত না তা নয়। তবে হাডু-ডু-ডু খেলার সময় নিতান্তই খেলা দেখার কৌতুক ও কৌতূহলেই তারা আশ্রমের মধ্যে এখানে ওখানে দল বেঁধে বসে খেলা দেখত।

বাড়াবাড়ি হলেই প্রতিভাদি দারোয়ান পাঠিয়ে ঝগড়া করতেন। পুলিশ আশ্রমকে স্নেহ সহানুভূতির চোখে দেখত। সেখানেও কলুষ ছিল।

তবুও হলফ করে বলব—সব সময়ে নয়। সে ওই পথচারীদের মধ্যেও নয়। যেটুকু দেখলাম এই পৃথিবীকে এই দেশ সমাজের মধ্য দিয়ে তাতে এইটুকুই জোর গলায় বলে যাব যে এখানে ভাল মন্দ দুইই দেখে গেলাম। মেয়েদের মধ্যে সতীলক্ষ্মী দেখলাম—তারা সংখ্যায় কম নয়। অনেক। আবার প্রেতিনীর মত প্রমত্ত উল্লাসে যারা নাচে তারাও অনেক। আবার আর এক দল আছে যারা জড় বস্তুর মত হাটে বাজারে বিক্রী হল কিন্তু জুয়োর ছকের গুটির মত অদৃষ্টের পাশা পাটির দানের চক্রান্তে নরকে পড়ল তারাও অনেক। পুরুষদের মধ্যেও ঠিক তাই। ভাল মন্দ এবং সংসারের চক্রে চক্রান্তে দুর্বলের মত পাক খেয়ে ছিটকে পড়ে টলতে টলতে পড়ল কাদায় কি নরকে, তারাও অনেক। ভালোর মধ্যে যারা খাঁটি ভালো তারাও কম নয়। আবার যারা দায়ে পড়ে ভাল তারাও অগুন্তি নয়। আমার মত অবস্থায় না পড়লে বুঝতে পারবেন একথা আমি বলব না। অনেকের তৃতীয় নেত্র আছে, কিন্তু আমার মত যারা জীবনের ফলের ঝুড়ি ঘাঁটাঘাঁটি করলে—হাতে বেছে যারা একদিকে কাঁচা শক্ত ফল সুপবিত্র পাকা ফল আবার কিছুটা দাগ ধরা ফল এবং পচা ফল বাছাই করলে—তারা এর সংখ্যা গণাগুন্তি ক'রে বলতে পারে।

আমি চরমতম দুর্ভাগিনী। কিন্তু সংসারে অসৎ অসত্যের পচ আমায় স্পর্শ করে নি। সুরমাদি সংসারের বিচারে আধপচা। এবং অসত্যও তাঁর মধ্যে আছে। নইলে মজুমদার সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ককে তিনি ঢেকে বা চেপে রাখবেন কেন? তাঁর এই অনাথ আশ্রমের কাজে ডুবে থাকার মধ্যে তাঁর হারানো ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যে অকৃত্রিম বেদনা—তাও তো সত্য! এই সুরমাদি'ও আমার মতের মতই মত পোষণ করেন। তবে বলেন—যারা অদৃষ্টের চক্রান্তে পাক খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ে ঘুরণ পাক লেগে মাথা ঘুরে কাদায় বা নরকে পড়ল—তাদের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু ওই প্রতিভাদি,—ও বলে—না। কুৎসিত হেসে বা ব্যঙ্গ ক'রে ট্যারা চোখ নাচিয়ে বলে—মরণ। ভালো? সৎ? সতী? লক্ষ্মী? সীতা? সাবিত্রী? এর মানেই বা কি—ঘরই বা কোথায়? নেই—নেই—নেই! কেউ এক টাকায় বিকোয় কেউ পাঁচে কেউ পাঁচশোয়—কেউ পাঁচ হাজার—কেউ পাঁচ লাখে। ছড়ানো টাকা। দেখ ভেল্কি দেখিয়ে দি! সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক! বলে হি হি করে হাসে। প্রতিভাদির মাড়ির উপরে কুকুর দাঁত দুটো উঠে থাকে। সেগুলো উঁচিয়ে ওঠে। ভয় হয়।

ওর ইতিহাসটা বলি। ও নিজেই বলেছিল।

মা বাপের তিন মেয়ে। প্রতিভা মেজো। ট্যারা, কালো—কিন্তু দেহখানি সুগঠিত একটু পুরুষালি গড়ন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন প্রতিভাদি পঁয়তাল্লিশ পার হচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু এখনও সে দেখতে যুবতী। বাপ মা বিয়ে একটা দিয়েছিল। সংসারও হয়েছিল তার। ওই মজুমদার সাহেব আর সুরমা দিদিদের দেশে গ্রামেই ছিল শ্বশুরবাড়ী।

বাপের বাড়ীও খুব বেশী দূর ছিল না। একটা মেয়ে ছিল। স্বামী দেখতে ভাল ছিল। মেয়েটি ভাল দেখতে। স্বভাবেও সে বাপের মত। বাপ মানুষ নাকি ভাল ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অহরহ ঝগড়া হ'ত প্রতিভাদির। ঝগড়া হ'ত টাকাপয়সার জন্য। নিতান্ত গৃহস্থ ঘর—আর নিজে ছিলেন টোলে পড়া পণ্ডিত, যজমানী করতেন—পুরোহিতের কাজ। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ-শান্তি, দুর্গাপুজো, এই সব। আর পণ্ডিতি করতেন টোলে।

প্রতিভাদির দিনরাত্রি অভিযোগ ছিল—এতে চলবে কি ক'রে? দাবী ছিল—আরও চাই।

তিনি বলতেন—পাব কোথায়?

—সে আমি কি জানি? যা ক'রে পার আন?

যাক;—তিনি মারা গেলেন দশ বছরের মেয়েকে এবং পঁচিশ বছরের প্রতিভাকে রেখে। মেয়েটির পর আর দুটি সন্তান হয়ে আঁতুড়েই মারা গিয়েছিল। প্রতিভাদি আজও বলে, বেঁচেছিলাম মরেছিল। মেয়েটা যদি ম'রে যেত তবে—।

কথাটা আর বেরুতো না মুখে। অন্যের এমন হলে প্রতিভাদি নিশ্চয় বলত—ঢঙ। ও সব লোক-দেখানি।

এ ধরণের কথা শুনে তারিফ করে অনেক। বলে হ্যাঁ, সত্যি কথা বলেছে। আমি তা বলিনে। প্রতিভাদি সম্পর্কেও না।

বিধবা হয়ে প্রতিভাদি'র গালাগালির মুখ অবাধ হয়ে গিয়েছিল। স্বামীকে আর মা-বাপকে গালাগাল দিতেন বেশী। ওদের বলত পাঁঠা। ওইটে তাঁর প্রিয় গাল। আজও বলে—কি বলব তা ছাড়া! তা না'হলে ওই অবস্থায় বিয়ে করে? পাঁঠাকে কাটতে নিয়ে যায় হাড়কাঠে, বাঁধা অবস্থায় বেলপাতা খায়। এরাও তাই দুঃখের হাড়কাঠ-বাঁধা অবস্থায় বিয়ে করে।

হেসে বলে আমিও তো তাই। ওই বাপের মেয়ে ওই স্বামীর স্ত্রী। আমিও নিজেকে বেচতে শুরু করলাম তার মৃত্যুর পর। ওই সুরমাদের বাপের বাড়ীতে ভাত রাঁধতে গেলাম, গিয়ে পাকড়ালাম সুরমার ছোট ভাইকে। সেখানে জানাজানি হল, তাড়িয়ে দিলে। তারপর মজুমদার সাহেব এল গাঁয়ে, গিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। সব পাঁঠা, সব পাঁঠা, সব পাঁঠা।

বলে কুকুর দাঁত বের ক'রে হাসত। বিশ্রী হাসি। সে হাসিতে যত বিষ তত নেশা। লোককে যেন মাতিয়ে তুলত উগ্র মাদকের মত। যারা শুনত তারাও হাসত।

সুরমাদির সঙ্গে এ নিয়ে তার বাদানুবাদ হয়েছে। বলছি সে কথা পরে। আমাকে নিয়েই হয়েছে।

আশ্রমে মেয়ে ছিল অনেকগুলি। পঁচিশ তিরিশ বয়েসের মেয়ে গুটিছয়েক। বামুন

কায়স্থ বৈদ্য বেশী। অর্ধেকের বেশী। বাকীরা সব অন্যান্য জাত। অধিকাংশই নিরক্ষর। সামান্য ক'জন লিখতে পড়তে পারে। রামায়ণ মহাভারত পড়া হ'ত। এরাই পড়ত সুর করে অন্যেরা শুনত। কিছু কিছু নাটক নভেলও পড়া হত। আর আমি কাটতাম সেলাই করতাম। ওদেরও পুরনো কাপড় কাটতে দেওয়া হত। নতুন কাপড়ও কয়েকজন পেত। তারা ওই ওখানকার মেয়েদের জামা সেমিজ তৈরী করতে দেওয়া হ'ত। আমার তৈরী জামা বাজারে যেত বিক্রীর জন্যে। ছেলেদের জামা প্যাণ্ট সার্ট, মেয়েদের ব্লাউজ আমি ভাল তৈরী করতাম।

এরই মধ্যে ঘটল ওই বিয়েটা। সে মেয়েটির নাম ছিল করুণা। বামুনের ঘরের বিধবা। ঝরঝরে চেহারা বছর ত্রিশেক বয়স। নিঃসন্তান। আঁটসাঁট গড়ন। দেখতে চটক ছিল। আমি ওখানে যাবার কিছুদিন আগে এসে পৌঁছেছে। গিয়েই শুনলাম মেয়েটি খুব পাজী। আশ্রমের নিয়ম নাকি মানে না। সকালে বিকেলে যে সমস্ত কাজ আছে খাটাখাটুনীর তা করতে যায় না। মানে গাছের গোড়া খোঁড়া, আগাছা তোলা—এ করতে মহা আপত্তি। জল তুলে দেওয়া তা সে পারবে না। কারণ সে তা করে নি কখনও। তা ছাড়া বাইরের লোকের শিস্-ইসারা-গান এসব সে কান পেতে শোনে। ময়লা কাপড় সে পরতে পারে না। সাজগোজে একটু বেশী মন।

আলাপ আমার সবার সঙ্গেই হয়েছিল। করুণার সঙ্গেও হয়েছিল। ওই প্রথম যখন এলাম তখনই সুরমাদি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে তাকে ডেকে আমার এবং প্রতিভাদির সামনেই তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন।

সে যখন এসে দাঁড়াল—তখনই তাকে দেখে আমার বেশ ভাল লাগল। ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন বেশভূষা এবং চেহারাতেও শ্রী আছে। সুরমাদি বললেন—তোমার নামে—এসব কি শুনছি?

করুণা আঁচলের খুঁট নিয়ে পাকাতে লাগল উত্তর দিলে না।

সুরমাদি বললেন—জবাব দাও।

—কি জবাব দেব?

—যা শুনছি তার।

—কি শুনছেন বলুন।

—তুমি কাজকর্ম কর না। আশ্রমের নিয়ম মান না—

—আমি ওই মজুরিণীদের মত গাছের গোড়া খোঁড়া খোসা-আগাছা তোলা, জল তোলা এসব কখনও করি নি, করতে পারব না।

—পারতেই হবে। তোমাকে এমনি কেউ বসে খেতে দেবে না।

—না দেবেন—বের ক'রে দেবেন—হরি বলে ভিক্ষে ক'রে খাব।

—হুঁ। তোমার সাতদিন রাত্রে খাবার বন্ধ রইল।

প্রতিভাদি বললে—তাতে ওর কি হবে? চুরি ক'রে খাবে। ক্ষেতে শসা থাকে মূলো

থাকে টমাটো থাকে নুন দিয়ে খাবে।

কথাটা গ্রাহ্য না করে সুরমাদি বললেন, তা ছাড়া বাইরে মানে বেড়ার বাইরে থেকে লোকের হাসিঠাট্টায় কান দাও?

আবার চুপ করে রইল করুণা।

—বল?

—কি করব? কালা নই, কানে আসে, আপনি দিতে হয় না।

—তুমি উত্তর দাও ইসারায়?

—না।

প্রতিভাদি বললেন—দাও।

—না। না না।

প্রতিভাদি রাগে ফেটে পড়লেন—না-না-না। তিন সত্যি। তুমি আমার সতীলক্ষ্মীর শিরোমণি! বিধবা হয়ে কি কি করেছিলে আমি জানি না? আমাকে বল নি?

—যা করেছি করেছি তখন করেছি। এখানে এসে কিছু করি নি আমি। আবারও বলছি—না-না-না। কর্তা সেদিন এখানে এসে আমাকে ডেকে আমার সকল কথা শুনতে চেয়েছিলেন—শুনেছিলেন, সে দিন থেকে তুমি এমনি করছ আমাকে। আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন—আমি চলে যাই। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

আরও কথা-কাটাকাটি হয়েছিল—সে সব থাক। প্রতিভাদি অনেক অশ্লীল কথা বলেছিলেন।

সুরমাদি—প্রতিভাদিকে থামিয়ে—করুণাকে বেশ শক্ত করে শাসিয়ে বলেছিলেন—বেশ তুমি তা হলে রান্নার কাজ করবে। ঘরগুলো ঝাঁট দেবে। এ কাজ বামুন কায়েত বদ্যি সব ঘরেই আছে। গেরস্ত বাড়ীতে সকলেই করে। এ না বললে চলবে না।

—করব।

—আর বাইরের ওই সব নোংরা ব্যাপারে মন দিয়ো না, ভাল হবে না। ওই তারের বেড়ার কাছে কখনও যেতে পাবে না তুমি। এই পুকুরের চারিপাশ ছাড়া—অন্য দিকে যাওয়া তোমার বারণ রইল।

—যাব না।

সুরমাদি আমাকে বললেন—ওকে একটু লেখাপড়া শিখিয়ো। যত্ন নিয়ো, কেমন?

বলেছিলাম—হ্যাঁ। নেব।

সুরমাদি চলে গিয়েছিলেন। আমার জায়গা হয়েছিল যে-ঘরে, সে-ঘরটা পুকুরটার পশ্চিম পাড়ের উপর বড় লম্বা ব্যারাকের মত বাড়ীটার দক্ষিণ দিকে একটেরে। এখানাই ছিল প্রথম আমলের আপিস। খালি একখানা ঘর। তার পাশের ঘরটাতেই থাকত করুণা।

ক'দিন মেলামেশা ক'রে বুঝেছিলাম করুণা খুব জটিল মনের মেয়ে। ব্রাহ্মণঘরের বিধবা।

বেরিয়েছিল খেটে জীবিকা উপার্জন করবে বলে। রাঁধুনীর কাজ করবে। কাজ এক জায়গায় পেয়েছিল। কিন্তু বিতাড়িত হয়েছিল দুর্নাম নিয়ে। তারপর ভিক্ষা; যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন সাজে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে ভিক্ষা চাওয়াটা আয়ত্তও করেছিল। ট্রেনে ভিক্ষে করতে করতে গিয়ে পড়েছিল—রেলকারখানা চিত্তরঞ্জনের ধারে। সেখানে এক ভিন্ন ভাষাভাষী ভদ্রলোকের কাছে ভিক্ষে করতে গিয়ে নজরে পড়েছিল। লোকটি অবস্থাপন্ন। ভিক্ষে দিয়েছিলেন—তিনি পাঁচ টাকার নোট। তারপর তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সে কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে। তার মধ্যে সে বলেছিল ভিক্ষে না ক'রে সে যদি তার সঙ্গে যায় তার ঘরে কাজকর্ম করে তবে সে তাকে নিয়ে যেতে রাজী আছে। করুণা জিজ্ঞাসা করেছিল—কি কাজ? সে বলেছিল—আমার সেবার কাজ। আমার যত্ন করতে হবে। সেবা করতে হবে। আর কি?

কথাটার মধ্যে গোপন সে কিছু রাখে নি।

রাজী হয়ে গিয়েছিল করুণা। রাজী, সে রাজী। বেশ হিসেবীর মত বলেছিল—কিছুদিন পরে তাড়িয়ে দিলে কি হবে তখন?

সে বলেছিল—টাকা দেব।

—দেবেন তার প্রমাণ কি?

—সে বিশ্বাস করতে হবে। ধর তোমাকে যদি মেরেই ফেলি তো কি করবে তুমি?

রওনাও সে হয়েছিল—তার সঙ্গে। জেনানী ক্লাসে তাকে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল—আমি এসে নামিয়ে নেব। মাঝে মাঝে খোঁজ ক'রে যাব। তার আগে কোথাও নেমো না।

ভদ্রলোক ভাঙা বাংলায় কথা মন্দ বলত না।

কয়েকটা স্টেশন যেতে যেতে করুণার আপসোস হয়। প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। ভয় লাগে। কিন্তু নেমে পড়তেও পারে নি।

হঠাৎ গয়া জংসনে—সে নেমে পড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত। স্টেশন প্লাটফর্মে নেমে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে গিয়ে টিকিট কালেক্টরের হাতে ধরা পড়ে। ও গাড়ীটা তখন ছাড়ে-ছাড়ে। যে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার নজর পড়েছিল ওভারব্রিজের মুখে টিকিট কালেক্টার আর করুণার দিকে। তিনি নেমে এসেছিলেন—এ কি, ইখানে কুথা যাচ্ছে তুমি? অ্যাঁ?

করুণা চীৎকার ক'রে উঠেছিল—না, না আমি যাব না। আমি যাব না।

সেই মুহূর্তেই ওভারব্রিজ ধরে নেমে প্লাটফর্মে আসছিলেন মজুমদার সাহেব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মজুমদারের। থমকে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন—কি হয়েছে? তুমি বাঙালী?

সাহেবী পোষাক পরা লোকটির মুখে বাংলা কথা শুনে করুণা কাতরস্বরে বলে উঠেছিল, বাঁচান, আমাকে বাঁচান। এ আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

—ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

ট্রেনটা তখন ছেড়েছে, লোকটি বেগতিক দেখে ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছিল। মজুমদার সাহেব চীৎকার করেছিলেন, পাকড়ো পাকড়ো পাকড়ো। কিন্তু ট্রেন তখন গতি দ্রুত করেছে এবং লোকটি কামরার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর মজুমদার সাহেবকে আঁকড়ে ধরেছিল করুণা।

সমস্ত শুনে মজুমদার সাহেব বলেছিলেন, ভয় নেই তোমার। আমি তোমাকে আশ্রয় দেব। আমাদের একটি নারী কল্যাণ কেন্দ্র আছে। সেখানে নিরাশ্রয় অনাথ মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হয়। কলকাতার পথেই পড়বে। সেখানে তোমাকে ভর্তি ক'রে দিয়ে যাব।

মজুমদার সাহেব কলকাতার পথেই মাঝখানে নেমে তাকে আশ্রমে দিয়ে গেছেন। সেবার একদিন থেকে তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে গিয়েছিলেন। মধ্যে আরও একবার এসে তার সঙ্গে অনেক গল্প করেছেন। তার ইতিহাস শুনেছেন। বলেছেন—ভাল উদার পাত্র পেলে বিয়ে দিয়ে দেবেন তার।

করুণা তাতে সায় দিয়েছে। কিন্তু শর্ত তার সৎজাতি হওয়া চাই পাত্র। শহরের মানুষ হওয়া চাই। পাড়াগাঁয়ে সে বিয়ে করবে না।

করুণা জয়াকে বলেছিল, কোন বাঙালী ভদ্রলোকের আশ্রয়ে সে বিবাহ না করেও থাকতে রাজী আছে। তবে সে সত্যকারের ভদ্রলোক হওয়া চাই। আর বিপত্নীক হওয়া চাই।

কিন্তু আশ্রমের তা নিয়ম নয়। বিবাহ ছাড়া আশ্রম কোন মেয়েকে কোন পুরুষের হাতে দেয় না। তবে হ্যাঁ, চাকরি হলে যেতে দেয়। কিন্তু তাতেও তারা অনেক সন্ধান ক'রে তবে ছেড়ে দেয়।

এই করুণা।

করুণার বুকে সাহস ছাড়াও একটা বল ছিল, সেটা মজুমদার সাহেবের স্নেহের বল।

প্রতিভাদি তার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এই জন্যে।

* * *

জয়া তাকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেছিল। করুণা আগ্রহের সঙ্গে শিখতেও চেয়েছিল। কিছুটা লেখাপড়া সে জানত। উচ্চ প্রাইমারী পর্যন্ত পড়া ছিল তার। ক'মাসে সে বেশ খানিকটা এগিয়েছিল। জয়া তাকে শরৎবাবুর বই পড়তে দিত। জয়ার বিদ্যেও সামান্য—তবুও তা ক্লাস নাইন পর্যন্ত পাঠ্য তার পড়া ছিল। অনাথ আশ্রমে এতদূর পর্যন্ত সে এগিয়েছিল। জামা কাটা সেলাই এতে খুব আগ্রহ ছিল না করুণার। গোগ্রাসে সে পড়তে চাইত উপন্যাস। রামায়ণ মহাভারত এ সে খুব পছন্দ করত না।

জয়া যাওয়ার তিন মাস পরে অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটল। ঘটনা ঘটল যেদিন মজুমদার সাহেব আশ্রমে উপস্থিত সেই দিন।

গভীর রাত্রে হঠাৎ চীৎকার উঠল—কে? কে? কে? পাকড়ো পাকড়ো পাকড়ো!

অন্য কেউ নয়, করুণা।

সে ছুটে পালিয়ে আসছিল মাঠের মধ্য দিয়ে। টর্চের আলোয় তার সাদা কাপড় পরা মূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন মজুমদার সাহেব এবং প্রতিভাদি। সাহেব খাতাপত্র দেখছিলেন।

চীৎকার শুনে দারোয়ান বেরিয়ে এসে সাদা মূর্তিটাকে তাড়া করেছিল। করুণার দুর্ভাগ্য সে হুঁচোট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল—ব্যারাক বাড়ীটার নিচেই।

করুণা ধরা পড়ল, সে চোরের মত ছুটছিল।

কোথায় গিয়েছিল কেন গিয়েছিল—প্রশ্ন ক'রে কোনও উত্তর মেলে নি তার কাছে।

এর পর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল করুণা সম্পর্কে। করুণার বিয়ে দেওয়া হবে। বিয়ের পাত্র প্রৌঢ় ব্রাত্য; অবস্থায় সম্পন্ন ব্যক্তি। ওখানটার কাছাকাছি কয়লার কুঠী আছে। ওখানকার ব্রাত্যদের মধ্যে অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি আছে। একজন বিপত্নীক প্রৌঢ় ব্রাত্য—সে আশ্রমকে এক হাজার টাকা দান করলে; তারই সঙ্গে রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে হয়ে গেল করুণার।

করুণা আপত্তি করল না। বিয়ে করে চলে গেল।

যাবার সময় করুণা জয়াকে বলে গিয়েছিল—তোমাকে বলে যাই জয়াদি। সেদিন রাত্রে আমি মজুমদার সাহেবকে পাকড়াতে গিয়েছিলাম নিজে থেকে। ধরা পড়ে গেলাম। ওই রাক্ষুসীটা ছিল। তা ঠকিনি—জিতেছি। এ লোকটার মত টাকা না থাক—টাকা আছে। আর মজুমদার সাহেব থেকে বয়সে কম বাঁচবে কিছু দিন। আরও আছে। লোকটা লেখাপড়ায় আমার চেয়ে বেশী বিদ্বান নয়। ওকে আমি মুঠোতে বাঁধতে পারব। তোমাকে কথা দিচ্ছি লোকটাকে সত্যি সত্যি স্বামীর মতই ভজব আমি। জাত গেল—যাক ধর্মকে আমি ফিরিয়ে পাবই। কিন্তু সাবধান হয়ো জয়াদি। আমি ভালবাসি বলে ব'লে গেলাম।

আগেও এরকম বিয়ে আরও একটা নাকি হয়েছে। কলকাতার আশ্রমেও তাই। অনাথ আশ্রমের মেয়েদের বিয়েতে জাত কুল কে দেখে? আর এ রকম বিয়েতে মজুমদার সাহেব এইসব সম্পন্ন ব্রাত্যদেরই পছন্দ করেন। বলেন—বামুন, কায়স্থ, বৈদ্য—এরা যখন অনাথ আশ্রমের মেয়ে বিয়ে করতে চায়—তখন তারা পত্নী চায় না। চায়—উপপত্নী। তার থেকে এরা অনেক ভাল। উঁচু জাতের মেয়ে বলে খাতির করবে। জন্ম তার যেমনই হোক। জাত কি হবে? যে জাতের হোক—মানুষ, ধর্ম তো মানুষের কর্মে, ওইটে থাকলেই সব থাকল।

কথাবার্তা মজুমদার সাহেব ভালই বলেন। জানেন অনেক।

জয়া লিখেছে। তার পত্রের দিকে তাকালাম।

লিখেছেন—বলেছি মানুষের মধ্যে সব-ভাল মানুষ আছে। তাদের কতক সত্যিই সব-ভাল মানুষ। কতক দায়ে পড়ে সব-ভাল ব্যক্তি। মন্দও তাই। এদের থেকে ভাল এবং মন্দ দুই মেশানো মানুষই বেশী। এরা কিছু ভাল কিছু মন্দ। এদের মধ্যে একটা জাত আছে যারা কতক কতক জায়গায় বা কখনও কখনও খুব ভাল—সত্যিকারের মহৎ, দুর্লভ মহত্ত্বে মহৎ। আবার তাদের মধ্যেই এমন মন্দ আছে যে সে মন্দের কথা ভাবা যায় না। মজুমদার সাহেব এই ধরণের মানুষ।

আমার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়তে সুরমাদি আমাকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে দূরে ওই নারী কল্যাণ কেন্দ্র। কিন্তু নারী কল্যাণ কেন্দ্র তাঁর হাত থেকে তো দূরে নয়। ওই যেবার করুণার বিয়ের আগের ঘটনাটা ঘটল সে-বারই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে আমার উপর।

করুণা বিয়ের পর নিজের ঘরে যাবার সময় বলে গিয়েছিল—"তুমি সাবধান হয়ো জয়াদি।"

আমি সাবধান চিরদিন। এই আশ্রমেরই ভোলাদি—ভোলা দাসী একটি প্রৌঢ়া মেয়ে। সে আমাকে বলেছিল—তোমার মধ্যে শুচিবাই আছে জয়া।

জয়া আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—শুচিবাইয়ের কি দেখলে ভোলাদি? সত্যিই ছোঁয়ায়-নাড়ায় লোকের সঙ্গে ব্যবহারে কোথাও শুচিবাইয়ের কোন ছোঁয়াচই তার ছিল না। মানুষকে অপবিত্র সে কোন দিনই ভাবে নি। কোন আচরণে তা প্রকাশ পায় নি।

লাবণ্য বলে একটি মেয়ে প্রতিবাদ করে বলেছিল—এ তুমি ভাই মিথ্যে দোষ দিচ্ছ।

ভোলাদাসী বলেছিল—জয়া মিথ্যে কথা বলতে পারে?

—তাতে শুচিবাইয়ের সঙ্গে কি আছে?

ভোলাদাসী তার জবাব না দিয়ে আবার প্রশ্ন করেছিল—বাইরে মাঠে আশপাশ গাঁয়ের ছোঁড়ারা এসে লাফালাফি করে শিস দেয় গান গায়—জয়া সেদিকে তাকায় কোন দিন? হাসে কোন দিন? বেশী বাড়াবাড়ি করলে ঘরে ঢোকে না?

—সব সত্যি। তার মধ্যে শুচিবাই কোথা পেলে?

ভোলাদাসী হেসে বলেছিল—ওর মধ্যেই আছে। ও তো এক ধরণের শুচিবাই।

—মরণ তোমার!

—আমি মরেছি অনেকদিন লা। অশুচি-বাইয়ে মরেছি। —ও মরবে শুচি-বাইয়ে। কর্তাকে ফিরে আসতে দে না আর বার দুই। দেখবি। করুণা যে দোষে গেল—ও তার উল্টো দোষে যাবে! দেখিস!

এসব কথাবার্তা হত—সেলাইয়ের আসরে। দুপুর বেলায়। অধিকাংশ মেয়েই সেলাইয়ের কাপড় কোলের উপর রেখে সূচ সুতো সুদ্ধ হাত মাটিতে রেখে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমুতো। শিখত দু'চার জন। ভোলাদাসী অবশ্য শিখবার আগ্রহে জেগে থাকত না—সে জেগে থাকত দিনে ঘুমুলে অম্বল হয় বলে। আর অম্বল হ'লে বিকেল থেকে তার খুব কষ্ট হ'ত। রাত্রেও পর্যন্ত এক এক দিন ঘুমুতে পারত না। হেউ হেউ ক'রে ঢেকুর তুলত এবং গ্লাস গ্লাস জল খেত। সে জেগে থাকত বাধ্য হয়ে। অন্যকে জাগিয়ে রেখে গল্প করত অনর্গল। জয়া কাজ শেখাতো—সে বেশী আমল দিত না তবুও মধ্যে মধ্যে এসে তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিত—সেলাইটা পাশে রেখে।

সে সমস্তটা শুনে হেসেছিল জয়া। বলেছিল, ওটা আমার থাক ভোলাদি। ওইটেই আমার জীবনের মূলধন! বাঁচবার সম্বল।

—বাঁচতে হবে ভাই অনেক দুঃখে।

দু'জনের কথাই সত্যি।

করুণার বিয়ের সময় মজুমদার সাহেব আসেন নি। কিছুদিন পরই এলেন। সব

ইনস্‌পেকশন ক'রে সেদিন জয়াকে ডাকলেন। উপলক্ষ্য অনাথ আশ্রমে জয়ার ভাই বিজয় অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিভা পাশে ব'সে ছিল।

জয়া দাঁড়িয়ে ছিল টেবিল ধরে।

মজুমদার সাহেব বলেছিলেন—বস, তুমি বস।

এই সময় সাহেবের চা কেক প্যাস্ট্রি এসেছিল। ও সব তাঁর সঙ্গেই থাকে। তাঁর নিজস্ব বেয়ারা ট্রেতে ক'রে দু'কাপ চা কেক প্যাস্ট্রির পাত্র এনে নামিয়ে দিয়েছিল। সাহেব একটা কাপ প্রতিভাদিকে দিয়ে অন্যটা তুলে জয়ার সামনে এগিয়ে ধরে বলেছিলেন, নাও। বেয়ারাকে বলেছিলেন—আমার জন্যে আর একটা আন।

—না-না। আমি তো চা খাই না।

—আমার অনারে আজ না-হয় খেলে। খাও! নাও-নাও।

প্রতিভা ধমক দিয়ে বলেছিল—কি হচ্ছে? আদুরীপনা না-ঢঙ? নাও না! দিচ্ছেন!

মজুমদার সাহেব বলেছিলেন হেঁকে—ওরে মধুর শিশিটা আনিস।—তারপর প্রতিভাকে বলেছিলেন—তোমাকে একটু মধু খাওয়াব। শিলংয়ের কমলা ফুলের মধু। খেলে কথাগুলো মিষ্টি হবে তোমার!

প্রতিভা ঝেঁকে উঠেছিল—নিমফল মধু দিয়ে খেলে কি রোচে? তার থেকে মিষ্টি জিনিস মধু দিয়ে খান আরও মিষ্টি লাগবে! ওই ওকে দিন।

কঠোর স্বরে মজুমদার বলেছিলেন—প্রতিভা! বলেই কথা পালটে বলেছিলেন—বড় দুর্দান্তপনা করছে তোমার ভাই। কি করব আমরা বুঝতে পারছি না। সকলের মত ওকে তাড়িয়ে দেওয়া। আমি দিই নি। সেটা তোমার জন্যে!

প্রতিভার সাহস অপার। সে সেই ধমকের পরও বলে উঠল—কেন—জয়াই বা এমন কি যে তার জন্যে তার ভাইয়ের উপদ্রব সইতে হবে?

বেশ কঠিন কণ্ঠে মজুমদার বলেছিলেন—জয়ার অনেক গুণ প্রতিভা!

এর উত্তরেও প্রতিভা কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কঠিনতর কণ্ঠে মজুমদার সাহেব বলেছিলেন—চা খাওয়া হয়েছে তোমার? না-খাওয়া হয়ে থাকলে কাপটা হাতে করেই বাইরে গিয়ে খাও! যাও।

এ আদেশ আর অমান্য করতে পারে নি প্রতিভা। কিন্তু ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে উঠে যেতে গিয়ে কাপটা পড়ে গেল ডিসের উপর থেকে। ভেঙে টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে গেল। মজুমদার সাহেব তিক্ত হেসে বললেন—যাক। যাও গিয়ে বেয়ারার কাছে চা নিয়ে খাও। আমার কাপটাই নাও। আমার জন্যে নতুন করে তৈরী করতে বল।

প্রতিভা বেরিয়ে গেল।

মজুমদার সাহেব বললেন—তুমি এত ভদ্র তোমার এত গুণ যে তোমাকে স্নেহ না ক'রে পারি না।

জয়া হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে তাঁর পা দুটোর উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে

কাঁদতে কোন রকমে বলেছিল—আপনি আমার বাবা। আমার দু'বছরে বাবা মারা গেছেন। তার এক মাস পর মা গেছেন। কাকা ছিলেন—পাগল হয়ে গেছেন। আপনি আশ্রয় না দিলে হয়তো কোন দিন ম'রে যেতাম। আপনি আমাদের বাঁচান—

—ওঠো! ওঠো!

অবাধ্য হয়নি জয়া, উঠেছিল। বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল মজুমদার সাহেবের চোখে জল দেখে। তাঁর চোখ থেকে জলের দুটি ধারা নেমেছে।

চুপ করে বসে আছেন সামনের দিকে তাকিয়ে।

জয়া হাত জোড় করে বলেছিল—হয়তো বাবার চেয়েও বেশী। আপনি ভগবানের মত আমাদের কাছে। বাবা মা যখন মারা যান তখন ওই ভাই ছিল দেড় বছরের; আমার সেই ছ'বছর বয়স থেকে আমিই ওকে বুকে ক'রে বয়ে বেড়িয়েছি।

মজুমদার সাহেব বলেছিলেন—বস মা বস!

জয়া ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল মা শব্দটি শুনে।

জয়ার লেখা সেই খাতা-ভর্তি চিঠিখানার দিকে তাকালাম। পৃষ্ঠাটা খোলাই ছিল।

"মজুমদার সাহেব সেই ধরণের মানুষ।"

দু'লাইন আগে থেকে আবার পড়লাম। "কতক জায়গায় বা কখনও কখনও এরা খুব ভাল, সত্যিকারের মহৎ, দুর্লভ মহত্ত্বে মহৎ।"

হ্যাঁ—আছে। এই সংসারকে আমাদের দেশে বলে—বহু রত্নের পুরী। বহু বিচিত্রের সংসার। এমন বিচিত্র মানুষ আছে বই কি! কিন্তু এ বৈচিত্র্যের প্রকাশ অকারণে এক দিক থেকে হয় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত দুই দিকের স্পর্শযোগে হয়। বিষও হয় অমৃতও হয়। বিষ অমৃত হয়, অমৃত বিষ হয়।

জয়ার ভাগ্যে বিষ অমৃত হয়েছিল। প্রতিভার ভাগ্যে গোড়াতেই উঠেছিল বিষ। সেটা হয়ত উঠেছিল—তীব্র থেকে তীব্রতর। যে বিষ আকণ্ঠ পান ক'রে—প্রেতিনী হয়ে উঠেছিল—তীব্রতর হয়ে উঠে তাকে ওই প্রেতিনী সত্তাতে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়েছিল সেদিন।

মজুমদার সাহেব তাকে চড় মেরেছিলেন। কারুর সাক্ষাতে মারেন নি। তবুও সেটা গোপন থাকে নি কারু কাছে। মজুমদার সাহেব প্রতিভা কেউই কণ্ঠস্বর উচ্চ করতে দ্বিধা সংকোচ করেন নি। শেষ কটা কথা ব্যারাক পর্যন্ত এসে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

—আমি ওকে মা বলেছি প্রতিভা—ও আমার মা!

—তোমার অনেক মা আমি দেখেছি—শেষ পর্যন্ত—

এবার ঠাস ক'রে চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন মজুমদার সাহেব। এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁর মোটর বেরিয়ে গিয়েছিল আশ্রম থেকে।

সেদিন নিজেকে নিরাপদ বোধ ক'রে সে ভগবানকে ডেকে রাত্রে অনেক কেঁদেছিল।

ভগবান কিন্তু একদিকে নিরাপদ করে অন্যদিকে তার বিপদ এনে দিলেন। বিশ্বা হয়তো তার ভাগ্য। ভগবান করলেন নিরাপদ। ভাগ্য আবার ডেকে আনলে বিপদ। এ না মানলে বলতে হয় সংসারের কাঁটা ছড়ানো প্রান্তরে যে হাঁটে তার সামনের কাঁটার গাছটা কেটে দিলেও সে নিরাপদ হয় না—কাঁটা মাটির সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে আছে। পায়ে সে ফোটেই।

বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচলেও নেকড়ে শেয়াল অসংখ্য।

আশ্রমের চারিপাশে স্থানীয় গ্রামগুলির প্রমত্ত নব যুবক দলের শিস গান ছুঁড়ে মারা অশ্লীল রসিকতা বাড়তে লাগল। ক্রমে ঢেলায় বাঁধা চিঠি এসে পড়তে লাগল ওখানে।

এবার তাকে বাঁচালেন মজুমদার সাহেব। জয়া কলকাতায় চিঠি লিখলে। তার সন্দেহ হয়েছিল প্রতিভাকে। সে-ই ওদের উস্কে দিয়ে করাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল তার। মজুমদার সাহেব এসে পুলিসে খবর দিয়ে তাদের শাসন করলেন।

জয়া তাঁকে মিনতি ক'রে বললে—বাবা, আমাকে এখান থেকে কলকাতা আশ্রমে নিয়ে চলুন। এখানে থাকলে হয়তো আমি ম'রে যাব।

মজুমদার সাহেব একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—না—সেটা হয় না জয়া। কলকাতার আশ্রমে—।

না—না—না ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে সেটা শুধু জয়াকেই বলেন নি, নিজেকেও বোধ হয় বলেছিলেন।

তিনি সুরমাকে ভয় করেছিলেন—না—নিজেকে ভয় করেছিলেন সে কথা জয়া জানে না।

প্রশ্নটা তার অর্থাৎ জয়ার নয়। প্রশ্নটা আমার।

মজুমদার সাহেব বলেছিলেন—আমি ভাবছি জয়া—আমি তোমাকে কোন স্কুলে ভর্তি ক'রে দেব। বোর্ডিংএ থাকবে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার অনুরাগ আছে, ঐকান্তিকতা আছে—তুমি পাস করতে পারবে। তুমি যতদূর পড়তে পার—আমি তোমাকে পড়াব। এম-এ পাস ক'রে নেবে। তোমার এখানে থাকার বিপদ বুঝি। এখানে তোমাকে রাখব না। আমার গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়—এখন এম. ই.। হাই স্কুল এখনও হয়নি, হ'লে আজই পাঠিয়ে দিতাম। তুমি ভয় পেয়ো না।

সেদিন সৌভাগ্যের উঁকি মারা প্রসন্ন হাস্যময় মুখ দেখে জয়া অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এত সৌভাগ্য হবে তার। সে কল্পনা করেছিল অনেক রকম। শেষে ভেবেচিন্তে স্থির করেছিল—না, কলেজে সে পড়তে যাবে না। ম্যাট্রিক পাস করে সে কোন গার্লস স্কুলে চাকরি ঠিক করে নেবে। সেখানে সে ভাইকে নিয়ে যাবে। কাজ করতে করতেই নিজে পড়বে—ভাইকে পড়াবে।

সে জানে ভাইয়ের অশান্তপনা সে তার জন্য। তারই জন্যই সে এমন হয়ে গেছে। তার কাছে এলেই সে বদলাবে। মজুমদার সাহেবকেই বলবে—তাঁর গ্রামের স্কুলেই চাকরির জন্য। তিনি দেবেন—সে নিশ্চয়-নিশ্চয় পাবে।

এই পড়তে পড়তে সে আই-এ দেবে বি-এ দেবে।

ভাই ম্যাট্রিক দেবে। একবারে না পারে দুবার তিনবার চারবারে তাকে পাশ করতে হবে। তাদের বংশে—তার ঠাকুরদার সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বাপের আমল থেকে বাপ কাকা এরা বিদ্যার চর্চা করে এসেছেন। তাঁরা দুজনেই শিক্ষক ছিলেন। তারা তাঁদের সন্তান—তারাও তাই করবে।

তার জীবনের ছন্দে এ পর্যন্ত ছিল একটি বিষণ্ণ ধীরতা। সে চলত ধীরে—কথা বলত মিষ্ট মৃদু স্বরে—অবসর সময়ে বসে থাকত শান্ত ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে—ভাবত—। ভাবত হয় ভাইয়ের কথা নয়তো পাগল কাকার কথা। আজও তিনি অর্ধপাগল। উন্মাদ পাগলামি কমে এসেছে। এখনও অসংলগ্ন কথা বলেন। থাকেন সন্ন্যাসীর মত। গেরুয়া পরেন। ঘোরেন এখানে ওখানে। কাকীমা সেই গেছেন বাপের বাড়ী আর কাকাও তাকে আনেন নি—তিনিও আসেন নি। কোন কোন দিন ভাবে বাল্যকালের কথা। বাবা মা, ঘর, সে পূর্ববঙ্গের গ্রামের ঘর-নদী-বাগান। সে সব খুব আবছা মনে পড়ে। ঝাপসা ছবির মত। দেশ ভাগের পর বাবার তৈরী করা নতুন বাড়ীর কথা মনে পড়ে। টিনের চাল, মাটির দেওয়াল। কয়েকটা ছোট ছোট গাছ উঠানে। গ্রামটা তাদের ছিল—কেবলমাত্র এদেশে আসা পূর্ববঙ্গের লোকদের; একখানা বড় গ্রাম থেকে একটু সরে—একটা জঙ্গলের মত জায়গা পরিষ্কার করে গ্রামখানা হয়েছিল। চারিপাশে গ্রামের চারিদিকে বড় বড় গাছের ছবি স্পষ্ট মনে আছে তার। বাবা দোকান করেছিলেন একটা—যে দোকান ফেল পড়ে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে উপবাস অর্ধ উপবাসে বছর খানেক কাটিয়ে টি. বি.-তে পড়েছিলেন। মনে পড়ে রুগ্ন বাবাকে। সে-ই তাঁর সেবা করত, তিনি কাঁপতেন—কাতরাতেন, শেষের দিকে কাশলে তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বের হত। এক এক দিন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তবে কাশি থামত। সে-ই একটা মাটির গামলা তুলে তাঁর মুখের কাছে ধরত। মায়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। এক এক দিন এক একটা স্মৃতির টুকরো ঘিরে তার চিন্তা ঘুরত। কোন কোন দিন একটার পর একটায় যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলত—পরিক্রমা করে আসত সেই পূর্ববঙ্গ থেকে আজ পর্যন্ত।

সেই জীবনের ছন্দে—অবকাশ সময়ের চিন্তায় একটা বদল হয়ে গেল—মজুমদার সাহেব—না তিনি অন্যের কাছে যাই হোন, অন্যে তাঁকে যাই বলুক, এখন ভাল মন্দ দু'দিক বিচার করে জ্ঞানী লোকে বিচারকে যে রায়ই দিন তাঁর সম্পর্কে—সে তাঁকে বাবাই বলবে; তার বাবার তুল্য—মজুমদার সাহেব তার জীবনের ছন্দ পাল্টে দিয়ে গেলেন; তার দুর্ভাগ্যের যবনিকা সরিয়ে সৌভাগ্যের উঁকিমারা মুখ তাকে দেখিয়েছেন—তীর থেকে অন্ধকারপথে পড়েছে আলোর ছটা।

সে হাসতে লাগল। উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে লাগল। বয়স্কা মেয়েদের মধ্যে যাদের কিছু বয়স কম তাদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গান গাইলে। মধ্যে মধ্যে সে ছুটত। সব থেকে হুল্লোড় করত স্নানের সময়। সাঁতার কাটত। সাঁতার কেটেছিল সে সেই ছ-সাত বছর বয়সে। এদেশে এসে তারা যে বাড়ী করেছিল সেখানকার পুকুরে। আবার তার শখ হল সে নতুন

করে সাঁতার কাটা শিখবে। ঘণ্টাখানেকেরও বেশী সে সাঁতার দিতে লাগল। দিন পনেরোর মধ্যে মোটামুটি পোক্ত হয়ে উঠল সে সাঁতারে। একটা কলসী নিত—সঙ্গে। সেটাকে ভাসিয়ে—হাতে করে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে দিয়ে—সাঁতার দিয়ে চলত। ক্লান্তি হলে কলসীটাকে করত আশ্রয়।

ভোলাদাসী একদিন বললে—তুই ভাই জিতলি জয়া।

কথাটা বোঝেনি জয়া ; সে বললে—কেন ভোলাদি ?

—তোকে একদিন বলেছিলাম—মনে আছে তোর ? শুচি বাই ?

হেসে জয়া বলেছিল—তা আছে। কিন্তু এতে হার জিৎ কোথা ভোলা দি ?

—নেই। আমি ভেবেছিলাম রে—যতই শুচিবাই তুই মনে মনে পুষিস, পরিত্রাণ তুই পাবি নে। পাপ তোকে ছাড়বে না। বুড়ো তোকে সত্যিই মা বলে নিয়েছে রে। সেদিন মানে প্রথম দিনও ভেবেছিলাম—এ ওর ভাঁওতা। ওরা যে সব পারে! মুখে মা বোন দিদি মেয়ে বলেও—সব পারে। কিন্তু না। মনে হচ্ছে সত্যিই।

জয়া তার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—এই জন্যেই তোমাকে আমি খুব ভালবাসি। তুমি ভুল হলে স্বীকার কর। যখন ভগবানকে মুখপোড়া বলে গাল দাও তখন ঠিক বুঝতে পারি এক সময় না এক সময় মনে মনে প্রণাম ক'রে বলবে ভুল করেছি, দোষ হয়েছে ঠাকুর, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমাকে আমার কেমন লাগে জান!

—কেমন ?

—জনার বিদূষকের মত। কাকার কাছে কলকাতায় ছিলাম—তখন পুজোতে যাত্রা হত। জনা নাটকে বিদূষক ছিল—সে কিছুতেই হরির নাম করত না। লোকে মনে করত লোকটা পাষণ্ড। কিন্তু সে খুব ভক্ত ছিল—জানত যে হরির নাম একবার করলেই 'বল হরি' হয়ে যাবে—হরি এসে তাকে নিয়ে চলে যাবেন রথে চড়িয়ে।

ভোলা দাসী হেসেছিল—বলেছিল—বেশ ভাই তুই ম্যাট্রিক পাস করে চাকরি যখন পাবি—তখন যেন আমাকে নিয়ে যাস। তোর রান্নাবান্না কাজকর্ম করতে তো একটা লোক লাগবে।

—নিশ্চয় যাব। নিশ্চয়। নিশ্চয়। নিশ্চয়।

—একটা গাই কিনিস। গাই আমি খুব ভালবাসি—যত্ন করতে পারি—খুব ভাল হবে, বাড়ীতে দুধ পাবি। গোবর থেকে ঘুঁটে দেব।

—দূর! গরু রাখলে গাছপালা হবে না ভোলাদি—মুড়িয়ে খেয়ে দেবে। আর ঘুঁটে কোথায় দেবে ? সে সব ইস্কুলের কোয়ার্টার, তাতে ঘুঁটে দিলে খারাপ হবে যে—আর দিতেই বা দেবে কেন ? তার থেকে তুমি আমি আমার ভাই মিলে বাগান করব। শাকসব্জী লাগাব।

—দূর—দুধের তুল্য জিনিস আছে। তাও ঘরের দুধ। ছেলেপিলে হলে বুঝবি। তখন গোয়ালার জল দুধ খাওয়াবি আর আপসোস করবি।

লাবণ্য এসে পড়ায় ও কথায় ছেদ পড়েছিল। লাবণ্যই কথা বলে ঘরে ঢুকে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

—কি চিঠি এসেছে জয়া। মুখখানা হাঁড়ি হয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ প্রতিভাদির মুখখানা হাঁড়ি হয়েছে।

জয়া উঠে বসেছিল। তার মনে হয়েছিল—নিশ্চয় চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে—মজুমদার সাহেব লিখেছেন—জয়াকে ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে বলিবে। আমি গিয়া তাহাকে আসানসোলে ভর্তি করিয়া দিব।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—দাঁড়াও আমি যাই আপিসে কোন ছুতো ক'রে। দেখে আসি কি ব্যাপার।

—তোকে বলবে মনে করেছিস ?

—দেখি না। কি বলে। দুটো কড়া কথাও তো বলবে।

প্রতিভাদি সত্যিই খুব গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। জয়া যেতেই সে খ্যাঁক করে উঠেছিল। বলেছিল—কি, কি চাই তোমার ?

জয়া মনে মনে ঠিক করেই গিয়েছিল উত্তরটা। বলেছিল, ভাইটার কোন চিঠি পাইনি অনেকদিন—তাই দেখতে এসেছি কোন চিঠি এসেছে কিনা।

—না। আসে নি।

জয়া তবু নড়েনি। সামনের বেঞ্চে বসেছিল।—বাবা কোন চিঠি দেন নি ?

—বাবা ? তোমার সাতপুরুষের বাবা। বাবা দার্জিলিং যাচ্ছেন সুরমাকে নিয়ে। এদের মত শয়তান বদমাস আর দুনিয়ায় নেই। বুঝলে। দুনিয়ায় নেই। তাঁরা চললেন দার্জিলিং। আশ্বিন মাসে দার্জিলিংয়ে বেড়াবেন। কাঞ্চনজংঘা দেখবেন।

জয়া আর হাসি চাপতে পারছিল না; সে আস্তে আস্তে উঠে চলে আসছিল—হঠাৎ চোখে পড়েছিল একখানা পোস্টকার্ড বেঞ্চের তলায় পড়ে আছে। সে হেঁট হয়ে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ঠিকানাটা দেখেছিল। সুন্দর মেয়েলি হস্তাক্ষরে লেখা—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণেষু।

প্রতিভাদির মেয়ে আছে সে শুনেছিল। প্রতিভাদি অবশ্য নাম তার কালে-কস্মিনে এক আধ বার করে। চিঠি-পত্র সে দেয়ও না—মেয়েও খুব কম লেখে। মজুমদার সাহেবই তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটি নাকি ভাল। সে মজুমদারের স্কুলেই মাস্টার। মেয়েটির হাতের লেখাটি তো সুন্দর!

চিঠিখানা তুলে টেবিলের উপর রেখে জয়া বলেছিল—আপনার মেয়ের চিঠি না প্রতিভাদি ?

—ও—হ্যাঁ। দাও—

—টেবিলের তলায় পড়ে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—হাতের লেখাটি তো খুব সুন্দর! চমৎকার!

একটু হাসলে প্রতিভাদি। বললে—হ্যাঁ। বুদ্ধিও ওর খুব ছিল। খুব বুদ্ধি কিন্তু। একটু চুপ করে থেকে বললে—দশ বছর বয়সে ওর বাবা মারা গেল। এগার বছর বয়সে—আবার একটু থেমে বললে,—পেটের দায়ে চাকরি নিলাম—কলঙ্ক হল। মজুমদার সাহেব গ্রামের লোক গ্রামে গেলেন—তিনি চাকরি দিলেন ওঁর দেশের বাড়ীতে। তারপর।—হেসে বললেন—তারপর সাহেবের সেবা করতে কলকাতা আসতে হবে বললেন। বুঝতে পার তো। বয়স তো হয়েছে। বললাম—মেয়ের কি হবে? এরপর তো আর ওর বিয়ে হবে না। আপনি বিয়ে করেন নি—আপনার সেবা করব। লোকে কি কেউ বিয়ে করবে ওকে? উনি দেখেশুনে একটি ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছেলেটি ভাল। চাকরি করতে করতে বি-এ পাস করেছে। তারই খবরটা দিয়েছে। আমি তো লজ্জায় চিঠি তাকে লিখি নে। পড় না চিঠিখানা পড়।

জয়া পড়ছিল চিঠিখানা। সুন্দর হাতের লেখা। বানান ভুল নেই। তার নিজের লেখায় অনেক বানান ভুল আছে। স্বামীর পাশের খবর দিয়েছে—ছেলেমেয়ের খবর দিয়েছে। গ্রামের কথা লিখেছে। এবার ধান ভাল—সে খবর দিতেও ভোলে নি।

চিঠিখানা নামিয়ে দিয়েছিল সে টেবিলের উপর। বলেছিল—সুন্দর চিঠি। লেখাপড়াও তো ভালো শিখেছেন। একটি বানান ভুল নেই।

—পড়তে পেলে—ও বি-এ, এম এ পাস করত। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—মজুমদার সাহেব আমাকে বলেছিলেন—ওকে নিয়ে চল সঙ্গে—স্কুলে পড়বে, বোর্ডিংয়ে থাকবে। কিন্তু আমিই তা দিইনি। আমি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলাম। বোঝা নামাতে চেয়েছিলাম ঘাড় থেকে। তাছাড়া—তা ছাড়া ভেবেছিলাম—মেয়ে লেখাপড়া শিখবে—আমাকে ঘেন্না করবে। আমার জন্যে লজ্জা পাবে। তার থেকে বিয়েই ভাল। তা ভালই হয়েছে। ও—ওর বাপের মত। বাপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ ছিল—অল্পতেই খুশী হত। ঠিক তার মত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—হ্যাঁ, ভালই হয়েছে। সে সুখেই আছে। আমার মত রাক্ষসী তো নয়। আমার ভয়ঙ্কর ক্ষিদে জয়া। সময় সময় নিজেকেই আমার ভয় করে।

আরও খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—কিছু দিন আমি সুখী হয়েছিলাম—ওর দাসীবৃত্তি ক'রে। কিন্তু ওই সুরমা এসে আমার কপাল পুড়িয়ে দিলে। অনাথ আশ্রম করে ওকে রাণীর হালে রাখলে—আমি ক্ষেপে গেলাম। দিনরাত ঝগড়া করতাম। শেষে এখানে এই আশ্রম ক'রে আমাকে এখানে রাখলে। নির্বাসনে দিলে।

একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললে প্রতিভা। সাধারণ দীর্ঘনিশ্বাস থেকেও সে নিশ্বাস আরও দীর্ঘ, হয়তো আরও অনেক উত্তপ্ত। ফেলে তিনি বললেন—ভারী মিষ্টি করে বললেন—বস

তুমি।

জয়া দাঁড়িয়েই শুনছিল। বসবার যেন অবসর হয় নি। সে প্রায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। অকস্মাৎ এ কি হল? প্রতিভাদি তার কাছে তার অন্তর উজাড় করে সমস্ত দুঃখ ক্ষোভ ঢেলে দিচ্ছেন। একান্ত আপন জনের মত তাকে বলছেন—বস তুমি। অর্থাৎ এখনও কথা শেষ হয় নি। কথা বলে আশ মেটে নি। সে বসেছিল।

তারপর কিন্তু কথা হারিয়ে গিয়েছিল। দু'জনেই চুপচাপ বসে ছিল অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ।

জয়ার চিঠিতে রয়েছে—"তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিলাম। প্রতিভাদিদির দুঃখে মন আমার ভারী উদাস হইয়া গেল। তাহাকে খুব ভাল লাগিতেছিল। এতদিন তিনি যে সব মন্দ কথা বলিয়াছেন—তাহা সব ভুলিয়া গেলাম। কি বলিয়া সে কথা তাহাকে জানাইব তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কতক্ষণ পর প্রতিভাদিদি বলিলেন—তোমার ভাগ্য ভাল জয়া। লোকটা তোমার উপর পাপদৃষ্টি দেয় নাই। যদি স্কুলে ভর্তি করিয়া দেয়—তবে—ভাল করিয়া পড়িয়া পাস করিও। চাকরি করিয়া আপনার পায়ে দাঁড়াইয়ো। কিন্তু খবরদার এ লোকটা হইতে অনেক দূরে—অনেক দূরে। ইহাদের মতি যে কখন চঞ্চল হয়, পরিবর্তন হয় তার ঠিক নাই। এটা জানিয়ো আমি আর বাধা দিব না। আমিও তাহাকে তাগাদা দিব সত্বর তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিতে। এখানকার কাছে কোন স্কুলে ভর্তি হইও। মধ্যে মধ্যে এখানে আসিবে। আমি তোমাকে সত্যিই দিদির মত আদর করিব। যাও। দেখ গাছে জল দিবার সময় হইয়াছে।"

জয়া লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে এসেছিল—আনন্দে ভরপুর হয়ে। প্রতিভাদি'ও তাকে ভালবেসেছেন। আর কোন শত্রুতা নেই তার সঙ্গে। পৃথিবীতে আজ তার কেউ শত্রু নয়। বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে ছুটতে ছুটতে এসে উঠেছিল এ ব্যারাকে। লাবণ্য ভোলা দাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

—কি রে? কি হল?

জয়া হাসিমুখে বলেছিল—সে অনেক কথা। বলব—সন্ধ্যের'পর আমার ঘরে—চুপি চুপি বলব।

—কবে যাবি তুই?

—তা জানি না।

—তবে?

—তবে সে অনেক কথা। এখন চল। গাছে জল—গাছে জল—গাছে জল। কোমর বাঁধো জল তোল—। ছোটো।

—মর, যা—

—তাই বটে। কিন্তু চল।

—না বললে যাব না।

—প্রতিভাদির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল।

—ভাব হয়ে গেল কি ?

—ভাব হয়ে গেল, ভাব হয়ে গেল এতে আবার কি কিসের ?

—মুখটা হাঁড়ি হয়েছিল কেন ? কি চিঠি এসেছে ?

—সাহেব সুরমাদি দার্জিলিং যাচ্ছেন, এখন কিছুদিন আসতে পারবেন না।

প্রথম খিল খিল করে হেসে উঠেছিল ভোলাদাসী—তারপর তার সঙ্গে লাবণ্য। ও মাঃ—তাই।

—হিংসেতে ফেটে যাচ্ছেন! হি-হি-হি-হি-হি।

—না, হেসো না এমন করে ভোলাদি। পরের দুঃখে হাসতে নেই। চল, বেলা গেল, চল জল দিতে হবে। ক'দিন বৃষ্টি হয়নি। গাছের গোড়াগুলো কাঠ হয়ে গেছে শুকিয়ে।

পুকুর থেকে বালতি করে জল তোলা। ঘাট থেকে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েরা দু'সার হয়ে। এক দিকে খালি বালতি গেল ঘাটে অন্য দিক দিয়ে হাতে হাতে জলভর্তি বালতি এল বাগানে। মধ্যে মধ্যে দিক বদল। খালি বালতির দিক দিয়ে আসতে লাগল ভর্তি বালতি।

এ নিয়ে ঝগড়া বাধে। বাধে জল ভর্তি বালতি বইবার বারের সংখ্যা নিয়ে। আজ ঝগড়া বাধল না। এই ঝগড়ার জন্যে ঘাটে নিজে থাকে জয়া। সে ঠিক ঠিক ভর্তি বালতি ধরিয়ে দেয়—একবার এদিক একবার ওদিক।

জল দেওয়া শেষ করে জয়া ঘাটে নামল—গা ধুতে। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরা। সন্ধ্যের সময় গা ধোয়ার পর্ব স্নানের পর্বের মত নয়, অল্পেই সারে। কিন্তু জয়া কোমর বেঁধে কাপড় সামলে ভেসে পড়ল জলে। মাথার চুল ভিজে গেল।

ভোলাদাসী বললে—ও কি ? এই সন্ধ্যেবেলা মাথা ভিজুচ্ছিস কেন ?

—শরীরটা আনচান করছে ভোলাদি। জলে গা ডুবিয়ে শরীরটা জুড়লো। বলে সে এগিয়ে চলল মাঝজলের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য।

মন ছিল হাল্কা হয়ে—তোলপাড় করলে জল।

প্রতিভা এসে দাঁড়িয়ে ডাকলে—জয়া এ কি করছ ? উঠে এস! জয়া!

জয়াকে ঠেলা দিলে লাবণ্য। জয়া চিৎসাঁতার দিচ্ছিল—ডুবে গেল। মুহূর্তে ঘুরে উঠল কিন্তু জল খেলে। কাশতে লাগল।

লাবণ্য বললে—প্রতিভাদি। ডাকছে। তাই ঠেলা দিলাম।

ওরা ফিরল। কাশতে কাশতেই ফিরছিল জয়া। বুকে একটা ব্যথা লাগছিল। খুব দূরে তারা যায়নি, এসে ঘাটে উঠল। কিন্তু জয়া তখনও কাশি সামলাতে পারে নি। নিষ্ঠুরভাবে

কাশছে।

দাঁড়িয়েও সে বুকে হাত দিয়ে কাশছিল।

প্রতিভা বললে—কি হল ?

—জল খেয়ে কাশছে প্রতিভাদি !

—উঠে এস। ধর ওকে।

হঠাৎ মুখের ভিতরটা গরম হয়ে গেল জয়ার। বিস্বাদ হয়ে গেল। ঠোঁট বেয়ে বেরিয়ে এল কিছু। জয়া বুঝতে পারে নি। কিন্তু লাবণ্য চীৎকার করে উঠল—ও মা !

—কি ? প্রতিভা প্রশ্ন করলে।

—রক্ত !

জয়া এবার দেখলে তার বুকের কাপড়ে মুখ থেকে নির্গত গরম বস্তুটা পড়ে লালচে করে দিয়েছে। রক্ত !

প্রতিভা শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, সে কি ? রক্ত ?

জয়া থর থর করে কাঁপছিল। বুকের কাপড়টা লাল। মুখ থেকে কাশতে কাশতে রক্ত পড়ছে। মনে পড়ল বাবার কথা ! বাবা তার বুকে হাত দিয়ে কাশত ; কাশি সহজে থামত না। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে থামত। মারও তাই।

টি. বি.। যক্ষ্মা রোগ। সাক্ষাৎ মৃত্যু।

তারও হ'ল !

সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকে কালো বনের রেখার উপর শুধু একটা লম্বা লালচে রঙ টেনে দিয়েছে।

জয়ার রক্ত কি ওখান পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে লেগেছে ?

* * *

না, যক্ষ্মা নয়। জয়ার যক্ষ্মা তখনও হয়নি ! জয়া কলকাতায় এল। পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠালে তাকে প্রতিভা। সে-ই তাকে সাহস দিলে ভয় নেই, এখানকার ডাক্তার যা বলেছে তাই সত্যি দেখবে। গলা চিরে রক্ত পড়েছে। জল খেয়ে কেলেছ, বেশী গলা চিরে গেছে। হয়তো বা ছোট শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল। কই, তারপর তো আর পড়ে নি !

কলকাতার আশ্রমে এসে এক মাস সে স্বতন্ত্র একখানা ঘরে পড়ে রইল। মজুমদার সাহেব সুরমা দেবী দার্জিলিংয়ে—তাঁদের চিঠি লেখা হয়েছে।

বহু কষ্টে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। ভাই অনেক বড় হয়েছে। তের-চৌদ্দ বছর বয়স। শরীর তার সবল। দু'জনে কাঁদলে।

জয়াই প্রথম আত্মসম্বরণ ক'রে বললে—কাঁদিসনে, আমার কিছু হয় নি। তুই দেখিস। কিন্তু তুই ভালো ছেলে হ। পড় ভাল ক'রে। আমি এবার স্কুলে ভর্তি হব। পাস করব। দেখিস তুই। তারপর মাস্টারি নিয়ে—দেখবি তোকে নিয়ে যাব। তুইও পাস করবি, কলেজে পড়বি ! দেখিস।

এক মাস পরে ফিরে এলেন মজুমদার সাহেব আর সুরমা দেবী। দুজনে পরদিন একসঙ্গেই জয়াকে দেখতে এলেন। মজুমদার সাহেব চিন্তিত ভাবে বললেন, রক্ত পড়েছে গলা দিয়ে?

জয়া বললে—হ্যাঁ।

সুরমা দেবী বললেন—সে সত্ত্বেও আশ্রমে ওকে রাখা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। অত্যন্ত অন্যায়! আমি তোমাকে বার বার বলেছিলাম লিখে দাও ওকে অন্য কোথাও রাখতে।

—অন্য কোথায়? জায়গা তো চাই!

—সে তুমি দয়ার সাগর—তুমি বুঝবে! এখানকার চার্জ আমার। এখানে এতগুলো ছেলেমেয়ে। কলকাতা শহর। আর ওই ব্যাধি। সেখানে রাখলে কি হ'ত? প্রতিভা এখানে পাঠিয়ে নিজের দায় ঝেড়ে ফেলেছে। আমি এর জন্যে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইব। আর যত সব কুড়োনো মেয়ে নিয়ে তোমার ন্যাকরা। তিনি চলে গেলেন।

জয়া অবাক হয়ে দেখলে প্রতিভার প্রেতিনীটা সুরমার মধ্যে থেকে দাঁত বের ক'রে তাকে শাসাচ্ছে।

মজুমদার সাহেব বললেন, ভেবো না তুমি। কালই ডাক্তার ডেকে তোমাকে দেখাবার ব্যবস্থা করছি। ভেবো না। তিনিও চলে গেলেন।

ভেবো না! বললেই না ভেবে পারে? জয়ার তরুণ জীবনে তখন অনেক আশা, মনে তার অনেক বল, সব যে রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে! সারারাত সে ঘুমোয় নি সেদিন। কাল ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হবে।

হ'ল সব। ডাক্তার দেখলেন। একস্‌রে হল। থুথু গয়ের পরীক্ষা হল। রায় এল—না টি. বি.-র কোন লক্ষণ ধরা পড়ে নি। টি. বি. নয়।

আনন্দে অধীর হয়ে গিয়েছিল সে।

জীবনী সমেত জয়ার চিঠিখানায় সে লিখেছে—যেদিন জানিলাম আমার টি. বি. হয় নাই সেই আনন্দের দিন আবার আমার ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হইয়াছিল—। যে পাঁচিলটা আমাদের অর্থাৎ বয়স্কা মেয়েদের ও ছেলেদের আশ্রমের মাঝখানে, সেখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—"ওরে দীপু টি. বি. হয় নাই। আমার টি. বি. হয় নাই, আমার টি. বি. হয় নাই। সে দিনটির কথা মনে হইলে আজও মনে হয়, না—না—এ আমার টি. বি. নহে। এখানকার ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না।"

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘরের জানালায় ঠুকঠুক শব্দ শুনে চমকে উঠেছিল জয়া। সেদিনও তার ঘুম হয়নি। আনন্দে ঘুম হয়নি। সে ভবিষ্যতের কল্পনায় বিভোর ছিল। রাত্রি তখন অনেক। হঠাৎ তার ওই একক ঘরখানার পিছনদিকের জানালায় ঠুক ঠুক শব্দ উঠল। ঘরখানা ছোঁয়াচে রোগের রোগীকে রাখবার জন্যেই তৈরী। পিছন দিকটায় খানিকটা গাছপালা, তার ওপারেই ছেলেমেয়েদের সীমানার পাঁচিল। সে চমকে উঠল। প্রথমেই ইচ্ছে হ'ল চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু ভয় হ'ল। একটা কেমন ভয়। কে? কে? একলা

যুবতী মেয়ে সে ঘরে শুয়ে আছে। তার পিছনের জানালায় তাকে ডাকছে—সে যদি বলে—। বলে যে তার ডাকবার কথা ছিল!

জয়া লিখছে—বিচিত্র মানুষের মন। মনে হল যদি—মজুমদার সাহেব হন! সঙ্গে সঙ্গে ছি-ছি করেছিল নিজেকে। তারপরই মনে হয়েছিল, দীপু নয় তো? দুর্দান্ত অশান্ত দীপু! সে তো খবর পেয়েছে এক্সরে হচ্ছে, অন্ত পরীক্ষা হচ্ছে।

সে এবার জানালার ধারে গিয়ে মৃদুস্বরে বলেছিল—কে?

—আমি দীপু!

জানালা খুলে জয়া বলেছিল, কি করে এলি তুই?

—পাঁচিল ডিঙিয়ে!

—তুই ডাকাত হবি রে। তুই ডাকাত। ভিতরে আয়।

—না, যাব না। এখুনি পালাব। তোমার খবর পেয়েছ? এক্সরেতে কিছু নাকি পায়নি?

—হ্যাঁ রে। কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। বলেছিলাম তোকে। কিচ্ছু হয়নি আমার! কিচ্ছু না। একটু—একটু কাছে আয়। আর একটু।

জয়া দীপুর চিবুকে হাত ঠেকিয়ে—সেই হাত ঠোঁটে ঠেকিয়ে তাকে চুমু খেয়েছিল। বলেছিল—চলে যা এবার। দেখ, এবার আমি বোর্ডিংয়ে চলে যাব—তুই কিন্তু ভাল ছেলে হ'স। কেমন। হ্যাঁ, পাস করে চাকরি পেলেই তোকে নিয়ে আসব।

দীপু অবলীলাক্রমে একটা গাছে উঠে—সেই গাছ থেকে পাঁচিলের উপর সুন্দর কৌশলে ঝুলে নেমে পড়ে—ওপারে লাফিয়ে পড়েছিল—একটি শব্দ উঠেছিল শুধু—ঝুপ!—কি ডাকাত ছেলে! প্রসন্ন আনন্দে তার মন ভরে উঠেছিল।

* * *

কবে তাকে বোর্ডিং পাঠানো হবে—স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে—তার জন্যই সে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা ক'রেছিল। আর ভাবছিল তার ভবিষ্যতের কথা। বেশ লাগছিল তার। হঠাৎ একদিন তার ডাক পড়ল আপিসে—সুরমা দেবীর কাছে। সুরমা দেবী একা ছিলেন।

গম্ভীর ভাবে সুরমা দেবী বললেন—দেখ, মেদিনীপুরে একটি মহিলা সমিতির জন্যে একজন টীচার দরকার। আমার চেনা একজন বন্ধু আমাকে বলছিলেন। সেলাই শেখাতে হবে—উল বোনা শেখাবে, আর যতটা পারবে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়াতে হবে। আমার মনে পড়ল তোমার কথা। তাঁকে বলেছি আমি তোমার কথা। তিনি তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। তুমি চলে যাও সেখানে। মাইনে পাবে তিরিশ টাকা। সমিতির ঘরে থাকবে। বুঝেছ!

মহিলা সমিতি? উল বোনা সেলাই শেখাতে হবে। প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়াতে

হবে ? স্কুল নয় বোর্ডিং নয় ? সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। স্তম্ভিত, হ্যাঁ সে স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিল।

—শুনলে কথা ? তোমাকে আজই যেতে হবে।

জয়া বললে—বাবা—

—কে বাবা ? বাবা কে ?

—সাহেব—

—হ্যাঁ—তাই বল।

—উনি বলেছিলেন—

—কি বলেছিলেন—

—বলেছিলেন—আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

—স্কুলে ভর্তি করে দেবেন—বোর্ডিংয়ে রাখবেন। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা হাতখরচা দেবেন। কি ভাব কি তোমরা ? যত সব কুড়োনো ভিখিরী—তাদের আস্কারা দিয়ে মাথায় তোলা। না সে সব হবে না। এত টাকা আমাদের নেই। তোমাকে একলা করলে তো চলবে না। করতে হলে সকলকে করতে হবে।

হঠাৎ মুখটা কাছে এনে মৃদু অথচ অতি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন—কি করে এ সব কথা আদায় করেছ ওঁর কাছ থেকে ? কি করে ? বুঝেছ আমি বোকা ?

জয়া পাথর হয়ে গিয়েছিল। স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিল পৃথিবী এত কদর্য !

—যাও। বিকেলে আমার সেই বন্ধুটি আসবেন—তোমাকে দেখবেন। দেখে পছন্দ হলে নিয়ে যাবেন। মেদিনীপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। যাও।

জয়ার পত্রে রয়েছে—সেদিন সেই সময় মনে হয়েছিল কেন আমার টি. বি. হল না। সেই বেলাটা হতাশ হয়ে শুধু পড়েই ছিলাম বিছানায়। খুলল না আমার ভাগ্যের বন্ধ দরজা, খুলেও খুলল না। হে ভগবান।

কাল—আর আজ। কাল টি. বি. হয়নি খবরটা পেয়ে পৃথিবীকে যত সুন্দর মনে হয়েছিল—আজ ওই সামান্য চাকরি নিয়ে যেতে হবে—হয়তো সারাজীবনই ওই আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে এই জেনে পৃথিবী যেন কালো হয়ে গেল।

আশ্রমের ঝি ছিল কামিনী। ষাট বছর বয়স—খুব পাকাপোক্ত। দরকার হলে অবাধ্য মেয়েদের সে মারত। চ্যাঙদোলা করে তুলে নিয়ে যেত। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিত। সে এসেছিল কিছুক্ষণ পর। সে ঘরে ঢুকে বলেছিল—কাঁদছ নাকি ?

হেসে জয়া বলেছিল—না।

—বেশ। কাঁদবে কেন ? তোমার ভাগ্যি এখান থেকে বেরুতে পারছ। ছাড়া পাচ্ছ। এরা ছেড়ে না দিলে তো কেউ ছাড়া পায় না। পালিয়ে গেলে হুলিয়া করে ধরে আনে। ছেড়ে দিচ্ছে—বেরিয়ে যাও, গিয়ে পথ করে নাও আপনার। পথ করবার এই সময়। বুঝেছ।

যৌবন আছে। মোটামুটি ছিরি আছে। চলে যাও। মন চায় তো—।

একটা ঠিকানা দিয়ে বলেছিল—এই ঠিকানায় যেয়ে পদ্ম বাড়ীউলি আছে। আমার নাম করো। সে তোমাকে যত্ন করে রাখবে। হিল্লে করে দেবে তোমার। বড় বড় লোক আসে সেখানে। বুঝেছ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়—

জয়া শিউরে উঠে বলেছিল—পায়ে পড়ি। কামিনী তোমার পায়ে পড়ি। ওসব বলো না—আমাকে ও সব বলো না।

কামিনী বলছিল—ও মাঃ-গোঃ! একেবারে সতীলক্ষ্মী! শোন বলে রাখলাম, যা মন চায় করো। পদ্মর ওখানে ফিলিমের বাবুরা আসে—নতুন মেয়ের খোঁজে। তোমার ভাগ্য যদি খোলে তবে লাখ টাকা রোজগার করবে। লোকে পাগল হবে—

জয়া উঠে বসে বলেছিল—না-না। ওসব তুমি বলো না। আমি বলে দেব।

—হেসে উঠেছিল কামিনী—বলে দেব? তবে তো আমার ফাঁসী হয়ে যাবে। আর বলব—তুমি বলেছ আমাকে! বলেছ—কামিনী তোমার যদি জানাশুনো কেউ থাকে—কোন বাড়ীউলী যারা মেয়ে নিয়ে কারবার করে রাত্রে, ঘর ভাড়া দেয় তাদের ঠিকানা যদি দাও—তবে আমি চলে যাব সেখানে। তিরিশ টাকার চাকরিতে কি হবে আমার! আমি বলে দেব বলাতে তুমি আমার নামে লাগাচ্ছ!

জয়া নির্বাক হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তে! হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। হঠাৎ কামিনী ব্যস্ত হয়ে উঠে চলে গিয়েছিল অন্য দিকে। সুরমাদি তখন আশ্রম ঘুরতে বেরিয়েছেন। দূর থেকে দেখতে পেয়েছে কামিনী।

জয়ার পত্রে রয়েছে—সারা বেলাটা কথাটাকে মন থেকে দূর করতে পারি নি। ভনভনে নীলচে মাছির মত কথাটা এক ঝাঁক ওই মাছির মত মনের মধ্যে ভন্ ভন্ ভন্ করে উড়ছিল।

বিকেল তিনটের সময় তার আবার ডাক পড়েছিল আপিসে।

আপিসে সুরমাদির সামনে বসেছিলেন আর একটি মহিলা। প্রৌঢ়া, চোখে চশমা, পরনে সাদা থদ্দরের শাড়ী। সুরমাদি জয়াকে বলেছিলেন—

—প্রণাম কর। এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম।

প্রণাম করে মাথা তুলতেই—তিনি চশমার ভিতর দিয়ে জয়াকে দেখে বলেছিলেন—কি নাম তোমার?

—জয়া ব্যানার্জী।

—তোমার হাতের কাজ দেখলাম—ভাল। শুনলাম এদের নারী কল্যাণ কেন্দ্রে কাজও করেছ। ভাল কাজ করেছ। পাড়াগাঁয়েও ছিলে। তা হবে—একে দিয়ে না-হবার কোন কারণ দেখছি না। তুমি যাবে তো?

জয়া বললে—যাব।

তার মনের মধ্যে নতুন বিভীষিকা দেখা দিয়েছে।

কামিনী কুৎসিত নিষ্ঠুর হাসি হাসছে। সে জেনেছে এখানে থাকলে কামিনী তার পিছনে লাগবে। উত্ত্যক্ত করবে। রাজী না হলে সেই তার নামে অভিযোগ আনবে—কুৎসিত অভিযোগ। অন্যদিকে সুরমা তাকে সন্দেহ করেছে। সে বললে—যাব।

—বেশ। যদি আজ যেতে পার তবে তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। না হলে—আমি ঠিকানা দিচ্ছি—তুমি চলে যাবে।

—আমি আজই যাব।

সুরমা বললেন—ওকে আমি বলে রেখেছি, ও তৈরী হয়েই আছে।

* * *

মেদিনীপুরে চন্দ্রকোণা।

সেখানে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন—তুমি ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী মশায়ের নাম করে চলে যাও। যে কোন রিক্সাওলা তোমাকে পৌঁছে দেবে। তিনি বিখ্যাত লোক। সারা জীবন দেশের সেবা করেছেন। ভারতবর্ষের লোকও তাঁকে জানে। তাঁর স্ত্রী অরুণা চৌধুরী—তিনিও দেশের কাজ করেছেন—করছেন এখনও। এ সমিতি তাঁদের—তাঁকে চিঠিখানা দিয়ো। তিনি তোমাকে যেখানে কাজ সেখানে পাঠিয়ে দেবেন।

জয়ার পত্রে রয়েছে—পৃথিবীতে ভালো মানুষ আছে, দেবতার মত মানুষ আছে। চোখে দেখলাম।

পরিচয় নিয়ে কি সমাদর—স্নেহই করলেন। অরুণা দেবী আমার মা হয়ে গেলেন। তাঁকে মা বললাম। তাঁর কাছে যে স্নেহ পেলাম তা মায়ের স্নেহের মতই। নিজের মায়ের স্নেহের সঙ্গে পার্থক্য কোন্‌খানে জানেন? এ মায়ের বিচারবুদ্ধি বড়। নিজের মায়ের আবেগটা ছিল বড়। অনেক মানুষ দেখলাম। প্রথমেই বলেছি ভাল মন্দ সাধারণ তিন জাতের মানুষের কথা। এঁরা প্রথম জাতের অর্থাৎ খাঁটি ভাল জাতের মানুষ। তবে এঁদের খুব কাছে এগিয়ে যেতে ভয় করে—সে এঁদের দীপ্তি এবং ধার দেখে। ভাল বিচারের ধারাগুলি বড় ধারালো এবং সূক্ষ্ম। নিক্তির ওজন করে কার কি প্রাপ্য বিচার করে দিয়ে থাকেন। অনেকটা উঁচুতে থাকেন। মাটির মানুষের সঙ্গে মিশবার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে নেমে এসেও এঁরা মাথায় অনেক উঁচু হয়ে যান—মেশাটা হয় না। মাটির মানুষের তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বা মুখের দিকে তাকাতে ঘাড় বেঁকিয়ে উল্টো দিকে মাথা নিচু করতে হয়। তবু বলব—আমার এই ছোট জীবনে এমন বড় মানুষ আমি দেখি নি। আমার জন্যে অনেক করেছেন—সে কথা পরে বলছি; কিন্তু সেই জন্যেই বলছি না—বড় মানুষ; এঁরা সত্যিকারের বড় মানুষ। গান্ধীজীর শিষ্য। জীবনটা এঁদের তপস্যা। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। প্রথম যৌবনে এঁরা পরস্পরকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে বিবাহ করেন নি। দেশে স্বাধীনতা আসার পর যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে তার তিলক পরে প্রৌঢ় বয়সে বিয়ে করেছেন। কি যে ভাল আমার লেগেছিল এঁদের কি বলব। মনে হয়েছিল একদিন একরাত্রি এঁদের সঙ্গে বাস করে পবিত্র হয়ে গেলাম, জীবনে নতুন বল পেলাম।

পরের দিন ওখান থেকে ছ'সাত মাইল দূরে একখানি গ্রামে তাঁরা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই আমার কর্মস্থল। পথে যেতে যেতে সুরমাদি'কে আর সেই মহিলাটিকে (তাঁর নাম সুরমাদিও আমাকে বলেন নি আমিও জিজ্ঞাসা করি নি। অরুণা দেবী মাকে যে পত্র তিনি আমার হাতে দিয়েছিলেন খামে বন্ধ করে, সেখানাও পড়তে পাইনি।) ধন্যবাদ জানালাম। না হোক আমার স্কুলে ভর্তি হওয়া—না পাই আমি পাস করে বড় হওয়ার সুযোগ—আমি দেবতার মত মানুষের কাছে এসে পড়ছি, সৎসঙ্গের মহৎ আশ্রয়ের যদি কোন বাস্তব মূল্য নাও থাকে—তবু আমি পবিত্র হয়ে গেলাম ধন্য হয়ে গেলাম।

* * *

নতুন জায়গা, শান্ত পল্লীগ্রাম, সরল গ্রামের মানুষ। জয়া তার চিঠিতে লিখেছে, বয়স্কা মেয়েরাও লজ্জাশীলা। এঁদের পড়ানো বড় শক্ত কাজ। বুঝতে না পারলে বলেন না বুঝতে পারি নি।

—বুঝেছেন? জিজ্ঞাসা করলে ঘাড় নেড়ে জানান—হ্যাঁ।

—বলুন তো!

চুপ করে থাকেন। মুখ নামিয়ে নখে মেঝের মাটি খোঁটেন।

—তা হ'লে বুঝতে পারেন নি?

এবার 'না'-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জানান—না বুঝতে পারেন নি।

আবার বোঝাতে হয় জয়াকে। ক্লান্তি বোধ হলেও ঝেড়ে ফেলে দেয়। বিরক্তি এলেও তাকে শাসন করে সরিয়ে দেয়।

এক বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়ে পড়ানোর কাজও জুটেছিল তার। বিনিময়ে পেয়েছিল খাওয়া আর পেয়েছিল থাকার জায়গা।

মাসে মাসে মাইনের টাকা জমছিল। মাসে তিরিশ, বছরে তিনশো ষাট। তার মধ্যে নিজের কাপড় জামা ভাইয়ের জন্য কাপড় জামা কিনে পাঠানোর জন্য খরচ ঠিক করেছিল ষাট টাকা। বাকী তিনশো টাকা জমবে বছরে। বছর দুই গেলেই ভাইকে আনবে কাছে। নিজের পড়া হ'ল না ভাইকে পড়াবে।

মাঝে মাঝে অরুণা দেবী এসে তার কাজ দেখে যেতেন। কিছুদিন পর পর সে যেত তাঁর বাড়ী।

মা তাঁকে ভালবেসেছিলেন। সে ভালবাসা গাঢ় হয়েছিল। এক বছর পর আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে জয়ার কপাল খুলল।

মা অরুণা দেবী বললেন, জয়া, আমি তোমার জন্যে ভাবছি কিছুদিন থেকে।

কথাটা বুঝতে পারে নি জয়া। চুপ ক'রে থেকেছিল। ভয় হয়েছিল হয়তো বা তার কোন অপরাধ হয়ে গেছে যার জন্যে তিনি চিন্তিত হয়েছেন, ভাবছেন এরপর কি ক'রে তাকে আর রাখবেন?

অরুণা মা বুঝতে পারেন নি তার সংশয়। তিনি বললেন, এই কাজ করছ এতে তোমার

কি হবে? কোন উন্নতির তো সম্ভাবনা নেই। সারা জীবনই এই সামান্য মাইনেতে পড়ে থাকতে হবে। তার থেকে তুমি এ চাকরি ছেড়ে দাও। এখন সরকার থেকে গ্রামসেবিকা ট্রেনিং সেণ্টার খুলেছে সেই ট্রেনিং নাও। পাস করলে চাকরি পাবে। মাইনে এর থেকে অনেক বেশী পাবে। তারপর হয়তো আরও রাস্তা খুলবে কে বলতে পারে? কি বল?

কি বলবে জয়া? সে কেঁদে ফেলেছিল।

* * *

চাকরি ছেড়ে আসবার দিন—গ্রামের মেয়েরা তাকে অনেক আশীর্বাদ করেছিল। এক বৃদ্ধা বলেছিলেন—সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক মা—

তাঁর কথা তরুণীদের কলহাস্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন—মরণ, এতে হাসির কি পেলি?

একজন মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চাপা দিয়ে বলেছিল—জয়াদির যে বিয়েই হয় নি ঠাকুরমা!

বৃদ্ধা ঠকেন নি—বলেছিলেন—হয় নি, হবে। এমন মেয়ে কতজনা সেধে এসে বিয়ে করবে। বুঝলি! ও কি তোদের মত বাপ-মায়ের গলার কলসী। সেধে বর আসবে—সর্বাঙ্গে গয়না দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাবে। ও রাজরাণী হবে। আমি বলে রাখলাম।

কথাটা সারারাস্তা গুঞ্জন করেছিল জয়ার বুকে। সে গুঞ্জনের মৃদু সঙ্গীতঝঙ্কারে বিভোর হয়ে সাত মাইল পথ বন্যার জল ভেঙে এসেছিল মায়ের ওখানে—একবারের জন্যও ক্লান্তি বোধ করে নি—অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় নি।

অরুণা মা তাকে ভর্তি করে দিয়েছিল গ্রামসেবিকা ট্রেনিং সেণ্টারে। জায়গাটা কোথায় তা জয়া লিখতে বোধ হয় ভুলে গেছে।

জয়া লিখেছে চিঠিতে রয়েছে—"এসে ভর্তি হয়েছিলাম অষ্টম শ্রেণীতে। মা আমাকে সব দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে।"

জীবনে সেই দিনটিই তার শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন। জগতের দুয়ার খুলল তার কাছে। সম্মুখে তার রাজপথ চলে গেছে সোজা দিগন্ত পর্যন্ত। চল—চল—চল। এগিয়ে চল!

মনে হয়েছিল জয় করেছে সে সব বাধাবন্ধ। এবার দৌড়ুতে হবে। ছুটতে হবে। ওই দিগন্ত পর্যন্ত যদি যেতে হয়—তবে প্রাণপণে ছুটতে হবে। পথে দেখা হবে তার সঙ্গে। ঐ বৃদ্ধা যার কথা বলেছে—তার সঙ্গে। বৃদ্ধার কথাগুলি গুঞ্জন করে উঠেছিল তার মনের মধ্যে।

ট্রেনিং সেণ্টারে বসে চরকা কাটত; চরকা একটানা ঘরঘর গান গাইত—যেন বলত—সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। তার সঙ্গে বাজত তরুণীদের খিল খিল হাসি।

মন বলত দেখা হবে, হবে দেখা তার সঙ্গে, পথে হবে দেখা। এই দেশের সেবিকা হয়ে চলবে তুমি কাজের পথে—গ্রামে গ্রামে; বন্যায় আর্তিতে তুমি চলবে সেবা করতে হঠাৎ পথে দেখা হবে। সে আসবে বন্যার্ত মানুষকে ত্রাণ করতে। সবল হাতে নৌকার লগি ঠেলে

নৌকা নিয়ে হাতের পেশী ফুলে উঠেছে, মাথার রুক্ষ লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে। কাঁধের উত্তরীয়খানা পায়ের তলায় পড়ে আছে, নৌকা কিনারায় লাগিয়ে নৌকার আর্ত মানুষগুলিকে নামিয়ে দিয়ে তার কাছে এসে হেসে বলবে—নমস্কার।

সে আরক্ত মুখে বলবে—নমস্কার।

সে বলবে—একটু জল খাওয়াতে পারবেন। ভাণ্ডার তো আপনার হাতে।

সে তাকে কিছু খাদ্য সমেত জল এনে দেবে।

সে বলবে—এই তো! এই জন্যেই তো আপনাদের বলে অন্নপূর্ণা!

এক বুড়ী—ওই বন্যার্ত দলের মধ্য থেকে বলে উঠবে—তা বাবা তোমরা দুটিতে অন্নপুন্নো মূর্তিতেই দাঁড়িয়েছ গো। আঃ বাবা শিব লইলে বাঁচায় কে? আর অন্নপুন্নো মা লইলে অন্ন দেয় কে?

এ ওর দিক তাকিয়ে মুখ নামাবে—ও-ও তাই করবে। কিন্তু অন্তরভ্রমর গুঞ্জনে ভরে উঠবে। চরকায় বেজে চলত সেই ভ্রমরগুঞ্জন।

চরকা থামত, ওদিকে ঘণ্টা পড়ত। কল্পনায় ছেদ পড়ত। ঘণ্টাটাই যেন বলত—না—না—না। চরকা রেখে কল্পনাবিলাস ঝেড়ে ফেলে—সে অন্য কর্তব্যে চলে যেত। পড়া—শিক্ষা।

এ দেশের অগণিত মানুষ শিক্ষায় বঞ্চিত। শতকরা শিক্ষার হার মাত্র ২৩।২৪।

দুঃখদৈন্যের শেষ নেই, দুর্গতির সীমা নেই, কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। শত শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ। বর্ণভেদে জাতিভেদে জর্জরিত।

তার মধ্যে অন্য কল্পনা জাগত। সারাটা জীবন সেবা করে যাবে মানুষের। মানুষকে সত্যকারের মানুষ করবে। ভাইকে এনে কাছে রাখবে, লেখাপড়া শেখাবে। তাকেও দেশের সেবায় ব্রতী করবে। তার মত ছোট গ্রামসেবিকা নয়—দেশের একজন বড় সেবক করবে। সায়েন্স পড়াবে। সায়েন্টিস্ট হবে দীপু। বড় বড় রিসার্চ করবে। মোটা মাইনে পাবে। তার ঘর হবে—সংসার হবে। সে-ই তার বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসবে। সে-ই হবে সে ঘরে কর্ত্রী।—গ্রামসেবিকার কাজ থেকে আরও বড় কাজ বেছে নেবে সে তখন।

দুটো বছর কেটে গেল।

[illegible]জল আলোয় ভরা তার প্রতিটি দিন। আশার উৎসাহের [illegible]লোকদীপ্তিতে ঝলমল করেছে।

* * * *

এরপর আমার নিজের ভাষায় জয়ার জীবন প্রকাশ করব না। তার লেখা ঘটনাগুলিকে নিজের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে মেজে ঘষে ধরব না। হুবহু জয়ার লেখা কথাগুলিই তুলে দেব। তাতে উপন্যাস সাহিত্যের বিন্যাস ক্ষুণ্ণ হয় হোক। পাঠক মার্জনা করবেন।

জয়া লিখেছে—চিঠিতে রয়েছে—

"সেই পেয়েছিলাম জীবনের অপূর্ব স্বাদ। গত বছর পায়ে হেঁটে মেয়েদের সঙ্গে দূর-

দূরান্তরে গিয়েছি বন্যার্তদের সেবা ও সাহায্যের জন্য। মনে কত আশা—নিজে মানুষ হয়ে তাইকে মানুষ করব। চিরদিন চরকা কেটে খদ্দর পরব। আমার এই বন্ধনহীন জীবনটাকে বিলিয়ে দেব দেশের কাজে। তার মধ্যে দিয়ে দেশের আশীর্বাদে যদি বন্ধন আসে—পরব। কিন্তু—।

আবার উঠল আমার জীবনে ঝড়। পরীক্ষা কাছে এসে পড়েছিল। খুব পড়ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ শুরু হল সর্দিকাশি। খুব অসুস্থ শরীর নিয়েই পরীক্ষা দিলাম।

পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করলাম। শরীর সুস্থ থাকলে প্রথম হতাম নিশ্চয়। মাস্টাররাও তা বললেন।

দুদিন পর রাত্রে খেতে বসেছি; ঠাকুরের স্তবপাঠ শেষ করে ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলতে গিয়েছি—এমন সময় এল খুক করে একটা কাশি—সঙ্গে সঙ্গে মুখটা 'বে-আস্বাদে' বিস্বাদ হয়ে গেল—গরম একটা তরল পদার্থে মুখটা ভরে গেল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কি এটা। রক্ত। হ্যাঁ রক্ত। আমি জানি এর স্বাদ। আমি জানি। ভয়ার্ত হয়ে আসন থেকে উঠে—ছুটে পালিয়ে এলাম নিজের ঘরে। মুখের বস্তুটা—উগলে ফেললাম—রক্ত রক্ত, টকটকে রাঙা তাজা রক্ত!

তারপর সাতদিন ক্রমাগত আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সে প্রায় রক্তের বান।"

* * * *

জয়া জন্মেছিল দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে। এ ছাড়া তো কোন ব্যাখ্যাই হয় না। যাঁরা ইতিহাসবিদ যাঁরা রাজনীতিজ্ঞ তারা বলবেন ইতিহাসের বলি। বামপন্থী চরম দক্ষিণপন্থীরাও তাই বলবেন একটু ইতরবিশেষ ক'রে, দোষ দেবেন দেশ বিভাগে যারা সম্মত হয়েছে তাদের ওপর। গণবিপ্লব না ক'রে আপোসে যারা স্বাধীনতা নিয়েছে দায়ী তারা। আমি ভাবছি তার দুর্ভাগ্যের কথা। দোষ যার হোক দায় যার হোক দুর্ভাগ্য যে তার চরম তাতে সন্দেহ নেই। এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটি সৌভাগ্যের রজতরেখা তার সাধনার পুণ্যবলেই ঝিকমিক করছে। এই মন্দ পৃথিবীতে ভালো মানুষের দেখা পেয়েছে; মন্দ মানুষও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে।

এখানে ওই দেশসেবক শ্রীচৌধুরী আর তাঁর স্ত্রী—জয়ার অরুণা-মা সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিলেন চন্দ্রকোণা থেকে। জয়া তখন রক্তক্ষরণে শীর্ণাঙ্গী এবং পাণ্ডুর হয়ে গেছে। গায়ে তার উত্তাপ ফুটেছে।

স্বপ্নে সে মাকে দেখে—বাবাকে দেখে। অরুণা মা তাকে দেখে শিউরে উঠে কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন—এ কি চেহারা হয়েছে জয়া?

জয়ার মুখে শুধু একটি শীর্ণ হাসি ফুটেছিল।

সে বলেছিল—আমি বাঁচব না?—বাঁচতে সে চেয়েছিল—বাঁচতে চায়।

চৌধুরী বলেছিলেন—বাঁচবে বই কি। আজকাল টি. বি.-র অনেক ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। স্বতন্ত্র হাসপাতাল রয়েছে। ভয় কি? আমি ব্যবস্থা করছি।

হাজার হাজার টি. বি. রোগী আজ হাসপাতালে আশ্রয়াভাবে ভুগছে, মরছে, সেখানে জয়া, পিতৃহীনা মাতৃহীনা বন্ধুহীনা স্বজনহীনা জয়া আশ্রয় পেলে চৌধুরী মশায়ের চেষ্টায়। আপনার সাধনায় এই পৃথিবীতে তাদের স্নেহটুকু অর্জন করেছিল।

জয়া চিঠিতে লিখেছে—আমার পরিণাম দেখে অরুণা মা, চৌধুরী মেসোমশায় পেলেন মর্মান্তিক আঘাত। তাঁরা সাত দিনের মধ্যে চেষ্টা ক'রে ডিগরী স্যানাটেরিয়ামে আমার জন্যে ফ্রি বেড ক'রে দিলেন। তাঁরা সত্যই মহৎ মানুষ, সত্যকারের দেশসেবক। প্রথম প্রথম তাঁরা আমাকে দেখতে এসেছেন। আর্থিক সাহায্য করেছেন। তাঁদের মত পরোপকারী মহৎ মানুষের জন্য আমার অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি আন্তরিক অকৃত্রিম।

মজুমদার সাহেব সুরমাদি এঁদের অপরাধ অনেক। কিন্তু দেখেছি তাঁদের মধ্যেও তাঁদের অপরাধের কীর্তিনাশার ধারার সমান্তরালে ভাগীরথীর ধারার মতও একটি ধারা আছে। আমি তাতে স্নান ক'রেই কীর্তিনাশার ধ্বংসস্রোত থেকে রক্ষা পেয়েছি।

দীর্ঘ আট মাস ধরে এই মৃত্যু-রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলছি। আমি বাঁচতে চাই। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে দেখব আমি শেষ পর্যন্ত। আমার ভাগ্যের দোষ—পৃথিবীকে দোষ দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারি না। নইলে আমার ভাই এমন করবে কেন?

দু মাস আগে খবর এসেছে, চিঠি পেয়েছি অনাথ-আশ্রম থেকে—আমার ভাই সেখান থেকে পালিয়েছে।

তারা যাই লিখুক—আমি জানি সে কেন সেই দোতলা সমান পাঁচিল ডিঙিয়ে এই অচেনা পৃথিবীর অন্ধকার পথে নেমে এসেছে—হারিয়েছে। সে তার দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছে। উৎকণ্ঠা তার আর সহ্য হয় নি। জানি না সে বেঁচে আছে কিনা। থাকলেও আমার কল্পনায় যা দেখি—তাতে শিউরে উঠি। শিউরে উঠি আর বলি, তাই যদি হয়ে থাকে তবে ভগবান তুমি তাকে টেনে নিয়ো—টেনে নিয়ো। আমি কল্পনায় দেখি—কলকাতার পথের ভিক্ষুকদের সঙ্গে সে মিশে গেছে। হাত পেতে চাচ্ছে—দুটো পয়সা দেবেন, বাবু—কিছু খাই নি। বাবু! অথবা উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছে। কোন পুলের তলায় বাসা নিয়েছে অসংখ্য ভিক্ষুকদের সঙ্গে। কিম্বা হয়তো অপরাধীর দলে পড়ে পথে পথে ঘুরছে পথের পথিকদের ভারী পকেট খুঁজে খুঁজে।

আজ এই কুড়ি বছরের জীবনে—আমি নায়কহীন নায়িকা। হয়তো তাই হয়েই আমার জীবন-নাটকে যবনিকা নামবে।

আপনার মহাশ্বেতা বই পড়ে আজও মনে সাধ—আমি নায়িকা নীরার মত হব। সংগ্রাম করে জিতব। ভাগ্যকে ফেরাব। তার অঙ্গ থেকে দুঃখের ছাপ-মারা পরিচ্ছদ খুলে উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরাব।

আবার ভয় হচ্ছে, তা হবে না। আমাকে বিশ্বনাটকে অসম্পূর্ণ চরিত্র হিসেবে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন—আমাকে তাই চলে যেতে হবে।

তাই আপনার কাছে আমার রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়েই এই কাহিনীটুকু লিখে পাঠালাম।

আপনি লিখবেন। উপন্যাস না হয় ছোট গল্প, তাই লিখবেন। আমার বড় সাধ।

এরই নিচে লেখা—সমাপ্ত।

* * *

সমাপ্ত ওখানে নয়। এর পরও আছে। সুতপা বা সুরূপার কাহিনী যেমন আজও শেষ হয় নি—জয়ার কাহিনীও ওখানে শেষ হয় নি। আমি চিঠি লিখেছিলাম জয়াকে—সান্ত্বনা দিয়ে। লিখেছিলাম, "জয়া, আমি আশীর্বাদ করছি—তুমি ভাল হয়ে উঠবে। সংসারে—তুমি ঠিক লিখেছ জয়া—ভাল মানুষ আছে মন্দ মানুষ আছে, ভালয় মন্দয় মেশানো সাধারণ মানুষ আছে—তারাই বেশী। তোমার সাধনায় তুমি মন্দ মানুষের ভিতর থেকে ভাল মানুষের ঘুম ভাঙিয়েছ; তোমার বিরুদ্ধে তোমার দুর্ভাগ্যের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে—পার হয়ে এসেছ। অনাত্মীয়ের মধ্য থেকে আত্মীয়কে আবিষ্কার করেছ। আপনজন তুমি পেয়েছ—পাবে। আমিও আজ থেকে তোমার আপন জন হলাম। তোমার জীবনী আমি পেয়েছি। যত্ন করে রেখে দিলাম। তুমি লিখেছ সমাপ্ত—আমি সেটা কেটে দিয়েছি। প্রতীক্ষা ক'রে রইলাম—উপযুক্ত সমাপ্তির ছেদের জন্য। লিখব—তোমার জীবনী আমি লিখব।"

সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার ডাক্তারকে পত্র লিখলাম জয়ার অবস্থা সঠিক কি—তা জানবার জন্য। চিঠির জয়ার সঙ্গে—আসল জয়ার তফাৎ আছে কিনা সে প্রশ্নও করলাম।

জয়ার একখানা উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতাভরা পত্র পেলাম। ডাক্তার লিখলেন—মেয়েটি বড় ভাল। তবে ভাবপ্রবণ। সেটার জন্যই ও নিজে যেন ভাল হতে চাচ্ছে না। বিশেষ ক'রে ওই এক ভাই ছিল, তার নিরুদ্দেশের খবর পাওয়া অবধি মুষড়ে পড়েছে। অসুখকে চাচ্ছে। তবুও ওকে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্যোত্তর স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠাতে পারব বলেই মনে করি।

* * *

এর পরও আছে।

কিছুদিন পর একখানা চিঠি এল জয়ার। হস্তাক্ষরটা মনে ছিল। তাই উল্টে নামটা দেখলাম প্রথমেই। দেখলাম জয়াই বটে। এবার লিখেছে এম. আর. বাসুর স্যানাটোরিয়াম থেকে। ওয়ার্ড—পি-ও, বেড নম্বর ছয়। আরোগ্যোত্তর স্বাস্থ্যাবাস।

মস্ত লম্বা চিঠি। এক কথার পুনরাবৃত্তি বার বার। দাদা সম্বোধন করে লিখেছে—আপনার দুখানা চিঠি এবং একখানা পাঠানো বই পেয়েছিলাম আমি। আমি সেই যক্ষা-রোগিনী জয়া। আপনার সেই আশার কথা ভরা চিঠি দুখানা থেকে আমি আশ্চর্য বল পেয়েছিলাম দাদা। আমি বাঁচতে চাওয়ার মধ্যে জোর পেয়েছিলাম। নতুন করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা এনে দিয়েছিল আমার মধ্যে। বর্তমানে আমি walking patient; ডাক্তার গাঙ্গুলী বলেছেন, তুমি কিছুদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে। একটা অপারেশন দরকার হয়, সেটাও দরকার হবে না। কিন্তু সেদিন মেডিকেল বোর্ড এসেছিল—তারা বলেছে—অপারেশন করতে হবে। এবং তাতে কোনই ভয় নেই। শীঘ্র অপারেশনের ব্যবস্থা

করবেন।

ভয়? দাদা অপারেশন করতে আমার একটুও ভয় নেই। আমার অপারেশন আমি চাই। আমি ভাল হয়ে উঠব। আবার লড়াই শুরু করব দুর্ভাগ্যের সঙ্গে। আমি জিতব।

সব থেকে আনন্দ আমার—আমার হারানো ভাই ফিরেছে। কৃষ্ণনগরের দু'জন অপরিচিত ভদ্রলোক তাকে সেখানে পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে—আমাকে তার খবর দিয়েছিলেন। আমি চিঠি লিখেছিলাম কাকাকে। সেই সন্ন্যাসী কাকা। কাকীমা মারা গেছেন। কাকার মাথা ভাল হলেও উদাসী। কিন্তু তাঁকে ছাড়া আর লিখবই বা কাকে? কাকা তাকে নিয়ে গেছেন। সেখানে সে আছে। কিন্তু বুঝতে পারি বড় কষ্টেই আছে।

আমি এখন লিখবার চেষ্টা করি। কিছু হয় না। লজ্জা পাই। আমার জীবনে নিয়ে কখন লিখবেন দাদা? এখনও সময় হয় নি?

আমি লিখেছিলাম—না, এখনও সময় হয় নি।

আবার চিঠি পেলাম বেশ কিছুদিন পর। এবার ঠিকানা নীলরতন সরকার হাসপাতাল, ফ্রেজার বি ওয়ার্ড বেড নং ২। কলিকাতা ১৪। দাদা, আমি নীলরতন সরকার হাসপাতালে অপারেশনের জন্য এসেছি। অপারেশন ছাড়া আমি ভাল ঠিক হব না। এখানকার চেস্ট সার্জন ডাঃ চ্যাটার্জী—এখানে গিয়ে আমার কেস সম্পূর্ণ রেডি কেস দেখে এখানে অপারেশনের জন্য এনেছেন।

খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন হবে আমার। তার আগে যে নানান পরীক্ষা আছে তাই হচ্ছে। সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব কিনা জানি না। কি রকম সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আগে বলেছি কতজনকে, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না—কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে—ভয় আছে তার মধ্যে।

আমি যদি মারা যাই, আমার জীবন নিয়ে বই লিখতে যেন ভুলবেন না। সে বই আমার পড়া হবে না—চোখে দেখা হবে না। তবু এই অখ্যাত জীবনের কাহিনী আপনার মানস সরোবরে স্নান করে মানুষের কাছে পৌঁছুবে—তারা জানবে—জয়া বলে দুর্ভাগিনী একটি মেয়ে ছিল—যে হার না মেনে মরেছে। এতেই আমি ধন্য হব।

এ চিঠি যখন পাই তখন আমি নিজে অসুস্থ শয্যাশায়ী। আমার বড় জামাই, আমার সংসারের উজ্জ্বলতম রত্ন—ক্যান্সারে [illegible]ক্রান্ত [illegible] হাসপাতালে। আমার দৌহিত্র—বড় মেয়েরই একটি পুত্র—তার নেফ্রাইটিস। এর মধ্যে কত দিন ইচ্ছা করেছি, জয়াকে দেখে আসব। কিন্তু পারি নি—সময় করতে পারি নি, সম্ভবত মনের দিক থেকেই সময় হয় নি।

জয়া ক্ষুব্ধ নিশ্চয় হয়েছিল। হবারই কথা। আমি চিঠিতে লিখেছিলাম আমাকে আপনজন মনে করো। সে তা করেছিল, চিঠিতে তার পরিচয় আছে। আমিই প্রমাণ দিয়েছিলাম, আমি সত্য করে আপনজন হই নি, হতে পারি নি। দুঃখ সে পাবে বই কি।

আরও কিছু দিন পর—তখন আমার জামাই প্রায় শেষ-যাত্রার জন্য সেজেছে—তার মৃত্যুর দশ বারো দিন আগে আবার চিঠি পেলাম জয়ার।

সব ঠিক হয়েও জয়ার অপারেশন হয় নি। তার গ্রুপের রক্ত পাওয়া যায় নি। চমকে উঠেছিলাম।

দুর্ভাগ্যের চক্রান্ত কি এমন নিষ্ঠুর অলঙ্ঘনীয় হয়, যার জন্য মানুষের সব চেষ্টা হার মানে?

না, ভুল বললাম। সেই চেষ্টাটাই হয় নি। যে চেষ্টায় এ রক্ত সংগ্রহ করা যেতে পারত, দেশ থেকে হোক দেশান্তর থেকেই হোক—সে চেষ্টা হয় নি। এ দেশে সে প্রাণ, সে প্রেম, সে চেতনা নেই।

আপন শিয়রে দুর্ভাগ্যের উদ্যত বজ্রপাতের আতঙ্ককে মুহূর্তের জন্য সরিয়ে রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম। ওরই মধ্যে আর একটা খবর ছিল জয়ার। সে তার মামীমার দেখা পেয়েছে। যে বড়লোক মামারা তাকে উপেক্ষা করেছিলেন, তাঁদেরই একজনের স্ত্রী। তিনি স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছেন তাঁর সন্তানতুল্য একজনের কাছে। তাঁরা বেলেঘাটায় থাকেন। দেখা হয়েছে আকস্মিক ভাবে হাসপাতালে।

আরও খবর ডাক্তারেরা বলেছে—অপারেশন না হলেও সাবধানে থাকলে টি. বি. চাপাই থাকবে—কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। সম্ভবত চলে যাবে সে মামীর কাছে। মামী তাকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ চিঠির উত্তর দিতে পারি নি।

দশ বারো দিন পর আমার জামাই মারা গেলেন। মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। ওদিকে নাতিটির অসুখ প্রবল হয়ে উঠেছিল। লড়াই চলছিল তাকে নিয়ে।

মাস তিনেক পর—সে যখন একটু সুস্থ হয়েছে, তখন আমি পড়লাম কঠিন অসুখে। দিল্লী থেকে আসবার পথে ট্রেনে অসুস্থ হয়ে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় পৌঁছুলাম হাওড়ায়। তারপর ছ'মাস শয্যাশায়ী।

এই অবস্থাতেই একখানা চিঠি এল জয়ার। পোস্টকার্ডখানায় তার মামীর বাড়ীর ঠিকানা পেলাম। জবাব দিলাম তার। অবসর অনেক তখন হাতে। কাজকর্ম নিষেধ। চলাফেরা বারণ।

কদিন পর জয়ার চিঠি এল। দীর্ঘ চিঠি। চিঠি পড়ে শিউরে উঠলাম।

দাদা, কদিন আগে অভাবনীয় ভাবে আপনার চিঠি পেলাম। আপনার চিঠি পেলে মনে হয় যেন আমি কি বিরাট একটা জিনিস লাভ করেছি।

দাদা নতুন ঝড় উঠেছে জীবনে। সাইক্লোন টাইফুনের মত। দিনে রাত্রে মনের দিক থেকে সময় নেই। এ ঝড়ের কথা লিখতে কলম সরে না—মুখে কাউকে বলা যায় না; কিন্তু তবু আপনাকে না লিখে পারছি না। আমার জীবনের উপাদান যে আমাকে আপনার হাতে দিয়ে যেতে হবে। যেতেই হবে। আমাকে নিয়ে যে আপনি লিখবেন। আমার যে তাতে বড় আকাঙ্ক্ষা।

এখন রাত্রি দশটা। সব কথা লিখতে যে কটা বাজবে জানি না। হয়তো রাত্রি শেষ হয়ে যাবে। আর আপনাকে না লিখে যে শান্তি পাচ্ছি না।

অথচ এ কথা আপনাকে লেখা যায় না। বোধ হয় একমাত্র 'মা' ছাড়া আর কারও

কাছে বলা যায় না।

আপনাকে লিখেছিলাম—আমি মামীমার কাছে এসেছি। মামীমা থাকেন তাঁর পালিত সন্তানের কাছে। এই পালিত ছেলে এখন চাকরি করে। ছেলে তাঁকে সমাদরে স্থান দিয়েছে। আমাকে মামী স্থান দিলেন ঘরে—তাঁর পালিত ছেলে হেসে বললে, বেশ তো!

আমার জীবনের কথায় বোধ হয় লিখি নি—একসময় তখন আমার বয়স অনেক কম—তখন কাকার কাছে কলকাতায় থাকতাম। কাকা এই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। বিয়ে হয়েও হয়তো যেতো। কিন্তু কাকা তারপরই পাগল হয়ে গেলেন।

এখানে এসে তাঁকে দাদা বলে প্রণাম করলাম। তিনি সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন। ভরসা দিলেন, ডাক্তারের কাছে তিনি শুনে এসেছেন—না হোক অপারেশন—কোন ক্ষতি নেই। রোগ বলতে গেলে সেরেই গেছে। অপারেশন প্রয়োজন—খুব দূর আশঙ্কার জন্য শতকরা দুটো চারটেতে হয় যে অপারেশন না হলে আবার রোগ দেখা দেয়—দুরন্ত অনিয়ম অত্যাচারে।

তাঁকে আবার প্রণাম করলাম। মনের আনন্দে ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম—সুস্থ হয়েছি, এবার চাকরি খুঁজব। খুঁজছিলাম। দাদা খুব সহানুভূতির সঙ্গে দরখাস্ত দেখে দেন। তিনি চাকরি করেন রেলে। বাইরে যেতে হয়। যখন আসেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজ নেন।

মামীমা একদিন তাঁকে বলেছিলেন—একসময় তো তোর সঙ্গে জয়ার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—এখন ও একরকম ভাল হয়েই গেছে। এবার তুই ওকে বিয়ে কর না রে।

আমি শিউরে উঠে বলেছিলাম—না মামীমা, না। আমার দুর্ভাগ্য আমার থাক—তার ছোঁয়াচ লাগলে ওর হয়তো অনিষ্ট হবে।

তিনিও বলেছিলেন—জয়া ঠিক বলেছে মা। বিয়ে ওর না-করাই ভাল। তা ছাড়া বিয়ে করতে হলে আরও একটু লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করব আমি। যে চাকরি ক'রে সাহায্য করতে পারবে সংসারে।

এই কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত আমার জীবন ছিল নিশ্চিন্ত—রাত্রে সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। খবর পেয়েছি, ভাই ভাল হয়েছে—কারখানায় কাজ শিখছে। তার সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি আমি।

আপনাকে আগের চিঠি লেখার দু-তিন দিন পর পর্যন্তও আমার নিশ্চিন্ত সুন্দর সুসময় গেছে। হঠাৎ সব পাল্টে গেল—উল্টে গেল। সাদা কালো হয়ে গেল। রাত্রি দুর্যোগে ভরে উঠল। যেন—সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র পৃথিবীর আলো জোনাকির দীপ্তি সব মুছে গিয়ে হয়ে গেল ভয়াল অন্ধকার।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমার ভীষণ ঘুম। আমাদের মাত্র একখানা ঘর। একটা বড় মশারির মধ্যে আমরা সকলে শুই। ঘুম ভেঙে মনে হল কার নিশ্বাস পড়ছে আমার গায়ে। গায়ে যেন স্পর্শ অনুভব করি—অত্যন্ত লঘু স্পর্শ। অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে দেখি দুটো চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে।

থর থর করে উঠল সমস্ত ভিতরটা। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম না কি করব?

চীৎকার করব? ফিস্ ফিস্ করে বলব—সরে যান—সরে যান। কিছুই পারলাম না। শুধু পাশ ফিরে শুলাম। মুখে যেন ঘুমের ঘোরে বললাম—ঠাকুর!

কাজ হল। সন্তর্পণে সরে গেলেন ওপাশে নিজের জায়গায়। তিনি শুলেন। আমি যেন ঘুম ভেঙে উঠে জল খেলাম। তারপর কাতরাতে লাগলাম—মধ্যে মধ্যে। তিনি বুঝলেন আমি জেনেছি—দেখেছি। আমি সারারাত জেগে রইলাম।

পরদিন রাত্রে দীর্ঘক্ষণ জেগে রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে ছিলাম। আবার ঘুম ভাঙল—মশারিতে টান পড়ে। চোখ মেললাম। মশারির ওপারে মানুষের ছায়া। আমি নড়েচড়ে জানান দিলাম—আমি জেগে আছি। মামীমার কাছ ঘেঁষে গেলাম। সরে গেলেন তিনি।

পরদিন আবার! এ দিন আমি একবারও ঘুমুই নি। দেখলাম তিনি মধ্যে মধ্যে উঠছেন, কিন্তু আমাকে 'জাগন্ত' দেখে আবার ঘুমের ভান করছেন। সেটা ছিল গত-কাল।

আজ সকালে উঠে মনকে বেঁধে ফেললাম। আমি বুঝেছি ওই মানুষটি দিনে ভাল—কিন্তু রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে হার মানেন অন্তরের পশুর কাছে। অসহায় হয়ে যান। কিন্তু আমি উপায়হীনা। আমি জীবনে সংকল্প তো বিচ্যুত হব না। মামীমাকে বললাম। মামীমা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন—হতেই পারে না। তবু তিনি তাঁকে ডেকে বললেন—জয়া এইসব কথা বলছে তোর নামে। এ সত্যি?

মুহূর্তে তিনি যে কাণ্ড করলেন, আমি তা কোনদিন ভাবতেও পারতাম না। মামীমার পায়ের কাছে ব'সে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললেন—তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি মা—এর আমি কিছুই জানি না।

মামীমা বললেন—জয়া!

তিনিই বললেন—ওকে বকছ কেন মা—ও ওর সম্পূর্ণ ভ্রম। ও স্বপ্ন দেখেছে বলেই আমার বিশ্বাস! মা, এই বয়স—এমন হওয়া স্বাভাবিক।

আমি পাথর হয়ে গেলাম দাদা—মনে হল নরকে নেমে যাচ্ছি। পাপ আমার মনের পাপ, পাপ আমার স্বপ্নের পাপ, অন্তরে অন্তরে আমি পাপী—আমি পাপী—আমি পাপী।

এর থেকে কুৎসিত আর কিছু হতে পারে দাদা? মরা উচিত, এরপর আমার মরা উচিত। নয় কি? কিন্তু আমি মরব না। হার আমি মানব না। আমি এবার এ আশ্রয় ছেড়ে পথে হাঁটব। কোথায় তা জানি না। যেমন করে হোক—যেখানে হোক আমি আমার কাজ যোগাড় করে নেব—চলব, আমার সংকল্পের পথে চলব। হয় জিতব। নয় মরব। জিতলে একদিন আপনার কাছে এসে দাঁড়াব। আর চিঠি পাবেন না। তবে আমার জীবন নিয়ে যেন বই লিখবেন। আমি কাল সকালে বের হয়ে পড়ব। ইতি—

জয়া।

*　　*　　*

এই জয়ার শেষ চিঠি।

চিঠিগুলি রেখেই দিয়েছিলাম। সুতপা অর্থাৎ সুরূপার বিচিত্র জীবন-কথা লেখা খাতাখানার খানিকটা পড়তে পড়তে মনে পড়ল জয়াকে। মনের সৃষ্টির সম্মুখে রূপসী সুরূপাকে আড়াল করে এসে একটি শ্যামবর্ণ সাদাসিদে মেয়ে।

তবে ভাল লাগছে কল্পনা করতে তার চোখ দুটি ডাগর। মাথায় চুল আছে অনেক। একটু দীর্ঘাঙ্গী।

সে বললে—সুরূপার জীবন নিয়ে লিখবেন ভাবছেন। আমার কথা? লিখবেন না? আমি জয়া! আমি জানি আমার জীবন আপনাদের সাহিত্যের দরবারে রুচিকর হবে না; বলবেন, হয়তো, আমার জীবন শুকনো। আমার জীবনে প্রেম নেই। আমার জীবনে আমার স্বেচ্ছায় বরণ করা দুঃখ। এ দুঃখে যে জল চোখে আসবে—যদিই আসে সে জল, দুঃখের সূচ ফুটিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে বের করা জল? আজ হয়তো আমার সংজ্ঞাই হবে অস্বাভাবিক। তবু লিখবেন। ক্ষতি কি। না হয়—ছুঁড়ে ফেলেই দেবে রসিকজনে। আমরা মানে আমার মত একগুঁয়ে মেয়েরা তো কোন কালেই শেষ হবে না। কোনকালেই শেষ হবে না। কোন কালে না। রাজ্যসম্পদের লোভেও না। মরণের ভয়েও না।

আমি তাই লিখলাম।

লিখে নিয়ে গেলাম তো সুতপার কাছে। সুতপা আমার হাতে খাতা দেখে সাগ্রহে বললে—লেখা হয়ে গেছে?

বললাম—না সুতপা। অন্য একটা। আর একটি মেয়ের। তারও যক্ষ্মা হয়েছিল। তারটা লিখেছি—তার কাছে আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল। দেখ তো কেমন লাগে? তোমারটা পরে লিখব।

সুতপা খাতাখানা খুলে পড়তে লাগল। বললাম—পড়। কাল আসব।

পরের দিন গেলাম। দেখলাম। দেখলাম, সুতপা খাতাখানা হাতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

বললাম—পড়েছ?

বললে—দুবার পড়েছি।

—তারপর?

—তারপর! আগে শেষ করুন। পথে বের করে দিলেন—এ কি শেষ হ'ল?

আর তো জানি না। কারণ এ তো কল্পনা নয়—এর যে প্রতিটি ছত্র সত্য।

—তবু কল্পনা করুন পথে চলতে চলতে সে দেখা পেলে তার জন্মজন্মান্তরের—হ্যাঁ তা ভিন্ন কি বলব? হ্যাঁ—বলা যায়—তার বাঞ্ছিত জনের—যাকে প্রথমে দেখেই ভাল লাগে। তার সঙ্গে মিলে সে এসেছে আপনাকে প্রণাম করতে।

ঘাড় নাড়লাম।—না। কল্পনা করতে ভাল লাগছে—শেষ-শয্যায় শুয়ে আছে জয়া। আমি খবর পেয়ে গেছি। সে হেসে বলছে—আমি মরছি—কিন্তু আমি হারিনি।

সুতপা বললে—আমার জয়া হতে ইচ্ছে করছে।

বললাম—তাহলে যদি মরতে মরতে জয়া বলে আমার আপসোস হচ্ছে দাদা—

কেন আমি সুতপা হইনি!

সুতপা বললে—না! না!

বললাম—কেন?

সে বললে—জানি না।

গুরুদক্ষিণা

৺শশীভূষণ নিয়োগী—

আমার শিক্ষাগুরু-শ্রেষ্ঠের

স্মৃতির উদ্দেশে-

তারাশঙ্কর

ইংরেজী ১৯১৫ সনের মার্চ্চ মাস।

আমের মুকুল ঝরে গুটি দেখা দিয়েছে। এবার এরই মধ্যে বেশ একটু খরা দেখা দিয়েছে। হাওয়া এলোমেলো হয়ে উঠেছে, মাঠের মাটি ধুলো হয়ে উড়ছে এরই মধ্যে। ধান-কাটা শস্যহীন মাঠখানি বিস্তীর্ণ প্রায় মাইলখানেক হবে, তার উপর পণ্ডিতমশায়ের দেহখানি ভারী। রামজয় পণ্ডিত নিজেই বলেন—দেহ নয় বাপু। ঘৃত দুগ্ধ এবং ভিটামিন-বহুল আতপান্নের ফল যাবে কোথা? তা ভারী হোক—দেহ কিন্তু অসমর্থ নয়, বেশ শক্ত; শুধু উদরখানি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে স্ফীত। পণ্ডিতমশায় বলেন—'ও আমার দামোদরের প্রসাদ'; কখনও শ্লোক তৈরি করে বলেন—'দামোদর প্রসাদেন উদর গিরিগোবর্দ্ধন।' পণ্ডিতমশায়ের গৃহদেবতা হলেন দামোদর। বলেন—যাঁর প্রসাদে উদর তাঁর প্রসাদেই ভরে এবং তাঁর কৃপাতেই সহজেই ওকে বহন করি। ওতে আমার কষ্ট হয় না। শুধু একটু দোলে। বেশ সাধুভাষা করে বলেন—ভূকম্পকম্পিত পর্ব্বতোপম। তাতেও অসুবিধা অনুভব করেন না। কিন্তু পেটের মধ্যে জলরাশি কব্‌কব্‌ করে।

পণ্ডিত ইস্কুলে যাচ্ছিলেন। আজ কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। প্রায় দশটা বাজে। বাবুদের বাড়ীতে গিন্নীমায়ের মানসিক তুলসী দেওয়ার কাজ ছিল। সে কাজ করে, বাড়ীর পুজো সেরে দামোদরের প্রসাদ ভক্ষণান্তে যখন বাড়ী থেকে বের হয়েছেন তখনই তাঁর ছায়াঘড়িতে পৌনে দশটা। সামনে মাঠ ভেঙে গেলে রাস্তা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ—ওয়ান মাইল। মাঠের প্রান্তদেশে একবার থমকে দাঁড়ালেন। মাঠখানার পূর্ব্বসীমানা বরাবর পাকা রাস্তাটা গ্রামের ভিতর হয়ে ত্রিভুজের দুটি বাহুর মত ভঙ্গিতে ইস্কুলের পাশ দিয়ে চলে গেছে। মাঠের ভিতর দিয়ে পায়েচলা পথটা ত্রিভুজের কর্ণরেখার মত ইস্কুলের অনতিদূরে পৌঁছেছে। পথের মাপে অনেকটা কম। কিন্তু পথ কম হলেও পথকষ্ট কম হবে না, কারণ এবারে বসন্তের মাঝামাঝি অকালগ্রীষ্ম উঠছে; মাঠে ধুলোর প্রাবল্য। সর্ব্বাঙ্গ ধুলোয় ভরে যাবে। তার উপরে ভরা উদর, গোবর্দ্ধনগিরি ভারী হয়েছে।

তা যাক। নেমে পড়লেন তিনি মাঠে। না হলে দেরি হয়ে যাবে। এতকাল পর্য্যন্ত কতদিন দেরি হয়েছে। এত কালের ধারাধরণ ছিল আলাদা। নতুন কাল আসছে নতুন ধারাধরণ নতুন নিয়ম-নির্দ্দেশ নিয়ে। আজ বাবুদের বাড়ী তুলসী দিতে গিয়ে তিনি যা শুনে এসেছেন তাতে তিনি কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ইস্কুলের নবকলেবর হবে। কলেবর অর্থে বাড়ীঘরের সংস্কার নয়—আগাগোড়া নিয়মকানুন এবং তার সঙ্গে মাস্টার পণ্ডিত সব বদল হবে।

এ সংসারে একপ্রকার বিদ্যা আছে যাকে বলে গুরুমারা বিদ্যা। গুরুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিদ্যাতেই কুরুক্ষেত্রের দ্রোণের মত ধরাশায়ী হন। সেই গুরুমারা বিদ্যাই এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ম্যানেজিং কমিটি যখন কিছুদিন আগে হঠাৎ পালটে গিয়েছিল তখনই এই ধরণের একটা সন্দেহ তাঁর মনে উঁকি মেরেছিল। ম্যানেজিং কমিটির পুরনো

মেম্বরেরা প্রবীণ মানুষ ভারিক্কি লোক—তাঁরা সরে দাঁড়ালেন এবং চৈতন্যবাবুদের বাড়ীর জনতিনেক সদ্য বি-এ, এম-এ পাসকরা তরুণ ছেলে কমিটির মেম্বর হ'ল। তারা সব হাল আমলের বিদ্যোৎসাহী ছেলে—তাদের নাকি অনেক কল্পনা। তাদের হাতে ইস্কুলের উন্নতি হবে। তারা প্রয়োজনে টাকাকড়ি সংগ্রহ করবে—নিজেরা দেবে! অনেক শিক্ষক বেশ একটুখানি খুশী হয়েছিলেন। হাজার হলেও ছাত্র, অনেক স্নেহ করেছেন, তাদের হাতে গুরুদের অভাব-অভিযোগ অবশ্যই দূর হবে।

পণ্ডিত মাঠে নেমে গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে বার-দুই ঘাড় নেড়ে উঠলেন আপনমনে। মনে মনেই বললেন—হবে। অবশ্যই দূর হবে। গোপনন্দন মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ নয়। এরা হিসেবী গোপনন্দন। লগুড়াঘাতে বুড়ো গরুগুলিকে গোগৃহ থেকে বনে বিচরণ করতে পাঠাবে। চরে খাওগে। অথবা বনের বাঘের উদরে যাওগে।

অবশ্য—; একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। অবশ্য জনকতক শিক্ষকের উপর অভিযোগ অনেকদিন থেকেই আছে। কিন্তু তাই বলে আগাগোড়া বদল! ওই হেডমাষ্টার চন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত! নিজের জন্যে তিনি ভাবেন না। দামোদর আছেন। তার উপর ব্রাহ্মণের ছেড়ে। কানে ফুঁ—শাঁখে ফুঁ—উনোনে ফুঁ তিন মহলা বৃত্তির পাকা বন্দোবস্ত। টোল ছেলে ইস্কুলে হেডপণ্ডিতি এ এক ধরণের কানে ফুঁ, এ যদি যায় তবে শাঁখে ফুঁ অর্থাৎ পুরোহিতগিরি আছে—তাও যদি যায় তো উনোনে ফুঁ অর্থাৎ রাঁধুনী বামুনের বৃত্তি আছে। তাও যদি যায়—যদি দেশসুদ্ধ লোকের হেঁসেলে মুরগী ঢোকে—বাবুর্চ্চি আসে তখন হরি-আল্লা-গড বলে লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে বেড়াবেন। যে যে-নামে ভিক্ষা দেয়! তাও না মেলে তখন দামোদররূপী গোলালো শালগ্রামশিলাটি গলায় ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ফেলবেন। গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হলে খতম; না হয় যদি—গোল মসৃণ দামোদর নালীতে না আটকে চুপ করে গিয়ে উদরে আসন গ্রহণ করেন তবে নিশ্চিন্ত। সেক্ষেত্রে আর যে জীবনে ক্ষিদে লাগবে না এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়। তিনি ভাবছেন তাঁর সতীর্থদের জন্য।

সেকেণ্ড মাষ্টার মৃগাঙ্কবাবু বিরাট পণ্ডিত—যেমন সংস্কৃত তেমনি ইংরেজী তেমনি অঙ্কে দখল; ছোটখাটো মানুষটি বিদ্যের একটি জাহাজ। ওঁর অবশ্য ভাবনা নেই, এমন লোককে যে ইস্কুল পাবে সে-ই সমাদর করে নিয়ে যাবে। শুধু উনি সাহস করে গেলে হয়। ওই সাহসের জন্যই উনি এখানে হেডমাষ্টারী নেন নি। সায়েবের ভয়, ছেলেদের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয়, পোকামাকড় আধিব্যাধি সবকিছুর ভয় তাঁর, ভয়ে অস্থির। শুধু ভয় করেন না ভগবানকে—কারণ তিনি নাস্তিক—ভগবান মানেন না। বিদেশে যান নি ওই ভয়ের জন্য। নইলে উনি কলেজে অধ্যাপক হতে পারতেন। পড়ানোর ধরণটাও তাঁর নাকি কলেজী ধাঁচের। দর্শনের অধ্যাপক হওয়াই তাঁর উচিত ছিল। তবে এবার নিশ্চয় যাবেন। না গিয়ে উপায় কি? তিনিও ব্রাহ্মণ কিন্তু তিনি তো তাঁর মত তিন ফুঁয়ে সমান পোক্ত নন। মৃগাঙ্কবাবুর পক্ষে এটা হয়ত ভালই হবে।

থার্ড মাষ্টার রতনবাবু মহৎ ব্যক্তি। আত্মভোলা পাগল মানুষ। জীবনে হারবার মানুষ নন। ওঁর জন্যেও ভাবনা নাই। বাড়ীতে কিছু জমিজেরাতও আছে।

ফোর্থ মাষ্টার কেষ্টবাবু রতনবাবুরই ভাইপো। কেষ্টবাবু শিক্ষক হিসাবে দুর্লভ শিক্ষক। তার উপর লোকটি পদ্য লেখেন—ইস্কুলের ছেলেদের জন্য বই লেখেন। বই থেকেই কেষ্টবাবু মাসে দেড়শো-দুশো টাকা রোজগার করেন। মাষ্টারী করেন বোধ হয় মাষ্টারী করবার জন্যে। বাড়ীতেও তাঁর ভাল জমিজমা।

ফিফ্‌থ মাষ্টার যামিনী—হেডমাষ্টার চন্দরবাবুর ভাগ্নে। যামিনী আবার এই ইস্কুলের ছাত্র। রোগা শরীর, স্নান করে না, প্রচণ্ড তামাকখোর, দুর্বল মানুষ; ভয় যামিনীর জন্য আছে। যামিনীর কথা মনে হলেই পণ্ডিতের শরীরটা ঘিন ঘিন করে ওঠে। দাঁতে করে অনবরত গোঁফ চিবোয়। গোঁফ ছিঁড়ে তার গোড়াটা চুষে খায়। আর গায়ে যা গন্ধ! নারায়ণ হে! কিন্তু বেচারা যাবে কোথায়?

সিক্‌স্‌থ মাষ্টার গোপাল—এই গাঁয়েরই ছেলে। মাষ্টার ভাল। তা ছাড়া খেলতে পারে। জবরদস্ত শরীর; বল খেলে নাকি খুব ভাল। লাথি মেরে—কিক্ না কি বলে, তাই, মানে ওই কিক্ মেরে বলটাকে একেবারে মুল্লুক পার করে দেয়; একেবারে 'গেরাউণ্ড' পার—ছেলেরা বলে—পগার পার অর্থাৎ সীমানা পার। গোপালও এই ইস্কুলের ছাত্র। ভাল ছেলে, ওর অনেক গুণ; হাতের লেখা ছাপা হরফের মত। দূর থেকে হাতের লেখা বলে চেনা যায় না পর্য্যন্ত। গোপালটাও বড় তামাকখোর। শোনা যায় টেনে কল্কে কাটিয়ে দেয়। আর ওর বাড়ীতে নাকি তামাকের একটা আড্ডা আছে। ইস্কুলের ছেলেরাই নাকি সেখানে গিয়ে তামাক খায়; প্রতি কল্কের জন্যে দু'পয়সা দিতে হয়। ওই পয়সার জন্যেই গোপালের সব গুণ মাটি। ছেলেদের বইয়ে ছাপার হরফের মত হরফে নাম লিখে দিয়ে পয়সা নেয়। ক্লাসে জলছবি বিক্রী করে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বিনামূল্যে নমুনা আনিয়ে সেগুলো চড়া দামে বিক্রী করে। কেউ কেউ বলে, টাকা পেলে গোপাল দু'চারটে কোশ্চেন বলে দেয়। হতভাগা; নেহাত হতভাগা। দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিনাশী বটে, কিন্তু পৃথিবীতে দরিদ্রেরা যত লোভ সংবরণ করে ধনীরা তা পারে না। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কি প্রবৃত্তি! আরে ব্রাহ্মণ ইচ্ছে করেই ধনসম্পদ নেয় নি, কিন্তু দারিদ্র্যের কালিমা কোন দিন তার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে নি। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও দারিদ্র্যকালিমামুক্ত। দারিদ্র্যের অন্ধকার পটে সূর্য্যের মত তার অবস্থান ও অস্তিত্ব। তবে গোপ্‌লা শক্ত ছেলে—নানান কাজে দক্ষ যুবক ও, মাথায় বুদ্ধি আছে, হাতে কৌশল আছে, দক্ষতা আছে, গায়ে ষণ্ডের মত শক্তি আছে—ও আপনার পথ করে নেবে। গোপ্‌লার বুদ্ধির দৌড় বিলাত পর্য্যন্ত খেলে বেড়ায়। বিলাত থেকে গোপাল বিনামূল্যের নমুনা আনায়। ছেলেরা ওর নাম দিয়েছে বিলিতী মাষ্টার। মাঝখানে বিজ্ঞাপন দেখে জরমানী থেকে কোষ্ঠী করিয়ে এনেছে। কোষ্ঠীতে কি আছে কে জানে? পদচ্যুতি? কর্ম্মান্তর? চাকুরি থেকে ব্যবসায়ে ভাগ্যোন্নতি? তাই থাকবে।

মাষ্টার গুনতে এইখানেই শেষ। এর পর পণ্ডিতের পালা। হেডপণ্ডিত তিনি—গোবিন্দ-

পুর-নিবাসী শ্রীরামজয় দেবশর্ম্মা—উপাধি চট্টরাজ। শ্রীমান্ দামোদর প্রভুর চরণাশ্রিত। কাব্যবেদান্ততীর্থ। নিজের জন্য তিনি আদৌ চিন্তিত নন। পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম তাঁর অবশ্যই কাম্য, কিন্তু চণ্ডমতি পুত্র বা শিষ্যের লগুড়াঘাতে ভীত হয়ে তিনি পলায়ন করবেন না। হাতজোড়ও করবেন না।

সেকেণ্ড পণ্ডিত—ড্রয়িং-মাষ্টার শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়—নর্মাল ত্রৈবার্ষিক বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত—সংস্কৃতও জানেন—অঙ্কশাস্ত্র পড়াতে পারেন, চিত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং চট্টোপাধ্যায়ও তাঁরই মত ত্রি-ফুৎকার-শাস্ত্রে পারঙ্গম, সুতরাং তাঁর সম্পর্কেও মাভৈঃ। শুধু একটি চিন্তা আছে—চট্টোপাধ্যায়ের তাঁর মত গিরিগোবর্দ্ধনসদৃশ উদর না থাকা সত্ত্বেও তিনি ঔদরিক। খান বেশী। তা হোক—কাশ্যপগোত্রীয় বিপ্রনন্দন লোভকে সংবরণ করতে পারবেন। হ্যাঁ তা পারবেন।

থার্ড পণ্ডিত—সদ্‌গোপ ঘোষ কুলোদ্ভব—শ্রীমান যতীন্দ্র। যতীন্দ্রও এই ইস্কুলের ছাত্র। এর আগে যতীন্দ্রের দাদা গোপেন্দ্র ছিলেন এখানকার থার্ড পণ্ডিত এবং ড্রিল মাষ্টার। ওই চট্টোপাধ্যায়ের মতই নর্মাল ত্রৈবার্ষিক। অঙ্কশাস্ত্রে নাকি পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। ফাষ্টো কেলাসে পরীক্ষার্থীদের অঙ্ক কষাতেন তিনি। তাঁর আমলেই যতীন্দ্র এখানে এসেছিল ছাত্র হিসাবে। কিন্তু এনট্রান্স পাস যতীন করতে পারে নি। শেষ ওর দাদা পাঠিয়েছিল হুগলী নর্মাল ইস্কুলে। নর্মাল পাস করে দাদার শূন্য পদে বহাল হয়েছে। গোপেন্দ্র ঘোষ চলে গেলেন নিজ গ্রামের কাছের এক মাইনর ইস্কুলে হেডপণ্ডিত হয়ে। যতীন্দ্র সম্পর্কে কি বলবেন? তাঁদেরই হাতের অক্ষমতায় এই দীর্ঘ দশ বৎসরে যতগুলি শিবমূর্ত্তি গড়তে গিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গী তৈরী হয়েছে যতীন্দ্র তাদেরই অন্যতম। এই ইস্কুলের বোর্ডিং থেকে কিশোর বয়সে এখানকার অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ বাবুমহাশয়দের কুলকজ্জল তনয়দের কাছ থেকে জামা-কাপড় সিগারেট চুলকাটা টেরির পাঠ নিয়ে একটি বাবু-মাষ্টারে পরিণত হয়েছে। ছাত্রজীবনে কোন শিক্ষক ওর মাথার মধ্যে ঢুকতে পারত না—এখন শিক্ষকজীবনে কোন ছাত্রের মস্তিষ্কে যতীন ঢুকতে পারে না। গুণের মধ্যে নিরীহ এবং সৎ। বোধ করি সকলের চেয়ে বিপদ হবে যতীনের। ভরসা অবশ্য ওর দাদা। এ অঞ্চলে মাষ্টার পণ্ডিত হিসাবে গোপেন্দ্রের নাম খুব। সম্মানও খুব। দাদা অবশ্যই ভাইয়ের একটা ব্যবস্থা করবে।

ফোর্থ পণ্ডিত—লাষ্ট পণ্ডিত পঞ্চকপর্দ্দক মিশ্র অর্থাৎ পাঁচকড়ি ওরফে পাঁচন মিচ্ছি। মাভৈঃ। পাঁচন পাঁচন নয় খুঁটি। শক্ত ব্যক্তি, কঠিন ব্যক্তি। ভোরবেলা উঠে জমি দেখে আসে। বাড়ী ফিরে গ্রামের জমিদারী সেরেস্তার কাগজ নিয়ে বসে। তার পর স্নান করে গ্রামদেবতার পূজা করে। তৎপর ইস্কুলে আসে। আপাল গোপালদের নিয়ে পড়ে। ইনফ্যাণ্টো কেলাসের শিশুগুলিকে বলে—আপাল গোপাল। মাষ্টারগিরির ষ্টার বাদ দিয়ে বলে—মাষ্টারগিরি নয় আমার মা-গিরি। ব্রজলীলার মা যশোদার কাছে পাঠ নিয়েছি। ছঁচোট খেয়ে পড়লে ধুলো ঝেড়ে তুলতে হয়। দুষ্টুমি করলে উদুখলে বন্ধনভয় দেখাতে হয়। সবচেয়ে মুশকিল হয় ক্ষিদেয় ওদের মুখ শুকোলে। দেখলেই বুঝতে পারি। কিন্তু করি কি? তাও

পকেটে পুজোর প্রসাদী দু'চারখানা বাতাসা থাকে ; শেষ ঘণ্টায় সব থেকে কচি যারা তাদের ডেকে হাতে দিয়ে বলি—যা খেয়ে ঢকঢক করে পেট ভরে জল খেয়ে নে। ইস্কুল শেষ করে আর এক দফা জমিদারী সেরেস্তার কাজ; তার পর সন্ধ্যাবেলা হরিনামের দলে খোল বাজানো। কাজ গেলে পাঁচন গ্রামে প্রাইভেট পাঠশালা খুলে বসবে। পঞ্চকপর্দ্দকের সামনে বৃত্তির পাঁচ মহলার পঞ্চ সিংহদ্বার খোলা।

আর আছে—।

রামজয় পণ্ডিত আপন মনে মাঠের মধ্যে সশব্দে হেসে উঠলেন। আর আছে দাড়িয়াল জেয়াউদ্দিন আহম্মদ। পণ্ডিত বলে—দাড়িয়াল আহম্মক। জেয়াউদ্দিন পণ্ডিতকে বলে—চৈতনওয়ালা তিলকবাজ—উঁপ আপ। দু'জনেই সমবয়সী এবং বাল্যকালের খেলার সঙ্গী। দু'জনের বাড়ীও এক গ্রামে। জেয়াউদ্দিনের বাপ তাঁর বাপের বন্ধু ছিলেন। হজ সেরে এসেছিলেন। আবার মহাভারতে পণ্ডিতলোক ছিলেন। সংস্কৃত জানতেন। আহম্মদও সংস্কৃত কিছু পড়েছে। আহম্মদের জন্য কোন ভাবনা নাই। সকলের চেয়ে সক্ষম সে। মসজিদে আজান পড়ে জীবন কাটিয়ে দেবে সে। ওদের সমাজ ভাল। নিজেদের সমাজের নিন্দে করেন না রামজয় পণ্ডিত, এ সমাজে—এই বিল্বগ্রামের মত হালফ্যাশনের গ্রাম দু'চারখানা ছাড়া অন্য সকল গ্রামেই হরি বলে কি কালী বলে দাঁড়ালে সকল ঘর থেকেই একমুঠো করে চাল মেলে। তা মেলে। আল্লা বলে, 'খোদা মঙ্গল করবেন' বলে দাঁড়ালেও বিমুখ করে না। এটা ঠিক। তবুও আহম্মদদের সমাজে অনুরাগ আরও বেশী। তা ছাড়া আহম্মদ আর একটা জিনিস পারে। উপোস করে থাকলে তাঁরও ঠোঁট শুকোয়—ধরা পড়েন—আহম্মদের তাও পড়ে না, উপোস করে থাকলে আহম্মদ পান খেয়ে ঠোঁট রাঙিয়ে রাখে ; আহম্মদের ঘরে চাল আছে কি নাই ধরা যায় না। ওঃ—দাড়িয়াল আহম্মক—মৌলভী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ—ইয়ার বুজরুক। আহা-হা ভাল ভাল আরবী-ফারসী কথাগুলো সব মনে পড়ছে না! কিন্তু আহম্মদ এতক্ষণ তামাকের ভাণ্ডার শেষ করে রেখে দেবে।

খাওয়ার পর বাড়ীতে সোয়াস্তির সঙ্গে তামাক কোনদিনই খাওয়া হয় না। আজ তো হয়ই নাই। বাবুদের বাড়ী তুলসী দিয়ে বাড়ীর পুজো সেরে দামোদরের প্রসাদ পেয়ে উঠেই দেখেছেন—উঠোনে রোদের দাগে পৌনে দশটা। তালাক সাজা ছিল—মেয়ে বীণা তামাক সেজে রেখেছিল, কিন্তু টানতে গিয়ে ধোঁয়া পান নি। বীণা বোধ হয় সাজবার সময় কল্কের ঠিকরে ঝেড়ে বের করে নি। কাঠি দিয়ে খুঁচতে গিয়ে তাড়াতাড়ির ঠেলায় তামাকসমেত উলটে পড়েছে। হাত খানিকটা পুড়েও গিয়েছে, টুকরো আগুন হাতের উপর পড়েছিল। পণ্ডিত রাগ করে হুঁকো কল্কে নামিয়ে দিয়ে উড়নি চাদরখানা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রেষ্টোরুমে কেষ্টধনের হাতে সাজা তামাক খাবেন। ইস্কুলের চাকর কেষ্টধন। চৈতন্য ইনষ্টিটিউশনের আদিকাল থেকে আছে। বোর্ডিঙেও চাকরি করে। কেষ্টধন তাঁর জন্যে এবং ওই দাড়িয়াল আহম্মদের জন্যে এক ছিলিম করে ভাল তামাক যোগাড় করে রাখে। খাস

কাষ্টগড়ার সুগন্ধিযুক্ত তাম্রকূট। যোগাড় করে বোর্ডিঙের বাবুনন্দনদের কাছে। ওঁরা দু'দশ জন চিরকালই আছেন। এক যান—অন্য আসেন। কেউ চার বছরের পাঠ আট বছরেও শেষ করতে পারেন না। কেউ চার-পাঁচ বছর থেকেই চলে যান। কেউ ইস্কুল বদল করেন কেউ ছেড়েছুড়ে বাড়ী ফেরেন; অবশ্য তার আগেই হয় বিবাহ। কেষ্ট তাঁদের তামাক সেজে ফাইফরমাস খেটে বাড়তি কিছু উপার্জ্জন করে—ফাউ পায় দু'তিন ছিলিম তামাক। তাই সে তাঁদের খাওয়ায়। তামাক সেজে টিকে ভেঙে উপরে চাপিয়ে রেখেছে কেষ্ট। গেলেই অগ্নি-সংযোগ করে দেবে। আঃ, মাঠটা আর ফুরোয় না। গায়ের উড়নিটা ভিজে গেছে। পায়ের চটির মধ্যে ধুলো কাঁকর ঢুকেছে একরাশ। বগলের ছাতাটা বগলেই আছে খোলেন নি। ছাতায় বাতাস টানবে—জোরে হাঁটা যাবে না।

আঃ—এইবার মাঠের শেষ। এতক্ষণে কোণাকুণি মাঠ ভেঙে পাকা রাস্তায় উঠে পণ্ডিত হাঁফ ছাড়লেন। পাকা রাস্তার এইখান থেকেই দু'পাশে চৈতন্যচরণ বাবুর কীর্ত্তি। কাজল-কালো জলে টলমল বাঁধা ঘাট শ্যামসায়র দীঘি, বাগান, কাছারি, বোর্ডিং-ইস্কুল, গেষ্ট-হাউস, থিয়েটারবাড়ী, তার ওদিকে রাধাসায়র—তার ওপাশে দাতব্য চিকিৎসালয়। কীর্ত্তিমান চৈতন্যবাবু চিরজীবী। কিন্তু তাঁর সকল কীর্ত্তির মূল কীর্ত্তি এবং প্রথম কীর্ত্তি এই ইস্কুল। চৈতন্য ইন্‌ষ্টিটিউশন। চৈতন্য ইন্‌ষ্টিটিউশনের গোড়া থেকে আছেন চন্দ্রবাবু।

পণ্ডিত গিয়ে নামলেন—শ্যামসায়রের বাঁধাঘাটে। হাত পা মুখ ধোবেন। প্রকাণ্ড প্রশস্ত ঘাট; ঘাটে আজ লোকজন নাই। অন্যদিন চীৎকারে-ঝঙ্কারে-উল্লাসে-কলরবে-লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপিতে শ্যামসায়রের জলে যেন সমুদ্রমন্থন চলে। বোর্ডিঙের ছেলেরা স্নান করে। আজ ছেলেদের স্নান হয়ে গিয়েছে।

ওঃ, তা হলে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মার্চ মাস—ফাগুনের শেষ। মকরসংক্রান্তি থেকে সূর্য্য ফিরে চলেছেন বিষুবরেখার দিকে; সপ্তাশ্ববাহন বেশ জোরে ছুটেছেন; আন্দাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাজল ক'টা? কেষ্টধনের তাম্রকূট সেবন এবং হেডমাষ্টার চন্দ্রভূষণের সঙ্গে দেখা করে নিরিবিলিতে কথা ক'টা বলা হবে তো? চন্দ্রভূষণকে প্রস্তুত করে রাখতে হবে। সে হয়ত শুনেছে জেনেছে, কিন্তু তাঁর কর্ত্তব্য তাঁকে করতে হবে। বলতে হবে যা শুনেছেন।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তাটা চলে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে। বিল্বগ্রামের বাজার হয়ে চলে গেছে। রাস্তার দক্ষিণ গায়ে চৈতন্য ইন্‌ষ্টিটিউশন; ইস্কুল বোর্ডিং একসঙ্গে—একটা চতুষ্কোণ বিশাল উঠোনের চারিদিকে গড়ে উঠেছে। রাস্তার দিকটায় মাঝখানে একটা কাঠের ফটক—তার এক পাশে ইস্কুল, এক পাশে বোর্ডিং। বোর্ডিঙের সামনের ঘরটিতে পীঠরক্ষক ভৈরবের আটনের মত হেডমাষ্টার চন্দ্রভূষণের ঘর। আজ ন' বছর এই ঘরটিতে তিনি আছেন। ঘরখানির সামনে একফালি বারান্দা, তার উপর একখানি তক্তপোষ, খানদুই চেয়ার। আজও পর্য্যন্ত প্রত্যহ রামজয় পণ্ডিত ঢুকবার সময় দেখেছেন চন্দ্রভূষণ ঘরের মধ্যে

পোশাক পরছেন বা পোশাকপরা শেষ করে বেরিয়ে আসছেন। কোন দিন দরজাটা ভেজানো থাকে, কোন দিন ভেজানো দরজা খুলে চন্দ্রভূষণ বেরিয়ে আসেন। চোখাচোখি হলেই একটু হেসে মৃদুস্বরে বলেন—তাম্রকূট?

রামজয় হেসে বলেন—গুরবে নমঃ। তাঁর নির্দ্দেশ করি কি বল?

পিছনে বাল্যস্মৃতি আছে। রামজয় আর চন্দ্রভূষণ পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা। বয়সে এক—বাল্যসাথী তাঁরা। একসঙ্গে পড়েছেন একই পাঠশালায়। সে পাঠশালার গুরু ছিলেন চন্দ্রভূষণের বাবা ভুজঙ্গভূষণ দত্ত। রামজয়ের বাবা বিশ্বজয় চট্টরাজের ছিল পৈতৃক টোল। টোল তখন সদ্য সদ্য ইংরেজীর চলন হওয়ায় টাল খেতে সুরু করেছে। বিশ্বজয় পণ্ডিত টোল ছাড়েন নি, কিন্তু টোলের চেয়ে ভাগবত কথকতা এবং গুরুগিরিতে বেশী নজর দিয়েছেন। সেই কারণেই ছেলেকে বন্ধু ভুজঙ্গের পাঠশালায় দিয়ে বলেছিলেন—ভুজঙ্গ, তুমিই ওর প্রথম গুরু হও। তার পর যা হয় করা যাবে।

হঠাৎ একদিন জেয়াউদ্দিন পাঠশালায় এল। মলমলের টুপি—বুটিদার পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে আহম্মকের সে কি শোভা! তার উপর গায়ে তামাকের খোশবু। পাঠশালার ছেলেরা ভেবেছিল—গন্ধটা আতরের। আহম্মক বলেছিল—এতরের না, তামকুলের খোশবু। পাকিটে একছিলম তামকুল নিয়ে এসেছি। পণ্ডিতের ছিলম নিয়া খাব। তিন ওয়াক্ত তামকুল না খেলে মেজাজ দিল ঠিক থাকে না। আমার নানার হুকুম আছে।

নানার ভিটেতেই আহম্মকের বাস ছিল। আহম্মকের মা বাপের এক মেয়ে। নানা ছিলেন সে আমলের আমীর মানুষ। এককালে না কি এ অঞ্চলের নবাব ছিলেন ওঁরা। তখন অবশ্য সর্ব্বস্বান্ত। থাকবার মধ্যে ভাঙা বাড়ী, মসজেদ আর কিছু সামান্য নিষ্কর। জেয়াউদ্দিনের বাপ ছিলেন সাধুমানুষ। আরবী ফারসীতে এলেম—সংস্কৃতে জ্ঞান; তেমনি রসিক মানুষ। আহম্মকের নানাদের প্রতিষ্ঠিত মক্তব ছিল—সেই মক্তবের মৌলবী সাহেবের ছেলে। ছেলে দেখে আহম্মকের নানা জামাই করেছিলেন। সে অনেক কথা। সে কথা থাক। তামাকের কথায় মন যে কোথায় চলে গেছে! মহাভারত মনে পড়ে গেল পণ্ডিতের! —'মনঃ শীঘ্রতরং বাতাৎ, বায়ুর চেয়েও মন শীঘ্রতরগতি!

কিন্তু থাক মহাভারত! বায়ুর চেয়ে শীঘ্রতর গতি মন আবার তাঁর ফিরে এল ওই চন্দ্রভূষণের সঙ্গে বিজড়িত বাল্য-স্মৃতিতে। 'ওই গুরবে নমঃ' প্রসঙ্গে। জেয়াউদ্দিন সেদিন খোশবু মাখানো তামাক এনেছিল এবং সেই লোভেই চন্দ্রভূষণ ও রামজয় উভয়ে জেয়াউদ্দিনের সঙ্গে সেই প্রথম তামাক খেয়েছিলেন। তামাক খেয়ে তারপর হয়েছিল ভয়। ভুজঙ্গ দত্ত কঠোর লোক ছিলেন। তামাক তো তামাক, পান পর্য্যন্ত খেতেন না। বৈষ্ণবমানুষ গলায় মালা, কপালে তিলক, টাকপড়া মাথাতেও টিকি ছিল তাঁর, বিনয়ের অবতার কিন্তু পাঠশালাতে সাক্ষাৎ রুদ্র। তাই তামাক খেয়ে নেবুর পাতা কলার পাতা চিবিয়েও শুকনো মুখে পাঠশালায় এসে ভয়ে কাঁপছিলেন। ভুজঙ্গ দত্ত ছিলেন ট্যারা। কোন্ দিকে যে তাকিয়ে থাকতেন সে বুঝবার শক্তি দেবতারও ছিল না—কুতো মনুষ্য। সেই ট্যারা চোখের দৃষ্টিতে চন্দ্র এবং

রামজয়ের ইশারা করা ধরে ফেলে—তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে তাঁদের ডেকেছিলেন।

—এদিকে এস। তোমরা। রাম আর চন্দ্র।

অতঃপর আর কি!—দুই কানে ধরে চন্দ্রকে টেনে আকাশে তুলে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। তার পর রামজয়ের কানের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। রামজয় ধাঁ করে দুই হাতে কান ঢেকে বলে উঠেছিলেন—গুরুর কান। মা-পিসী-মাসীদের কাছে শেখা কথাটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ভুজঙ্গ পণ্ডিত যিনি নাকি পাঠশালায় সাক্ষাৎ রুদ্র—তিনিও কথাটা শুনে হেসে ফেলেছিলেন—হাতও সরিয়ে নিয়েছিলেন। মাথার চুল ধরে টেনে বলেছিলেন—কান গুরুর। তা তামাকও কিন্তু গুরুর প্রসাদ? তামাক খেতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন গুরু? সেই অবধি চন্দ্র তামাকের ত্রিসীমানায় আর যায় নি। কিন্তু রামজয় আর তামাক ছাড়তে পারেন নি। এই কারণেই চন্দ্রবাবু যখন মৃদু হেসে তাঁকে প্রশ্ন করেন—তাম্রকূট?

পণ্ডিত মৃদু হেসে বলেন—গুরবে নমঃ।

বলেই হন্‌হন্ করে চলে গিয়ে ওঠেন মাষ্টারদের রেষ্টো রুমে।

ভিতরে বিশাল প্রাঙ্গণ—তার উত্তর দিকে ইস্কুল এবং পুরনো বোর্ডিং; পূব দিকে পাকশালা—দক্ষিণ দিকটায় অর্দ্ধেকটা ফাঁকা, অর্দ্ধেকটায় নতুন বোর্ডিং। পশ্চিম দিকটায় ছোট দু'কুঠরি একটা রাণীগঞ্জের টালিছাওয়া ঘর। বিরাট উঠানটা মাপে বোধ করি কাঠা পনের জমি হবে। তার মাঝখানে বড় কুয়ো, শান-বাঁধানো চত্বর, তার পাশে পশ্চিম দিকে ছেলেগুলোর কসরতের আখড়া, ছেলেগুলো দোল খায়, নানা রকমের দোলন। পণ্ডিত বলেন মল্লভূমি। পণ্ডিত এসবের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে চলেন নতুন বোর্ডিঙের একেবারে পূর্ব্বদিকের ঘরে। এই ঘরেই মাষ্টারদের রেষ্টো রুম। ও ঘরে থাকে বোর্ডিঙের এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ঘোষবংশজ শালপ্রাংশু মহাভুজ বৃষস্কন্ধ প্রশস্তটাক চকচকে মস্তক গজদন্ত ব্যাঘ্রবিক্রম শ্রীনকুলচন্দ্র ঘোষ। ছেলেরা বলে ডেভিড হেয়ার। নকুলচন্দ্রের চেহারার সঙ্গে ওই ডেভিড হেয়ার নামক ইংরেজ শিক্ষাবিদের চেহারার আশ্চর্য্য মিল আছে। সে মিল তিনি নিজে মিলিয়ে দেখেছেন এবং ছেলেগুলোর দৃষ্টিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। চন্দ্রবাবুর মত গম্ভীর ব্যক্তিও মুচকি হেসে বলেছেন—ডেভিলস! কিন্তু মিল ঠিক বের করেছে। ওদের চোখে পড়ে কি করে? ওই ডেভিড হেয়ার নকুল ঘোষের ঘরের এক কোণে সারি সারি হুঁকো-কল্কে এবং তামাক-টিকে সাজানো থাকে। কেষ্টোধন তামাক সেজে দেয়। এ ঘরে বসেন পঞ্চকপর্দ্দক, শম্ভু চাটুজ্জে, আহম্মক আর তিনি। যামিনী, যতীন, গোপাল এরা তিন জনে এই স্কুলের ছাত্র, তাদের আড্ডা যামিনী এবং যতীনের ঘরে। থার্ড মাষ্টার রতনবাবু তামাক খান না, তামাক দূরে থাক পানও খান না, তিনি এসে সটান গিয়ে বসেন লাইব্রেরীতে অথবা আপন খেয়ালে পায়চারি করেন কিংবা বোর্ডিং কম্পাউণ্ডের নৈর্ঋত কোণে মুচকুন্দ চাঁপা গাছটার তলায় আসন পেতে বসেন। ফোর্থ মাষ্টার কেষ্ট পাল নিজের ঘরেই থাকে—কেষ্ট পালও তামাক খায় না কিন্তু সে তামাক আনিয়ে রাখে—ওর ওখানেই সেকেণ্ড মাষ্টার

মৃগাঙ্কবাবুর আড্ডা। মৃগাঙ্কবাবু তামাকখোর হিসাবে—ভেটারন না কি বলে—তাই। চোখ বুজে তামাক খান আর কেষ্ট পালের সঙ্গে বাঁজা তর্ক করেন; পাল বলে—ভগবান নাই এ কথা আপনি কি করে বলেন?

মৃগাঙ্কবাবু মৃদু মৃদু হাসেন, তার বাঁ পাখানি নাচতে সুরু করে, তিনি বলেন—আমি তাঁর জন্য দুঃখিত হতে পারলেও খুশী হতাম কেষ্টবাবু, কিন্তু তাও হবার উপায় নাই—কারণ আদপেই যা নাই তার জন্য দুঃখিত হই কি করে?

ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত তিন ভাষাতে মৃগাঙ্কবাবু ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন। মৃগাঙ্কবাবুর রঙ কাঁচা সোনার মত—সে রঙ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যেন কাঁচা সোনায় আগুনের আঁচ লাগে।

পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে দাঁড়ান, মৃগাঙ্কবাবু যেদিন সেই মুহূর্তে সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান সেই দিন দাঁড়ান। নইলে সটান চলে যান নকুল ঘোষের গুহায়। বাইরে থেকেই হাঁকতে থাকেন—কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর।

কেষ্ট ঘর থেকে সাড়া দেয়—আজ্ঞে পণ্ডিতমশায় তামাক রেডি।

—রেডি! জয়জয়কার হোক কেষ্টধন, ওরে তোর জয়জয়কার হোক। বধূমাতার পুত্র-সন্তান হোক, শ্যামলী-ধবলীর বকনা বাছুর হোক, পুকুরে মৎস্যকুল বৃদ্ধি পাক। তোর জমির উপর পুষ্কর মেঘের আবির্ভাব হোক। ওদিকে রান্নাশালে কলরব করে ছেলেরা:— ভাত—ভাত আন ঠাকুর। ভাত!

—ডাল দাও। ভাত না ভিজলে খাব কি করে?

—তরকারি। খাব কি দিয়ে?

—নুন, নুন।

ছেলেগুলোর মধ্যে একটা দুর্দ্ধর্ষের দল আছে। চন্দ্রবাবু হাসেন এবং বলেন—ডেকইটস! পণ্ডিত বলেন—পবননন্দনের খুড়তুতো ভাই। মানে হনুমান আর ভীমের। ওরা চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে। ওই বাবুনন্দনদের মত এক দল যাবে এক দল আসবে। ওদের স্থান খালি নাহি রবে। ষাট-পঁয়ষট্টি জনের মধ্যে ওরা কখনও দশে ছয়-সাত, কখনও দশ-বারো, এর বেশী নয়। ওরা পাশাপাশি বসে বালতি দরুনে ভাত খাবে। এক-এক জনে তিন-চার বালতি; এবং ঠাকুরকে হাতজোড় করিয়ে বলাবে—আর ভাত নাই। ওদিকে তখনও দশ-বারো জন খেতে বাকী। বিশ-ত্রিশ জন—আরও দু'মুঠো ভাত নেবার জন্যে বসে আছে। ওরা তখন হৈ চৈ করবে—না খেয়ে ইস্কুলে যাব কি করে? নকুল ঘোষ ছুটবে।—চাপাও, আবার হাঁড়ি চাপাও! ঠাকুর! চাপিয়ে দাও হাঁড়ি! দুর্দ্ধর্ষেরা বসেই থাকবে। ভাত হবে—সেই ভাত খেয়ে তবে উঠবে। বকরাক্ষসের কিল চড় লাঠি ঠেঙা খেয়েও ভীম পায়েসের গামলা ছাড়ে নি—ভীমের খুড়তুতো ভাইয়েরাও শূন্য পাতা ছেড়ে ওঠে না। চন্দ্রবাবু এসে তখন দাঁড়াতে বাধ্য হন, বলেন—গেট আপ ওঠ ওঠ! তাড়াতাড়ি কর! নো মোর ভাত। আর না!

ওদিকে তখন রেষ্টোরুমে আহম্মদ এবং তাঁর মধ্যে সুরু হয় বাগ্‌যুদ্ধ। কে আগে কল্কে

পাবে। কেষ্ট ধূমায়িত কল্কে হাতে হাসে। অন্য পণ্ডিতেরাও হাসেন।

আহম্মদ পণ্ডিতকে বলে—তিলকধারী টিকিবালা ব্রহ্মদৈত্যাচার্য্য বাম্‌না।

পণ্ডিত ওকে বলে—দাড়িয়ালো কচ্ছহীনো—আহম্মক মামদো খাঁ।

ও বলে—তুই আগে তামাক খাবি কি? ওরে বাম্‌না! আমার কাছে তুই খেতে শিখলি।

পণ্ডিত বলে—ওরে মামদো সেইজন্যেই তো। তামাক খাবার গুরু তুই। দাড়িয়াল হতভাগা তোর মঙ্গলের জন্যেই তো বলি—আগে আর পরে নয়—তুই তামাক খাস নে। একেবারেই খাস নে!

—ক্যানেরে বেহ্মদৈত্যি? ক্যানে?

—ওরে মামদো, রোজ রোজ কত বলব? তুই মরে কবরে যাবি কি না?

—যাব।

—আমি মরে চিতেয় পুড়ব কি না?

—পুড়বি। ওরে বামনা তোর চিতে রাবণের চিতার মতুন চিরকাল জলবে। নিববে না।

—না নিবুক। সেই আগুনে আমি তামাক সাজব আর খাব। বুঝলিরে দাড়িয়াল। কিন্তু তুই যাবি কবরে। বল মামদো মাটির ভিতর আগুন কোথা পাবি? ওরে মামদো তোর পেট ফুলে ঢোল হবে। মাটির ভিতর থেকে তামাক তামাক একটান তামাক বলে চেল্লাবি!

প্রথম প্রথম আহম্মদ দমে যেত। উত্তর খুঁজে পেত না। আজকাল উত্তর খুঁজে পেয়েছে। ফোর্থমাষ্টার কেষ্ট পাল ভূগোল পড়ায়—তার উপর লোকটা লিখতে পারে—বই লেখে; কেষ্ট পাল বলে দিয়েছে—মৌলবী সাহেব মাটির ভিতর আগুন আছে। আগ্নেয়গিরি তার প্রমাণ। আপনি সেখান থেকে আগুন নিয়ে তামাক খাবেন। ভয় কি?

পণ্ডিত হেসে বলেন—তবে খা।

পঞ্চকপর্দ্দক, শম্ভু পণ্ডিত, নকুল ঘোষ হাসে। নকুল ঘোষের বড় বড় দাঁত দুটি সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে পড়ে,—ঘোষ টাকে হাত বুলোয় এবং জুতসই একটি কথার ফোড়ন খোঁজে।

আজ পণ্ডিত ফটকের ভিতর ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। কৈ? চন্দ্রভূষণ কৈ? বারান্দায় কেউ নাই। ঘরের দরজায় তালা বন্ধ। কোথায় গেল চন্দ্র?

ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই ডান দিকে পশ্চিম পাশে ইস্কুল-বাড়ীর পূর্ব প্রান্তের একখানা ঘরের ভিতর থেকে একটি কিশোর-কণ্ঠের কয়েকটি কথা তাঁর কানে এল।

—না স্যর, এ কথা শুনি নি স্যর!

—শুনিস নি? সত্যি বলছিস শুনিস নি? না, আমাকে সে কথা বলতে তোর লজ্জা হচ্ছে? আমাকে ছাড়িয়ে দেবে।

—না স্যর। শুনলে নিশ্চয় বলতাম।

এই তো, এইটেই তো হেডমাষ্টারের আপিসঘর, পাশে দক্ষিণ দিকে লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর জানালাগুলো খোলা রয়েছে। খোলাই থাকে। ন'টার সময় কেষ্ট ঝেড়ে-মুছে জানালা খুলে রেখে যায়। হেডমাষ্টারের আপিসের জানালাও খোলা থাকে। আজও বন্ধ নেই—তবে আধখোলা, না—তার চেয়েও কম খোলা। চন্দ্র জানালাটা ভেজিয়ে দিয়ে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। গলার স্বর শুনে মনে হ'ল—সেকেণ্ড ক্লাসের শিবনাথ। এই গ্রামেরই বাঁড়ুজ্জে বাবুদের বাড়ীর ছেলে। ছেলেটি পড়াশুনায় অমনোযোগী কিন্তু বুদ্ধিমান—মর্য্যাদাবান ছেলে। এ ছাড়াও আরও একটা কি আছে ছেলেটার মধ্যে। ধরা যায় না ঠিক বোঝা যায়, কিন্তু একটা কেমন বিচিত্র স্পর্শ লাগে। ঘুমের ঘোরের মধ্যে স্পর্শের মত—কার স্পর্শ, কিসের স্পর্শ বোঝা যায় না কিন্তু ঘুমের মধ্যেও চেতনা সজাগ হয়। গ্রামের ছেলে, চৈতন্য-বাবুদের বাড়ীর প্রায় পাশের বাড়ীর ছেলে—বোধ করি সেইজন্যেই তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে কথাটা জেনে নিচ্ছে। জানালা ভেজিয়ে দিয়েছে, কেউ যেন না দেখতে পায়। রামজয় পণ্ডিত ভুলে গেলেন স্থানকালপাত্রের বিচার। ভুলে গেলেন ইস্কুলের আপিসে চন্দ্রভূষণ হেডমাষ্টার—তিনি হেড পণ্ডিত। ভুলে গেলেন ঘরে শিবনাথ ছেলেটি রয়েছে। ভুলে গেলেন তামাক খাওয়া হয় নি। তিনি ডাকলেন—চন্দ্রভূষণ! চন্দর!

বগলের ছাতাটার ডগাটা দিয়ে ভেজানো জানালাটা খুলে দিলেন।

চন্দ্রভূষণ তাকালেন। উঃ, চন্দ্রের মুখের কি চেহারা হয়েছে! মাত্র এক দিনে! শনিবার যাবার সময়ও চন্দ্রভূষণ সহজ মানুষ ছিল। গম্ভীর সতেজ দৃঢ়। আজ মুখে রেখা পড়েছে। চুলগুলিও কি বেশী পেকে গেছে?

চন্দ্রভূষণ হাতের ইশারায় শিবনাথকে যেতে বললেন। রামজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—রামজয় এখানে এস! একটি ম্লান হাস্যরেখা তাঁর পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামজয় পণ্ডিত শিবনাথ ছেলেটি চলে যেতে দরজাটি ভেজিয়ে দিলেন, ছাতার ডাঁট দিয়ে ঠেলে খোলা জানালাটিও বন্ধ করে দিলেন। তারপর চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

চন্দ্রভূষণ তাঁর বাল্যসাথী—পাঠশালার সহপাঠী, কিন্তু কর্ম্মজীবনে তিনি চন্দ্রভূষণের অধীন সে কথা ভুলে যান না। যখন তুমি সম্বোধন করে দুটো প্রাণের কথা বলবার বাসনা হয় তখন এই ভাবেই দরজা বন্ধ করে প্রথমেই একটু হেসে নিয়ে কথা শুরু করেন। চন্দ্রবাবুও হাসেন। তার পর বলেন—কি? হাতে বই বা কলম যাই থাক সেটা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসেন।—কও, কি বার্ত্তা?

আজ কিন্তু রামজয় হাসলেন না, চন্দ্রবাবুও না। হাসা দূরের কথা, চন্দ্রবাবু রামজয়ের মুখের দিকে তাকাতেও পারলেন না। প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে সামনের দেওয়ালে টাঙানো

চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবুর অয়েল-পেন্টিঙের দিকে চেয়ে রইলেন।

পণ্ডিত বললেন—আমি শুনেছি সব।

—শুনেছ? কোথায়? কার কাছে?

—বাবুদের বাড়ীতে তুলসী দিতে গিয়েছিলাম। পূজুরী ঠাকুর বললে—পণ্ডিতমশায় আপনাদের ইস্কুলের নাকি ভারি গোলমাল? সব—মানে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সব ওলোট-পালট? সব জবাব হয়ে নাকি নতুন মাষ্টার আসছে? জিজ্ঞাসা করলাম—কে বললে? তো বললে—এলনই তো শুনছি—কাছারিতে সব গুজগাজ ফিসফাস হচ্ছিল। ম্যানেজার বাবুর কাছে নাকি চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে।

চন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন—ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা কর নি?

—হ্যাঁ। তাও করেছি।

—কি বললে ম্যানেজার?

—ভাঙলে না। তবে বললে—পুরনো মাষ্টারের জবাব নতুন মাষ্টার বহাল এ সবের কথা কিছু নাই পণ্ডিতমশায়—শুধু লিখেছেন—মাষ্টারদের জন্যে বাসাবাড়ী চাই। ছ'সাতটা বাড়ী দেখে রাখতে হবে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। পাকা উঠোন—পাকা মেঝে স্নানের ঘর চাই।

চন্দ্রবাবু হাসলেন—পাকা মেঝে স্নানের ঘর! সে তো আমাদের জন্যে নয় রামজয়। কথা ঠিকই বটে। আমিও চিঠি পেয়েছি। ওতেও তাই আছে। কলকাতায় মাষ্টার-পণ্ডিত ঠিক হয়ে গেছে।

রামজয় টেবিলের উপর থেকে হাতপাখাখানা তুলে নিয়ে বাতাস খেয়ে নিলেন বারকয়েক—তারপর বললেন—কে লিখেছে?

—বেনামী চিঠি। কোন এক্স্-স্টুডেন্ট বোধ হয়। এঁদের আপিসে তো অনেক এক্স্-স্টুডেন্ট রয়েছে।

—শ্যামাপদ নয়? ওই রমেন্দ্রবাবুর খাস কেরানী—প্রাইভেট সেক্রেটারী না কি তোমরা বল।

—না। তার হাতের লেখা তো চেনা। কলকাতার সব চিঠি তো সে-ই লেখে। তার লেখা নয়। আর সে লিখবে না। নাঃ, সে লিখতে পারে না।

—কি লিখেছে? সব জবাব?

—একরকম তাই। লিখেছে আগাগোড়া বদল হবে। ওখানে কর্ত্তাদের তিন-চারটে গোপন মিটিং হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক মাস্টার-পণ্ডিতের দোষত্রুটি নিয়ে প্রকাণ্ড বড় ফিরিস্তি তৈরি হয়েছে। খোদ ডিভিশনাল ইনস্পেক্টার অব স্কুলস মাষ্টার পছন্দ করে দেবেন। আসল ব্যাপার হ'ল রামজয়—ইস্কুলের গ্র্যাণ্ট-ইন্-এড বেড়েছে। আশী টাকা থেকে তিনশো টাকা। এক বছরের টাকাটা একেবারে হাতে আসবে। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট সর্ত্ত দিয়েছে—ছেলেদের মাইনের হার বাড়াতে হবে। ওদিকে মাষ্টারদের মাইনে বাড়বে।

আমরা যারা এতকাল কম মাইনেতে কাজ করে এসেছি তাদের মাইনে কি করে বাড়াবে বল ?

চন্দ্রবাবু একটু হাসলেন।

—তা বটে। পণ্ডিত বললেন—মেধোকে মাধব বলা যায় কি করে। হাজার টাকা পণই বা দেয় কি করে ? আর মেয়েই বা প্রণাম করে কি করে ? আমাদের হরি মুখুজ্জের কন্যের বিবাহ—হাজার টাকা পণ, পাত্র দ্বিতীয় পক্ষ, প্রথম পক্ষের পরিবারের উপর রাগ করে বিয়ে করছে, তাকে নেবে না ; বিয়ের লগ্নে পাত্র এল না, খবর এল—সে মেয়ে দু'হাজার টাকা আঁচলে বেঁধে স্বামীর ঘরে এসে চেপে বসেছে। তখন কি হয় ? গ্রামে ছিল মাধব বাঁড়ুজ্জে, গরীবের ছেলে—খেটেখুটে খায়, বাড়ীতে বিধবা মা, সে বেচারী পাঁচজনের ক্রিয়াকর্ম্মে রান্নাবান্না করে দেয়। সেই মাধবকে এনে লগ্ন রক্ষে হ'ল, বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পর মুশকিল হ'ল—মেয়ে বলে—বিয়ে হয়েছে, হয়েছে—ওকে পেনাম করব কি করে ? বাপ বলে—তাই তো—মেধোকে মাধবই বা বলব কি করে ? বাবাজীই বা মুখে বেরোয় কি করে ? আর হাজার টাকা পণ মেধোকে দেব কি বলে ?

চন্দ্রবাবু হাসলেন—এবারের হাসিতে ছিল প্রাণের স্পর্শ। বললেন—শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটা মাধবের ঘর করেছে তো রামজয় ? কোন্ মাধব বল তো ?

—সে তুমি চেন না। হরি মুখুজ্জে আমাদের শিষ্য। শ্রীপুর বাড়ী। তা মাধব হার মানে নি। বুঝেছ। ছেলেটার জেদ চেপে গেল। বউকে ফেলে চলে গেল। বললে—বউ প্রণাম করবে, শ্বশুর বাবাজী বলে হাতে ধরে বসাবে, ওই হাজার টাকা পণ দেবে, শাশুড়ী মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত দেবে—তবে আমার নাম মাধব বাঁড়ুজ্জে। চার পাঁচ বছর পর ফিরল মেধো মাধব হয়ে। জামা, জুতো মায় বুকে চেনঘড়ি ঝুলিয়ে। ভূষি মালের কারবার করে ফেঁপে উঠেছে। এসে গাঁয়ে জমি কিনলে—পুকুর কিনলে। তখন আর শ্বশুর এসে বাবাজী বলে হাত না ধরে পারলে না। মেয়েও পাঠালে। মেয়েটাও প্রণাম করলে। শাশুড়ী মাছের মুড়ো রান্না করে জামাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেও। সবই হ'ল। কিন্তু হাজার টাকা পণ আর হরি মুখুজ্জে দিলে না। বললে—ওটা আর ভুলে যাও এত দিন পর। মাধব কিছু বললে না। কিছুদিন পর ছেলে হ'ল। ছেলেটা বছর-খানেকের হলে তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে মাধব বউকে শ্বশুরবাড়ীর দোরে এনে নামিয়ে দিয়ে বললে—হাজার টাকা নিয়ে আমার বাড়ী যাবি, নইলে থাকবি এখানে। ব্যস—ওই বলেই মাধব উধাও, একেবারে ব্যবসার জায়গায়। শেষে হরি মুখুজ্জে জমি বিক্রি করে হাজার টাকা নিয়ে মেয়ে ঘাড়ে করে মাধবের বাড়ী গিয়ে বললে—বাবাজী এইবারে ক্ষান্ত দাও।

চন্দ্রবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। ঘরে এসে ঢুকলেন মৃগাঙ্কবাবু সেকেণ্ড মাষ্টার। তাঁর সঙ্গে কেষ্টবাবু ফোর্থ মাষ্টার। পাশের লাইব্রেরী এবং জেনারেল আপিস ঘরে আরও অনেকগুলি পায়ের শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল। চন্দ্রবাবুর বুঝতে বাকী রইল না যে, খবরটা শুনতে কারুর আর বাকী নেই। তিনি মৃগাঙ্কবাবুকে সম্ভাষণ জানিয়েই

বললেন—বসুন।

ভীরু প্রকৃতির মানুষ মৃগাঙ্কবাবু। এর মধ্যেই আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে গিয়ে দু'বার চেয়ারের হাতলে কাছার কাপড় জড়িয়ে ফেললেন। কোন রকমে ছাড়িয়ে আসন পরিগ্রহ করে বললেন—কি সব শুনছি মাষ্টারমশাই? এ সকল কি সত্যি?

চন্দ্রবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন, উত্তর কি দেবেন ভেবে পেলেন না। মৃগাঙ্কবাবুর পা নাচছে, মুখের চেহারা অস্বাভাবিক। যে-কোন রকমের সামান্য উত্তেজনা—সে ভয় হোক, রাগ হোক, আনন্দ হোক—হলেই মৃগাঙ্কবাবুর ডান পা নাচতে থাকে। পা নাচাতে নাচাতে মৃগাঙ্কবাবু বললেন—কথাটা তা হলে সত্যি? Well, we are going to be driven away? Chucked out? So it is true? এঁ্যা? Well, well—I don't care। পঁয়তাল্লিশ টাকার চাকরি—ইজ ইট চাকরি?—A মুটে can earn, a মজুর can earn, a মেথর can earn, anybody···anybody can earn forty-five rupees a month. Others may care, but I don't care, you see I don't care.

টেবিলের উপর একটা চাপড় মেরে কথাটা শেষ করলেন মৃগাঙ্কবাবু। কাঁচা সোনার মত রঙ মৃগাঙ্কবাবুর। কপালে সেই রঙের মধ্যে রক্তোচ্ছ্বাসের আভা দেখা দিয়েছে। শান্ত চোখ দুটির দৃষ্টি একই সঙ্গে চঞ্চল এবং ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে। মৃগাঙ্কবাবু সমস্ত কথাগুলি হেডমাষ্টার চন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন। অভিযোগ যেন তাঁরই বিরুদ্ধে। এর উদ্যোক্তা যেন তিনি। চন্দ্রবাবু সহিষ্ণু ধীর মানুষ। তিনিও চঞ্চল হয়ে উঠলেন এ অভিযোগে। কিন্তু তবু তিনি স্থির হয়ে বসে রইলেন। প্রতিবাদ করলে মৃগাঙ্কবাবু হয়ত চীৎকার করে উঠবেন। হয়ত বা ভদ্রলোক কেঁদে ফেলবেন। রামজয় পণ্ডিত কেষ্টমাষ্টার এঁরা দু'জনে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দক্ষিণ পাশের ঘরে লাইব্রেরীতে অন্য মাষ্টারেরা স্তব্ধ হয়ে শুনছে। সৌভাগ্যক্রমে ঘরখানা একপাশে এবং সমস্ত ইস্কুলটাই ঠিক এই মুহূর্ত্তে প্রায় ছাত্রশূন্য তাই রক্ষা—কেউ শুনতে পায় নি। নইলে এতক্ষণে পশ্চিম পাশের হলটায় ছেলেরা হুড়মুড় করে এসে জমে যেত। ছেলেরা ইস্কুলের নিয়মানুযায়ী বোর্ডিঙের উঠানে সমবেত হচ্ছে। তারা সারবন্দী দাঁড়াবে—স্তোত্রপাঠ করবে:

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরমনিধানম্।

ইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে এই প্রথাটি চলে আসছে। স্তোত্রপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস আরম্ভ—কেষ্ট চাকর ঘণ্টা পিটবে—দশটি শব্দের পর ঢনো ঢনো ঢনো ঢনো শব্দের একটি তরঙ্গ সৃষ্টি করে শেষে আবার একটি বিচ্ছিন্ন একক উচ্চ ঢং শব্দ। ঠিক পূর্ণচ্ছেদের মত।

চন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—এখন সময় নেই মৃগাঙ্কবাবু। স্তোত্রপাঠ আরম্ভ

হয়েছে। যতক্ষণ কাজে রয়েছি ততক্ষণ কর্ত্তব্য করতে হবে। চলুন ওখানে যাই।

বলে নিজেই অগ্রগামী হলেন চন্দ্রবাবু। তাঁর আপিসরুম থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড হল—হলের উত্তর দিকে রাস্তার উপর প্রশস্ত বারান্দা, বারান্দার প্রান্তে সারবন্দী গোল থাম। তার পর বারান্দার সমান লম্বা সিঁড়ি ধাপে ধাপে রাস্তায় গিয়ে নেমেছে। হলের দক্ষিণ দিকে ঘরের সারি—পর পর দুটি ঘরের সারি, তার পর সিঁড়ি, সিঁড়ি গিয়ে নেমেছে বোর্ডিঙের উঠানে। ওই উঠানেই স্তোত্রপাঠ হচ্ছে।

চন্দ্রবাবু আকারে দীর্ঘকায় মানুষ। দীর্ঘ পদক্ষেপে হল পার হয়ে ঢুকলেন ফোর্থ ক্লাসে। হলে পাশাপাশি তিনটি ক্লাস; ফিফথ-সিক্স্‌থ-সেভেন্থ। এ আমলের ক্লাস সিক্স্‌-ফাইভ-ফোর। হলের দক্ষিণ গায়ে এক সারিতে চারখানি ঘর। পূর্ব্বপ্রান্তের ঘরে লাইব্রেরী, তার পর থার্ড ফোর্থ সেকেণ্ড ও ফার্ষ্ট ক্লাস অর্থাৎ ক্লাস এইট, সেভেন, নাইন ও টেন। তার দক্ষিণে এক সারিতে তিনখানা ঘর, মাঝখানের বড় ঘরটা শিশুমহল—প্রাইমারি সেকশন, দু'পাশের একখানা করে ঘরে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদের এডিশনাল সাবজেক্টের ক্লাস। আর একখানায় ইস্কুলের ভাঙা চেয়ার-টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড, ছেলেদের খেলার সরঞ্জাম—ফুটবল, ক্রিকেট, কাগজের বোঝার সঙ্গে নানান টুকিটাকি বোঝাই করা আছে।

ফোর্থ ক্লাস পার হয়ে প্রাইমারি সেকশনের ঘরটায় ঢুকবার মুখে বললেন। তাঁর পিছনের শিক্ষকদের উদ্দেশ করেই বললেন; তাঁর পিছনে অনেকগুলি পদশব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, মাষ্টাররা আসছেন; স্তোত্রপাঠের সময় মাষ্টার মশায়রাও উপস্থিত থাকেন. এই নিয়ম; বললেন:—আপনারা হয়ত আমাকেও সন্দেহ করছেন, ভাবছেন এর মধ্যে আমিও রয়েছি। ভাবছেন—আমার পরামর্শ অনুসারে এসব হচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি এবং শেষ দরজার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, জুতোর ডগা দিয়ে দরজার চৌকাঠে কয়েকটা মৃদু ঠোক্কর দিয়ে বললেন, আপনাদের এ সন্দেহ স্বাভাবিক। হতেই পারে। আমি ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর, আমি হেডমাষ্টার। অনেকের ধারণা ফাউণ্ডারদের সঙ্গে আমার গভীর অন্তরঙ্গতা। কিন্তু—

এবার তিনি মুখ তুললেন—এতক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন, এতগুলি সহকর্মীর উৎকণ্ঠিত শুকনো মুখের দিকে চোখ তুলতে—চোখে চোখ মেলাতে গভীর বেদনা অনুভব করছিলেন, বুকের ভিতর একটা আবেগের সৃষ্টি হচ্ছিল। আবেগ জীবনধর্ম্ম—প্রাণের স্পর্শের উষ্ণতাময় প্রকাশ, কিন্তু সে প্রকাশের উষ্ণতা বেশী হলে বিকার-ব্যাধির মত বিভ্রমের সৃষ্টি করে। সেই কারণেই তিনি কঠিন সংযমে সংযত করে রাখছিলেন নিজেকে, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে তার পরিচয় ছিল, তিনি যেন মেপে পা ফেলছেন—তিনি যেন আজ অত্যন্ত শান্ত, সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা প্রচণ্ড চেষ্টা রয়েছে; শক্ত বাঁধে বাঁধা নদীর জমে থাকা শান্ত গভীর জলরাশির মত অচঞ্চল তিনি। স্রোতের চিহ্ন আবিষ্কার করতে হলে গভীর তলায় ডুবতে হবে—নয়ত অনেক উপরে গিয়ে খুঁজতে হবে।

মুখ তুলে ফিরে তাকিয়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কৈ? মৃগাঙ্কবাবু কৈ?

ফোর্থ মাষ্টার কেষ্টবাবু মৃদুস্বরে বললেন—সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই আসেন নি। তিনি লাইব্রেরী-ঘরে—। কথাটা সমাপ্ত করলেন না কেষ্টবাবু।

চন্দ্রবাবু সেকেণ্ড পণ্ডিত শম্ভু চাটুজ্জেকে বললেন—আপনি যান, মৃগাঙ্কবাবুকে আসতে বলুন। বলুন আমি বলছি। যতক্ষণ আছি ততক্ষণ ডিসিপ্লিন মানতেই হবে। যান।

শম্ভুবাবু ফিরলেন। চন্দ্রবাবু যে কথা সুরু করেছিলেন 'কিন্তু' বলে—সে কথা আর বললেন না। মৃগাঙ্কবাবু নাই। ওদিকে স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এ সময়ে এখানে সকল শিক্ষককে উপস্থিত থাকতে হবে—এই নিয়ম। তিনি দীর্ঘ পদক্ষেপ দীর্ঘতর করে চৌকাঠ পার হয়ে ইস্কুলের সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন।

থার্ড মাষ্টার রতনবাবু স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিয়েছেন। স্থূলবপু রতনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন হাতজোড় করে—স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে। খালি গা, জামা এবং উড়নি কাঁধে ফেলা, মুখে চোখে কোনখানে কোন দুশ্চিন্তার লেশমাত্র চিহ্ন নাই; নিরুদ্বিগ্ন, নির্বিকার।

শম্ভু পণ্ডিত ফিরে এলেন; ফিরে এলেন একা। তিনি একেবারে ওধারে মৌলবী জেয়াউদ্দিনের পাশে স্থান গ্রহণ করলেন।

চন্দ্রবাবুর সংযত শান্ত দৃষ্টি উত্তেজনায় চঞ্চল হ'ল না, কিন্তু অধিকতর গাম্ভীর্যে গম্ভীর হয়ে উঠল, থমথমে হয়ে উঠল মুখখানা।

"তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃপ্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥"

এইখানেই শেষ হ'ল গীতা থেকে স্তোত্রপাঠ। এর পর কোরাণ থেকে বয়েৎ পাঠ করবে মুসলমান ছেলেরা। "লা ইলাহি ইলাল্লা—"। হিন্দুর ছেলেরা যখন গীতার স্তোত্রপাঠ করে তখন মুসলমান ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে—ইচ্ছে হলে স্বরে ও সুরে স্বর ও সুর মিলিয়ে পাঠ করতেও পারে, না হলে চুপ করে থাকতেও পারে। স্তোত্রপাঠ শেষ হলে মুসলমান ছেলেরা বয়েৎ পাঠ করে—হিন্দুর ছেলেরা দাঁড়িয়ে থাকে, চুপ করে থাকতেও পারে, যোগ দিতেও পারে।

গোড়ার দিকে ইস্কুল আরম্ভ হওয়ার সময় শুধু স্তোত্রপাঠই হ'ত। তখন ইস্কুলে ফার্সী পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না, মুসলমান ছাত্রও ছিল সংখ্যায় নগণ্য। গোটা ইস্কুলে একশো কুড়ি-পঁচিশ ছাত্রের মধ্যে দশ-বারো জন, তাও সবই ছিল নীচের ক্লাসে। ইস্কুলে তখন মৌলবীও ছিল না। পাঁচ বছর পর ১৯১০ সনে এখানে এসেছিলেন একজন মুসলমান সব-রেজিষ্ট্রার, তাঁর ছেলে রহমান ভর্তি হয়েছিল সেকেণ্ড ক্লাসে—সে ফার্সী পড়ত। প্রায় মাসতিনেকের মধ্যে এসেছিলেন একজন মুসলমান পুলিস সব-ইনসপেক্টার। তাঁর ছেলে ভর্তি হয়েছিল ফোর্থ ক্লাসে। সব-রেজিষ্ট্রার ইস্কুলের কমিটির একজন এক্স-অফিসিয়ো মেম্বর ছিলেন, কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেব ছিলেন উদার মানুষ। তিনি তাঁর ছেলের একলার জন্য মৌলবী রাখতে বা

ফার্সী ক্লাস খুলতে জেদ দূরের কথা—অনুরোধও করেন নি। বলেছিলেন—আমি নিজে বাড়ীতে রহমানকে ফার্সী পড়িয়ে দেব। কিন্তু দারোগা হক ছিলেন সেকেলে খাঁটি দারোগা এবং ধর্মবিশ্বাসে গোঁড়া। চোর-ডাকাত সন্দেহে গ্রেপ্তার করতে, কবুল খাওয়াবার জন্তে ঠ্যাঙাতে যেমন ওস্তাদ ছিলেন, ধর্মের গোঁড়ামিতেও ছিলেন তেমনি ধুরন্ধর। তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়া, রোজা রাখা ইত্যাদি পালনীয় কর্তব্য পালন করেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না, আরও অনেক কিছু করতেন যা ইসলাম ধর্ম-বিধিতে নেই। গোঁড়া বৈষ্ণব যেমন কালীকে মসী বলে—কাটাকে বানানো বলে তেমনি সংস্কৃতকে তিনি নাগরী ভাষা বলতেন, ও ভাষার বই ছুঁতেন না, এমন কি যাত্রাগান পর্যন্ত শুনতেন না, কারণ তার মধ্যে কালী-কৃষ্ণ-শিব দুর্গা আছে। এই হক সাহেব জেদ ধরলেন ফার্সী ক্লাস খুলতে হবে এবং মৌলবী রাখতে হবে। সেবার ফোর্থ ক্লাসে স্থানীয় মুসলমান ছাত্র ছিল চারজন, থার্ড ক্লাসে দু'জন, সেকেণ্ড ক্লাসে সব-রেজিষ্ট্রারের ছেলে ছাড়া দু'জন, ফার্ষ্ট ক্লাসে ছিল না ; এদের সকলেরই বিশেষ ভাষা ছিল সংস্কৃত। হক সাহেব স্থানীয় মসজিদে গিয়ে মুসলমানদের কঠিন তিরস্কারে তিরস্কৃত করেছিলেন এবং থার্ড ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র ও অভিভাবকদের কাছে দরখাস্ত সই করিয়ে পরদিন ইস্কুলে দাখিল করেই ক্ষান্ত হন নি, তার নকল পাঠিয়েছিলেন শিক্ষাবিভাগে, রীতিমত একনলেজমেণ্ট ডিউ রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছিলেন। এর এক মাসের মধ্যেই এল মৌলবী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ। রামজয় পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করেই চন্দ্রবাবু তাঁকে ডেকে এনে চাকরি দিলেন। হক এতেও আপত্তি তুলেছিলেন ; জিয়াউদ্দিন মৌলবী সংস্কৃত জানে এবং পড়ে, হিন্দুদের পৌত্তলিক পালাগান শুনে কাঁদে। কিন্তু সে আপত্তি টেকে নি। মৌলবী জিয়াউদ্দিন এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজের মাথার মণি ঠাকুর সাহেবদের বাড়ীর দৌহিত্র, তাঁদের উত্তরাধিকারী, কোরাণ ও যাবতীয় ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে মহাশয় ব্যক্তি।

এর কিছুদিন পরই আপত্তি উঠল স্তোত্রপাঠে।—এ মুসলমানদের পক্ষে অধর্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ। স্তোত্রপাঠ আমরা করব না।

দরখাস্ত হাতে করে দিয়ে এল জিয়াউদ্দিন মৌলবীরই আত্মীয় আবু হোসেন—ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্র। চন্দ্রবাবু দরখাস্ত পড়েই বললেন—হোয়াট ? স্তোত্রপাঠ তোমরা করবে না ? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে তোমাদের আপত্তি ?

আবু হোসেন ছেলে হিসেবে খারাপ ছিল না, বরং ছেলে সে ভালই ছিল। তার উপর সে ছিল অবস্থাপন্ন সিয়া বংশের। জিয়াউদ্দিনের মাতামহ দৌহিত্রকে ফকীরের পাট দিয়ে গিয়েছিলেন—আবু হোসেনদের আমিরীর পাট ক্ষয়িত হয়েও জোত-জমিদারীর ঠাট বজায় ছিল। তার উপর তার বাবা জেলার হাকিমদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন নানা কারণে। ও অঞ্চলের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত হয়েছিলেন। লোকে বলত খান সাহেব খেতাব তাঁর জন্তে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের খাস কামরায় তাকের ওপর 'জাগ' দেওয়া রয়েছে, পেকে উঠলেই সেটি তিনি পাবেন। সুতরাং আবু হোসেন সাধারণ ছেলের মত হেডমাষ্টারকে ভয় করত না। সহপাঠীদের কাছে সে বেশ হেঁকে-ডেকেই বলত—তুমরা ভয় করবে কিন্তু আমি করব না।

উনি হেডমাষ্টার—আমিও ই চাকলার পুরনো আমীর-ঘরের ছেলে। বাপজান হা হা করে হেসে বলেন—তুদের হেডমাষ্টার—আমাদের কি বলে—ই দত্তের পোলা; পাঠশালায় মৌলবী ছিল, আমাদের নানকায়ের সেরেস্তায় এক টাকা পাঁচ আনা জমা রাখে। চন্দরের ঠাকুর-দাদাকে আমার বাবা ধরে এনে দু'টাকা জরিমানা করে আদায় নিয়া তবে ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল ভারি তো নানকারদার! তার আবার এত দাপ। জমিদার হলেও না-হয় বুঝতাম। এখুনও চন্দর মাষ্টার বছরের প্রথমেই এক টাকা পাঁচ আনা পাঠায়ে দেয়। হাঁ।

সুতরাং আবু হোসেন দরখাস্ত দিয়েই চলে যায় নি। সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। হেডমাষ্টার সবিস্ময়ে 'হোয়াট' বলে গর্জ্জন করে উঠলেও টলে নি। চন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল—দরখাস্তে সব লিখা আছে। সংস্কৃত ওই হিঁদুদের শাস্তর থেকে পাঠ আমরা করব না। হিঁদুর ঈশ্বরের কাছে আমরা মুছলমানরা কেন প্রার্থনা করব?

চন্দ্রবাবু একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আবুকে আল্লা ঈশ্বর গড-এর অভিন্নতা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন—ওর মধ্যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের দেবতার নাম যে-যে শ্লোকে আছে সে শ্লোক বাদ দিয়ে যেটুকু সকল ধর্ম্মের পক্ষে গ্রহণীয় তাই আছে ওর মধ্যে।

রামজয় পণ্ডিত এবং মৌলবী জিয়াউদ্দিন দু'জনকে ডেকে পণ্ডিতকে দিয়ে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিয়ে শুনিয়েছিলেন। এ নিয়ে গোড়া থেকেই তাঁরা সাবধান ছিলেন। সে সেই ইস্কুল স্থাপনের কাল থেকে। গীতার একাদশ অধ্যায় থেকে অর্জ্জুনের স্তবমালার তিনটি শ্লোক গ্রহণ করেছিলেন—'ত্বমাদি দেব; পিতাঽসি লোকস্য'; এবং 'তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং'; যে শ্লোক ক'টি ভাষান্তরিত করলে পৃথিবীর যে-কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের নিজস্ব মনে হবে। এ পরামর্শ দিয়েছিলেন এক মহৎ ইংরেজ শিক্ষাব্রতী মিষ্টার জোন্‌স। এতে বাধা গোড়া থেকে তো কম পড়ে নি। ইস্কুল প্রতিষ্ঠার তিন মাস পর বোর্ডিং হাউস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বোর্ডিঙের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য এসেছিলেন খোদ কমিশনার সাহেব। সঙ্গে এসেছিলেন ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর অব স্কুলস আর এসেছিলেন সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহকুলের মত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও, এস-পি থেকে পুলিসের সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর পর্য্যন্ত। সে এক রাজসূয় যজ্ঞ। লালমুখ কমিশনার, ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর অব স্কুলস দু'জনে সূর্য্য-চন্দ্রের মত ছিলেন কেন্দ্রস্থলে ডাকবাংলোয়। চারিপাশে ছোট বড় মাঝারি তাঁবু খাটানো হয়েছিল পাঁচ-ছ'টা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বাঙালী আই-সি-এস, পুলিস সাহেব ছিলেন একজন সাদা চামড়া কিন্তু এদেশী সাদা। ওঁরা সকলে এই সব তাঁবুতে বাসা নিয়েছিলেন—মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি ইত্যাদির মত। "রেল ছাড়া বিশ ক্রোশ" বলে একটি প্রবাদবাক্য দেশে রেললাইন পড়ার পর থেকে প্রচলিত হয়েছে, এ অঞ্চলটি তাই। সবচেয়ে কাছের ষ্টেশন এখান থেকে আট মাইল দূরে। তাই মহামান্য অতিথিরা কিছু আগেই এখানে শুভ পদার্পণ করেছিলেন। একদিন আগে এখানে এসে এখানকার রেল থেকে কুল পর্য্যন্ত সমস্তকিছু ইন্‌স্পেক্‌শনের কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে পালন করতে অবহেলা করেন নি। ইস্কুলের পাশেই সব-রেজেষ্ট্রি আপিস—সেই আপিসে এসেছিলেন কমিশনার এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। ইস্কুলে তখন স্তোত্রপাঠ হচ্ছে।

কোরাসে স্তোত্রপাঠের সুরে আকৃষ্ট হয়ে কমিশনার সাহেব ঢুকে পড়েছিলেন।

—এ কি হইটেছে? জান?

চন্দ্রবাবু তখন সেকেণ্ড মাষ্টার। হেডমাষ্টার ছিলেন প্রৌঢ় শিক্ষাব্রতী গিরিজাবাবু। তিনি বলেছিলেন—It is a prayer, Sir!

—Prayer?

—Yes Sir, prayer.

—But it is not from the Bible?

—No Sir, this is from our Geeta.

—Geeta! চমকে উঠেছিলেন কমিশনার। Geeta! তার পর কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিলেন—

You must stop it.

স্টপ ইট? হেডমাষ্টার নির্ব্বাক হয়ে গেলেন। প্রতিবাদ করবার সাহস তাঁর ছিল না। বাঁচিয়েছিলেন ডিভিশনাল ইনস্পেক্টর অব স্কুলস। প্রাচ্যভাষায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত-মানুষ। তিনি শুনে বলেছিলেন—সে কি? গীতার মত পবিত্র গ্রন্থ থেকে স্তোত্রপাঠে আপত্তির কি থাকতে পারে? আমি গীতা ভাল করে পড়েছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পবিত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে গীতার স্থান।

তাঁদের নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল তা কেউ শোনে নি। ডাকবাংলোর দরজা জানালা বন্ধ করে বেশ জোর জোর কথাবার্ত্তা হয়েছিল। এ কথা বলেছিল ডাকবাংলার মালী বাবুর্চিরা একবাক্যে। এস্-ডি-ও ছিলেন ওরই মধ্যে হিন্দুমানুষ। তিনি চৈতন্যবাবুকে বলেছিলেন—ওরে মশায়, সে হাতাহাতির উপক্রম। ইন্‌স্পেক্টার জোন্‌স সাহেব চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ—কখ্‌খনো না, এ তুমি বন্ধ করতে পার না। ইউ কাণ্ট স্টপ ইট। কেউ যদি বলে যে বাইবেল পড়ার জন্যে ইংলণ্ড বিপন্ন হবে—তবুও বাইবেল পড়া বন্ধ করবে ইংরেজ? এদেশের লোক তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ গীতা পড়লে যদি ইংরেজ সাম্রাজ্য যায় তো যাক সে সাম্রাজ্য। তুমি কমিশনার হয়েছ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে যদি গীতার স্তোত্রপাঠ বন্ধ কর তবে আমি প্রতিবাদ তো করবই, উপরন্তু ইংলণ্ডের কাগজে প্রকাশ করে দেব। এ সব শুনে তো হকচকিয়ে গেলাম আমরা। পর্দ্দা ফাঁক করে উঁকি মেরে শুনছিলাম। পর্দ্দা ফেলে দিলাম। কি জানি—কোথায় কখন নজরে পড়বে, মুণ্ডুপাত করবে আমাদের। ওদিকে কালেক্টর সাহেব বাংলোর দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন।

বিকেলবেলা দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানের শেষে সমাপ্তি-সঙ্গীত গাওয়া হবে ঘোষণা হতেই জোন্‌স সাহেব বললেন—হেডমাষ্টার, আপনার স্কুল বসবার সময় গীতা থেকে যে প্রেয়ার হয় সেই প্রেয়ার আমরা শুনতে চাই। কমিশনার সাহেব শুনেছেন, তিনি অর্থ বুঝতে পারেন নি কিন্তু ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য্য সুরের পবিত্রতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। আমি কিছু স্যানস্কৃট বুঝি, আমি শুনলে খুব খুশী হব। সভাপতি কমিশনার সাহেবও খুশী হবেন।

গিরিজাবাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। চন্দ্রবাবুই তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডেকে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।—গাও। কোন ভয় নাই। গেয়ে যাও।

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্"

সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি আকাশে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইনস্পেক্টার জোন্‌স মাথা নত করে গির্জ্জায় উপাসনা-কালের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আরও তিনটি শ্লোক ছিল, 'বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ', 'সখেতি মত্বা যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি', যার মধ্যে হিন্দু পুরাণের দেবতা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। প্রার্থনার শেষে জোন্‌স সাহেব বলেছিলেন—আমি হেডমাষ্টারকে অনুরোধ করব—তিনি যেন এই তিনটি শ্লোক বাদ দেন। কারণ এই শ্লোক তিনটিতে প্রজাপতি পিতামহ যাদব শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি দেবতার উল্লেখের জন্য এটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রার্থনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্লোক তিনটি বাদ দিলে এটি পৃথিবীর সর্ব্বমানবের প্রার্থনাসঙ্গীতে পরিণত হবে।

যাবার সময় হেডমাষ্টারকে ডেকে বলেছিলেন—আমি বোধ হয় শীগ্‌গির চলে যাব মিঃ চক্রবর্ত্তী। তোমাদের ওই প্রার্থনাসঙ্গীত যেন তোমরা তুলে দিয়ো না। উপর থেকে খোঁচা বা বন্ধ করার হুকুম আসবে না—এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। সে পথ আমি বন্ধ করে যাব। তবে দোজ থি স্ট্যানজাস্—বাদ দিয়ো। ভবিষ্যতে ভাল হবে।

ও তিনটি শ্লোক বাদ দিয়েছিলেন তাঁরা, ওই ধার্ম্মিক পণ্ডিত ইংরেজটির কথা অবহেলা করেন নি। সেদিন আবু হোসেনের আপত্তি শুনে, দরখাস্ত হাতে নিয়ে চন্দ্রবাবু মনে মনে জোন্‌স সাহেবকে নমস্কার করেছিলেন।

আবু কিন্তু এতেও মানতে চায় নি। সে বলেছিল—হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বরকে ডাকা মানেই এছলামের অধর্ম্ম।

তার দিকে কয়েক মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—তা হলে তুমি আমার ইস্কুল থেকে অন্য ইস্কুলে চলে যেতে পার। বলেই তিনি ডেকেছিলেন—গোপাল।

গোপাল—নৃত্যগোপাল ছিল তখন কেরানী। এই ইস্কুলেরই ছাত্র, ইস্কুলের প্রথম ফোর্থ মাষ্টারমশায়ের ছেলে। গোপাল এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। কেউ বলত কালো গোপাল, একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি দুষ্টু ছেলে বলত—ড্যান্সিং গোপাল অর্থাৎ নৃত্যগোপাল।

আবুকে দেখিয়ে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—এর সার্টিফিকেট দিয়ে দাও। আর কোন ছাত্রের যদি আপত্তি থাকে তো সেও চলে যেতে পারে।

আবুকে বলেছিলেন—ভেবে দেখ তুমি। তিন দিন সময় দিলাম আমি। নাও, গো টু ইয়োর ক্লাস। গো।

জিয়াউদ্দিন মুসলমান ছাত্রদের ডেকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। আবু বলেছিল—আপনি যদি শক্ত হতেন তবে আমাদের ভাবনা কি ছিল? আপনি নিজে যে উদের শাস্তর পড়েন সংস্কৃতের তারিফ করেন।

জিয়াউদ্দিন হেসে বলেছিলেন—ওরে আবু, হিন্দুরা দুধ দই মধু ঘি চিনি মিশায়ে পঞ্চামৃত

করে দেবতাদের ভোগ দেয়। জিনিসটা কিন্তু যেমন মিঠা তেমনি পোষ্টাই। তা হিন্দুদের দেবতাকে ভোগ দেওয়া সিন্নী কি প্রসাদ না খাই, নিজের ঘরে উ পাঁচটা মিঠা জিনিস মিশায়ে খেতে দোষ কি? বল—তুমিই বল বুঝে। রমজানে আমরা জাকাৎ করি পেস্তা বাদাম চিনি দিই, তা বলে হিন্দুরা পেস্তা-বাদাম দেওয়া ফল খাবে না, না খায় না?

শেষ উদার সব-রেজিষ্ট্রার রহমন সাহেব এসে ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। গীতার স্তোত্রপাঠের শেষে কোরাণ থেকে বয়েৎ পাঠ হবে। সমস্তক্ষণই হিন্দু-মুসলমান সমস্ত ছাত্রদের থাকতে হবে। ইচ্ছে করলে যে-কোন একটি প্রার্থনার সময় চুপ করে থাকতে পার, কিন্তু কোন রকমের বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। চন্দ্রবাবু আনন্দের সঙ্গে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। রামজয় পণ্ডিতও আপত্তি করেন নি। আপত্তি করেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। সেকেণ্ড মাষ্টার মশায়।

—এ সব মীনিংলেস মাষ্টারমশায়। গীতা—কোরান! দু'দিন পর বাইবেল থেকে পাঠ করতে হবে। উঠিয়ে দিন—ও সব উঠিয়ে দিন। কোন ফল নেই এতে। আননেসেসারী ওয়েস্টেজ অব টাইম এ্যাণ্ড এনার্জি, শীয়ার ওয়েস্টেজ।

চন্দ্রবাবু উত্তর দেন নি কথায়। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন—আপনাদের চার জনকে—সেকেণ্ড মাষ্টারমশায় আপনি—হেডপণ্ডিত মশায়, মৌলবী সাহেব, ফোর্থ মাষ্টারমশায়কে—একটি কাজের ভার দিচ্ছি। ওই গীতার শ্লোকের আর কোরানের বয়েতের বাংলা অনুবাদ করে দিন। পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে হবে। কেষ্টবাবু যদি বাংলা ভার্স করে দিতে পারেন তো খুব ভাল হয়। আমাদের সিক্সথ মাষ্টার গোপাল আর ড্রয়িং মাষ্টার মশায় দু'জনে সুন্দর করে লিখে দিন; প্রত্যেক ক্লাসের জন্যে এক এক কপি। প্রত্যেক ক্লাসে টাঙানো থাকবে। এক সপ্তাহের মধ্যে এটা হওয়া চাই।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে আবার বললেন—আর একটা কথা, এই ব্যাপার নিয়ে ক্লাসে যেন কোন আলোচনা না হয়। অর্থাৎ যা ঘটে গেল তা নিয়ে। এবং এই প্রার্থনা করে ফল আছে কি নাই তা নিয়ে। বুঝেছেন? প্লিজ গো টু ইয়োর ক্লাসেস। নো ডিসকাসন প্লিজ।

মৃগাঙ্কবাবু মাষ্টারদের মজলিসে বলেছিলেন—অলরাইট! ইট ইজ অলরাইট! ইস্কুল অথরিটিজ যখন আমাকে চল্লিশ টাকা মাইনে দেয়, তখন ওরা যদি বলে যে, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে না, পৃথিবীর চারিদিকেই সূর্য্য ঘোরে অন এ চ্যারিয়ট ড্রন বাই সেভেন হর্সেস—এই শেখাতে হবে, অলরাইট তাই শেখাব—তাই বলব। অলরাইট।

সঙ্গে সঙ্গে পানের ডিবে খুলে খিলি তিন-চার পান মুখে পুরে দ্রুত চর্ব্বণে চিবুতে আরম্ভ করেছিলেন, তার সঙ্গে বাঁ হাতের আঙুলগুলি সযত্নপুষ্ট দাড়ির মধ্যে চালাতে সুরু করেছিলেন। এই দীর্ঘ দশ বৎসর স্তোত্রপাঠের সময়ে তিনি নিয়মানুযায়ী উপস্থিত থেকেছেন এবং স্তোত্রপাঠ যতক্ষণ হয়েছে ততক্ষণ বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ির ফাঁস ভেঙেছেন। পাঠ শেষ হলেই ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের আঙুল থেকে, জড়িয়ে-যাওয়া কয়েকটি ছেঁড়া দাড়ি ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে

ইস্কুলে ঢুকেছেন।

রামজয় রসিকতা করে পরশু অর্থাৎ শনিবার পর্য্যন্ত বলেছেন—এর চেয়ে নিত্য ক্ষৌরকর্ম্ম করুন সেকেণ্ড মাষ্টারমশায়। আস্তিক্যতত্ত্বে প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে শ্মশ্রু গুম্ফ কেশ সব মুণ্ডন করতে হয়; আপনার নাস্তিক্যতত্ত্ব—ওতে অন্ততঃ দাড়ি-গোঁফটা কামানো দরকার। অসুবিধেও নেই! এ দু'চার গাছি ছেঁড়ে কষ্টও হয়, আর কি বলে প্রায়শ্চিত্তও পুরো হয় না।

মৃগাঙ্কবাবু বলেন—পান খান এক খিলি। বিধানের দক্ষিণা এর অধিক দিতে পারব না। নিত্যাশৌচ যেখানে সেখানে পূর্ণ অশৌচান্তে ওটা করব; এই চল্লিশ মুদ্রার মাষ্টারীর পাপ থেকে মুক্তি যেদিন পাব—সেইদিন; বুঝেছেন না, একেবারে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করে দাড়ি-গোঁফ ফেলে দেব। তার দেরি নেই, বুঝলেন, দরখাস্ত কয়েকটা করেছি।

দরখাস্ত মৃগাঙ্কবাবু করেন এবং মৃগাঙ্কবাবুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বহু স্থান থেকেই তাঁর আহ্বান আসে; এই দশ বৎসরে অন্ততঃ দশ জায়গা থেকে তাঁকে ডেকেছে কিন্তু তিনি যান নি। ডাক এলে তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সকলেই তাঁকে যেতে বলে। পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিতে চেয়েছে। কোন কোন জায়গায় বাসাবাড়ীরও ব্যবস্থা এবং প্রাইভেট টিউশনির সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। মৃগাঙ্কবাবু প্রথমটা নিজে উৎসাহ দেখিয়েছেন, চাকর কেষ্ট থেকে সুরু করে সকলকে বলেছেন, 'যাচ্ছি এবার। ফরটি রুপিজ এ মন্থ, নো মোর অব ইট।' রামজয় পণ্ডিতকে বলেছেন—'পণ্ডিতমশায়, শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডনবিধির বিকল্প ব্যবস্থা থাকা চাই কিন্তু। এত সযত্নপালিত দাড়ি-গোঁফ—যা নাকি—"নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ প্রফুল্লকোষঃ পরিপক্কশালিঃ"র সঙ্গে তুলনীয় তাকে আর নষ্ট করতে পারব না। মূল্য নিয়ে শুদ্ধ করে দিন। দক্ষিণা—কিছু মোদকের রসগোল্লা এক পোয়া তার বেশী নয় কিন্তু।'

কয়েক দিন পরই কিন্তু মত পালটেছেন তিনি—নো। নো। নো। নট গোয়িং দেয়ার। আই এ্যাম দি লাষ্ট পারসন টু গো দেয়ার। দে আর ব্রুটস। চিঠি লিখতে জানে না।

না-হয় বলেছেন—খবর নিয়েছি সময়ে মাইনে দেয় না।

না-হয় বলেছেন—মাই গড, এ ডেঞ্জারাস প্লেস।

কতবার শিক্ষকেরা বলেছেন—কেন আপনি যাচ্ছেন না মৃগাঙ্কবাবু? চল্লিশ টাকা মাইনেতেও আপনি এখানে কেন পড়ে আছেন?

দাড়িতে হাত বুলিয়ে, পা নাচিয়ে, মৃগাঙ্কবাবু বলেছেন—নো ম্যাটার। ওরা চল্লিশ টাকার মত মাইনে দেয়—আমি চল্লিশ টাকার মত পড়াই। ওজন করে দিই। দেয়ার আই ফলো মাই প্রিন্সিপ্‌ল্—ভেরি ভেরি ষ্ট্রিক্টলি। এ্যাণ্ড য়্যাজ ফাউ—আই অ্যাটেণ্ড দি স্তোত্র প্যারেড।

আজ এই বোধ করি প্রথম দিন মৃগাঙ্কবাবু স্তোত্রপাঠের সময় এলেন না।

চন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মৃগাঙ্কবাবুর মত লোকের কাছে এটা তিনি প্রত্যাশা

করেন নি।

কোরাণ থেকে বয়েৎ পাঠ শেষ হয়ে গেল। ইস্কুলের ও পাশের বারান্দা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা বাজতে সুরু করল; কেষ্ট ঘণ্টার সামনে কাঠের হাতুড়ি ধরে দাঁড়িয়েই ছিল, পাঠ শেষ হওয়া মাত্র সে বাজাতে সুরু করেছে—ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং ঢং-ঢং—দশটি ঘণ্টার পর দ্রুততালে—ঢনো-ঢনো-ঢনো-ঢনো—ঢং!

ছেলেরা বাঁধ-ভাঙা জলের মত ছুটছে। ক্লাসে এসে বসবে। তরুণ কিশোর থেকে কাঁচ শিশুর দল। চঞ্চল বেগবান—অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সতেজ। লাফ দিয়ে বেঞ্চি ডিঙিয়ে বসবে। তা না বসলে ওদের আনন্দ হবে না। ঘোষণা করে না বললেও 'কে আগে গিয়ে বসতে পারে'—এ প্রতিযোগিতা ওদের মনে মনে ওদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আরম্ভ হয়ে গেছে।

—আস্তে, আস্তে, বয়েজ! আস্তে আস্তে! বললেন তিনি। তার পর আবার দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘরের পর ঘর অতিক্রম করে এসে আপিসে বসলেন।

মৃগাঙ্কবাবু বসে আছেন। টেবিলের উপর এ্যাটেণ্ড্যান্স খাতা পড়ে আছে। মাষ্টাররা এসে দাঁড়ালেন সই করবার জন্যে। চন্দ্রবাবু বললেন—টিফনের সময় বা ইস্কুলের পর যখন আপনাদের ইচ্ছে একবার আমার সঙ্গে বসবেন। আমার কিছু দেখাবার আছে, জানাবার আছে আপনাদের। সমস্ত দেখাব এবং যা জেনেছি সবই বলব। শুধু বিশ্বাস করবেন। ওনলি —আই উড আস্ক ইউ টু বিলিভ ইট। টু বিলিভ মি।

সর্ব্বাগ্রে মৃগাঙ্কবাবু হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

গোপাল ক'খানা খাতা খুলে সামনে এগিয়ে দিল। সই করে দিয়ে চন্দ্রবাবু এক শিট ফুলস্কেপ কাগজ টেনে নিলেন। লিখতে লাগলেন—মাই ডিয়ার অমরবাবু—। অমরবাবু স্বর্গীয় চৈতন্যবাবুর ভাগ্নে। এই ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন চৈতন্যবাবুর ডান হাত। চৈতন্য-বাবুই তাঁকে পড়িয়ে মানুষ করেছিলেন। এম-এ পাস করেছিলেন অমরবাবু, প্রথম জীবনে পশ্চিমে প্রোফেসারি করতেন। চৈতন্যবাবুই তাঁকে এনে তাঁর কলকাতার ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে-ছিলেন। অমরবাবু এখন ধনী ব্যবসায়ী, রাজসরকারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রতিষ্ঠাতাপক্ষের প্রতিনিধি।

ইংরেজীতে লিখে চললেন চন্দ্রবাবু। মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিলেন চৈতন্যবাবুর অয়েল পেন্টিঙের দিকে। তাঁকে যেন সাক্ষী মানছিলেন। অথবা তাঁর দিকে চেয়ে দেখেই তাঁর সব কথা মনে পড়ছিল। তিনি আরম্ভ করলেন—ইন দি ভেরি বিগিনিং আই বেগ অব ইউ—ইয়োর ফরগিভনেস—।

সর্ব্বাগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, অনধিকার প্রবেশ করে আমি আপনার মূল্যবান সময়ের হয়ত অনেকটুকুর উপর হস্তক্ষেপ করছি।

মাই লেটার উইল বি এ লং লেটার। আই উড আস্ক ইউ টু রিমেমবার—।

১৯০৫ সালের সে কাহিনী মনে করতে বলছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

It was like a dark night ; there was darkness everywhere ; darkness of ignorance.

হেডমাষ্টার চন্দ্রবাবুর লেখা চৈতন্য ইনষ্টিটুশনের এন্নুয়েল রিপোর্টের প্রথম লাইন হ'ল এই। আজ দশ বৎসর চৈতন্য ইনষ্টিটুশন স্থাপিত হয়েছে, দশ বৎসরে আটবার পুরস্কার বিতরণী সভা হয়েছে। আটবারের এন্নুয়েল রিপোর্টের আরম্ভ এই। এর বদল কখনও হয় নি। এর পরই চৈতন্য ইনষ্টিটুশন স্থাপনকে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এমনি একটি কল্পনার ছবি বোধ করি, চন্দ্রবাবুর মনের মধ্যে বাসা গেড়ে আছে। শুধু ইস্কুলের ওই এন্নুয়েল রিপোর্টেই নয়, যখনই এখানে শিক্ষাসংক্রান্ত সভা-সমিতি হয় তখনই তিনি ওই বলেই বক্তৃতা আরম্ভ করেন—It was like a dark night ;—লোকে—বিশেষ করে আধুনিকেরা, নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করে বলে—এই শুরু হ'ল বাঁধা বুলি।

এন্নুয়েল রিপোর্ট লিখে প্রতিবারই মাষ্টারদের ডেকে শোনানো হয়, মৃগাঙ্কবাবু বসেন সামনে, তিনি বিলাসীসুলভ ভঙ্গিতে নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে রসিকতা করে বলেন—সবই বেশ হয়েছে কিন্তু মালিকদের স্তব একটু বেশী করা হয়েছে।

চন্দ্রবাবু বলেন—Truth is Truth ; চৈতন্যবাবু না এগিয়ে এলে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকত এ জায়গা। কে করত, বলুন ?

মৃগাঙ্কবাবুর ছোটখাটো পা দুখানি ঘন আন্দোলনে দুলে ওঠে, বোঝা যায় সারা অন্তরটা দমকা হাওয়ায় তরঙ্গমুখর দীঘির মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে ; মুখে চোখে কৌতুক-দীপ্তি ফুটে ওঠে ; তিনি বলেন—Yes, but one can challenge ; কূট তার্কিক অবশ্যই বলতে পারে, কর্ম্মটি শয়তানের কর্ম্মের মত অপকর্ম্ম। প্রশ্ন করতে পারে—ইস্কুল করে হয়েছে কি ? বাপ-মায়ের খরচ বেড়েছে। টেরি কাটতে শিখেছে, ওপেন ব্রেষ্ট, ডবল ব্রেষ্ট কোট পরতে শিখেছে, পম্পশুর রেওয়াজ হয়েছে। And they can—আই মীন দি কূটতার্কিকস can quote Paradise Lost.

—the fruit
of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the world and all our woe.

এঁ্যা ? তা হলে কি বলবেন ? কথা শেষ করে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আর একবার হেসে নেন এবং আবার বলেন—

And everything has been told about the sun,
but nothing has been told about the moon ;

why ? কি গো কেষ্টবাবু ? চন্দ্র সম্পর্কে কিছু নিশ্চয় বলা উচিত ছিল না ? চন্দ্র অনেক

আলো দিয়েছে।

রামজয় পণ্ডিত এবার বলেন—চন্দ্র এখানে এক নয়, দুই। কৃষ্ণপক্ষ এখানে নেই-ই। একে চন্দ্র, দুইয়ে মৃগাঙ্ক। আমাদের ফকীর বৈরেগী গায়,—'যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নি দেখসে নদীয়ায়'।

চন্দ্রবাবু বলেন—গোপাল, কেষ্টকে বল তামাক-টামাক দিক। আর একটু মিষ্টি জল। পাঁচটা বাজে। এখন let us finish,—শেষ করে নেওয়া যাক। কি বলেন?

প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের আগে ইস্কুলের পর মাষ্টারেরা বসেন, এন্যুয়েল রিপোর্ট পড়া হয়। ইস্কুল থেকেই জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। চন্দ্রবাবু পড়ে যান—Then there came a torch bearer in that darkness. A great soul, a true lover of light—light of knowledge.

চৈতন্য ইনষ্টিটুশনকে সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা করলেও চৈতন্যবাবুকে টর্চ-বেয়ারার বলেন। বলেন, চৈতন্যবাবু আলোক-অর্ঘ্য দিয়ে যে পূজা করেন সেই পূজার ফলেই এই সূর্য্যোদয়, অর্থাৎ চৈতন্য ইনষ্টিটুশনের অভ্যুদয়।

—বাট দেয়ার ওয়ার টোলস এণ্ড মক্তাবস এণ্ড পাঠশালাজ—

তার্কিক মৃগাঙ্কবাবু ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাতে থাকেন। ওঁর উত্তেজনা যত বাড়ে তত বাড়ে ওঁর দাড়িতে হাত বুলানোর মুদ্রাদোষ।

তা ছিল। কিন্তু সে-সবের অবস্থা তখন নিবন্ত গ্রহের মত। চন্দ্রবাবু বলেন—তা যদি বলেন তবে এটাও বলতে হবে যে, ওগুলতে আলো দূরের কথা উত্তাপও একরকম ছিল না। পুরুতগিরি মৌলবীগিরি আর গমস্তাগিরি—টোল মক্তাব পাঠশালা থেকে পড়ে এই তিনটে কাজ করা যেত। আর কিছু না। বড় জোর আদালতে টাউটের কাজ। কোনটা না পেলে পাঠশালায় পণ্ডিতি।

এসব রচনা করা কথা নয়, এক বিন্দু রঙ ফলানো নয়, শোনা নয়, ভুক্তভোগীর কথা। চন্দ্রমাষ্টার বাপের পাঠশালা থেকে পড়া শেষ করে যখন বের হলেন তখনকার কথা আজও যে মনে জলজল করছে। রামজয় এবং জেয়াউদ্দিনও তাঁর সঙ্গে পড়ত। ওদের দু'জন ভুজঙ্গ পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে পৈতৃক পেশায় শিক্ষানবীশ হিসেবে গিয়ে ভর্ত্তি হ'ল আপন আপন বাপের কাছে। রামজয় ব্যাকরণ পড়ে কাব্য পড়বে শাস্ত্র পড়বে, বড় হয়ে ভাগবত পাঠ করে বেড়াবে, গুরুগিরি করবে, সমাজে বিধি-ব্যবস্থা দেবে। জেয়াউদ্দিনও তাই করবে নিজেদের সমাজে। মসজেদে আজান পড়বে—ঈদে বকরীদে মুসলমানদের নামাজ পড়াবে। চলে যাবে ওদের একরকম করে। মুশকিল হ'ল চন্দ্রভূষণের। কি করবে সে? ভুজঙ্গ পণ্ডিতের ইচ্ছে ছিল ছেলে মোক্তারি পড়ে। না পারলে আদালতে টাউটগিরি করবে। ওর পিছনে ভুজঙ্গ দত্তের জীবনের একটি মর্ম্মান্তিক স্মৃতির প্রেরণা ছিল।

ভুজঙ্গ দত্তের পৈতৃক বাসভূমি অভয়পুরের কোলেই ময়ূরাক্ষী নদী। তার ঠিক ওপারেই

বিখ্যাত গঙ্গুটিয়ার রেশমকুঠি। সারা বাংলা দেশের মধ্যে এত বড় রেশমকুঠি আর ছিল না। এখন কুঠি উঠে গিয়েছে কিন্তু বিশাল কুঠিবাড়ীটা এখনও পড়ে রয়েছে। প্রায় মাইল দেড়েক দূর থেকে সব চেয়ে উঁচু চিমনিটা দেখা যায়। বিরাটকায় ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার দুটো এখনও গাঁথা পড়ে আছে। এক হাজার ঘাই অর্থাৎ রেশমের গুটি ভিজানো ভাটি আজও অটুট রয়েছে। কুঠিতে চারজন সায়েব কর্মচারী থাকত। চারজন সায়েবের জন্ম ষোলটা ঘোড়া। ও অঞ্চলে চারিপাশে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে গ্রামে প্রায় ঘরে ঘরে ছিল পলুপোকা পালনের ধুম। ধানের ক্ষেতের চেয়ে পাট চাষের জমির কদর ছিল অনেক বেশী। অনেক কাল ধরেই অবশ্য এ অঞ্চলে রেশমের চাষ প্রধান। এখানকার রেশম থেকেই মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ গরদের তাঁত চলত, এবং ওই কুঠি ছাড়াও কয়েকটা গ্রামে আগেকার প্রথায় কিছু কিছু রেশম তৈরি হ'ত। এ রেশমের কারবারের মূল কারবারী ছিল বেজা বীরনগরের তন্তুবায়েরা। ওই তন্তুবায়দের কারবারেই ভুজঙ্গ দত্তেরা তিন পুরুষ ধরে কাজ করত। কারবারের সকল দায়িত্ব ছিল দত্তদের উপর; তেমনি ছিল অগাধ বিশ্বাস। সম্পর্কটা মনিব-ভৃত্যের ছিল না, সম্পর্কটা ছিল আত্মীয়তার। এদের কারবারে রেশমের পরিমাণ বেশী ছিল না, কিন্তু রূপে গুণে এদের রেশম ছিল অনেক উৎকৃষ্ট। কি কৌশল যে ছিল এর মধ্যে সে সায়েবরাও ধরতে পারত না। তবে একটা জিনিস সকলেই জানত। অল্প পরিমাণের জিনিস নিপুণ হাতের যত্নে যেমন সুন্দর করে তৈরি করা যায়—পাইকিরী হারে রাশীকৃত জিনিস কলের মুখে তেমন সুন্দর কখনও হয় না। এই কারণে কুঠির রেশমের চেয়ে এদের রেশমের কদর ছিল বেশী। খাস বিলেত থেকে এদের রেশমের উল্লেখ করে অর্ডার আসত। কুঠির কোম্পানী বিলেত থেকে কলকাতায় নির্দ্দেশ দিলেন—'তোমাদের রেশমের উন্নতি করো। নয়তো ওই যে উন্নত ধরণের রেশম যা ওই অঞ্চলেই পাওয়া যাচ্ছে—সেটা যাতে তৈরি না হয় তাই কর।' হাজার ঘাইয়ে কলে-ঘোরানো টাকুর মুখে এবং দু' হাজার আড়াই হাজার দিনমজুরের মোটা হাতে রেশমের উন্নতি কি করে হবে? হ'ল না। কাজেই উন্নত ধরণের রেশম-সুতো তৈরি করার পথ বন্ধের দিকে নজর দিল সায়েবরা। ভুজঙ্গ দত্ত তখন তন্তুবায়দের কাজকর্ম্ম দেখেন। সায়েবরা তাঁকে ডেকে অনেক লোভ দেখালে। কুঠিতে চাকরি দিতে চাইলে। তার পর ভয় দেখালে। একদিন তাঁর অভয়পুরের ঘর পুড়ে গেল। বেজা বীরনগরে তন্তুবায়দের ঘরেও আগুন লাগল। দত্ত অভয়পুর থেকে উঠে এলেন রামজয়দের গ্রামে। তন্তুবায়েরা পাকা বাড়ীর বনেদ পত্তন করলে। কিন্তু পাকাবাড়ী শেষ হবার আগেই একদিন রাত্রে তন্তুবায়দের বাড়ীতে পড়ল ডাকাত, এবং তন্তুবায়দের তিন ভাইয়ের বড় দুই ভাইকে সড়কী দিয়ে গেঁথে খুন করলে, বড় ভাইয়ের বড় ছেলে আপাদমস্তক কাঁথা চাপা দিয়ে পড়ে ছিল—তাকে বলিদানের খাঁড়ার কোপে কাঁথাসুদ্ধ দু'আধখানা করে দিয়ে গেল। জানলে সবাই—বুঝলে সবাই যে এ কাণ্ডের পিছনে কে আছে, কিন্তু প্রমাণ হ'ল না। সব চেয়ে বড় দুঃখ ছিল ভুজঙ্গ দত্তের যে, এই নিয়ে লড়াই করবার জন্তে—একখানা দরখাস্ত করবার জন্তে সারা সদর শহরে একজন উকিল কি মোক্তার তিনি পান নি। চন্দ্রকে মোক্তার করবার সাধ ছিল তাঁর এইজন্ত।

তাই পাঠশালার পড়া শেষ হতেই ভুজঙ্গ দত্ত এক শীতের সকালে চন্দ্রভূষণকে নিয়ে এলেন এই বিল্বগ্রামে। বিল্বগ্রামে তখন একটি মাইনর ইস্কুল হয়েছে। একটা মাইনর ইস্কুল ছিল ওই গন্ধুটিয়ায়। রেশম-কুঠির সায়েবরা ইস্কুলটা করেছিল। ওটা ছিল সায়েবদের কুঠি চালাবার কর্ম্মচারী কেরানী তৈরি করবার জন্য। একেবারে ইংরেজী না-জানা বাংলা-নবীশ লোক নিয়ে কাজ চালাতে অসুবিধা হ'ত। ইস্কুলটা অবশ্য কুঠির সায়েবরা করে নি, করেছিল রেভারেণ্ড জন টমাস। পাগলা পাদ্রী জন সায়েব। সুরুলের চীফ সায়েবের কুঠি থেকে এসেছিল গন্ধুটিয়ায়। তার উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজী শিখিয়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করবে। পাগলা পাদ্রী গ্রামে গ্রামে 'হরিজন' পল্লীতে ঘুরে বেড়াত, তাদের দুঃখে-কষ্টে-রোগে-শোকে পরমাত্মীয়ের মত গিয়ে পাশে দাঁড়াত। লোকে বলে—পাগল সায়েব তাদের ঘরে পান্তা ভাত খেত; তাদের দুঃখের রাত্রে শীতে বর্ষায় তাদের দাওয়ায় পড়ে থাকত। প্রলোভনও দেখাত। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের বলত—ইংরাজী শেখ, বাইবেল পাঠ করিয়া দেখ, প্রভু যীশুর অমৃত উপদেশ অনুধাবন কর। আমরা তোমাকে বিলাত পাঠাইব। দেখিবে সে কি দেশ। সেখানে ছোট জাতি নাই। কুসংস্কার নাই। নূতন জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিবে। সুসভ্য হইবে। আত্মার উন্নতি হইবে। এখানে তখন তুমি উচ্চ পদ পাইবে।—কিন্তু আশ্চর্য্য, একজনও ক্রীশ্চান হয় নাই। রেভারেণ্ড জন চলে যাবার পর ইস্কুলটি অবশ্য উঠে যায় নি, কিন্তু তার আর উন্নতিও হয় নি। সায়েবরা তা চায় নি।

মৃগাঙ্কবাবু ওই কুঠিয়ালদের ইস্কুল থেকেই মাইনর পাস করেছিলেন। চন্দ্রভূষণকে তাঁর বাপ ও ইস্কুলে দেয় নি ওই কুঠিয়ালদের ভয়ে। যে কুঠিয়ালদের ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছে তাদের ইস্কুলে ছেলেকে পড়তে দেবে কোন্ সাহসে? বিল্বগ্রামের পাশে কৃষ্ণপুর কায়স্থপ্রধান গ্রাম। সম্পন্ন গৃহস্থ সব। কৃষ্ণপুরে ওই অবস্থাপন্ন আত্মীয় গোপাল ঘোষের বাড়ীতে ছেলের জন্য আশ্রয় এবং অন্ন ভিক্ষা করেছিল ভুজঙ্গ দত্ত। ওখানে খাবে থাকবে এবং মাইলখানেক দূরে বিল্বগ্রাম মাইনর ইস্কুলে পড়বে।

সেদিনের কথা আজও মনে জলজল করছে চন্দ্রভূষণবাবুর। বাল্যকালের স্মৃতির মত মধুর মনোরম আর কিছু হয় না। কতদিন—অবসর সময়ে একা বসে বসে ভাবেন। স্কুলের সেসন শুরুতে যখন আপার প্রাইমারি শেষ করে দশ-বারো বছরের ছেলেগুলি টিনের পোর্টম্যাণ্টো, শতরঞ্জি বা চটমোড়া বিছানা নিয়ে বোর্ডিঙে এসে ভর্ত্তি হয় তখন তাঁর মুখে একটি স্মিত হাস্যরেখা ফুটে ওঠে। গ্রাম্য চেহারা, সরল ভীরু চোখের দৃষ্টি, নতুন জামা, নতুন কাপড়, নতুন জুতো পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়ায় অভিভাবকের সঙ্গে। ঠিক এমনি ভাবে বাপ ভুজঙ্গ দত্তের সঙ্গে এগার বছরের চন্দ্র এসে কৃষ্ণপুরের গোপাল ঘোষ মশায়ের বাড়ীতে উঠেছিল। লম্বা হিলহিলে চেহারা, মাথায় পুরু চুল, চোখে চকিত দৃষ্টি, মনে পড়ে বৈকি। মনে আছে কপালে তিলক, গলায় তুলসীর মালা, মাথায় টিকি, স্থূলকায় গোপাল ঘোষ তক্তপোশের উপর বসে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ লিখছিলেন। চন্দ্রকে দেখে বলেছিলেন—ও ভুজঙ্গ, তোমার

ছেলে যে চকা গরুর মত তাকায় হে! কিরে তুই গুঁতোস নাকি?

বলে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। গোপাল ঘোষ কর্কশভাষী ছিলেন না—সে আমলে লোকে তাঁকে রসিকজন বলত। সে আমলে এমনিই ছিল গ্রাম্য রসিকতা। অবশ্য অন্নপ্রার্থী বলে একটু অবজ্ঞা নিশ্চয়ই ছিল। চন্দ্রভূষণের ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু ভয়ে কাঁদতে পারে নি তখন। কেঁদেছিল বাপ চলে যাওয়ার সময়। বিল্বগ্রাম ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে ছেলেকে উপদেশ দিয়ে ভুজঙ্গ দত্ত উঠে দাঁড়াতেই কেঁদে ফেলেছিল। ঠিক এক মুহূর্তে মনে হয়েছিল—পৃথিবীতে সে একা, তার আর কেউ নাই। সে এক বিচিত্র অবস্থা—মর্মান্তিক অনুভূতি। অমাবস্যার রাত্রে দমকা বাতাসে দপ করে আলো নিভে গেলে হঠাৎ যেমন অমাবস্যার অন্ধকার এক মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলে ঠিক তেমনি ভাবে মুহূর্তে ছেলেদের মন আচ্ছন্ন করে দেয়—হতাশা—ভয়, এবং হঠাৎ কেঁদে ফেলে। চন্দ্রও কেঁদে ফেলেছিল। অনেক ছেলে বাপের কাপড় বা চাদরের খুঁট চেপে ধরে। তা চন্দ্র পারে নি। ভুজঙ্গ দত্তকে লোকে বলত কঠিন লোক। বাইরে সমাজে ছিল নিঃশব্দ ব্যক্তি, বরং ভীরু, কিন্তু বাড়ীতে পাঠশালায় ছিল ঠিক তার বিপরীত। কুঠিয়াল সায়েবদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে এসে ভিন্ন গ্রামে বাস করা অবধি তার এই চরিত্র দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। ঠিক মাটির পাথর হয়ে যাওয়ার মত। ক্রমশঃ জলধারণের শক্তি চলে যায়, জলে নরম হয় না শুধু শীতে ঠাণ্ডা হয়, গ্রীষ্মে তেতে ওঠে। তার মাত্রা—সাধারণ মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় দু'দিকেই।

চন্দ্র কেঁদে ফেলতেই ভুজঙ্গ দত্তের ট্যারা চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিল। মুখের কোন জায়গায় কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নি—ভুরু বা কপালে একটি কুঞ্চনরেখাও না। শুধু আশ্চর্য্য রকমের স্থির। দেখেই চন্দ্রের চোখের জল মুহূর্তে শুকিয়ে গিয়েছিল। ভুজঙ্গ দত্ত এতক্ষণে একটু নড়েছিল। নড়েছিল শুধু ঠোঁট দুটি। মৃদু স্বরে ধীর উচ্চারণে কয়েকটি কথা বলেছিল শুধু—খবরদার! কাঁদবি না। যদি শুনি কান্নাকাটি করেছিস—তা হলে এসে তোকে নিয়ে যাব, পথে গলায় পা দিয়ে মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দোব।

বলেই ভুজঙ্গ দত্ত ছেলের দিকে পিছন ফিরে নিজের গ্রামের দিকে পা বাড়িয়েছিল। একবারও ঘুরে তাকায় নি। চন্দ্রভূষণও আর কোন দিন দিনের আলোতে কাঁদে নি। কাঁদত রাত্রে।

গোপাল ঘোষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। জোতজমা পুকুর বাগানের মালিক—গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, গোলায় ধান, সিন্দুকে বন্ধকী গয়না ছাড়াও সামান্য দু'শো আড়াইশো টাকা আয়ের পত্তনী মহলের অংশও ছিল তাঁর। কায়স্থের ছেলে, জমিদারী সেরেস্তার কলমে দক্ষতাও ছিল অসামান্য। বসেও খেতেন না, বড় জমিদারের মহলে গোমস্তাগিরি করতেন। ঘরে ছিলেন মিতব্যয়ীর চেয়েও একটু বেশী। বাড়ীতে চাকর-বাকর ছিল না। গরুবাছুরের রাখাল মাহিন্দার দিয়েই সব কাজ চলত। বাড়ীতে অন্য লোক ছিল না। বাইরের ঘরটা ছিল বাড়ী থেকে প্রায় পৃথক। সম্পত্তির মধ্যে থাকত একখানা তক্তপোশ, কয়েকটা মোড়া, খান-দুই চেয়ার। আর তাকের উপর থাকত দোয়াত-কলম এবং হালসালের পঞ্জিকা ও

একখানা চৈতন্যচরিতামৃত। এই ঘরেই স্থান হয়েছিল এগার বছরের চন্দ্রভূষণের। ডাকাতির ভয়ে সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোপাল ঘোষ ইষ্টস্মরণ, হরিনাম-সংকীর্তন ইত্যাদি সেরে খেয়ে-দেয়ে টিনে-ছাওয়া কোঠাবাড়ীর উপরতলায় উঠে সিঁড়ির মুখে চাপা দরজা ফেলে দিতেন। চাপা-দরজা এক বিচিত্র ব্যবস্থা। পাশাপাশি দু'প্রস্থ ঘরের মাঝখানে সোজা সিঁড়ির মাথায় একখানা ভারী তক্তা সিঁড়ির মাথায় পড়ে যেত পাটাতনের মত। খোলা ফেলার ব্যবস্থা উপর থেকে। ঢেঁকী শাবল গাঁইতি কুড়ুল কোন কিছুই চালানো যায় না—মাথার উপর যা পড়ে থাকে সিন্দুকের ডালার মত। ঘোষ উপরে বসে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থাকতেন। জানালার ধারে বসে মধ্যে মধ্যে হাঁকতেন—কে যায়?

চন্দ্রভূষণ থাকত বাইরের ঘরে। দিনে যে কান্না কাঁদতে ভরসা পেত না, সেই কান্না কাঁদত রাত্রে। দুরন্ত আতঙ্কে অধীর হয়ে কাঁদত। এ কোন্ পৃথিবী? কেউ কোথাও আপনার জন নাই, কোথাও একবিন্দু আনন্দ নাই—হাসি নাই—সুখ নাই—এ কোন্ পৃথিবী? সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজত। বাল্যকালে পাঁচ বছর বয়সেই মা মারা গিয়েছিলেন—বাবা আর বিবাহ করেন নি—একটি বৈষ্ণবদের মেয়ে বাড়ীতে থাকত কাজকর্ম্ম করত। তার আকর্ষণ খুব ছিল না। একালে তার কথা মনে হলে চন্দ্রভূষণবাবুর ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে; সে কথায় আজকাল মনে মনে পিতৃনিন্দা অস্ফুট ভাবে সাড়া দিয়ে ওঠে, একটু লজ্জা অনুভব করেন। কিন্তু সেকালে কিছু মনে হ'ত না। সেকালে এটা যেন একটা অত্যন্ত সাধারণ দোষের কথা ছিল। বাড়ীর কোন বিশেষ মানুষের জন্য কাঁদত না, কাঁদত সবার জন্য সকল কিছুর জন্য—পরিচিত ঘরবাড়ী মাঠঘাট গাছপালা জীবজন্তু, পরিচিত সকল মানুষ, সবার জন্যই কাঁদত। অপরিচয়ের পীড়ায় পরিচিত সকল-কিছুর জন্য বিচিত্র মমতা।

হঠাৎ কান্না থেমে যেত। কোন শব্দ উঠত। গাছে ডালপালায় ঝটপট করে উঠত কিছু, নয়ত সশব্দে কিছু পড়ত কোথাও, নয়ত দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ উঠে চলে যেত দূরে। হয়ত-বা কোন স্বর শোনা যেত। এঁ্যা—ও!

চন্দ্রভূষণ আঁতকে উঠত। কি? কিসের শব্দ? ভূত? প্রেত? পিশাচ? ডাকাত? ওঃ, সে-কি মর্ম্ম-যন্ত্রণাকর আতঙ্ক। বিস্ফারিত চোখে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে বসে থাকত চন্দ্রভূষণ। তখন ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাইন-ডাকিনী চারিদিকে স্বচ্ছন্দ-বিচরণে ঘুরত। কত গাছে কত ভূতই না ছিল! এই যেখানে চৈতন্য ইনষ্টিটুশন হয়েছে এইখানেই ছিল দুটো প্রকাণ্ড প্রাচীন বট। কৃষ্ণপুর থেকে বিল্বগ্রাম মাইনর স্কুলে যেতে হলে এই বটগাছের তলা দিয়ে যেতে হ'ত। এই পথে সেকালে শব নিয়ে যেত উদ্ধারণপুর, বিল্বগ্রাম ঢুকবার মুখে, এই গাছে মড়া ঝুলিয়ে রেখে শববাহকেরা গাছতলায় রান্নাবান্না করে খেত। গাছ দুটোয় পিশাচ থাকার প্রবাদ ছিল। কত শব নাকি হারিয়েছে এখানে। দক্ষিণ দিকে—প্রশস্ত মাঠটায় সেকালে আলেয়া জ্বলে জ্বলে বেড়াত!

ভোর হ'ত। সূর্য্য উঠত। চন্দ্র বেরিয়ে আসত ঘর থেকে। আলোর মধ্যে বাঁচত। হতাশা কাটত। অন্ধকার রাত্রি আর একাকীত্ব এর চেয়ে ভয়াল নিষ্ঠুর আর কিছু হয় না।

রাত্রে সে সঙ্কল্প করত—ভোর হলেই উঠে সে পালাবে। দু'চার দিন মাঠের পথ ধরে খানিকটা চলেও যেত, কিন্তু খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়াত, তার পর আবার ফিরত। পড়া করতে হবে—অঙ্ক কষতে হবে। ফেরার পথে মাঠের এখানে-ওখানে বৈচি ফুলের গাছ থেকে বৈচি সংগ্রহ করে নিত। ক্লাসে শরৎ বলে একটি ছেলে আছে—ভারি মিষ্টি চেহারা—তাকে দেবে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, History repeats itself—বিখ্যাত ইংরেজী প্রবচনটি আশ্চর্য্য ভাবে সত্য। পৃথিবীতে সেই আদিকাল থেকে মানুষের জীবনে একই খেলার পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। সেই একই খেলা—শুধু রং বদলায়, ঢঙ পালটায়, পুরনো পোশাকের বদলে নতুন পোশাক পরে। এই তো মাসখানেক আগে কেষ্টচন্দ্র দুটি যুধ্যমান ছেলেকে ধরে এনেছিল তাঁর কাছে। ক্লাস ফোর আর ফাইভের ছেলে। দু'জনেরই বাড়ী বিল্বগ্রাম। চাটুজ্জেদের রবি আর মুখুজ্জেদের দুলু। রবি দুলুর নাকে খামচে দিয়েছে, তার জামার পকেটটা ছিঁড়ে দিয়েছে দুলু রবির হাতে কামড়ে ধরেছিল জন্তুর আক্রোশে। আক্রমণ করেছে আগে রবি।

—কি হয়েছে? কিসের জন্য এ মারামারি? একটু কঠোর স্বরেই বলতে হয়। ধমক দিতে হয়—এও—বলো বলো।

ছেলে দুটি কাঁদে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মোছে আর ফোঁপায়। রবির ফোঁপানি—কান্না চোখ মোছা—একেবারে মেকি; ছেলেটা দুষ্টু। সত্য সত্য কাঁদছে দুলু। ওর ভয় দুঃখ অভিমান অকৃত্রিম। হাসি আসে কিন্তু সে হাসি সম্বরণ করতে হয়। বলতে হয় —Don't cry, you, don't cry—বল—কথা বল।

বলে কেষ্ট। দুলুর কাকা কাল কলকাতা থেকে এসেছে, 'লেবেনচুষ' এনেছে। সেই লেবেনচুষ দুলু পকেটে পুরে এনেছে ওর কেলাসের বন্ধু অমরের জন্যে।

—অমর?

—ওই যে বনগাঁয়ের সুন্দর মতন ছেলেটা এবার এসে ভর্ত্তি হয়েছে। থাড় কেলাসের সমরের ভাই।

—আচ্ছা। তার পর?

তার পর বলে প্রশ্ন করলেও বাকিটা বুঝতে বাকি থাকে না। রবি ওর কাছে লেবেনচুষ চেয়েছিল। দুলু দেয় নি। কেন দেবে? কেমন করে দেবে? নিজের ভাগ থেকে দুটি নিয়ে এসেছে অমরের জন্যে, সে কি অন্য কাউকে দেওয়া যায়? রবির দাবি—সে তার পাড়ার ছেলে—আপনার লোক; তার চেয়ে ওই কোন্ দেশের কে—'অমরা না ফমরা' সে বড় হ'ল? তাই বা কেন হবে? এবং সে যখন বয়সে বড়—অধিকতর শক্তিশালী তখন দুলুর অমতে অনিচ্ছায় কি আসে যায়! মাৎস্যন্যায় তো এমনি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্ততঃ মানুষের ক্ষেত্রে। বড় মাছ ছোট মাছকে খায় দেখতে পেলেই, মানুষ মানুষের কাছ থেকে শক্তিপ্রয়োগে কেড়ে নেবার আগে একবার বলবে না? সে যে কথা কইতে শিখেছে। দুলুর পিঠে হাত বুলিয়ে

শান্ত করে রবির কানটা আলগা করে ধরে বেশ কয়েকটা ধমক দিয়ে বিদেয় করেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেদিন তাঁর ছেলেবেলার এই কথাটি মনে পড়েছিল। শরতের জন্য বৈচি আনার কথা :

কয়েক দিনেই শরতের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল।

বিল্বগ্রামের পশ্চিমে কৃষ্ণপুর, পূর্ব্বে গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুরের ব্রাহ্মণদের ছেলে শরৎ। ভারি ভাল গান গাইত। ওর বাবা যাত্রার দলে সেকালে জুড়ির গান করত।

ভোলা মহেশ্বর—বোম্!

লটপট জটাজুট গলে ফোঁসে অজগর—বোম্।

ওই শরতের সঙ্গে ভালবাসাই চন্দ্রভূষণের সেদিনের অপরিচয়ের শ্বাসরোধী যন্ত্রণার লাঘব করেছিল। প্রথম বছরেই আর একজনকে ভাল লেগেছিল; মাইনর ক্লাসের দেবরাজ মুখুজ্জেকে; বিল্বগ্রামেরই কুলীনপাড়ার গৃহস্থবাড়ীর ছেলে; ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়; টকটকে রঙ, নীলচে চোখ, ধারালো চেহারা, কিন্তু কথা ছিল ভারি মিষ্ট। আর ছিল দেবরাজের খুড়তুতো ভাই ঋষিরাজ—দেবরাজের সঙ্গেই পড়ত, মোটা-সোটা গোলগাল—কথাবার্ত্তা বিস্বাদ ছিল না, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগত না। দেবরাজের মত বুদ্ধি ছিল না তবে কখনও পিছনে পড়ে থাকে নি। বরাবর পাস করে গিয়েছে। হেড মাষ্টার বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জে বলতেন—দেবরাজ the intelligent and ঋষিরাজ the diligent. দেবরাজের সঙ্গে ভাব হয়েছিল বিচিত্র ভাবে। দেবরাজের স্বভাব ছিল নীচের ক্লাসের ছেলেদের পড়া ধরা। অঙ্কে দেবরাজ ছিল অদ্ভুত তীক্ষ্ণধী। ইংরেজীতেও ভাল ছিল দেবরাজ। কিসেই বা ভাল না ছিল। দেবরাজ চন্দ্রকে দেখেই প্রশ্ন করেছিল—Hallo boy—where do you come from?

চন্দ্র উত্তর দিতে পারে নি। কি করে দেবে? ইংরেজী A. B. C. D.ও তখন শেখে নি। সে বলেছিল—ইংরিজী আমি জানি না।

—হে বালক, কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় ঘর?

চন্দ্র উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করেছিল—আপনি কোথায় ঘর কেন বললেন?

—কি বলব তবে? গৃহ?

—না। কোথায় নিবাস!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত চন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে তার পিঠ চাপড়ে বলেছিল—Very good, very good; very, very, very good.

দেবরাজ সেই বৎসর বিল্বগ্রাম জি. সি. এম-ই স্কুল থেকে চার টাকা বৃত্তি নিয়ে মাইনর পাস করেছিল। ঋষিরাজ সাধারণ ভাবে পাস করেছিল। চন্দ্রভূষণও নিজের ক্লাসে সেবার ফার্ষ্ট হয়ে উপরের ক্লাসে উঠেছিল। বিশ্বেশ্বরবাবু হেডমাষ্টার বলেছিলেন—ভাল করে পড়বে তুমি। দেবরাজের মত স্কলারশিপ নিতে হবে তোমাকে!

দেবরাজ বি-এল পাস করে উকীল হয়েছেন। মস্ত বড় উকীল। বিল্বগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ঋষিরাজও উকীল। তিনিও গ্রামে আসেন না। অথচ দেবরাজ বলতেন—আমি

হব একজন ম্যাথামেটিসিয়ান। ঋষিরাজের ওসব বালাই ছিল না। তিনি বলতেন—আমি ভাই চাকরি করব। এই পোষ্টমাষ্টার-টাষ্টার গোছের।

চন্দ্রভূষণের মোক্তার হবার কথা। সেও মাইনরে বৃত্তি পেয়েছিল। যেদিন বৃত্তি পাওয়ার খবর এসেছিল, সেদিন বাপ ভুজঙ্গ দত্ত সমাদর করে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিল—মোক্তার নয়, উকীল হতে হবে। মনে থাকে যেন। তুই যেদিন উকীল হয়ে সদরে শামলা মাথায় দিয়ে জজকোর্টে ঢুকবি, সেই দিন আমি গাঁয়ের ভিটেতে নতুন বাড়ীর ভিৎ পত্তন করব। বড় দুঃখে গাঁ ছেড়ে এসেছি, কুঠিয়াল সায়েবদের এলাকায় সেরা জমি ছিল পাঁচ বিঘে তা জলের দামে বেচে দিয়েছি। কিন্তু ভিটেটা বেচি নি—তোর আশায়। বুঝলি!

তবু চন্দ্রভূষণের উকীল হওয়া হয় নি।

রামজয় বলে—'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।' ভাগ্য? না। ভাগ্য নয়। উকীল হতে চান নি তিনি।

রামজয় তার শাস্ত্রবাক্যের অভ্রান্ত সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে বলে—ভাগ্যের চক্রান্ত, নইলে পণ্ডিতমশায় এমন ধড়াস করে মরে যাবেন কেন? সামনে বি-এ পরীক্ষা, ক্ষৌরির দিনে পরীক্ষা আরম্ভ!

তর্ক চন্দ্রভূষণ করেন না। মনে মনে ভেবে দেখেন। অতীত ঘটনাগুলিকে বিচার করেন। কি থেকে কি হ'ল, কেন হ'ল বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করেন। সব মনে পড়ে না। কত বিচিত্র সংঘটনের স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়। নিজের ত্রুটি ও অপরাধের স্মৃতি-জড়িত ঘটনা সেগুলি; এগুলি মন ভুলে যায়; এ তার স্বভাব। অপকর্ম্ম বা কুকর্ম্মের ছোঁয়াচলাগা জিনিসপত্র যেমন জলে ফেলে দেয় বা পুড়িয়ে ফেলে মানুষ—ঠিক তেমনি ভাবে মনও স্মৃতিকে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিন্তু বিচিত্র স্মৃতির খেলা, ডুবে গিয়েও সে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না, ধ্বংস হয় না। সুযোগ পেলেই বিস্মৃতির অতল থেকে উপরে ভেসে ওঠে। গল্পের সেই সাত ভাই চম্পা ও বোন পারুলের মত। বড় রাণী ছোট সতীনের সাত ছেলে ও এক মেয়েকে আঁতুড়ে মেরে ছাইগাদায় পুঁতে দিয়েছিল—তাই থেকে হয়েছিল সাতটি চাঁপার গাছ আর একটি পারুলের গাছ। গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছিল। সুখস্মৃতি, প্রশংসার কাজ, গৌরবের ঘটনা মানুষ অহরহ মনে করে রাখে—ভেসে যাবে জলের উপরে পদ্মফুলের মত।

মাইনরে বৃত্তি পেয়ে জেলা ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিল চন্দ্রভূষণ। শিবচন্দ্র সোম; হেডমাষ্টার। বাংলা দেশের হাই ইংলিশ স্কুলের ইতিহাসে ভীষ্ম-দ্রোণের মত মহারথী; দেখলে অভিভূত হয়ে যেত চন্দ্রভূষণ। কি তেজস্বিতা! কত জ্ঞান! কি চরিত্র!

কত বড় বড় মানুষ তিনি তৈরি করেছেন। এই তো রায়পুরের ব্যারিষ্টার সিংহ তাঁর ছাত্র। এইবারই সিংহ সর্ হয়েছেন। তাঁর ভাই সিবিল সার্জ্জন হয়েছেন। তিনিও শিববাবুর ছাত্র।

বড় বড় ব্যারিষ্টার উকীল, বড় বড় ডাক্তার, প্রফেসর, হেডমাষ্টার, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ কত যে তাঁর ছাত্র সে হিসেব কেউ করে নি। তাঁর জীবনী লেখা হয় নি। হবেও না। শোনা যায় একজন বিদ্বান ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর সঙ্গে আলাপ করে পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—ওয়েল মিঃ সোম, একটা প্রশ্ন করব কিছু মনে করো না। তোমার মত পণ্ডিত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন লোক হেডমাষ্টার হয়েছ কেন? কেন তুমি শাসনবিভাগে চাকরি নাও নি? চেষ্টা করো নি? না—চেষ্টা করে পাও নি?

হেসে তিনি বলেছিলেন—আমি চেষ্টা করি নি।

—শুনে আমি সুখী হলাম। কারণ এদেশে অনেক বড় ইংরেজ কর্ম্মচারীর তোষামোদ-প্রিয়তার কথা জানি। তারা তোষামোদের খাতিরে যোগ্য প্রার্থীকে ফেলে অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য স্তাবকদের ছেলেপুলেদের চাকরি দেয়। যোগ্য প্রার্থীর নির্ভীকতা বা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান দেখলে তারা রুষ্ট হয়। আমি ভেবেছিলাম এইরকম কিছু শুনব।

—না। আমার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটে নি।

—কিন্তু তুমি শাসন-বিভাগে চাকরির চেষ্টা করো নি কেন?

—শিক্ষাবিভাগের চাকরি আমি পছন্দ করেছিলাম, আজও করি। তুমি জান কিনা জানি না—আমাদের দেশে গুরুর স্থান সর্ব্বোচ্চে।

—সে সব দেশে মিঃ সোম। আমাদের দেশেও।

—তা ছাড়াও—। শিবচন্দ্র বলেছিলেন—সায়েব, কথা বলতে গিয়ে আধখানা বলে আধখানা না বলা সেও এক ধরণের মিথ্যাচরণ। সেই হিসেবেই তোমাকে বলি—প্রথম জীবনে একটা সঙ্কল্প নিয়েছিলাম। এ ডিভাইন ভাউ। এন্ ওথ। টু ডেডিকেট মাই লাইফ টু বিল্ড এ নিউ বেঙ্গল। নতুন বাংলা তৈরির হিরো তৈরি করছি আমি।

সায়েব বলেছিল—বিরাট আদর্শ তোমার মিঃ সোম। দেশে ফিরে গিয়ে এ দেশ নিয়ে আমার বই লিখবার ইচ্ছা আছে। যদি কাজে পরিণত করতে পারি সে ইচ্ছেকে, তা হলে তার মধ্যে একটা চ্যাপ্টার রাখব—যে সব বিচিত্র মানুষ আমি দেখেছি। তার মধ্যে তোমার কথা আমি লিখব মিঃ সোম।

শিবচন্দ্র জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—যেন আকাশের গায়ে তাঁর কল্পনার ছবি ভেসে উঠেছিল; বলেছিলেন—'আমার কল্পনা কি জানো সায়েব, আমার কল্পনা—ইউরোপে যেমন ইংলণ্ড গড়ে উঠেছে, তোমরা গড়ে তুলেছ, ভারতবর্ষে তেমনি করে বাংলা দেশ গড়ে তুলব। ভারতবর্ষের ইংলণ্ড।' তার পর হেসে বলেছিলেন—'কিন্তু আমার নামের জন্য আমি আদৌ ব্যগ্র নই। নট এট্ অল্।' বলেই তিনি কবি টমাস গ্রের এলিজি থেকে আবৃত্তি করেছিলেন:

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen

And waste its sweetness on the desert air."

আমি বাংলাদেশের গৌরবের সমুদ্রের তলায় অনাবিষ্কৃতই থাকব।

শিবচন্দ্র সোমের এলিজি পড়ানো এখনও কানের কাছে গানের মত বাজে। খানিকটা দূরে গম্ভীর এবং গভীরকণ্ঠ গায়কের গাওয়া ধ্রুপদ গানের মত। তানপুরার তারের ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেমন ঘরের জানালার গরাদে এবং অন্য ধাতুপাত্রে স্পর্শ করলে বুঝা যায়, ধাতুর সর্বাঙ্গে নীরব কম্পনে একটি ঝঙ্কার ওঠে, তেমনি ঝঙ্কার উঠত বুকের ভিতর।

"The boast of heraldry, the pomp of power,
And all that beauty, all that wealth e'er gave.
Awaits alike th' inevitable hour :
The paths of glory lead but to the grave."

ফার্স্ট ক্লাসে এলিজি তিনি পড়াতেনই! সে পাঠ্য থাক বা না থাক। সেই ফার্স্ট ক্লাসেই মুখস্থ হয়ে গেছে। আর পড়াতেন 'ডেজার্টেড ভিলেজ'। বাংলা দেশের গ্রামের সঙ্গে তুলনা করতেন। বিচিত্র মানুষ—গ্রামের এম-ই স্কুলে খোঁজ করে ভাল ছেলেদের আনাতেন। পড়বার ব্যবস্থা করে দিতেন। বৃত্তি পাওয়া ছেলেদের নামে পত্র যেত। চন্দ্রভূষণ পত্র পেয়েছিলেন। বড় দুঃখ সে পত্র নাই, হারিয়ে গেছে। ভর্তির সময় ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন—Well—what's your name? ইংরেজীতে প্রশ্ন করতেন, ইংরেজীতে উত্তর দিতে হ'ত। সবশেষে জিজ্ঞাসা করতেন, One more question. Well—বড় হয়ে কি হবে তুমি? ম্যাজিস্ট্রেট? এ জাজ? প্রফেসর? টিচার? ডক্টর? এ বার-এ্যাট-ল? এ ভকীল? হোয়াট? কি হবে তুমি? ইউ। বল। স্পীক আউট।—এ ভকীল! গুড। বক্তৃতা করতে পার? ওয়েল—বল, মনে কর আমি জাজ, তুমি এসেছ ভর্তি হতে। বল—তোমার কেস বল। তোমার নাম বল, বাবার নাম বল, গ্রামের নাম বল। জাষ্ট লাইক দিস—সর্ মাই নেম ইজ—হোয়াট'স ইওর নেম?—রাখালচন্দ্র ঘোষাল, সন অব ঘোষাল; আই এম এন ইনহ্যাবিট্যাণ্ট অব বিরগ্রাম ইন দি ডিষ্ট্রিক্ট অব—; গো অন। গো অন।

ছেলে বলে যেত। সোম কখনও বলতেন—গুড, ভেরি গুড, কখনও বলতেন—নো নো নো মিস্টেক। ভুল সংশোধন করে দিতেন।

চন্দ্রভূষণের বুকের ভিতরটা ভয়ে গুর্‌গুর্ করে উঠেছিল। উকীল হব বললেই বক্তৃতা করতে বলবেন—এই বিরাট পুরুষ! গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

তখন একজন ডাক্তার হতে ইচ্ছুক ছেলেকে শিবচন্দ্র সোম প্রশ্ন করছিলেন—ওয়েল মিঃ উজবি ডক্টর ক্যান ইউ টেল মি—হোয়াট ইজ দি ইংলিশ ওয়ার্ড ফর দি ডিজিজ ওলাউঠা? বসন্ত? পানবসন্ত? ক্যান ইউ স্পেল টাইফয়েড? ওয়েল টেল মি। ধর একজন রোগী, তার পেট কেটে অপারেশন করতে হবে, না করলে সে মরে যাবে আর করলেও সে মরে যাবে, তবে একশ'র মধ্যে এক ভাগ আশা বাঁচলেও বাঁচতে পারে, সেখানে তুমি কি করবে?

ছেলেটি অকপটে বলেছিল—সে আমি জানি না সর্। That I don't know sir.

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন শিবচন্দ্র সোম। তার পর বলেছিলেন—একজন ইংরেজ ডাক্তার কি করবে জান? সে কাটবে। ওই এক পারসেণ্ট চান্স, হি উইল নট মিস। গুড। দেন—ইউ—হোয়টস ইউর নেম—

—মাই নেম ইজ চন্দ্রভূষণ দত্ত।

—সে—শ্রীচণ্ড্ভূষণ ডাটা। কি হবে তুমি?

—এ টিচার সর্।

উকীল ডাক্তারদের অবস্থা দেখে নিতান্ত নিরীহ মাষ্টার হবারই বাসনা করেছিল সে। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের ধার দিয়েই যায় নি—কে জানে কোন্ ফ্যাসাদ বাধবে।

—এ টিচার? দ্যাটস গুড, বাট হোয়াট টিচার—এ হেডমাষ্টার লাইক মি?

ওরই মধ্যেই যে ভবিষ্যতের সঙ্কল্পের বীজ পরিবর্ত্তন হয়েছিল তা সেদিন অনুমান করতে পারেন নি চন্দ্রভূষণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হেডমাষ্টার শিবচন্দ্রের প্রশ্নের ভয়ে সেদিন চন্দ্রভূষণ 'উকীল বা মোক্তার হব' একথা বলেন নি। যদি হেডমাষ্টার বক্তৃতা করতে বলেন? উকীলের ইংরিজী প্লীডার কথাটা জানা ছিল, কিন্তু মোক্তার কথাটার ইংরেজী তিনি জানতেন না। নবগ্রাম এম-ই ইস্কুলে কেউ কোন দিন বলে দেয় নি যে শব্দটা ফারসী ওর ইংরেজী হয় না। বলেছিলেন—আই শ্যাল বি এ টিচার, এ স্কুল মাষ্টার। কিন্তু মনে মনে উকীল বা মোক্তার হবার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দেন নি। সদর শহরে বড় বড় পাকা বাড়ীগুলির সামনে দাঁড়ালেই চোখে পড়ত ফটকের গায়ে বা মার্বেলের প্লেটে লেখা আছে কোন-না-কোন উকীলের নাম।···বি-এল; এম-এ, বি-এল, প্লীডার জজকোর্ট। দু'চারজনের বাড়ীর সামনে ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। শহরে যেখানেই যা-কিছু হোক উকীলেরাই সামনে এসে আসর জাঁকিয়ে বসতেন। আদালতেও মধ্যে মধ্যে যেতেন চন্দ্রভূষণ। দেখতে যেতেন। চোগা, চাপকান, শামলা, গার্ড চেন পরা উকীলেরা, কোর্টের প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দা অতিবাহন করে এ কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে যেতেন, পিছনে পিছনে মক্কেলের দল ছুটত, কেরানীরা ছুটত, তাঁদের পায়ের চকচকে চীনেবাড়ীর জুতোর মচমচ শব্দ উঠত, চন্দ্রভূষণ সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে থাকতেন। উকীলদের শুধু একটা জিনিস তাঁর ভাল লাগত না। যাঁরাই বড় উকীল, ভাল উকীল তাঁরাই প্রায় সকলেই বড় মোটা। মস্ত ভুঁড়ি। দু' একজন যে বেশ আঁটসাট-দেহ প্রবীণ ছিলেন না তা নয়, ছিলেন এবং দু'একজন অতি শীর্ণদেহও ছিলেন, তবু বড় উকীলত্ব এবং ভুঁড়িসমেত মোটাত্ব এ দুটোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। তরুণ উকীলেরা ফিটফাট ছিলেন, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল বড় উকীলদের দিকে। ফৌজদারী বড়

উকীল হরিহর মিশ্রের 'বহশ' শুনতে যেতেন মধ্যে মধ্যে। অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা করে যেতেন, কখনও গলা চড়ত, কখনও নামত, কখনও আবেগে কাঁপত, শুনে ভয় হ'ত চন্দ্রভূষণের। মনের জোর কমে যেত।

হঠাৎ একদা বিচিত্র ঘটনায় চন্দ্রভূষণ গভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্কল্প করলেন—না, তিনি উকীল হবেন না। উকীল না, মোক্তার না, ডাক্তার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট না, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট না, এসব কিছু হবেন না তিনি।

বিচিত্র একটি ছেলে এল ইস্কুলে। ১৮৯৪ সন। চন্দ্রভূষণ সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছেন। ক্লাসে তিনি প্রথম তিনজনের একজন। সেবার ফার্ষ্ট হয়েছেন। একদিন ইস্কুলটা হয়ে উঠল 'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মত'। সারা ইস্কুলে একটা গুঞ্জন উঠল। ইস্কুলের আপিস-রুমের পাশের ঘরের ক্লাস থেকে মিনিটকয়েকের মধ্যে সকল ক্লাসে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—'অদ্ভুত একটা নতুন ছেলে এসেছে। আশ্চর্য্য ছেলে! এমন সুন্দর ছেলে গোটা ইস্কুলে নেই। সোনার মত গায়ের রং। আর ধারালো তলোয়ারের মত চেহারা।'

আবার কয়েক মিনিট পরে সংবাদ ছড়িয়ে গেল—'সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হচ্ছে। এখানকার নতুন এস-ডি-ও সাহেবের ছেলে।'

চন্দ্রভূষণদের ক্লাস-রুমের সামনেই বারান্দা, সেখানে সত্যই এস-ডি-ওর তকমা-পরা আরদালী দাঁড়িয়ে ছিল। আধ ঘণ্টা পরেই স্বয়ং হেডমাষ্টার শিববাবু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। ছিপছিপে লম্বা ছেলেটির গায়ের রং সোনার মতই বটে। মাথায় রুখু বড় চুল, অবিন্যস্ত এবং ঈষৎ পিঙ্গল। চোখে সোনার চশমা। দৃষ্টিতে প্রসন্ন দীপ্তি। পরনের কাপড় জামা ধবধবে সাদা। খালি পা। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সহপাঠীদের দিকে। ঠোঁট দুটির মিলনরেখায় হাসির আভাস।

শিববাবু বললেন—দিস ইজ ইওর ক্লাস। তার পর বললেন—বয়েজ, হি ইজ মাষ্টার সুপ্রকাশ বোস, ইয়োর নিউ ক্লাস ফেলো।

ছেলেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল, এমন ভাবে তো শিববাবু কোন দিন কোন ছাত্রকে ক্লাসে নিজে নিয়ে আসেন নি। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, এস-পি, এস-ডি-ও এঁদের তো কোনদিন তিনি অতি মর্য্যাদা দেন নি—আজ এস-ডি-ওর ছেলে বলে— ?

বিবরণ বললেন হেডপণ্ডিত দেবানন্দ কাব্যতীর্থ; বললেন—ছেলেটা বোধ হয় শাপভ্রষ্ট। হেডমাষ্টারকে কি উত্তর দিয়েছে জানিস ?

হেডমাষ্টার বললেন—তুমি বড় হয়ে কি হবে বল ? কি হতে চাও ?

ছেলেটি বললে—বাবা মা বলেন আমাকে ইংলণ্ড পাঠাবেন, আই-সি-এস হব আমি। কিন্তু—

—কিন্তু কি বল ? আই-সি-এস হওয়া অবশ্যই খুব বড় কথা। তুমি শেষ পর্য্যন্ত কমিশনার হতে পারবে। আমাদের বাঙালীর মধ্যে প্রথম কমিশনার—কে হয়েছিলেন জান ?

—ইয়েস স্যার। রমেশচন্দ্র ডাট, আই-সি-এস। এ গ্রেট বেঙ্গলী নভেলিস্ট টু। অথর

অব মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, এণ্ড মেনি আদার বুকস। বাট—স্যার—

—ওয়েল, গো অন। শিববাবু উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন—বলে যাও।

ছেলেটি বলেছে—বাট স্যার—টু টেল এ লাই ইজ এ সিন। স্পেশ্যালি ইন প্রেজেন্স অব গুরু এণ্ড ফাদার। আই মাস্ট টেল দি ট্রুথ। আই মাইসেলফ—ডু নট লাইক ইট, আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু বি এন আই-সি-এস।

—দেন? হোয়াট ইজ ইট ইউ ওয়াণ্ট টু বি, স্পীক আউট।

—স্যার, আই ওয়াণ্ট টু বি এ মিশনারী।

—মিশনারী? ওয়েল—এ ক্রিশ্চান—

—নো স্যার। এ হিণ্ডু মিশনারী, এ সন্ন্যাসী। লাইক স্বোয়ামী বিবেকানণ্ড—অব চিকাগো ফেম।

স্তব্ধ বিস্ময়ে শিবচন্দ্র সোম ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। এ উত্তর তিনি কোন ছেলের কাছে শোনেন নি।

দেবানন্দ কাব্যতীর্থ নিজে নবদ্বীপের লোক। শুধু সংস্কৃতে কাব্যতীর্থই ছিলেন না। এম-এ পাসও করেছিলেন। তিনি একদিন ক্লাসে এই নিয়ে সুপ্রকাশকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছিলেন—তা হলে তোমার কাছে নাম খ্যাতি প্রতিষ্ঠাই বড়?

সুপ্রকাশ বলেছিল—না স্যার।

—না কেন? তা হলে তোমার মা-বাবা যখন চান তুমি জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হও, কমিশনার হও—তুমি তা না হয়ে সন্ন্যাসী হবে কেন?

সুপ্রকাশ বলেছিল—"যেনাহং নামৃতাস্যাম—কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্?"

চমকে উঠেছিলেন পণ্ডিতমশায়। বলেছিলেন—এ শ্লোক তুমি কার কাছে শিখলে?

—উপনিষদে পড়েছি স্যার। বাবার লাইব্রেরীতে ইংরেজী ট্র্যানশ্লেসন পড়েছিলাম। তার পর বাংলা অনুবাদ সমেত সংস্কৃত উপনিষদ যোগাড় করে পড়েছি আমি। এ শ্লোকটি আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

সুপ্রকাশ তেল মাখত না, মাছ-মাংস খেত না, জুতো পায়ে দিত না। সারাটা ইস্কুলের মধ্যে তার বন্ধু ছিল না। কয়েকজন অনুগত প্রীতিভাজন ছিল মাত্র। এ ছাড়া সব ছেলেই আড়ালে তাকে ব্যঙ্গ করত, সামনে সম্ভ্রম দেখাত। উকীল-মোক্তারদের একদল ফেল-করা ছেলে তাকে সামনেই ব্যঙ্গ করে বলত—'নদের নিমাই। মহাপ্রভু।' সুপ্রকাশ গ্রাহ্য করত না।

এই সুপ্রকাশের প্রভাবে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠবার আগে চন্দ্রভূষণ হৃদয়ের আবেগে মনে মনে শপথ করেছিলেন, "উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কিছু হবেন না তিনি। তিনি সুপ্রকাশের পিছনে পিছনে চলবেন।"

সুপ্রকাশের কাছে তিনি ক্লাসে হেরে গিয়েছিলেন, সে হার তিনি প্রায় প্রথম দিনই মেনে

নিয়েছিলেন বিনা ক্ষোভে বিনা ঈর্ষায়। তিনিই ক্লাসের একদিকে প্রথম বেঞ্চে প্রথম স্থানটিতে বসতেন, ভর্তি হওয়ার পরদিন সুপ্রকাশ ক্লাসে আসতেই চন্দ্রভূষণ নিজের সীট ছেড়ে দিয়ে সরে বসেছিলেন। জেলা ইস্কুলের দুটি বছর তাঁরা পাশাপাশিই বসতেন। সুপ্রকাশ ফার্স্ট, তিনি সেকেণ্ড। পরীক্ষাতেও তাই হ'ত। কিন্তু ফার্স্ট এবং সেকেণ্ডের ফলে অনেক পার্থক্য। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সুপ্রকাশ হয়েছিল সেকেণ্ড। চন্দ্রভূষণ মাত্র ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার শেষদিনে সুপ্রকাশ বলেছিল—ডোণ্ট ফরগেট দি ওথ ইউ হ্যাভ টেকেন। দি মিশন অব আওয়ার লাইফ।

চন্দ্রভূষণ কেঁদেছিলেন। সুপ্রকাশ প্রসন্ন হাসিমুখে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

সুপ্রকাশ ভর্তি হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে। চন্দ্রভূষণ গিয়েছিলেন বহরমপুর। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ। প্রিন্সিপ্যাল জানকীভূষণ ভটচাজ মশায়। ব্রজেন শীল তখন সদ্য চলে গেছেন। জীবনের সে একটা যুগ। জগতের রূপ বদলানো, আকাশের রং বদলানো, জীবনের অনেক কিছু পালটে গেল। ছুটিতে দেশে এসে দেখলেন—দু'বৎসরে ঘরের স্বাদ বদলে গেছে—শুধু ঘরেরই নয় এবং শুধু স্বাদই নয়—গোটা অঞ্চলটার বর্ণগন্ধশব্দস্পর্শস্বাদ সব বদলে গেছে। চোখে পড়ল অন্ধকার, নাকে এসে ঢুকল দুর্গন্ধ। অর্দ্ধনগ্ন—নিরক্ষর—মূক—ভীরু মানুষের বেদনাময় রাজ্য যেন অকস্মাৎ চোখে পড়ল। যেন আবরণটা হঠাৎ সরে গেল এতকাল পরে। যেন এতকাল এখানে রাত্রির অন্ধকারে বাস করেছেন। এইবার সকাল হয়েছে। সকালের আলোয় দেখছেন রাত্রির অন্ধকারে অজ্ঞাতসারে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটা পরিত্যক্ত ভাঙা ভগ্নপুরীতে; আশেপাশে যাদের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন তারা জীবন্ত মানুষ নয়; কঙ্কাল। কঙ্কালের মেলা।

রামজয় তখন ব্যাকরণ শেষ করেছে, কাব্য পড়তে সুরু করেছে। সে পড়ত নবদ্বীপে। সে থাকলে তার সময়টা আনন্দে কাটত। রামজয় তখন সংস্কৃত কাব্যের স্বাদ পেয়েছে। কত বিচিত্র সরস শ্লোক যে সে আবৃত্তি করত। রামজয় থাকলে জিয়াউদ্দিনও এসে জুটত। ভাল তামাক সে যথারীতি নিয়ে আসত। কিন্তু চন্দ্রভূষণ তখন তামাক ছেড়েছেন। ছেড়েছিলেন জেলা ইস্কুলে পড়বার সময়েই; সুপ্রকাশের প্রভাবে। চন্দ্রভূষণ গল্প করতেন শহরের কলেজের, নূতন কালের আদর্শের। কলেজের অধ্যাপকদের। রামজয় না থাকলে একলাই বেড়াতেন, গ্রামের প্রান্তরে প্রান্তরে, বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াতেন; নদীর ধারে বসে থাকতেন। অনেক কিছু ভাবতেন। খুঁজে বেড়াতেন কোথায় পড়ে আছে কোন্ ভাঙা প্রস্তরবিগ্রহ। কোথায় লোকের মুখে ছড়িয়ে আছে কোন মহিমময় জনপ্রবাদ। লোকগাথা।

কানের কাছে মনের মধ্যে গুঞ্জন করত—হোষ্টেলের বন্ধুদের আলাপ-আলোচনা জল্পনা-কল্পনার কথা। সেখানকার শেখা গান এখানে তিনি নির্ভয়ে গাইতেন—

কতকাল পরে, বল ভারত রে,

দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে।

অথবা—

এস সুদর্শন-ধারী মুরারি।

অথবা—

স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়।

গান আজ ভুলে গিয়েছেন। নইলে গাইতে একটু-আধটু পারতেন চন্দ্রভূষণ। বাজাতে বেশ পারতেন।

বাবা মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যের সময় ডেকে কাছে বসাতেন, বলতেন—আজ কি বলে, ঘোষ মশায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল নবগ্রামে। তিনি বলছিলেন—জেলা কোর্টের চেয়ে সাব-ডিভিশন কোর্টে বসলেই ভাল হবে। ওখানে উকীল-টুকীল কম। তা আমি বললাম উকীলই যখন হবে—তখন জেলা কোর্ট ছেড়ে সাব-ডিভিশনে বসতে যাবে কেন? কি বলিস তুই?

চন্দ্রভূষণ চুপ করেই থাকতেন। উকীল তো তিনি হবেন না। কি হবেন তা তিনি ঠিক করতে পারেনা নি—তবে উকীল নয়। সন্ন্যাসের সঙ্কল্প ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে। সুপ্রকাশ যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। চিঠি দিয়েও আর উত্তর পাওয়া যায় না। জীবনে নতুন বন্ধুদের ছোঁয়াচ লেগেছে।

বাবা বলতেন—কি রে কথা বলিস না যে?

নত মুখেই চন্দ্রভূষণ বলতেন—ওসব কথা এখন থেকে ভেবে কি হবে বাবা? আগে পড়া শেষ হোক। পাস করি।

বাবার মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠত। বলতেন—তা বটে। এক-এতে স্কলারশিপ, বি-এতে স্কলারশিপ পেলে এম-এ পড়বি বৈকি। আর এম-এ বি-এল পাস করে আগে হাইকোর্টের চেষ্টা না করে কি কেউ জজকোর্ট—সাব-ডিভিশন কোর্টের কথা ভাবে?

চন্দ্রভূষণকে আবার চুপ করে থাকতে হ'ত। কি বলবেন বাপের এই উৎসাহের মুখে? কেমন করে বলবেন—উকীল হবার কল্পনা আমি মুছে ফেলেছি বাবা।

বাবা বলে যেতেন—তবে জেলাকোর্টেও বড় পশার হয়, বহরমপুরে বৈকুণ্ঠ সেনের মত ক'জন উকীল আছে হাইকোর্টে? মাঝে মাঝে যাস, সেন মশায়ের মামলা করা দেখিস। বুঝলি?

বৈকুণ্ঠ সেনকে চন্দ্রভূষণ দেখেছেন, কিন্তু তাঁর ওকালতি তিনি কোনদিন দেখেন নি। তাঁর বাবা বৈকুণ্ঠ সেনের ওকালতির গল্প করতেন। এখানকার রেশমকুঠির প্রেষ্টন সায়েবকে সাক্ষীর ডকে দাঁড় করিয়ে কি নাজেহাল করেছিলেন, কি ধমক দিয়েছিলেন—সেই সব বহুবার শোনা গল্প। বাবা বলতেন—তুই হাইকোর্টেই বসিস—কি অন্য কোনখানেই বসিস, এখানকার এ বেটাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা হলে বিনা পয়সায় তুই আসবি। আমার কাছে ওদের শয়তানির অকাট্য প্রমাণ আছে। আমি সব দোব বার করে। তুই জেরা' করে সেই সব কুকাজ ফাঁস করে দিবি। ব্যস, এই হলেই আমার হ'ল। আর কিছু চাই না আমি।

তাঁর টেরা চোখ দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে অদ্ভুত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। বাঁকা ছুরির মত।

মৃত্যুকালে চন্দ্রভূষণ কাছে ছিলেন না। হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন তিনি। চন্দ্রভূষণ ছিলেন নবগ্রামে। এফ-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী আসার পরই নবগ্রাম এম-ই ইস্কুলের হেডমাষ্টার, তাঁর মাষ্টারমশাই তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—চন্দ্র, এ ক'মাস তো তুমি বাড়ীতেই থাকবে, তা কয়েক মাস আমার কাজটা চালিয়ে দাও। আমার শরীরটাও খারাপ, মেয়েটার বিয়েও না দিলে নয়। মাসকয়েক ছুটি পেলে আমি বাঁচি। কিন্তু এত বেশীদিনের জন্য তো কেউ একটিনি চালাবে না বাবা। ম্যানেজিং কমিটিও তাই বলেছে; লোক দেখে দিয়ে গেলে—তাঁদের আপত্তি নাই। মাইনেটা অবশ্যি আমি যা পাই তার চেয়ে কম দেবেন। তুমি তো বসেই থাকবে—যা হয় ক'মাস কিছু উপার্জ্জন করে নাও। কি বল? ইস্কুলের এখন দুঃসময়, বাবুরা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন, গ্রাম-শত্রুতার কথা তো শুনেছ। অনেক দরখাস্ত হচ্ছে ইস্কুলের বিরুদ্ধে। সব মাসে মাষ্টাররা সময়ে মাইনে পান না। নতুন লোক এলে সে তো খাতির করবে না। তুমি পুরনো ছাত্র। ইস্কুলে ফ্রি ছিলে। তুমি থাকলে নিশ্চিন্ত হই আমি।

তখন নবগ্রামে এই চৈতন্য-এইচ-ই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা—চৈতন্যবাবুর নূতন অভ্যুদয় হচ্ছে। সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসার রাজপথ ধরে লক্ষ্মীর রথ এসে তাঁর ঘরের আঙিনায় থেমেছে। এম-ই ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সুবর্ণবাবু তাঁর জ্ঞাতি। তাঁর সঙ্গে লেগেছে প্রতিষ্ঠাতার দ্বন্দ্ব। তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে মামলা, মামলা আর মামলা। মামলার খরচ চালাতে মধ্যে মধ্যে ইস্কুলের ফণ্ডের টাকায় হাত পড়ে। সে খবর সরকারী শিক্ষা বিভাগে উড়ো চিঠির মারফতে পৌঁছুচ্ছে কিন্তু ইস্কুলের মাষ্টারদের সহযোগিতায়, করুণায় তদন্তের বিপদগুলি পার হয়ে যাচ্ছে। মাইনে বাকী থাকা সত্ত্বেও মাষ্টারেরা তাঁদের মাইনে পাওয়ার খাতায় যথারীতি স্বাক্ষর করে দিয়ে, হিসাব-নিকাশ তহবিল মিল করে রাখছেন।

চন্দ্রভূষণ 'না' বলেন নি। উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়েছিলেন। ভারী ভাল লেগেছিল। ছাত্রজীবনেই এমন অযাচিত ভাবে চাকরি পাওয়া এবং যেমন-তেমন চাকরি নয় হেডমাষ্টারির একটিনি, এবং যে ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন সেই ইস্কুলের হেডমাষ্টারি—এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে! জেলা ইস্কুলের বোর্ডিঙে কলেজ হোষ্টেলের ঘরে শুয়ে কতদিন রাত্রে আজও স্বপ্ন দেখেন; নবগ্রাম এম-ই ইস্কুলের হেডমাষ্টার পড়া ধরছেন, তিনি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, উত্তর দিতে পারছেন না। নবগ্রাম ইস্কুলে এখনও তিন জন সে আমলের শিক্ষক রয়েছেন। তাঁদের উপরে হবে তাঁর স্থান। তিনি একটা বিচিত্র গৌরবের আস্বাদ পেয়েছিলেন, এবং রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। নবগ্রামেই থাকতেন, ইস্কুলের বাবুদের বাড়ীতেই একখানা ঘর পেয়েছিলেন, সেখানেই খেতেন, বাবুর ছেলেটিকে প্রাইভেট পড়াতেন; শনিবার হাফ ইস্কুলের পর গামছায় একখানা কাপড় বেঁধে নিয়ে বাড়ী চলে যেতেন। রবিবার বাড়ীতে থেকে সোমবার ভোরবেলা রওনা হয়ে নবগ্রামে ফিরতেন। মাইল পাঁচেক পথ, নতুন বয়স তখন, দীর্ঘকায় মানুষ—সোয়া ঘণ্টার বেশী লাগত না। এরই মধ্যে বাবা একদিন, সেদিন

মঙ্গলবার—ভোরবেলা হঠাৎ মারা গেলেন। শেষকালটায় তিনি তাঁকে খুঁজেছিলেন। বাড়ীতে যে বৈষ্ণবের মেয়েটি কাজকর্ম্ম, সেবাশুশ্রূষা করত, সে তাঁর হাতে বাক্স-পেঁটরার চাবি তুলে দিয়ে কেঁদে বলেছিল—দেখে শুনে নাও বাবা।

বাক্সের মধ্যে ছিল কিছু টাকা। আড়াইশো। কিছু বন্ধকী গহনা। আর সযত্নে কাপড় দিয়ে বাঁধা একতাড়া কাগজ। জমির দলিল, কিছু দাখিলা, আর ওই কুঠিয়াল সায়েবদের কীর্ত্তিকলাপের কাগজপত্র। অনেক কাগজ।

এফ-এ পরীক্ষাতেও স্কলারশিপ পেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, সুপ্রকাশের নাম পেলেন না। কি হ'ল? সুপ্রকাশ নাই? বেঁচে নাই? সংসারে নাই? চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে? অসংখ্য প্রশ্ন মনের মধ্যে উদ্যত হয়ে উঠল। জীবন তখন সুতোকাটা ঘুড়ির মত। বহরমপুর কলেজ থেকে প্রিন্সিপালের সই-করা আহ্বানপত্র পেয়েও বহরমপুর যেতে মন সরল না। কলকাতায় এলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ—আঠারোশো নিরানব্বই সাল। কলকাতা তখন অধিবাসের আসনে বিবাহের কন্যার মত বসেছে। দিকে দিকে নিত্য নব আয়োজন। পশ্চিমের বিজ্ঞান হোমশালা থেকে থরে থরে সাজানো চরু আসছে। ঘোড়ার ট্রাম উঠে যাচ্ছে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হবে। ইলেক্‌ট্রিক আলো আসছে। গঙ্গার বন্দরে সারি সারি জাহাজ, সেখান থেকে নামছে কত আয়োজন, কত উপচার! মিশনারীদের জেনারেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হয়ে, তিনি গেলেন সুপ্রকাশের সন্ধানে। কি হ'ল সুপ্রকাশের?

সারাটা দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, যদি সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটে তখন ঝকঝকে বার্নিশ করা বাড়ীর গাড়ীর সারি লেগে যায়—সুবেশ সুদর্শন ছেলের দল। বহরমপুরের দু'বছরের পরিমার্জ্জনায় চন্দ্রভূষণ তাঁদের কাছে শামাদানের আলোর কাছে মাটির প্রদীপের মত নিষ্প্রভ। কেউ তাঁর দিকে ফিরে তাকায় নি। ছেলেদের মধ্যে সুপ্রকাশকে খুঁজে পান নি। সমস্ত অন্তরটায় সে যে কি বেদনার আলোড়ন—কি যে সে উদ্বেগ—সে যে কি নিদারুণ উৎকণ্ঠা সে তিনি শুধু অনুভবে জানেন, ভাষায় সেদিনও প্রকাশ করতে পারতেন না, আজও পারেন না। কাঁদবার জন্য একটা দুর্দ্দমনীয় আবেগ তাঁর বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ছিল।

বেলা তখন দুপুর, একটার তোপ পড়ার কিছুক্ষণ পর একটি ছেলেকে অনেক সাহস করে ডেকে বলেছিলেন—শুনুন একটু।

ছেলেটির সর্ব্বাঙ্গে শহরের পরিমার্জ্জনা, কিন্তু বেশভূষার দীপ্তি ঝাড়ের আলোর বেলোয়াড়ী কলমের মত অসহনীয় নয়। চোখ ধাঁধিয়ে যায় না।

সে বলেছিল—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ

—বলুন।

—একটি ছেলের খবর বলতে পারেন? প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ত। এবার এফ-এ দেবার

কথা। এণ্ট্রান্সে সেকেণ্ড হয়েছিল। খুব সুন্দর দেখতে। খুব ব্রিলিয়াণ্ট।

—সুপ্রকাশ বোস ?

—হ্যাঁ। তার নাম তো এবার পেলাম না—গেজেটে। সে— ? সে কি পরীক্ষা দেয় নি ?

—সে তো বিলেত চলে গেছে। পরীক্ষা দেবার আগেই, ছ'মাস আগে চলে গেছে।

—বিলেত চলে গেছে ?

—হ্যাঁ। তাকে জানতেন আপনি ?

—জানতাম। আমরা একসঙ্গে এণ্ট্রান্স দিয়েছিলাম। একই ইস্কুল থেকে। সে প্রেসিডেন্সিতে পড়তে এল, আমি গেলাম বহরমপুর। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আজ মাস আষ্টেক কোন খবর পাই নি। চিঠি দিলেও উত্তর দেয় নি।

একটু চুপ করে থেকে তিনি বলেছিলেন, এইজন্যে তা হলে! কিন্তু বিলেত গেল সে— ?

হেসে ছেলেটি বলেছিল—আপনি তার সেই সন্ন্যাসী হওয়ার কথা ভাবছেন তো ? এখানে এসে প্রথম প্রথম এইসব সে বলত। হোস্টেলের ঘরে ধ্যানট্যান করত। কথাটা কানে উঠল সাহেব প্রিন্সিপালের। সাহেব ওকে ডেকে ওর সঙ্গে আলাপ করলেন। নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে সে যেত। তার পর ওর সব পালটাতে লাগল। তার পর হঠাৎ একদিন বাবার কাছে গেল, সেখান থেকে ফিরে এসে বিলেত চলে গেল। সেখানে গ্রাজুয়েট হয়ে আই-সি-এস পরীক্ষা দেবে। কেউ কেউ বলে—প্রিন্সিপালের পনের-ষোল বছরের ফ্রকপরা মেয়ের প্রেমে পড়েছিল সে। আই-সি-এস হয়ে সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করব প্রতিজ্ঞা করে নাকি সে বিলেত গিয়েছে।

চন্দ্রভূষণ কাঁদতে পারলে সুখ পেতেন, কিন্তু অপরিচিত ওই ছেলেটির সামনে কাঁদতে পারেন নি। সুপ্রকাশ, তাঁর আদর্শ সুপ্রকাশ শুধু তো নিজের আদর্শকে জাহাজ-ঘাটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায় নি, তার সঙ্গে চন্দ্রভূষণেরও সব ভাসিয়ে দিয়ে গেল। সেই সুপ্রকাশ, এই করলে শেষ পর্যন্ত। তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসে গোলদীঘির মধ্যে ঢুকে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর নীচে যেন তাঁরই পা দুটি ধরে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর উঠে গিয়ে বসেছিলেন একটা বেঞ্চের উপর। গোলদীঘির সামনে ট্রামের একটা ঘোড়া সেদিন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সবল সুস্থ শক্তিমান জানোয়ার! ওঃ! সে দৃশ্য সমস্ত জীবনে তিনি ভুলতে পারবেন না। ওঃ!

তিনিও যেন পড়েছিলেন। না। ঘোড়াটা মরে গিয়েছিল। তাঁর অবস্থা আরও করুণ। জীবনটা হয়ে গিয়েছিল যেন নোঙরছেঁড়া নৌকোর মত। তিনি বাসা নিয়েছিলেন একটা মেসে। তাঁদের মেস চাকুরে বাবুদের মেস, ও বৃত্তি পাওয়া ভাল ছেলে, গরীবের ছেলে; বাবুরা স্নেহের সঙ্গেই তাঁকে স্থান দিয়েছিলেন। দোতলার সিঁড়ির ঘরের পাশে ছোট্ট একখানি ঘরের মত ছিল; আগেকার কালে বোধ করি কাঠ ঘুঁটে থাকত। কয়লার পর কাঠ উঠেছে; ঘরটা আধখালি পড়েছিল, সেইটেই দিয়েছিলেন তাঁরা। নিরিবিলি পড়াশুনা করবে। নিরিবিলি অসাড় হয়ে পড়ে থাকবার সুবিধা নেই। বাবা ছিলেন না; উকীল

হতে হবে এ তাগাদা কেউ দিত না। সুপ্রকাশ সন্ন্যাসের আদর্শ ভাসিয়ে চলে গেছে। জীবনের তাগিদই হারিয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে চমকে উঠতেন, একটা চেতনা আসত, উঠে বসতেন। মনে জেদ জেগে উঠত, সুপ্রকাশের ভাসিয়ে দেওয়া আদর্শ তিনি তুলে নিয়ে আসবেন গঙ্গায় ডুব দিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশন তখন স্থাপিত হয়েছে। বেলুড়ে আশ্রম পত্তন হয়েছে। বাগবাজারে মিস মার্গারেট নোবল—সিস্টার নিবেদিতা এসেছেন। ওঁদের আশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প সার্থক করবেন। মধ্যে মধ্যে যেতেন ওখানে। আবার কয়েক দিন পর কেমন যেন সব শিথিল হয়ে যেত। হতাশায় এলিয়ে পড়তেন। মেসের ঘরে কলেজ কামাই করে শুয়ে ঘুমোতেন। মেসের বাবুদের নিমন্ত্রণে দু'একবার থিয়েটার দেখে মনটাকে সতেজ করে নেবার চেষ্টা করেছেন। কি প্রচণ্ড নেশা থিয়েটারের, কি দুর্নিবার আকর্ষণ! সে যেন স্বর্গলোকের মায়াপুরী। সেই সব অপরূপ সাজসজ্জায়—রঙে প্রসাধনে সুরঞ্জনার দল, সেই লাস্য, সেই কটাক্ষ, সেই হাসি—চোখ বুজলেই মনশ্চক্ষে ভেসে উঠত। সেই গান—সেই ঐকতান চোখে তন্দ্রা এলেই কানের পাশে বাজতে থাকত। এতেও ভয় পেয়েছিলেন তিনি। তিনি ভীরু, তিনি দুর্ব্বল—সে তিনি স্বীকার করেন। তিনি জানেন। তিনি সভয়ে সরে এসেছিলেন। বারতিনেক থিয়েটার দেখার পর আর যান নি। শেষবারের ঘটনা জীবনে লজ্জার কথা হয়ে রয়েছে। কাউকে বলতে পারেন নি, রামজয়কেও না। থিয়েটারের নাচের দলের একটি মেয়েকে দেখে তিনি পাগল হয়ে গেলেন। বহুকষ্টে তার নাম-ঠিকানা যোগাড় করে কয়েকটা দিন ঘুরে বেড়ালেন—ওই পাড়াটার আশেপাশে বিভ্রান্তের মত। একদিন সাহস করে ঢুকলেন; গলি পথ, দু'ধারের বাড়ীর দরজায়, উপরের বারান্দায় দেহপসারিণীদের মেলা। কত জনের কত অশ্লীল ইঙ্গিত, আহ্বান। ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি গলির ভিতর থেকে। সেখান থেকে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নান করে মেসে ফিরলেন। সেই শেষ। তার পর আবার কিছুদিন বেলুড় মঠ। আবার কিছুদিন পর আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন নৈরাশ্যে; ঘুমে; তামসিকতায়।

থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেলেন। প্রিন্সিপাল ডেকে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, এ কি? তুমি না এফ-এতে স্কলারশিপ পেয়েছিলে?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন চন্দ্রভূষণ। সামনে দুটো আলমারীর ফাঁকের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বাবা। নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে।

প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড জন মরিসন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তাঁর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন—ইউ আর উইপিং মাই বয়? না না, চক্ষের জল মুছিয়া ফেল। অনুতাপে তোমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন? এমন হইল কেন? তোমার সকল পুস্তক আছে?

—আছে।

—তুমি মেসে থাক, সেখানে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাও না?

—না ফাদার, সে সব অসুবিধা আমার কিছু নাই।

—দেন্? হোয়াই? হোয়াটস রং? তোমার শরীর?

—শরীরও আমার ভাল আছে ফাদার।

—দেন্? স্পীক আউট, টেল মি মাই বয়।

—আমার বাবা—। বলতে গিয়ে আবার কেঁদে ফেলেছিলেন চন্দ্রভূষণ। ফাদার এবার তাকে কোলের কাছে ডেকে বসিয়ে বলেছিলেন—তোমার বাবা তোমাকে পড়াইতে চান না? খরচ দেন না?

—না ফাদার। তিনি নেই, তিনি মারা গিয়েছেন। সংসারে আমার আর কেউ নেই।

অকৃত্রিম সহানুভূতিতে ফাদার বারবার ঘাড় নেড়ে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—আই এম সরি, ভেরি সরি মাই বয়। ইউ হ্যাভ লস্ট ইয়োর ফাদার, মে হিজ সোল রেস্ট ইন পীস! কিন্তু তাঁহার জন্য শুধু কাঁদিলে হইবে না—মাই বয়। তোমাকে বাঁচিতে হইবে, বড় হইতে হইবে। তোমার পিতা নিশ্চয়ই তোমাকে একজন সুশিক্ষিত বড়মানুষ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তুমি এণ্ট্রান্সে স্কলারশিপ পাইয়াছিলে—এক-এতে পাইয়াছ, নিশ্চয় তিনি অনেক আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে।

দীর্ঘদিন পর এমন স্নেহের স্পর্শ পেয়ে চন্দ্রভূষণ এক দিকে অজস্র ধারে কেঁদেছিলেন, অন্য দিকে অকপটে সকল কথাই তাঁর কাছে প্রকাশ করে বলেছিলেন—সুপ্রকাশের কথা, সন্ন্যাসের কথা, বর্ত্তমানের ভাঙাহাল ছেঁড়াপাল নৌকোর মত তাঁর নিজের অবস্থার কথা।

জিভ এবং তালুর ডগায় চুক চুক শব্দ করে মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ প্রকাশ করে ফাদার বলেছিলেন—নো নো মাই বয়, দ্যাটস নট দি ওয়ে, দ্যাটস নট দি ওয়ে। এ পৃথিবীতে অনেক কর্ম্ম, অনেক অনেক। সন্ন্যাসী হইয়া যাঁহারা দেশের সেবা করিতেছেন—তাঁহারা মহাপ্রাণ, গ্রেট সোল্স। দ্যাট গ্রেট মঙ্ক স্বোয়ামী বিবেকানণ্ড—আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার অনেক শক্তি। কিন্তু সকলেই বিবেকানণ্ড হইলে চলিবে না। পারিবেও না। এ পথ তোমার আছে না। তোমার দেশের অনেক কর্ম্ম আছে। দেশের দিকে তাকাইয়া দেখ। অন্ধকার, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। ডার্কনেস এভরিহোয়ার, ডার্কনেস এট নুন, ডার্কনেস অব ইগনোরেন্স, ইললিটারেসি, সুপারিস্টিশন! তোমার দেশে এখন কত বড় লোক কত চেষ্টা করিতেছেন। লুক এট দেম! আলো জ্বালাইয়া ডাক দিতেছেন।

চন্দ্রভূষণ অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিলেন, দুটি চোখের কোল থেকে গড়িয়ে পড়া জলের ধারা আপনি শুকিয়ে এসেছিল। ফাদার বলে চলেছিলেন—বড় বড় শিক্ষাব্রতীদের নাম। দেশসেবাব্রতীদের নাম।

—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি দেখিয়াছ? আনন্দমোহন বসু? গুরুদাস ব্যানার্জ্জী? ফিলসফার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল? তুমি বহরমপুর হইতে আসিয়াছ, সেখানে তিনি আগে প্রিন্সিপাল ছিলেন। গিরিশচন্দ্র বসুকে দেখিয়াছ? বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ? সায়েন্টিস্ট প্রফুল্লচন্দ্র রায়—পি. সি. রায়কে দেখিয়াছ? সারাজীবন ইনিও বিবাহ করিলেন না, তোমার

দেশের প্রাচীন বিদ্যাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়া জগৎকে দেখাইতেছেন। তিনি কি সন্ন্যাসী অপেক্ষা কম? তোমাদের জে. সি. বোস এনাদার সায়েন্টিস্ট? জানকী ভট্টাচার্য্যের নিকট তুমি পড়িয়াছ। আশুতোষ মুখার্জ্জী, এ গ্রেট স্কলার, ইউনিভারসিটিজ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন দি গবর্ণরস কাউন্সিল। ইঁহাদের দিকে তাকাইয়া দেখ। ইঁহারা তোমাদের দেশের অন্ধকারের দুর্য্যোগ ঘুচাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন।

রেভারেণ্ড মরিসন সেদিন ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন এর পর, তাকিয়েছিলেন খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ পর আবার বলেছিলেন—আমাদের দেশের আকাশ এত নীল নয়, এমন নীল আকাশ—উজ্জ্বল নীল আকাশ আমরা দেখিতে পাই না। তোমাদের দেশের আকাশ আশ্চর্য্য নীল—এত বড় মনে হয়। কিন্তু বড় উত্তপ্ত দেশ। এই দেশে আমরা আসিয়াছি—নিপীড়িত মানুষকে সেবা করিতে। তোমরা সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে! এতো সহজে তোমরা পার। মধ্যে মধ্যে আমার বিস্ময় লাগে।

ফাদারের বয় এসে দাঁড়িয়েছিল এই সময়। ফাদার তাকে চা আনতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—দুইজনের জন্য আনিবে। কিছু বিস্কিটস, দুই স্লাইস রুটি আনিবে।

—তোমার নিশ্চয় ক্ষুধা পাইয়াছে। মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে। নাও, লুক হিয়ার মাই বয়; আমার কথা শুনিতে বলিব তোমাকে। আমি তোমার ভাল চাহিতেছি। তোমাকে আমি প্রমোশন দিব। বাট ইউ মাস্ট প্রমিস, ওই সকল কল্পনা তুমি করিবে না। নো। যত দিন পড়িবে তত দিন না। তোমার দেশ প্রাচীন দেশ। উইথ গ্রেট ট্র্যাডিশন। বাট এভরিথিং ইজ ফরগটন, দি হোল কান্ট্রি—সমগ্র দেশ অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে মানুষ আলো খুঁজিতেছে। লাইট, লাইট—মোর লাইট!

জীবনতরণী ঘুরল। জীবনকে তরণীর সঙ্গে উপমা দিয়ে বলতে হয়—ফাদারের স্নেহেই ছেঁড়া পাল, ভাঙা হাল—জোড়া লাগল। ঘূর্ণির টান থেকে সরে ঘাটের মুখে ফিরল। তখন আর একবার মনে হয়েছিল—উকীল হবেন তিনি। কত বিচিত্র কল্পনা করতেন। উকীল হবেন তিনি। সুপ্রকাশ আই-সি-এস হয়ে ফিরবে। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ হবে নিশ্চয়। কোন দিন দেখা হবেই। সুপ্রকাশ লজ্জা পাবার ছেলে নয়, লজ্জা সে পাবে না; মেমসাহেব বিয়ে করবার জন্য সে যখন সাহেব হবে তখন তার সাহেবিয়ানার উগ্রতার উত্তাপ বৈশাখের উত্তপ্ত বালির মত হবে। ইংরিজী ছাড়া কথা কইবে না, বাংলা সে ভুলে যাবে। তাঁকে চিনতেও সে পারবে না। তিনিও চিনবেন না। পরিচয় হবে কোর্টে। মামলার মধ্যে আইন নিয়ে, যুক্তি নিয়ে তর্ক উঠবে। তুলবার সুযোগ তিনিই দেবেন। অসহিষ্ণু করে তুলবেন। কটু মন্তব্য অবশ্যই সে করবে। অধিকতর কটু জবাব দেবেন তিনি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনের মধ্যে জেগে উঠত। উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আইনের তর্ক করতে করতে বিরক্ত হয়ে একজন ইংরেজ জজ বলেছিল—'হাফ এডুকেটেড বার।'

গুরুদাস তৎক্ষণাৎ কথাটার পাদপূরণ করে জবাব দিয়েছিলেন—'এণ্ড কোয়ার্টার

এডুকেটেড বেঞ্চ।'

তেমনি উত্তর দেবেন। ওই রেশমকুঠির সাহেবদের সঙ্গে দরিদ্র গ্রামবাসীর মামলা। রাত্রির পর রাত্রি কল্পনা করে একটি মনোমত কেস তিনি গড়ে তুলেছিলেন। রেশমকুঠির সাহেবরা অনেক দিন থেকে কুঠির সামনের রাস্তায় কালীপ্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা বন্ধ করে দিয়েছে। এর জন্য অনেক শাসন অনেক নির্য্যাতন করেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে ফল হয় নি। মামলা করতে দরিদ্র দুর্ব্বল লোকগুলি সাহস পায় নি। নীরবে অপমানের বোঝা মাথায় করে নিজেদের অধিকার ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছে। ওই—ওই নিয়ে মামলা হবে। তিনি বাধিয়ে তুলবেন। সুপ্রকাশ ম্যাজিষ্ট্রেট হলে ফৌজদারি, জজ হলে দেওয়ানি। তিনি বলবেন—'ইউরোপের এই উদ্ধত ব্যক্তিগুলি—এই সুপ্রাচীন দেশের মহাধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝতে পারে না। তারা কালীমূর্ত্তিকে বলে বর্ব্বরতার প্রতীক; নগ্ন নারীমূর্ত্তি হলে তাকে অশ্লীল বলে। টু দেম পীপ্‌ল অব দিস কান্ট্রি ইজ এ মালটিচুড অব পেগান্‌স্, ইন দি ডার্কনেস। ইয়োর অনার এ আমার মনগড়া কথা নয়; এ কথা হ'ল 'জন টমাসে'র। এই কথাই তিনি লিখে গেছেন। আজ ইউরোপ-আমেরিকায় ভারতের বাণী, ভারতধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার করে এসেছেন স্বোয়ামী বিবেকানন্দ। তারা উৎসুক হয়ে উঠছে ভারতকে জানবার জন্য। কিন্তু এখানে যারা সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যে উত্তপ্ত তাঁরা এদিকে দৃকপাতহীন। এই জন টমাসই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—কলকাতায় যখন তিনি প্রথম আসেন তখন একজনও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করতে পারেন নি। 'অন মাই এরাইভ্যাল এট ক্যালকাটা, আই স'ট ফর রিলিজিয়াস পীপ্‌ল—বাট ফাউণ্ড নান'। এরা তাদেরই সগোত্র। সব থেকে দুঃখের কথা, লজ্জার কথা—আমাদের দেশের এক দল লোক—কেউ প্রতিষ্ঠা-লোভে, কেউ-বা ইউরোপীয় সভ্যতার বিলাস-ঐশ্বর্য্যের লোভে, কেউ শ্বেতাঙ্গিনীর মোহে—এই সকল উদ্ধত, পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু, অনাচারীদের এই সব উক্তিকে সমর্থন করছেন উচ্চ কণ্ঠে! এ কথা আপনি আমার চেয়েও ভাল করে জানেন। ইয়োর অনার—মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে আয়নার দিকে তাকালে আমার মধ্য থেকেও তার ছায়া উঁকি মারে। আপনি নিশ্চয় আমার কথা সমর্থন করবেন।'

বিবর্ণ হয়ে যাবে সুপ্রকাশ!

হয়ত-বা উদ্ধত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করবে।

তিনি তার কঠোর প্রত্যুত্তর দেবেন।

দিনকতক উৎসাহ অনুভব করতেন। জীবনে জোর পেতেন। আবার কিছুদিন পর স্তিমিত হয়ে যেতেন। বি-এ পরীক্ষা দিলেন। ভাল হ'ল না পরীক্ষা। বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ীতে একা। রামজয় সেবার বাড়ীতে ছিল না। সে ভাগবতের কথকতা করতে বেরিয়েছিল। একা জিয়াউদ্দিন তাঁর কাছে এগিয়ে আসত না। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রভূষণ গেলে কৃতার্থ হ'ত। চন্দ্রভূষণ একলা ঘুরে বেড়াতেন—প্রান্তরে প্রান্তরে। অর্দ্ধনগ্ন দীন দরিদ্র

লোকগুলি তাঁকে দেখে পাশ কাটিয়ে সরে যেত। কথা বলত না। রাত্রিতে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন চন্দ্রভূষণ। রাত্রের আকাশে অসংখ্য তারা। কিন্তু গোটা দেশের জীবনের আকাশে তারাও নাই। সেখানে নীরন্ধ্র অন্ধকার।

হঠাৎ দেখা হ'ল অমরবাবুর সঙ্গে।

নবগ্রামের চৈতন্যবাবুর আত্মীয়, তাঁর শ্যালিকাপুত্র অমরবাবু। অমরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ। আশ্চর্য্য মানুষ। চৈতন্যবাবুর বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে প্রশস্ত বারান্দায় নবগ্রামের একদল তরুণের মধ্যে বসে সুর করে কবিতা পড়ছিলেন। ইংরেজী নয় বাংলা কবিতা।

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্ম্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশী।

রাস্তা ধরে যেতে যেতে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিনের অমরবাবু আর আজকের অমরবাবু স্বতন্ত্র মানুষ। অথবা তরুণ শাল আর পূর্ণপরিণত বিশালকায় বনস্পতি শালে যা তফাত তাই, তফাত অনেক আছে। অনেক পার্থক্য। তরুণ শালের সঙ্গে সাধারণ আম-জাম-কাঁঠালের—তরুণ অবস্থায় মিতালি হয়, অসম্ভব নয়, দৈর্ঘ্যে পল্লবে তখন তো খুব অসমতা থাকে না, তখন বর্ষার মেঘের দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে শীর্ষ আন্দোলন করে উল্লাসে মাতামাতি করা চলে; অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যে মর্ম্মরধ্বনিতে সুরে সুর মিশিয়ে আলোর ঠাকুরকে ডাকা যায়; সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তে দু'জনের মাথাতেই একসঙ্গে আলোর আশীর্ব্বাদ নেমে আসে; কিন্তু শাল তার স্বাভাবিক শক্তিতে পত্রপল্লবে বিস্তারলাভ করে দূর আকাশলোকে মাথা তুলে যখন পূর্ণ হতে চলে তখন তার পাশে থেকেও সাধারণ গাছের সম্পর্ক অনেক দূর হয়ে যায়। তার পল্লবের মর্ম্মরধ্বনির গুরুগম্ভীর সুরের সঙ্গে সাধারণ গাছের সুর মেলে না; বর্ষার উল্লাসে সে যখন বাজায় মৃদঙ্গ কি সপ্তস্বরা তখন এ বাজায় একতারা আর ডুবকী। সূর্য্যোদয়ে আলোর আশীর্ব্বাদ বনস্পতির মাথায় অনেক আগে নেমে আসে।

সেদিনের তরুণ অমরবাবু ছিলেন শুধু শিক্ষাব্রতী। শুধু শিক্ষার দীপ্তিতে ভাস্বর, চোখে ছিল শুধু এই একটি প্রশ্ন। দেশে শিক্ষাবিস্তার করবেন। তিনি সেদিন ডেকে চন্দ্রভূষণের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কেউ বোধ করি কানে কানে তাঁর পরিচয় বলে দিয়েছিল।

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি শুনতে দেখে তিনি নিজে ডেকে নিয়েছিলেন—আসুন—আসুন, উঠে আসুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? রসের আসর—মাঝখানে বসে যান।

তিনি মাঝখানে বসেন নি, একপাশে বসেছিলেন। আলাপ হতে বেশী সময় লাগে নি। দিনকয়েকের মধ্যে আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রভূষণ বিস্মিত হয়েছিলেন অমরবাবুকে দেখে। বিল্বগ্রাম বনেদী ব্রাহ্মণ-জমিদারদের গ্রাম। তার মাঝখানে চৈতন্যবাবু অকস্মাৎ উদয় হয়েছেন—ব্যবসার ঐশ্বর্যের ছটা নিয়ে। তাতে মামলার জট পাকিয়েছে, দাঙ্গার দাপট বেড়েছে, খাওয়া-দাওয়া উৎসব-ব্যসনের সমারোহ বেড়েছে; পোশাক-আশাক গাড়ী-ঘোড়ার সম্ভ্রম বেড়েছে; খেমটা নাচ বাঈ নাচের আসর জেঁকে উঠেছে, প্যালা দেওয়ার প্রতিযোগিতা বেড়েছে, আর কিছু হয় নি। চৈতন্যবাবু মন্দ নন—মানুষটিও চরিত্রবান, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এঁদের মধ্যে অমরবাবুর মত মানুষকে দেখে অবাক হবার কথাই। কিছুদিনের মধ্যেই চন্দ্রভূষণের সকল কথা জেনে অমরবাবু বলেছিলেন—'মাই মিশন ইজ দাইন, দ্যাট অব দাইন—ইজ মাইন।'

আজকের অমরবাবু আর অধ্যাপক নন, বিরাট ব্যবসায়ের মালিক, তাঁর মিশন শুধু শিক্ষার মিশনই নয়, আরও অনেক বহু-বিস্তৃত।

আজকের অমরবাবুর সামনে শান্ত ধীর বিনীত ভাবেই আসন গ্রহণ করলেন চন্দ্রভূষণবাবু।

সেদিন থেকে পনের দিন পরের কথা। পনের দিন ধরে চন্দ্রবাবু সেই পত্রখানা লিখেও শেষ করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে হঠাৎ কাল রাত্রে অমরবাবু বিল্বগ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তখন রাত্রি বারোটা, অসমাপ্ত পত্রখানার খসড়ার উপরেই চোখ বুলাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ চৈতন্যবাবুর বাড়ীর টমটমখানা ষ্টেশন থেকে এসে দাঁড়াল ওঁদের রেষ্ট-হাউসে, ঠিক ইস্কুলের সামনে—রাস্তাটার ওপারে। কে এল? নিশ্চয় কোন বিশিষ্ট অতিথি। মিনিটকয়েক পরেই কাঁকুরে রাস্তার উপর ভারী পায়ে দামী জুতোর মচমচে শব্দ তুলে কেউ এসে ডাকলে—চন্দ্রবাবু! জেগে আছেন? উঠুন। একবার উঠুন! আরে মশায় ঘুমোবার সময় নাই। কীপ এওয়েক, অনেক কাজ! অনেক কাজ!

অমরবাবুর কণ্ঠস্বর চিনতে চন্দ্রবাবুর ভুল হ'ল না। তিনি ধড়মড় করে উঠে বেরিয়ে এলেন—আপনি? অমরবাবু?

অমরবাবুর কণ্ঠস্বর পাখোয়াজের আওয়াজের মত গম্ভীর। তিনি বললেন—মাউণ্টেন হ্যাজ কম টু মহম্মদ। আপনার কাছেই এসেছি। আসুন, আপনার সঙ্গে কাজ সেরে—আবার ভোরের ট্রেনেই ফিরে যাব আমি। বলেই চলতে সুরু করলেন রেস্ট-হাউসের দিকে। দুপুর রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে কাঁকর-বিছানো রাস্তায় জুতোর শব্দ উঠতে লাগল, আর উঠছে রেস্ট-হাউসের সিঁড়ির দুপাশের বড় ঝাউ গাছ দুটোর সোঁ সোঁ শব্দ।

—মাসীমা চিঠি লিখেছিলেন।

অর্থাৎ, চৈতন্যবাবুর স্ত্রী। ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন চন্দ্রবাবু। কৈ তাঁকে তো কিছু বলেন নি

তিনি ?

—অনেক গুজব আপনি শুনছেন। আমি অবশ্য—ক্যান ওয়েল ইম্যাজিন—ইয়োর এ্যাংজাইটি !

সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠতে লাগলেন তিনি। রেস্ট-হাউসের প্রশস্ত বারান্দার উপর চেয়ার টেবিল সাজানো, টেবিলের উপর দামী শেজ-দেওয়া স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্প জ্বলছে ; একখানা ইজি-চেয়ারে তিনি শুয়ে পড়লেন—বসুন।

চন্দ্রবাবু ধীর শান্ত ভাবে চেয়ারে বসে সবিনয়ে বললেন—আমি গিন্নীমাকে কোন কথা বলি নি। আমি আপনাকেই চিঠি লিখছিলাম, এ লঙ লেটার, পনের দিনেও শেষ হয় নি।

একখানা ফাইল টেবিলের উপর রাখলেন অমরবাবু :—দেখুন :—ফাইলটির উপরে লেখা—"চৈতন্য ইনস্টিট্যুশন চার্জেস এগেনস্ট টিচার্স এ্যাণ্ড আদার ডিফেক্টস অব দি অরগ্যানিজেশন।" বললেন—অন্য মাষ্টারমশায়েরা আপনার কলীগ, সহকর্মী, মৃগাঙ্কবাবু আপনার বন্ধু, যামিনী আপনার ভাগ্নে, গোপাল, যতীন্দ্র ঘোষ আপনার ছাত্র, সকলের সঙ্গেই আপনার একটা ঘনিষ্ঠতা আছে। এক দিকে ইস্কুল, অন্য দিকে পারসোনাল রিলেশন, এ দুয়ের মধ্যে পড়ে আপনি নিশ্চয় বিব্রত হবেন। তা ছাড়া ওদের কাছে আপনার দুর্নাম হ'ত। সেই কারণেই আমরা এর মধ্যে আপনাকে জড়াই নি। আপনার কনসেন্স ক্লীয়ার থাক এইটেই আমরা—অন্ততঃ আমি চেয়েছিলাম চন্দ্রবাবু। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আপনাকে ডাকতাম। কিন্তু মাসীমার হুকুম।

হাসলেন অমরবাবু।

মাসীমা—ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবুর স্ত্রী, বিল্বগ্রামে তিনি গিন্নীমা। চৈতন্যবাবুর গৃহিণী বলেই তাঁর খ্যাতি নয়, চৈতন্যবাবুর ভাগ্যলক্ষ্মী বলে বিপুল অহঙ্কারে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা। চৈতন্যবাবুর আমল থেকেই তাঁর প্রবল প্রতাপ। স্বয়ং চৈতন্যবাবু তাঁকে মেনে চলতেন। ভাগ্যের কথা জ্যোতিষীরা বলতে পারেন, তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে—ও কথা, থাক, কিন্তু ব্যক্তিত্বে এই গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি যে অসাধারণ তাতে সন্দেহ উঠতে পারে না ; এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসে যে তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এ কথাতেও এ অঞ্চলে মতদ্বৈধ নেই। তাঁর নিজের সিন্দুকের মধ্যে তার প্রমাণ আছে। ব্যাঙ্কের হিসাব-বই নয়, নোট নয়, গিনি এবং নগদ টাকায় প্রমাণ তিনি মজুত করে রেখেছেন। কাগজের মধ্যে আছে কোম্পানীর কাগজ ; আর আছে এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ভূসম্পত্তির অধিকাংশগুলির বন্ধক রাখা তমসুক। পরিমাণে কয়েক লক্ষ। আজও পর্য্যন্ত—এখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, তিনি দুপুরে স্নানের পূর্ব্বে ঝিকে সঙ্গে নিয়ে নিজে গোবর মেখে ঘুঁটে দিয়ে থাকেন। অন্দরমহলে—দলিল দস্তাবেজ ও টাকার সিন্দুকের ঘর থেকে কাছারিবাড়ী পর্য্যন্ত তদারক করে আসেন, বাড়ীর ভাঁড়ার রান্নাশালের প্রতিটি বন্দোবস্ত থেকে ঠাকুরবাড়ীর দেবতাদের সকল বন্দোবস্ত তাঁর হাতে। তরকারি নিজে হাতে কোটেন, আলু-পটলের খোসাগুলি পর্যন্ত বেছে ভাজতে দেন, বাড়ীর তৈরি মিষ্টান্নের আকারগুলি পর্য্যন্ত তিনি নিরূপণ করে দেন। চৈতন্যবাবুর সংসার বিরাট, কীর্ত্তিকলাপ অনেক ; তার প্রত্যেকটির

প্রতিটি বন্দোবস্ত তাঁর অনুমোদন ভিন্ন হয় না। চৈতন্যবাবু পাকা উইল করে তাঁকে অধিকারও দিয়ে গেছেন। এই হলেন গিন্নীমা, অমরবাবুর মাসীমা।—তাঁর পত্র পেয়ে অমরবাবু এসেছেন বিল্বগ্রামে এবং চন্দ্রবাবুকে ডেকে তাঁর হাতে গোটা ফাইলটা তুলে দিলেন।

এটি রামজয় পণ্ডিতের কীর্তি। পণ্ডিত নিজে থেকেই করেছে। চন্দ্রভূষণ তাঁকে অনুরোধ করেন নি। গিন্নীমা—এ সংসারে রাজা-মহারাজা সাহেব-সুবো থেকে সুরু করে প্রজা সজ্জন—দুষ্ট বদমাস পর্যন্ত মানুষ-জনের সঙ্গে কথা বলেন নিজে; সেখানে কারুর কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন অনুভব করেন না তিনি। বারকয়েকই তাঁকে মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে হয়েছে অবশ্য কমিশনে সাক্ষ্য, তাতে তাঁদের পক্ষে বড় উকীলও হাজির ছিলেন, কিন্তু সে উকীলের কোন সাহায্যই তিনি নেন নি। একবার বিপক্ষের উকীল তাঁকে অভদ্র ভাবে জেরা করেছিল জেরার উত্তর দিয়ে সবশেষে তিনি উকীলটিকে ডেকে বলেছিলেন—ও বাবা, একটি কথা শুধোই তোমাকে!

উকীলটি হেসে বলেছিলেন—কি, বলুন।

—তোমার মা খুব বড় কুঁদুলী, নয়? পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক গাল না দিয়ে জল খায় না, নয়?

উকীলটি বলেছিলেন—আপনার চেয়ে একটু কমই হবেন।

গিন্নীমা বলেছিলেন—তা কি করে হবে বাবা? তা হলে তোমার মত দজ্জাল-বজ্জাত ছেলে কি করে হ'ল? তোমার বাবার গুষ্টির তো সুনাম শুনেছি বাবা।

এ অঞ্চলে কালা গোঁসাই বিখ্যাত দুর্মুখ বদমাস গৈরিকধারী। যার বাড়ীতে গিয়ে কালা গোঁসাই যা চায় তা না দিয়ে গৃহস্থের পরিত্রাণ নাই। না পেলে কালা গোঁসাই অভিশাপ দিতে সুরু করে, পৈতে ছেঁড়ে, মাথা কোটে। কিন্তু গিন্নীমায়ের বাড়ী সে ঢোকে না। গিন্নীমায়ের খাড়া হুকুম দেওয়া আছে—কালা গোঁসাই বাড়ী ঢুকলে তাকে ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের পড়ো ঘরটায় ঢুকিয়ে—মৌমাছির চাকে খোঁচা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে। ওই ঘরটায় মৌমাছির চাক আছে সেই বাড়ী তৈরির আমল থেকে। গিন্নী বলেন—ওই চাক যেদিন যাবে সেদিন আমার বাড়ীর লক্ষ্মী যাবে, আমার ভাগ্য ভাঙবে। তুই বেটা কালা গোঁসাই—তুই যদি সিদ্ধপুরুষ হোস, তোর কথা যদি ফলে—তবে তোকে মৌমাছিতে কামড়াবে না। তোর শাপশাপান্ত ফলবে বলে মৌমাছি উড়ে পালাবে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী এসেছিলেন সেদিন তাঁকে দেখতে। খাঁটি মেমসাহেব। তাঁর দুই হাতে দু'গাছি জড়োয়া চুড়ি পরিয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে বলেছিলেন—শুধু হাত, সিঁথি ফ্যাক ফ্যাক করছে, বিধবার মত; তোমরা রাজার জাতই হও আর যাই হও মেমসাহেব, তোমাদের আচার-আচরণ কিছু ভাল নয়।

এই যে গিন্নীমা, বিশ্বসংসারে মানুষের সঙ্গে কারবারে কারুর সাহায্য যাঁর প্রয়োজন হয় না, কাউকে যিনি গ্রাহ্য করেন না, দেবতাদের সঙ্গে কারবারে তাঁর কিন্তু রামজয় পণ্ডিত ছাড়া এক পা চলে না। বড়জোর স্বাধীন ভাবে তিনি দেবতাকে প্রণামটি করতে পারেন, মনের

কামনাটি মনে মনে জানাতে পারেন, তার বেশী কিছু নয়। চৈতন্যবাবু বাড়ীতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী প্রতিষ্ঠা করেছেন—তার উপর পুরানো মজা পুকুর কাটাবার সময় পুকুর থেকে বাসুদেব বিষ্ণুমূর্ত্তি পেয়েছেন—তাঁকেও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া গ্রামে আছেন গ্রামদেবতা চণ্ডীদেবী, একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ; আরও অনেক দেবতা; যাঁদের সঙ্গে গিন্নীমায়ের নিত্য কারবার চলে! কারবার পূজা দেওয়ার ও প্রণামের। এঁদের কাছে গিন্নীমা একান্ত অসহায়; তাঁরা কি বলেন তা তিনি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেন না, এবং তাঁদের বোঝাতে হলে অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত যে ভাষায় বলতে হয় তাও তিনি জানেন না, বলতে পারেন না, সে পারেন ওই রামজয় পণ্ডিত। রামজয় পণ্ডিতের ফিজ কম;—তুলসী দিতে আট আনা, বিল্বপত্র দিতে এক টাকা, চণ্ডীপাঠে এক টাকা, বিশেষ পূজা-হোমে দু'টাকা। খুব বড় ক্ষেত্রে পাঁচটা টাকা। কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গিন্নীমা হাইকোর্টের পাঁচশো এক টাকা ফিওয়ালা ব্যারিস্টার উকীল ও বত্রিশ টাকা ফিওয়ালা ডাক্তারদের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করেন রামজয়কে।

রামজয় নিজের জন্য আসেন নি। নিজের জন্য তিনি ভাবেন না। মাসে পঁচিশ টাকা তিনি অনায়াসে উপার্জ্জন করতে পারবেন। ত্রিফুৎকারের অধিকার নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন; কানে ফুৎকার—শঙ্খে ফুৎকার—উনানে ফুৎকার। উপবাসকেও তিনি ভয় করেন না। ভগবানের নাম নিয়ে মুষ্টিভিক্ষাতেও তাঁর মর্য্যাদা নষ্ট হবে না। একমুষ্টি চালের বিনিময়ে তিনি তাকে ভগবানের নাম মনে পড়িয়ে দেবেন। তার মনের সকল অন্যায় সঙ্কল্প—সকল পাপ কল্পনা চমকে উঠবে। তিনি অন্য কারুর জন্যও গিন্নীমায়ের কাছে আসেন নি, এসেছিলেন—চন্দ্রভূষণের জন্য।

সংবাদটা পাওয়া অবধি চঞ্চল সব মাষ্টারই হয়েছেন; মুখের হাসি আর কারুরই স্বাভাবিক নয়; কেউ আস্ফালন করে, কেউ গালাগাল করে মনের উৎকণ্ঠা চাপা দিয়ে চলেছেন; কিন্তু চন্দ্রভূষণ অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে গেছেন, কথাবার্ত্তা অত্যন্ত কম বলেন, অহরহই যেন চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। ইস্কুল ও বোর্ডিঙের কাজগুলি যন্ত্রের মত করে যান। রামজয় দু'তিন দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে সহজ মানুষ করে তুলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেন নি; চন্দ্রভূষণ যেন বেদনার বন্যার মধ্যে ডুবে গিয়েছেন। মধ্যে মধ্যে রামজয়ের রসিকতায় হেসেছেন—কিন্তু সে হাসি অত্যন্ত করুণ।

একদিন শুধু বলেছিলেন—রামজয়, শেষে চৈতন্যবাবুর মেজ জামাইয়ের অবস্থা হ'ল আমার?

চৈতন্যবাবুর মেয়েরা এই গ্রামেই বাস করেন; বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে কৃতী কুলীনের ছেলেদের জামাই করে গ্রামেই বাস করিয়েছিলেন। তাঁরাও সামান্য সম্পত্তিকে বাড়িয়ে রীতিমত বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনও করেছিলেন। হঠাৎ মেজ মেয়ে মারা গেল। মেজ জামাইয়ের সঙ্গে এর পর লাগল শ্যালকদের বিসম্বাদ। তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—ভাগ্নে-ভাগ্নীগুলিকে নিজেদের বাড়ীতে এনে, বাপ তাদের অহিতাকাঙ্ক্ষী অপবাদ রটিয়ে বাপকে পৃথক করে দেওয়া

হ'ল। চৈতন্যবাবুর মেজ জামাই কর্মক্ষমতায় কৃতী পুরুষ; কোলিয়ারীর ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজার, নিজেদের কোলিয়ারীর কর্তৃত্ব বিচ্যুত হয়ে পাশের কোলিয়ারীতে আটশো টাকা মাইনেতে চাকরি পেয়েছেন; কিন্তু মনের দুঃখে ক্ষোভে অহরহ মদ্যপান করে প্রায় পাগল হয়ে গেছেন।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—খুঁজে খুঁজে ওই তুলনা ছাড়া তো আর তুলনা পেলাম না। তুমি তো সব জান।

সবই জানেন রামজয়। বি-এ পাস করার পর তখন চন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি করবে ঠিক করতে পারছে না—তখনই একদিন রামজয় তাকে বলেছিলেন—আইন পড়ে তুমি উকীলই হও চন্দ্র। এমন করে কি-করব কি-করব করে ঘুরে বেড়িও না। ওটা তোমার পিতৃ-ইচ্ছা—ওটা পূর্ণ কর।

চন্দ্রভূষণ বলেছিলেন—বাবার ইচ্ছেটা আক্রোশের ইচ্ছে ছিল রামজয়। রেশমকুঠির সাহেবরা তাঁকে অনেক দুঃখ দিয়েছিল। তাঁর সে ইচ্ছে পূর্ণ ভগবান করছেন। কুঠি উঠে যাচ্ছে। আমি খুব ভাল খবর জানি। লোকসান হচ্ছে কুঠিতে, বিলেতের সাহেবরা কুঠি রাখবে না। আর ওকালতি আমার দ্বারা ঠিক হবে না। ওকালতিতে অন্ততঃ পাঁচটা বছর ঘরের ভেঙে খেতে হবে, সে আমি কোথায় পাব?

—উকীলের মেয়ে বিয়ে করবে হে বাপু।

—না, ভাই, চিরদিন পরিবারের কথা সহ্য করতে হবে। তা ছাড়া—

রামজয়কে সবিস্তারে খুলে বলেছিলেন—জেনারেল এ্যাসেমব্লিজের প্রিন্‌সিপ্যালের কথাগুলি। It is darkness, darkness everywhere! চারিদিকে অন্ধকার রামজয়, চোখ তো আছে ভাই, দেখ বিচার করে! অমরবাবুর কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন—চৈতন্যবাবুর শালীর ছেলে, চৈতন্যবাবুর এত বড় ব্যবসা কিন্তু অমরবাবু ব্যবসায়ে না ঢুকে প্রোফেসর হয়েছেন। তিনি দেশ সম্পর্কে যা বললেন তা যদি তুমি শুনতে ভাই!

রামজয় জানেন—রামজয় অতি অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু বলেই সেদিন চন্দ্রভূষণ খাতির করে কথা বলেছিলেন; অন্য কেউ হলে তাকে আক্রমণ করে দেশের সবকিছুকে আবর্জ্জনা কুসংস্কার বলে গালাগাল করতেন। এ নিয়ে চন্দ্রভূষণের লেখা একখানা চিঠি রামজয়ের কাছে আছে; যত্ন করে রেখে দিয়েছেন পণ্ডিত। এই চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনে হেড পণ্ডিতের কাজ নেবার জন্য চন্দ্রভূষণ রামজয়কে লিখেছিলেন। রামজয় প্রথমটা দাসত্ব গ্রহণ করতে চান নি। চাকরির মানেই তাঁর কাছে ছিল দাসত্ব। এ সব শিক্ষা রামজয়ের বাবার। তিনি বলতেন—শিক্ষা তো দান করতে হয়; বেতন নিয়ে শিক্ষা দেওয়া তো শিক্ষা-বিক্রয়ের চেয়েও হীন কর্ম্ম।

রসিকতা করে বলতেন—বাবা, পাঁচ সিকের বিনিময়ে কানা খোঁড়া কুঁজো কালা—সেবাদাসী মানে ঝি মেলে, সহধর্ম্মিণী মেলে না। ওই ভাবে যে শিক্ষা নেয় সে হতভাগ্য নিতান্ত বাউণ্ডুলে জাত হারিয়ে বৈরেগী, আর যে শিক্ষা দেয়, সে হ'ল ওই কানা খোঁড়া কুঁজো কালা সেবাদাসী।

রসিকতা সংবরণ করে অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে বলতেন—গুরু শিক্ষাদান শেষ করে দক্ষিণা নেয়, মাসমাইনে আমাদের নয়। যে বেতন নেয় সেই দাস। যে ব্রাহ্মণ দাসত্ব করে সে ব্রাহ্মণ নয়।

এই কারণেই রামজয় প্রথমটা এখানকার চাকরি নেন নি। চন্দ্রভূষণ হেডমাষ্টার হয়ে তাঁকে আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। পত্রখানা সেই পত্র। লিখেছিলেন—"সুহৃদ্‌বরেষু, রামজয়, আমাদের শাস্ত্রে আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া একটা কথা আছে। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ তুমি এ বিষয় আমা অপেক্ষা অনেক অধিক জান। মহাভারতে পাঠ করিয়াছি, কৌরববংশ নির্ব্বংশ হইবার উপক্রম হইলে মহারাজ্ঞী সত্যবতী আপদ্ধর্ম্ম বিধি অনুযায়ী ক্ষেত্রজ পুত্র দ্বারা বংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের ঋষিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস নিজে তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের ঋষিত্বের হানি ঘটে নাই। তোমার পিতৃদেবের মতামত অতি সত্য; কিন্তু তাহা আপৎকালীন নহে। আজ দেশে আপৎকাল উপস্থিত। তাহাতে কি তোমার সন্দেহ আছে? দেশ অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রলয়কালীন অন্ধকার কি ইহা অপেক্ষাও অন্ধকার? সেই অন্ধকারে মানবকুল পশুতে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণসন্তান যাহারা—তাহারা কি করিতেছে? সিন্দূরের ফোঁটা কাটিয়া মদ্যপান করিয়া, কালী কালী তারা তারা রবে হুঙ্কার ছাড়িয়া তান্ত্রিক সাজিয়া যত প্রকার পাপাচার হয় বা হইতে পারে—করিয়া বেড়াইতেছে। তিলক ফোঁটা কাটিয়া—গলায় কণ্ঠি ধারণ করিয়া মূর্খ বৈষ্ণবেরা হরিনামোচ্চারণপূর্ব্বক ঠিক তাহাই করিতেছে। মূর্খের দল ঘরে বসিয়া কেহ দুইটা কেহ তিনটা বিবাহ করিতেছে। কুলীন নামক বিবাহ-ব্যবসায়ীরা—গঙ্গাযাত্রার পথেও কুমারী-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীন করিতেছে। সমাজপতি অবস্থাবান ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য যাঁহারা তাঁহারা সকলেই আচারভ্রষ্ট, অধার্ম্মিক, কেহই শাস্ত্রমর্ম্ম জানেন না, সংস্কৃত ইঁহারা কেহই পাঠ করেন না। তোমরা যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ তাঁহারা আজ ইঁহাদের কাছে টিকিধারী—পটোঝাড়া বামনা নামে অভিহিত। মাতৃপিতৃবিয়োগে কেশমুণ্ডন না করিয়া কি প্রকারে অব্যাহতি পাওয়া যায়—ইহাদের নির্দ্দেশে—সেইরূপ বিধান আবিষ্কারের নির্দ্দেশে তোমরা বিব্রত হইতেছ। আজও কি বলিবে দেশে আপৎকাল সমুপস্থিত হয় নাই? আপদ্ধর্ম্ম অনুযায়ী আজও কি কর্ম্ম করিবার সময় হয় নাই? এ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে তো অনেক কথাই হইয়াছে। এই আপৎকালে—শিক্ষার আলোক প্রজ্বলিত করিবার জন্যই আমি ওকালতি করি নাই, এ কথা তুমি জান। তুমি বলিয়াছিলে—আমি যদি কখনও কোন ইস্কুল গঠন করি—কোন ইস্কুলের হেডমাষ্টার হই তবে ডাকিলে তুমি আসিবে। চৈতন্যবাবুর ইস্কুল আমিই দাঁড়াইয়া গড়িয়া তুলিয়াছি, অন্ততঃ সমুদ্রবন্ধনে কাষ্ঠবিড়ালীর মতও সাহায্য করিয়াছি; এবার হেডমাষ্টার হইলাম। এইবার তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আইস।"

তার পর আজ আট বৎসর কি পরিশ্রম চন্দ্র করেছে—সে তো অজানা নয় কারুর। সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। আজ অযোগ্যতার অপবাদে—ত্রুটির অপবাদে সেই ইস্কুল থেকে চাকরি

গেলে সে আঘাত যে কি মর্মান্তিক হবে, সে কথা অন্য কেউ না বুঝলেও রামজয় মুহূর্তে বুঝেছিলেন। বাবুদের বাড়ীর মেজ জামাইয়ের উপমা মিথ্যে দেয় নি। সত্যই এ ছাড়া উপমা নেই। সমস্ত যৌবনকালটা চন্দ্রভূষণ তাঁর স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার অবকাশ পান নি, এই ইস্কুলের জন্য।

এই কারণেই রামজয় এসে কথাটা গিন্নীমায়ের কানে তুলেছিলেন। বলেছিলেন—মা একটা কথা বলব, অপরাধ যেমন সেবকের আছে তেমনি প্রভুরও হয় গিন্নীমা। কাজটা ভাল হবে না। আপনারা অবশ্য বড়লোক; ভগবানের অনেক দয়া; আপনাদেরও অনেক কীর্ত্তি অনেক পুণ্য, কিন্তু ভৃত্যদের উপর অবিচার করলে তাতেও আপনাদের অন্যায় হবে। আমাদের কথা আমরা বলব না; আমাদের দোষগুণ বিচার করুন। দোষ হয়—আমাদের যোগ্যতা না থাকে—আমাদের বিদায় করে দেন। কিন্তু হেডমাষ্টার চন্দ্রবাবুর বিচার এমনি করে করবেন না মা। কর্ত্তাবাবুর কীর্ত্তি, অর্থ কর্ত্তাবাবু খরচ করেছেন, চন্দ্রবাবু গড়ে তুলেছে।

গিন্নীমা কথাটা শোনেন নি এমন নয়, কথাটা মোটামুটি তাঁর কানে এসেছে। কিন্তু এত খোঁজ তিনি জানেন না। তিনি শুনেছেন ইস্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসে মাসে যে টাকা দেয়—সেই টাকাটা তারা ডবল করে দিচ্ছে, তার জন্য ইস্কুলের ব্যবস্থার কিছু রদবদল হবে; গবর্ণমেণ্টই পছন্দ করে নতুন মাষ্টার বেছে পাঠাবে। দু'চার জনের চাকরিও যাবে। কিন্তু কৈ বড়মাষ্টারের চাকরি যাবে—এ কথা তো তাঁকে কেউ বলে নি!

চন্দ্রবাবুকে গিন্নীমা বলেন—বড়মাষ্টার।

বড়মাষ্টার গিন্নীমায়ের প্রিয়পাত্র। কর্ত্তা বড়মাষ্টারকে ভালবাসতেন। সৎলোক; কড়ালোক। বছরে দু'বার চারবার গিন্নীমায়ের সঙ্গে বড়মাষ্টারের দেখা হয়, কথা হয়। ওই ইস্কুল আর বোর্ডিঙের ডাকাবুকো ছেলেগুলি তো সোজা নয়, একেবারে লঙ্কাপোড়ার দল; সাক্ষাৎ ডাকাত; সময়ে সময়ে গিন্নীমা বলেন—হারামজাদার পাল!

বছরে একবার করে ওদের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধবেই। ও বেটারা বাধাবেই। গরমের ছুটির আগে আম লিচু গোলাপজামের সময় গিন্নীমাকে একবার—কোনবার বা দু'তিন বার কোমর বাঁধতে হয়। কর্ত্তা চৈতন্যবাবু বাগান করে গেছেন, ওই ইস্কুল-বোর্ডিংকে ঘিরে তিনটি বাগান। কলকাতা থেকে কলমের গাছ এনে অনেক যত্নে তৈরি বাগান। আম, গোলাপ-জাম, লিচু, জামরুল, ফলসা, লকেট নানান দুষ্প্রাপ্য ফলের গাছে ফল ধরলে ছোঁড়াদের চুল-বুলানি সুরু হয়। প্রথম প্রথম দু'জন চার জন—দুটো-চারটে-দশটা লুকিয়ে পাড়ে। আগলদারে ধরে, শাসন করে ছেড়ে দেয়; তার পর বেটারা আগলদারের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, মারপিট করে এবং চেঁচাতে সুরু করে—আগলদার তাদের গাল দিয়েছে, মেরেছে। এবং শেষ একদিন জোট পাকিয়ে তিন-তিনটে বাগানের উপর পড়ে তছনছ করে দেয়। কর্ত্তা বেঁচে থাকতেই চলে আসছে এ কাণ্ড। কর্ত্তা শুনে হাসতেন। ছেলেদের কিছু বলতেন না, আগল-দারটাকে ডেকে মারধোর বেশী খেয়ে থাকলে বকশিশ দিয়ে দিতেন। আর বোর্ডিঙে গিয়ে

ডেকে—'চুরি করা বড় দোষ' এই সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে দশ টাকার মিষ্টি কিনে খাইয়ে আসতেন। বড়মাষ্টার কিন্তু শাসন করে চিরকাল। কড়া শাসন করে। সে গিন্নীমা জানেন। নিজের চোখে দেখেছেন। কর্ত্তা থাকতে এতখানি স্বাধীন তিনি হন নি, হাজার হলেও বউ-মানুষ ছিলেন, ইস্কুল পর্যন্ত যেতে কেমন বাধো বাধো ঠেকত। কর্ত্তা দেহ রাখলেন যেবার, সেইবারই আগলদারটা এসে পড়ল তাঁর কাছে। তিনি কর্ত্তাবাবু নন; কর্ত্তাবাবুর নরম স্বভাবের জন্য চিরকাল তাঁকে তিরস্কার করেছেন। সেকথা সকলেই জানে। তিনি যখন কর্ত্তাকে বকতেন—তখন পাড়াঘরের লোকে সকলেই শুনতে পেত। কর্ত্তা মধ্যে মধ্যে বলতেন—"গিন্নী একটু আস্তে বকো! লোকে শুনছে যে।" তিনি বলতেন—"শুনুক না। আমি আমার সাতপাকের স্বামীকে বকছি। বকব না? হাজারবার বকব। যার শুনতে খারাপ লাগছে সে নিজের কানে তুলো গুঁজুক। তোমাকে আমি ঘরেই বকছি, বাইরে গিয়ে তুমি যা করেছ তা তো না করে দিয়ে আসি নাই। তা যদি করতাম তা হলে লোকে বলতে পারত, মাগো, এমন পরিবার এমন মেয়ে, যে বাইরে বেরিয়ে স্বামীর নাকে ঝামা ঘষে দিলে!"

সেবার কর্ত্তার মৃত্যুর পর তিনি খবরটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জুড়িগাড়ী ডেকে বেরিয়ে পড়লেন। মেজ ছেলে বাড়ীতে থাকত, বিষয়-সম্পত্তি দেখত, বড়-ছোট কলকাতায় কয়লা কুঠিতে ব্যবসা দেখত; মেজ ছেলে ছুটে এল—করছ কি মা? তুমি কোথায় যাবে?

গিন্নী বলেছিলেন—সরে দাঁড়া রে মেনিমুখো, আমি যাচ্ছি ইস্কুলে বোর্ডিঙে। কোচোয়ান হাঁকাও গাড়ী।

ইস্কুলের সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে—হেঁকে চীৎকার করে বলেছিলেন—মুচকুন্দ সিং, মহাবীর পাঁড়ে, বাহড় শেখ—তুম লোক তিন বন্দুক ঘাড়ে করকে, তিন বাগান পাহারা দেও। টোটা ভরকে রাখো। কোন গাছকা এক পাতা নড়ে গা তো দাগ দেও বন্দুক। মানুষ কাঠবিড়ালী যে হোক—গাছ ছুঁয়ে গা তো লাগাও। কোচোয়ান ঘুমাও গাড়ী।

দু'দিন পর সকালে সে তছনছ কাণ্ড। নতুন কাটানো দীঘি শ্যামসায়রের চারি পারের বাগান লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে রাত্রে। চাপরাসী বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়েছে, সে কোন শব্দ পায় নি, অথচ গোটা পুকুরপারের একশ' দেড়শ' কলাঝাড়ের—কুড়ি কাঁদি কলা—তিরিশ-চল্লিশটা মোচা—কারা কেটে নিয়ে গিয়েছে; নতুন লাগানো তরকারির গাছগুলি উপড়ে ফেলে দিয়েছে; আর ভূতের নৃত্য করেছে চারিদিকে।

খবর পেয়ে তিনি গাড়ীর অপেক্ষা করেন নি, হেঁটেই চলে গিয়েছিলেন। প্রথমেই মহাবীরের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন—আভি নিকালো। এই গাঁ সে নিকালো। এই মুল্লুক সে নিকালো। তারপর বোর্ডিঙে গিয়ে উঠেছিলেন।

—কই বড়মাষ্টার? কোথায়?

বড়মাষ্টারের গরুর গাড়ী সেই সবে এসে নেমেছে বোর্ডিঙে। আগের দিন ছিল রবিবার, শনিবার বিকেলে বড়মাষ্টার বরাবর বাড়ী যায়। বড়মাষ্টার এসে দাঁড়িয়েছিল—আপনি

গিন্নীমা।

—আমি খানাতল্লাস করব। ঘরদোর, সব ছেলের বাক্স পেঁটরা—বোর্ডিঙের ভাঁড়ার হাঁড়ি সব দেখব আমি।

বড়মাষ্টার ভাল মানুষ, ভাল বুদ্ধি। কি কি যে বলেছিলেন তাঁকে তা তাঁর মনে নাই, তবে হ্যাঁ কথাগুলি যেমন ন্যায্য, তেমনি ধীর, তেমনি মিষ্টি। বাড়ীর বউয়েরা-ঝিয়েরা, পাড়ার নিন্দুকেরা তাঁকে দজ্জাল, দর্কশা, খাণ্ডারনী—যা বলে বলুক—ন্যায্য কথা মিষ্টি কথা তিনি মানবেন না—এ কখনও হয়? একশো বার মানবেন। মাথা হেঁট করে মানবেন। মেনেও ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিলেন তিনি। বড়মাষ্টার বলেছিলেন—আমি নিজে খানা-তল্লাস করব। যদি ছেলেদের কাণ্ড হয়, যদি এতটুকু প্রমাণ পাই, তা হলে দোষীকে কঠিন শাস্তি দোব আমি।

তিনি বলেছিলেন—বেঁধে সে বেটাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি বেটাদের পাছায় কল্কে পুড়িয়ে ছাপ দোব।

বড়মাষ্টার হেসে বলেছিলেন—সে যা করবার আমি করব। আপনি যদি এসব নিজে করবেন—তবে আমরা রয়েছি কি জন্যে? আপনি গিন্নীমা! আপনি দান করবেন, ধ্যান করবেন, পুজো করবেন, পুণ্য করবেন। রাজা জজ রাখে বিচার করবার জন্যে। নিজে কি পারেন না? পারেন। কিন্তু করেন না। কাউকে ফাঁসির হুকুম দিতে হবে, কারুর হাত কেটে দিতে হবে। সে সব তিনি নিজে মুখে উচ্চারণ করেন না। আবার জজ ফাঁসির হুকুম দেয়, ফাঁসি দেয় জল্লাদ। রাজা জজকে হুকুম করে, চুলচেরা বিচার করবে। কোতোয়ালকে বলবে—যেখান থেকে হোক বার কর চোরকে, খুনেকে।

ফিরে এসেছিলেন তিনি খুশী হয়ে, এবং পরে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন আর বড়-মাষ্টারকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন এর জন্য। ভাগ্যে তিনি সেদিন মাষ্টারের কথায় আর ভগবানের দেওয়া সুমতিতে ফিরে এসেছিলেন। কারণ এর পরই তাঁদের নানান বাগানে এমনি কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। শুধু তাঁদের বাগানেই নয়—বিরগ্রামের আরও দু'এক বাবুর বাগানে পুকুরে এমন ঘটনা ঘটল। তখন প্রকাশ পেল যে, কাণ্ডটা কতকগুলি দুষ্ট প্রজার কীর্ত্তি। অন্যবাবু যাঁদের এমন ক্ষতি হয়েছে তাঁরাও ওই মহলে তাঁদের শরিক। পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল বেটারা!

সেই অবধি বোর্ডিঙের ডাকাতরা অত্যাচার করলে—আর তিনি ইস্কুল পর্যন্ত যান না। ম্যানেজার তারণকে ডেকে বলেন—যাও তো তারণ একবার বড়মাষ্টারের কাছে।

তারণ যায়। তিনি ঘরে বসেই খবর পান—বড়মাষ্টার খুব বকেছে ছেলেদের। বেত নিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে শাসিয়ে বলেছে—পিঠকা চামড়া ছাড়ায় দেগা!

শুধু তাই নয়। বড়মাষ্টার সত্যিকারের ভাল মাষ্টার। চুলচেরা কড়া বিচার। তাঁর বাড়ীর ছেলে কেউ অন্যায় করলে তাকে তিনি খাতির করেন না। সমান শাসন করেন। এই তো সমর—এখন তাঁর নাতজামাই,—তাঁর বড় জামাইয়ের ভাই; সেও তো এই বাড়ীর ছেলের

মত, সেও এই বাড়ীতে থেকেই পড়ত ; এবং সকলেই জানত—তাঁর বড় নাতনীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে ; বাড়ীর ছেলেদের চেয়ে তার খাতিরযত্ন একবিন্দু কম ছিল না, বেশীই ছিল ; সেই 'সমর' বদ্ সঙ্গে মিশে সিদ্ধি খেয়ে কি কাণ্ড করলে। বড়মাষ্টার তাকে বাবুদের বাড়ীর ছেলে কি হবুজামাই বলে এতটুকু খাতির করে নি। পিঠে বেত মেরে শায়েস্তা করে দিয়েছিল। তাতেও হ'ল না দেখে তাকে এখান থেকে সরিয়ে কলকাতার ইস্কুলে পাঠাতে বললে। তাই পাঠানো হয়েছিল। এবং তাতেই শোধরাল সমর। দু'বছর পর আবার এখানে এসে ভর্ত্তি হ'ল, ফাষ্টো ডিবিসনে পাস করলে। এখন সমর বি-এ পাস করেছে, হোমরা-চোমরা হয়েছে। কিন্তু সেদিন বড়মাষ্টার কড়া শাসন না করলে, তাকে এ ইস্কুল থেকে অন্য ইস্কুলে পাঠাবার জন্যে না বললে—সমর বয়ে যেত।

কতবার পাড়া-ঘরের লোকেরা তাঁর কাছে এসেছে, কেউ ছেলে সঙ্গে এনেছে—পিঠে মারের দাগ দেখিয়ে—দেখুন, গিন্নীমা দেখুন, ইস্কুলের মাষ্টারে কেমন করে ছেলে মেরেছে দেখুন! বিচার করুন। কোন দোষ নাই ছেলের।

পাড়া-ঘরের কাণ্ড, কি করবেন তিনি? খবর পাঠিয়েছেন তিনি বড়মাষ্টারকে। তাঁর ছোট ছেলে ইস্কুলের সেক্রেটারী, সে আবার বড়মাষ্টারের ছাত্র। তা তিনি ছেলেকে বড় আমলে আনেন না; সরাসরি মাষ্টারকেই খবর পাঠান বা গাড়ী করে ইস্কুলের খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ান ; মাষ্টার আসে—কি গিন্নীমা?

—হ্যাঁ মাষ্টার, ওই ওদের ছেলেটাকে কোন্ মাষ্টার বড্ড মেরেছে গো!

—দোষ করেছে গিন্নীমা। ও যদি মাষ্টারের নিজের ছেলে হ'ত তবে মেরে রক্তদর্শন করত।

মাষ্টার ছেলেটির দোষ বলতেই গিন্নীমা গালে হাত দিয়েছেন।

সেই বড়মাষ্টারকে ছাড়িয়ে দেবে? অধর্ম্ম হবে! অন্যায় হবে! পণ্ডিত তুমি ঠিক বলেছ—পাপ হবে। মঞ্জরী ডাক তো—ছোটবাবু কোথা আছে ডাক তো।

ছোটবাবু—চৈতন্যবাবুর ছোট ছেলে—পবিত্রবাবু। পবিত্রবাবুই ইস্কুলের সেক্রেটারী। পবিত্রবাবু এই স্কুলেরই ছাত্র। প্রথম বৎসর যারা এই ইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিল—তাদেরই একজন। পবিত্রবাবু পাস করতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অনেক পড়াশুনা করেছেন। মানুষটি বড় ভাল। শৌখীন মানুষ; বই লেখেন; থিয়েটার করেন; মিষ্টভাষী রসিক লোক।

পবিত্রবাবু আসতেই গিন্নীমা বললেন—বলি হ্যাঁরে, এসব কি শুনছি?

রামজয় তখন চলে এসেছেন।

—কি মা?

—গুরুমারা বিদ্যে? তোরা বড়মাষ্টারকেও ছাড়িয়ে দিবি?

—আমি তো ঠিক জানি না মা।

—তুই যে ইস্কুলের সেক্রেটারী। তুই জানিস না কি রকম?

—আমি সেক্রেটারী হলেও অমরদাদাই তো সর্বেসর্বা। তিনিই তদ্বির করে 'এডে'র টাকা বাড়িয়েছেন। তাঁর সঙ্গেই ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কথাবার্ত্তা হয়েছে। তা ছাড়া—হীরেন আর সমর তারা দু'জন এবার নতুন মেম্বর হয়েছে। তারা এ ইস্কুলে ছেলেবেলা থেকে পড়ে পাস করেছে—তারাই মাষ্টারদের দোষের কথা বলেছে। দোষ মাষ্টারদের আছে মা। ইস্কুলকে ভাল করতে হলে—মাষ্টার ভাল চাই।

—ও সব কথা আমি বুঝি না। অমরকে তুই আজই চিঠি লেখ। বড়মাষ্টার আর রামজয় পণ্ডিতকে ছাড়ালে আমি শুনব না। অমর আসুক। এসে আমার সামনে—বড়-মাষ্টারের সঙ্গে কথা বলুক। পরামর্শ করে যা হয় করুক।

অমর সেই ভাগিদেই এসেছেন। এসে চন্দ্রবাবুকে ডেকে তাঁর সামনে গোটা ফাইলটি নামিয়ে দিয়ে বললেন—দেখুন আপনি। আপনাকে বাদ দিয়ে কাজ আমরা করেছি, সেটা আমাদের ত্রুটি। কিন্তু মাষ্টারেরা আপনার কলীগ; কেউ বন্ধু, কেউ আত্মীয়, কেউ ছাত্র। তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া আপনার পক্ষে কষ্টকর হবে বলেই আপনাকে এর মধ্যে নিই নি। তা ছাড়া তাঁরাও আপনাকে অপবাদ দিত। আপনি চৈতন্য ইনস্টিট্যুশনের প্রাণ। আপনাকে বাদ দিয়ে চৈতন্য ইনস্টিট্যুশনের উন্নতির পরিকল্পনা আমরা করি নি।

চন্দ্রবাবু ফাইলটা উল্টে দেখলেন।

প্রথমেই মৃগাঙ্কবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি। সর্ব্বশেষ রতনবাবুর। তার পর আরও একটি ফাইল—সেটির উপর লেখা জেনারেল।

সেইটেই সর্ব্বপ্রথম খুললেন।

প্রথমেই তাঁর নাম। শ্রীচন্দ্রভূষণ দত্ত। হেডমাষ্টার। হি ইজ দি লাইফ এণ্ড সোল অব দি ইনষ্টিট্যুশন। ত্রুটি বলতে তিনি একটু ভীরু। ঠিক একালের মত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু অভাব আছে। অতিমাত্রায় প্রাচীন শুচিবাতিকের মত বাতিক আছে।

হাসলেন চন্দ্রবাবু।

পবিত্র-সমর-হীরেন এদের থিয়েটারে বাতিক আছে। ইস্কুলের পড়ুয়া গাইয়ে ছেলেদের অভিনয় করা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকবারই সংঘর্ষ হয়েছে।

আবার ফাইলটা উল্টে নিলেন তিনি। মৃগাঙ্কবাবুর ফাইল ওল্টালেন।

"এ গ্রেট স্কলার নো ডাউট।"

কিন্তু ছাত্রদের কাছে দুর্ব্বোধ্য দুরূহ। এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে একান্ত অমনোযোগী। ক্লাসে তিনি পড়ান না। অধিকাংশ সময়েই ক্লাসে এসে দরজা বন্ধ করে ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করেন। নাস্তিক্যবাদী পাণ্ডিত্যের বিলাসে—নীতিবাদ ধর্ম্মবাদ শাণিত যুক্তিতে উড়িয়ে দিয়ে কৌতুক অনুভব করেন। যদি বলা যায়—তাঁর নিজের জীবনেও এই নীতিবাদ শিথিল তা হলে মিথ্যা বলা হবে না। পরীক্ষার সময় তিনি ছাত্রদের কাছে উপঢৌকন গ্রহণ করেন। অনেক সময়

প্রশ্নও তাঁর কাছে জানা যায়। ছাত্রেরা ছাত্রজীবনে কৌতুক ও উদ্দামতা বশে চৌর্যবৃত্তি করে তাঁর কাছে চুরি করা জিনিস নিয়ে এসেছে—তিনি তাও জেনেশুনে গ্রহণ করেছেন। ১৯০৭ সালে—শ্যামসায়রের পাড়ের বাগানে—যে কলা চুরি হয়েছিল, সে চুরি প্রজারা করে নি, ছেলেরাই করেছিল। ছেলেরা অনুমান করেছিল যে, গিন্নীমা এই নিয়ে অনেক হাঙ্গামা করবেন। জেনেই তারা কলা বোর্ডিঙে রাখে নি। নানা স্থানে লুকিয়ে রেখেছিল। তার একটি স্থান—মৃগাঙ্কবাবুর ঘর। মৃগাঙ্কবাবু গভীর রাত্রে উঠে ছেলেদের মত কৌতুকেই চুরি-করা কলাগুলি তাঁর বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন।—না। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—এ কি কখনও হতে পারে? মৃগাঙ্কবাবু। না—না—না। আবার তিনি ঘাড় নাড়লেন।

ভরাট কণ্ঠস্বর অমরবাবুর, মৃদুস্বরে কথা বললেও বুকের ভিতর একটা প্রতিধ্বনি তোলে। চন্দ্রভূষণ একটা জয়পুরি মিনেকরা ফুলদানীর কানাটা ছুঁয়ে ছিলেন, সেটার মধ্যেও প্রতিধ্বনির রেশ বেজে উঠল। অমরবাবু বললেন—কিন্তু এ সম্পূর্ণ সত্য। পঙ্কা ক্ষ্যাপাকে নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন?

পঙ্কা ক্ষ্যাপা! পঙ্কজ চক্রবর্ত্তী! এই ইস্কুলেরই ছাত্র ছিল পঙ্কজ। দুর্দ্দান্ত দুষ্ট ছেলে; মাইনর পাস করে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনে ফোর্থ ক্লাসে এসে ভর্ত্তি হয়েছিল। বিবগ্রাম থেকে ক্রোশ দুই দূরে বাড়ী। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। অবস্থাপন্ন কিন্তু অভিশপ্ত, সর্ব্বজননিন্দিত ঘর। অভিশাপ না দিয়ে লোকে জল খেত না। লোভী, সুদখোর, দয়ামায়াহীন, কুটিল জনের বংশ। শুধু তাই নয়, এ সংসারের সব রকমের ব্যভিচার ও-বাড়ীর প্রতিটি জনের জীবনে বাসা বেঁধেছিল। পঙ্কজ যখন ভর্ত্তি হ'ল তখনই তার দাড়িগোঁফ গজিয়েছে, তখনই সে তামাক ছাড়িয়ে চরস ধরেছে। চন্দ্রভূষণবাবু এটা অবশ্য জানতেন না। যখন জানতে পারলেন তখন পঙ্কজ মদ ধরেছে। মুখে মদের গন্ধ পেয়েই চন্দ্রবাবু তাকে ইস্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। পঙ্কজ প্রথম দিনেই ইস্কুলে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল তার রূপো-বাঁধানো হুঁকোর জন্য। সেটা চন্দ্রবাবু দেখেন নি। ছেলেরা দেখেছিল। এবং প্রথম দিনেই পঙ্কা ক্ষ্যাপা বলে খ্যাত হয়েছিল। কথায়-বার্ত্তায় অস্বাভাবিক ছিল পঙ্কা। সেই পঙ্কা—হঠাৎ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। আজ সে এ অঞ্চলে সাধুপুরুষ বলে খ্যাত। সত্যই পঙ্কা সাধুপুরুষ। পঙ্কা আজ মদ দূরের কথা তামাক পর্য্যন্ত খায় না। আশ্রম করেছে, নাম দিয়েছে 'দীনপ্রভু সেবাশ্রম'। আশ্রমে অস্পৃশ্য জাতির আতুর জনের সেবা হয়। আশ্রমে এনে রোগে সেবা, দুঃখে সাহায্য, শোকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় পঙ্কা ক্ষ্যাপা। ঈশ্বরের নাম করে পঙ্কা কাঁদে; পঙ্কা শাস্ত্রপাঠ করে পণ্ডিত হয়েছে; ভাগবত কথকতা করে পঙ্কা—

সে কথকতা শুনে লোকের নাকি চোখের জলে বুক ভেসে যায়। সাধু হওয়ার পর চন্দ্রভূষণ তাকে চোখে দেখেন নি। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলে। তিনি সবিস্ময়ে ভাবেন। মৃগাঙ্কবাবু বলেন—"এ রোগ! রোগ অব দি ফার্ষ্ট রেট! প্রাচীন মিশরের পুরুতদের মত ভেরি ভেরি ভেরি ক্লেভার রোগ। হি ইজ এ মডার্ন পাপবুদ্ধি! ধরা পড়বে একদিন! ধর্ম্মবুদ্ধি অর দি ম্যান অব শার্পেষ্ট ইন্টেলিজেন্স যেদিন আসবে এ্যাণ্ড আশ্রমের চারিদিকে আগুন লাগাবে, সেইদিন সব বের হবে। ওর ভণ্ড সাধুত্ব—পাপবুদ্ধির লুকোনো পাপের মত ঝলসানো শরীরে বেরিয়ে এসে আছাড়ে পড়বে। হি উইল কনফেস হিমসেলফ!"

রামজয় প্রতিবাদ করে। রামজয় বলে—

মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্,
যৎ কৃপাং—তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং।

রামজয় বলে—আমি পঙ্কাকে দেখেছি। পঙ্কা—সত্যিই পঙ্কজ এখন। গুরুর কৃপা। বেটার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ছিল—পেয়ে গিয়েছিল এক বৈষ্ণব সাধুকে। তাঁর কৃপা।

অমরবাবু বললেন—দু'বছর আগে হঠাৎ পঙ্কা ক্ষ্যাপা এসেছিল—মঙ্গলের কাছে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল এরফান শেখকে।

মঙ্গলবাবু চৈতন্যবাবুর বড়ছেলে। বিল্বগ্রাম অঞ্চলের বড়বাবু। প্রতিহিংসায় ক্ষমাহীন, অনুগতজনের প্রতিপালক, একচ্ছত্র প্রভুত্বকামী দুর্দ্দান্ততম ব্যক্তি! তেমনি খেয়ালী। ইস্কুলের ছেলেরা মঙ্গলবাবুকে মঙ্গলবাবু বা বড়বাবু বলে না, বলে মহম্মদ তোগলক! চন্দ্রভূষণবাবু বাইরে শাসন করেন, কোনক্রমে কারও মুখে এ কথা শুনলে তিনি শাসন করেন—নো—নো—নো! মাস্ট নট সে—এনিথিং লাইক দিস! নেভার! আই ওয়র্ন ইউ। কিন্তু মনে মনে মৃদু হেসে উপভোগ করেন, সায় দিয়ে নিজেকেই বলেন—ভেরি রাইট। ভেরি রাইট দে হ্যাভ সেড। ইয়েস! মঙ্গলবাবু দিল্লীর সম্রাটের ছেলে সম্রাট হলে নিঃসন্দেহে মহম্মদ তোগলক হতে পারতেন। ইয়েস!

অমরবাবু বললেন—আপনি জানেন, এরফানও দুর্দ্দান্ত লোক, এখানকার মুসলমানদের মাতব্বর। মেসোমশায় বেঁচে থাকতে থাকতেই এরফানের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত—সেও আপনার অজানা নয়। কিন্তু সে বিরোধ মামলা-মোকদ্দমায় পরিণত হয় নি। মামলা-মোকদ্দমার আরম্ভ এই কলার গাছ—কলার কাঁদি কাটা থেকে। শ্যামসাগরের পাড়ের কলাগাছ কলা কাটার পরই এখানকার অন্য বাবুদের এবং মেসোমশায়দের অন্যখানের বাগানের গাছ কাটা ফল ছেঁড়া আরম্ভ হ'ল। পুলিস এনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিলে—এ কাজ এরফানের দলের। তখন এঁদের সঙ্গে এরফানদের ঝগড়া চলছে—খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে। ওরা খাজনা দিচ্ছে না, এঁরা ওদের খাস পতিতে গরু চরা বন্ধ করেছেন। খাস-খামারের গাছ কাটছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন—আমি জানি অমরবাবু। গিন্নীমা আমাকে নিজে ডেকে বলেছিলেন—বড়মাষ্টার কিছু যেন মনে করো না বাপু! বোর্ডিং ছেলেদের ঘর তল্লাস করতে যাওয়াটা

আমার ঠিক হয় নাই। ছেলেদিগের কিছু মনে করতে বারণ করো। এ কাণ্ড পুলিস খবর দিয়েছে দুষ্টু বদমাস প্রজাদের ; ওই এরফান শেখ তার পাণ্ডা।

অমরবাবু বললেন—ইয়েস, আই এক্সপেক্ট ইউ টু নো। আপনি এখানে শুধু হেডমাষ্টারই নন। এখানকার লোক। আই নো, ইউ শেয়ার দেয়ার সরোজ্। সেই বিরোধ সেদিন পর্য্যন্ত চলেছে, একটার পর একটা মামলা। ইউ নো, মঙ্গল ভয়ঙ্কর কঠোর! নিষ্ঠুর বলব। এরফানও দুর্দ্দান্ত। সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মিটমাট করতে এল। সঙ্গে পঙ্কা পাগল। সেই এসেছিল এরফানকে নিয়ে।

মঙ্গল মামলা তোলবার শর্ত দিলে—শ্যামসায়রের কলাগাছ—কলা কাটার জন্য জরিমানা দিতে হবে! এই জরিমানা ভিন্ন বিরোধ মিটবে না।

পঙ্কা বললে—সে অপরাধ এরফানের নয়, মঙ্গলবাবু। অপরাধ আমার ; হাঁ আমারই বলতে পারেন। এরফান আমার কাছে গেল। আমি ওকে প্রথম বলেছিলাম, এরফান আমি সন্ন্যাসী মানুষ, নিজের বিষয়ের বিষ সইতে না পেরে পালিয়ে এসেছি। আমাকে আর ওর মধ্যে টেনো না। ও কাঁদতে লাগল। কথায় কথায় বললে—"বড়বাবু বলছেন—দশ বছর আগে শ্যামসায়রের পাড়ে কলাগাছ কাঁদি কাটার জরিমানা আগে আমানত কর, তবে মিটমাটের কথা। আমি কইলাম শ্যামসায়রের কাণ্ড কে করেছে—আমি জানি না। খোদার নাম নিয়া কইতে পারি, কোরাণ শরিফ হাতে নিয়া বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, ওই কাণ্ড দেখে আমরা তার পরে বেলগাঁয়ের বাবুলোকের অনেক বাগানে গাছ কেটেছি। তা বাবু কয়—হাতে তামাতুলসী নিয়া ভাগবত নিয়া আমিও কইতে পারি ঝুটা বাত। তাতে যদি আমার লাভ হয়। উ ফন্দী আমি জানি। সব কসুর মাফ করতে পারি, শ্যামসাগরের কসুর—মূল কসুর—সেটা মাফ আমি করব না। পঙ্কা বললে—আমার মনে পড়ে গেল মঙ্গলবাবু, শ্যামসায়রের কাণ্ডের কথা। সে কাণ্ড এরফান করে নাই, আমরা করেছিলাম।

হা হা করে হেসে বলেছিল পঙ্কা—মঙ্গলবাবু, একে ছেলেমানুষ বয়েস তার ওপরে ডাঙ্গাপাড়ার মামলাবাজ, সুদখোর, নেশাখোর চক্কত্তি বংশের গুণধর—পঙ্কা তখন ডঙ্কা বাজিয়ে যত কুকাজ অকাজ করে ফেরে। গিন্নীমা বললে—মহাবীর মুচকুন্দ বাহাল সেখ বন্দুক লেকে পাহারা দাও। গাছের পাতা নড়েগা তো ফায়ার কর দেও। কাঠবেড়ালী, পক্ষী, বাঁদর, চোর-ছ্যাচড় যা হবে—লাগাও গুলি।

গরীবের ঘরের ছেলেরা ভয় পেলে, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা বললে—এ অপমান সহ্য করে এই স্কুলে পড়বই না। চলে যাব অন্য স্কুলে। গেরস্তঘরের ছেলেরা বললে—কাজ কি ভাই, ওদের বাগান তো বাগান, পুকুরে পর্য্যন্ত নামব না, ওদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন হলে খেতেও যাব না।

পঙ্কা বললে—তুই শালারা মেয়েলোকের অধম। কুছপরোয়া নেহি হ্যায়। ও বাগানকে বাগান লোপাট করে দেঙ্গে। আমিও বাবা ডাঙ্গাপাড়ার চক্কত্তি বাড়ীর ছেলে! হুঁ হুঁ

ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দোব। টাকু মোড়লের ভেল্কি! চলে গেলাম—রাধানগরের জমিদারবাড়ীর ছেলে—সতীশের বাসায়।

রাধানগরের জমিদার হরিশবাবু ছেলেকে এখানে পড়তে দিয়েছিলেন, কিন্তু বোর্ডিঙে রাখেন নি। এখানে বাসা করে রেখেছিলেন। ঠাকুর-চাকর রেখে থাকত সতীশ। সতীশ তখন শয্যাশায়ী। পঙ্কা বললে—অসুখের নাম নাই শুনলেন। সে আমলে ওসব রোগ বাবুদের ঘরের অঙ্গের ভূষণ ছিল। বিল্বগ্রামে তখন আপনারাই চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি করেছেন—তার ডাক্তার ছিল ছোকরা মানুষ, সতীশের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল টাকার খাতিরে। সে চালাচ্ছিল—সতীশের হার্ট ডিজিজ হয়েছে।

বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে সন্ন্যাসী পঙ্কা বললে—সে কাল ছিল আলাদা মঙ্গলবাবু, সে তো আপনি জানেন। আপনার ছোট ভাই পবিত্রবাবু এখন ইস্কুলে সেক্রেটারি, বিশিষ্ট লোক, নেপালবাবু এখন সরকারী ডাক্তার, তাঁদের কথা মনে করুন না। আপনিই তো পবিত্রবাবুকে রাস্তার ওপর বেত মেরেছিলেন। জানুয়ারি মাসে টেষ্ট পরীক্ষা—তার পরে এণ্ট্রান্স একজামিন; মুণ্ডমালী-তলায় রায়বাবুরা মেলা বসালে, খেমটা নাচ নিয়ে এল; পবিত্রবাবু নেপালবাবু মেলা দেখতে গিয়ে সেইখানেই থেকে গেল—সাত দিন। থাকল সেই খেমটাওয়ালীদের বাসার পাশেই চালা নিয়ে; বাসা দিলে খোদ রায়বাবুরা। আঠারো-উনিশ বছরের ইস্কুলের পড়ো ছেলে—রায়বাবুদের পুত্রতুল্য—তাতেও রায়বাবুদের বাধল না। সবই তো মনে আছে আপনাদের। সেই কালের ব্যাপার তো। দু'বছর পর।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পঙ্কা বললে—আজ তাই বসে বসে ভাবি। ভগবানকে শতবার প্রণাম করি আর বলি, ধন্য তোমার দয়া, কোন দয়াতে ডাঙ্গাপাড়ার চক্কত্তি বাড়ীর ছেলে—ষণ্ডামার্ক কালাপাহাড় পঙ্কাকে উদ্ধার করতে গুরুর বেশে দেখা দিলে তুমিই জান। নইলে পঙ্কা যে কি হ'ত, তা ভাবি আর শিউরে উঠি।

মঙ্গলবাবু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—তোমার ওসব কথা শুনবার অবসর নাই পঙ্কা! কি হয়েছিল তাই বল। আর বললেই শুধু হবে না। প্রমাণ চাই। তুমি এরফানের কাছে ঘুষ খাও নি, সে কি করে বুঝব? তুমি সাধু হয়েছ তা গেরুয়া কাপড় দেখে বুঝছি। কিন্তু ভণ্ড সাধুই তো নিরানব্বুই জন!

পঙ্কা হেসে বললে—আমি সাধু এই কথা কি বলতে পারি মঙ্গলবাবু? ঠিক বলেছেন আপনি—সাধু হওয়া সোজা নয়। মানুষ যখন—তাও আমার মতন মানুষ যখন সাধু হতে চায়—তখন প্রাণের মধ্যে পাপ কামনা মাথা কোটে, সাপের মতন ছোবল মারে, ক্ষ্যাপা কুকুরের মত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। হিতোপদেশে পড়েছিলাম, বুড়ো অথর্ব্ব বাঘ চোরা পাঁকে ভরা পুকুরঘাটে বসে সোনার তাল নিয়ে মানুষদের ডাকত—আমি দান করব, তোমরা দান নেবে এস। দান নেবার আগে চান কর—পুকুরে শুদ্ধ হয়ে নাও। মানুষ পুকুরঘাটে নেমে চোরাপাঁকে পড়ত, বাঘ তখন তাকে দিব্য ভক্ষণ করত। তাও হয়। কথা আপনি ঠিক বলেছেন। তা সাক্ষী আমার আছে। তবে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—

আপনি অন্যায় করে তার ওপর রাগ করতে পাবেন না। সাজা দেবেন না।

মঙ্গলবাবু সে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পঙ্কা বললে—তা হলে গোপালবাবুকে ডাকুন। আমাদের ড্যান্সিং গোপাল—মানে নৃত্যগোপালবাবু, ইস্কুলের কেরানী, সে আমলে বোর্ডিঙের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আমি বলব না, তিনিই বলবেন। তাঁর মুখেই শুনবেন সব কথা। শুধু তিনি যেখান থেকে জানেন—তার আগে পর্য্যন্ত বলে দিই আমি।

অমরবাবু বললেন—পঙ্কার কথায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম চন্দ্রবাবু। সত্য কথার একটা সুর আছে। সে সুর আমি পঙ্কার কথার মধ্যে পেয়েছিলাম।

রাত তখন বারোটা পার হয়ে গেছে। বৈশাখ রাত্রির উত্তাপ তখনও কমতে সুরু করে নি। চৈতন্যবাবুর রেষ্ট হাউসের সামনের বাগানটার গাছগুলো নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার সিঁড়ির পাশে বড় ঝাউ গাছগুলোর গুনগুনানিও শোনা যাচ্ছে না। রাস্তার ওপাশে ইস্কুল-বোর্ডিং, সেখানে ছেলেগুলোর অনেকের এখনও ঘুম আসে নি—ওদের সাড়াশব্দে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কয়েকটা দুর্দ্দান্ত ছেলে ইস্কুলের ছাদে উঠেছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সিগারেট জ্বলছে। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করছে, জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন অনির্ব্বাণ জোনাকীর মত যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেদেরও মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সিল্যুট ছবির মত। ওরা জানে না যে, সামনেই রেষ্ট হাউসে এই রাত্রে হেডমাষ্টার বসে আছেন, অমরবাবু এসেছেন। আশ্চর্য্য দুরন্ত এবং অসম্ভব দুঃসাহস হতভাগাদের। একতলা ইস্কুলবাড়ী, উঁচুতে সাধারণ দোতলার সমান, অথচ ছাদে উঠবার সিঁড়ি নাই। চার কোণে চারটে নকসা কাটা থাম আছে; একেবারে নিচে থেকে উপর পর্য্যন্ত সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি চৌকো ঘর তোলা আছে, সেই খাঁজে খাঁজে হাতের আর পায়ের আঙুলের ভর দিয়ে দিব্যি উঠে গিয়েছে। ওঃ দে আর ডেভিলস ইনকারনেট। এ ডেভিলদের একমাত্র স্থান হ'ল সৈন্যবিভাগ। বেটারা শত্রুপক্ষের বড় বড় দুর্গ অনায়াসে জয় করতে পারবে। কিন্তু সে পথ বন্ধ। ইটন ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে খেলার মাঠে ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রথম আয়োজন গড়ে উঠেছিল। এ বেটারা তাদের চেয়ে এতটুকু ছোট নয়।

অন্য দিন হলে চন্দ্রবাবু এখুনি দীর্ঘ পদক্ষেপে গিয়ে—তাঁর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চীৎকার করতেন—হু আর দেয়ার? ইউ! স্পীক আউট! আনসার মি! ইউ ডেভিলস! সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টকে ডাকতেন—কেষ্ট! মই, মই নিয়ে এস। ইউ শয়তানস, ডোণ্ট—ক্লাইম্ব ডাউন—, ডোণ্ট, আই সে।

এর পরই হিন্দী বলতেন তিনি—মৎ উতারো। বিনা মইসে মৎ নামো। খবরদার। ই-উ ননসেন্স! শেষের ইউ ননসেন্স শব্দটা খুব জোরে চীৎকার করে বলতেন। কারণ ওই দুর্দ্দান্তরা ধরা পড়বার ভয়ে ওঁর সাবধানবাক্যে কর্ণপাত করত না। চন্দ্রবাবুর হাত-পা কাঁপত, কণ্ঠস্বরেও তার আভাস প্রকাশ পেত।

আজ কিন্তু তাঁর মনের সে সক্রিয়তা ছিল না। তিনি মৃগাঙ্কবাবু এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীদের

জন্য বেদনায় ম্লান হয়ে গেছেন। নীরবে অমরবাবুর কথাগুলি শুনেই যাচ্ছেন।

অমরবাবু বললেন—পঙ্কা বললে, সতীশ ছিল বাবুলোক। মঙ্গলবাবুর মায়ের কথাটা তার মনেও খুব লেগেছিল। কিন্তু সে বললে—বোর্ডিঙে থাকলে আমি মানহানির মোকদ্দমা করতাম। তোরা মানহানির মোকদ্দমা কর্, চাঁদা তোল্, আমিও চাঁদা দোব।

পঙ্কা বললে—কিচ্ছু লাগবে না—তুমি বাবা ডাক্তারের কাছ থেকে একটা কড়া নেশা যোগাড় করে দাও, যা এক ডোজ খেলে সারারাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে; ঢাক বাজালে, চিমটি কাটলে ঘুম ভাঙবে না। কিন্তু না মরে। সিদ্ধির সঙ্গে মিশিয়ে দোব। আমিই বলতাম, কিন্তু ডাক্তার চটে আছে, ফাঁকি দিয়েছি। ওর কাছে সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম—তামাক না খেলে আমার পেট ফাঁপে। হেডমাষ্টার ঘর খানাতল্লাস করে আমার রূপোবাঁধা হুঁকো কাষ্টগড়ের তামাক টিকে নিয়ে চলে গিয়েছিল—ওই সার্টিফিকেটে হুঁকো তামাক কল্কে আদায় করেছিলাম।

মনে পড়ে গেল চন্দ্রবাবুর। ওঃ কি শয়তান বদমাস এই পঙ্কা ছিল তখন! তখনকার দিনে তিনি জানতেন—ছেলেরা ছেলেবয়স থেকেই তামাক খেতে ধরত। সন্ধ্যার পর ছেলেরা আপন আপন ঘরে পড়তে বসবার পর তিনি একবার নিয়মিত প্রত্যেক ঘরে এসে দেখে যেতেন। ছেলেরা এই সময়টায় প্রত্যেকেই সে কি মনোযোগের সঙ্গে পড়ত! গোটা বোর্ডিংটায় পড়াশোনার সে যেন হাট বসে যেত। তিনি বলে যেতেন—আস্তে, এত চীৎকার করে পড়ে না। নট সো লাউডলি। কেউ না পড়লে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন—আজও করেন—শুয়ে কেন? শরীর খারাপ? সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ অনুভব করেন। তার পর চলে এসে নিজে পড়তে বসেন। নোট তৈরি করেন। কোন ভাল বই পড়েন। ওদিকে তিনি চলে আসবামাত্র ছেলেদের হুঁকো কল্কে তামাক টিকে বের হয়। যাদের নিজেদের হুঁকো কল্কে নেই তারা সুটসাট করে বের হয়ে যায় রান্নাশালায়, ঠাকুরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত তাদের। ঠাকুর বিভিন্ন জাতের হুঁকো রাখে। এর জন্যে মধ্যে মধ্যে তিনি প্রথম রাউণ্ড দিয়ে ফিরে এসে আবার আধ ঘণ্টা পর বের হয়ে পড়েন। কেষ্টকে ধরেন কর্মরত অবস্থায়। নইলে ঐ কেষ্টই খবর দিয়ে দেয় ছেলেদের। আর সঙ্গে নেন এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে। তারপর আরম্ভ করেন খানাতল্লাস। বের হয় হুঁকো-কল্কে, তামাক-টিকে। সেদিন নৃত্যগোপাল সঙ্গে ছিল। পঙ্কার হাতে রূপো-বাঁধানো হুঁকো দেখে তাঁর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। দাড়ি গোঁফ বের হওয়া ছেলে হলেও পঙ্কা ফোর্থ ক্লাসের ছেলে। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দুই হাতে চড় মেরেছিলেন পঙ্কাকে। তাকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন।—নিকাল যাও। তুম্ নিকাল যাও। নেহি মাংতা! ক্লীয়ার আউট! পঙ্কা মার খেয়েও কাঁদে নি; শুধু বলেছিল—স্যার আমার—

—নো—নো—নো। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইউ! গেট আউট!

সেদিন ওই পঙ্কার জন্যে প্রতিটি তামাকখোর ছাত্রেরই লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। শেষ

পর্যন্ত চৌদ্দ-পনেরটা হুঁকো, কুড়ি পঁচিশটা কল্কে, কয়েক রকমের তামাক পাকড়াও করে তাঁর নিজের ঘরে এনে বন্ধ করে রেখেছিলেন, প্রতিটি ছেলের জরিমানা করেছিলেন। ঠাকুরকে শাসিয়ে দিয়েছিলেন—নেক্সট টাইম—ইউ লুজ ইয়োর জব। পরক্ষণেই হিন্দীতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—ফিন এইসা হোগা তো নোকরী চলা যায়েগা!

রাগের সময় বাংলা ভাষায় তিনি যেন ঠিক জোর পান না। গেট আউট, আভি নিকালোর মত জোর—'এক্ষুনি বেরিয়ে যাও' বলে যেন পাওয়া যায় না। তিনি নিজেই জানেন—তাঁর হিন্দী কত ভুল হয়, কিন্তু কি করবেন? জোরালো ভাষা ভিন্ন কি দুর্দান্ত রাগ প্রকাশ করা যায়? আর দুর্দান্ত রাগ না হলে এই সব—সাপের পাঁচ পা দেখা, উদ্দাম বয়সের এই মহাবীরের সগোত্রীয়দের শাসন করা যায়? রামজয় বলে—এই বয়সে সবাই অল্পবিস্তর মহাবীরের প্রভাবে পড়ে। তোমাদের ইংরেজীতে নাকি বলে—বানরের লেজ খসেই নর। ওটা বাপু ঠিক কথা। লেজ খসবার আগে হনুমানত্ব করে নেয় আর কি। হনুমান রামচন্দ্রের ভক্ত হয়ে বিশ্বপূজ্য হলেন। তার আগে? সে বাবা খাঁটি আসল ও অকৃত্রিম হনুমান। সূর্য্য উঠতে দেখে রাঙা ফল ভেবে লাফ দিয়ে ধরতে চায় যে হনুমান—এই বয়সে সেই হনুমান হয় মানুষ। সে হনুমানদের বশে রাখা কি সোজা কথা!

সেদিন সমস্ত সন্ধ্যাটাই তিনি অনর্গল হিন্দী বলেছিলেন। ন'টায় খাবার ঘণ্টা পড়লে—খাবার জায়গায় এসে দশ মিনিট তামাক খাওয়ার অপকারিতা এবং নিষ্কলুষ চরিত্রমহিমা ব্যাখ্যা করে হিন্দীতেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার পর এসে খেতে বসেছিলেন। খেয়ে উঠেছেন মাত্র হঠাৎ কাতর চীৎকার শুনে তিনি চমকে উঠেছিলেন। কি হ'ল? কার কি হ'ল? কোনরকমে হাতমুখ ধুয়ে ছুটে গিয়েছিলেন দেখতে।—কে চীৎকার করছে?

কেষ্ট বলেছিল—আজ্ঞে পঙ্কজবাবু। পঙ্কাবাবু!

—কি হ'ল?

—পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে বলছে।

—পেটে যন্ত্রণা? পেট ফেঁপেছে যেন।

ছুটে গিয়েছিলেন তিনি।—কি হ'ল? পঙ্কা বিছানায় শুয়ে পেটে হাত দিয়ে আঁঃ-আঁঃ শব্দে চীৎকার করছিল।—কি হ'ল?

কোন রকমে পঙ্কা বলেছিল—দম আটকাচ্ছে। পেট ফুলছে। আঁঃ—আঁঃ—আঁঃ শব্দে ছটফট করে উঠেছিল এর পর আর কিছু বলতে পারে নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ডেকেছিলেন। ডাক্তার তরুণ যুবা। সদ্য পাস করে বেরিয়েছে। সে এসে খুব আড়ম্বর সহকারে পরীক্ষা করে বলেছিল—এর কি ক্রনিক কলিক কি অম্বলের অসুখ আছে?

—ছিল। পঙ্কাই বলেছিল—কোবরেজী ওষুধে ভাল হয়েছিল। কোবরেজ বলেছিল—খাবার পর ইয়ে খেতে।

—কি খেতে? তা খাওনি কেন?

—হেডমাষ্টার মশায় কেড়ে নিয়েছেন যে।

—কি ? কি কেড়ে নিয়েছেন ?

—সব। হুঁকো কল্কে তামাক টিকে। সব!

ডাক্তার বলেছিলেন—তামাক সেজে আন তো! কেষ্ট!

চন্দ্রবাবু নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে ঘরে গিয়ে রূপো-বাঁধানো হুঁকোটি কেষ্টর হাতে দিয়ে বলেছিলেন—নিয়ে যাও। এবং আধ ঘণ্টা পর আবার কেষ্টকে ডেকে সব ছেলেরই হুঁকো কল্কে তামাক ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পঙ্কা ভাত খাবার ঘণ্টা পড়বার আগেই ডাক্তারের কাছে গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছিল। টাকা কবুল করেছিল, কিন্তু সে টাকা দেয় নি। সেইজন্যেই সতীশের শরণ নিয়েছিল।

অমরবাবু বললেন—পঙ্কা বললে, সতীশ ডাক্তারের কাছে ওষুধ যোগাড় করে দিয়েছিল। বিকেলবেলা গিরিশ সাহার দোকান থেকে ভরিখানেক সিদ্ধি কিনে এনে, শ্যামসায়রের ঘাটে মহাবীর সিংকে বললাম তোমার ঘুটনিতে এটা ঘুটে দেবে সিংজী ? অর্দ্ধেক তোমার অর্দ্ধেক আমাদের। মহাবীর সিং খুব খুসী। একদম চয়নকে তাল বানা দেগা বলে নিয়ে নিলে। বিকেলে পাকা কলা, চিনি, দুধ, রসগোল্লা নিয়ে গেলাম। ফাঁক বুঝে ওর ভাগটায় ওষুধ ঢেলে দিয়ে আমাদের ভাগটা নিয়ে এলাম। সিদ্ধিটা ফেলে দিলাম। আমরা খেলাম অন্য সিদ্ধি। রবিবার, হেডমাষ্টার নাই ; পরামর্শ করলাম। ছেলে বাছাই করলাম। তার পর বললাম—দাঁড়া। গিয়ে ডাকলাম এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে—ড্যান্সিং গোপালবাবুকে। ও হ'ল, মঙ্গলবাবুদের আপনার লোক! তা ছাড়া ওই রাত্রে দু'তিনবার উঠে ছেলেদের ঘরে ঘরে দরজা ঠেলে দেখে, কান পেতে শোনে কে কি বলছে! হেডমাষ্টারের গুপ্তচর। ওকে চাই। অন্য ছেলেরা বললে—দে ওর ঘরে শেকল তুলে তালা বন্ধ করে! আমি বললাম—ক্ষেপেছিস ? দরজা বন্ধ দেখে চেঁচামেচি করে পাড়া জাগাবে। ছেলেরা বললে—তবে ? বললাম—দেখ না! কেউ কথা বলবি না। হাসবি না। খবরদার। গিয়ে মাষ্টারের ঘরে ধাক্কা দিয়ে বললাম—স্যার স্যার। মহাবিপদ, উঠুন উঠুন। শিগগির উঠুন। মাষ্টার উঠে বেরিয়ে এল ধড়মড় করে।

পঙ্কা বললে—ওই এসেছেন গোপালবাবু—ওঁকে জিজ্ঞেসা করুন। উনি বলুন তার পর।

হেসে পঙ্কা বললে—কোন ভয় নেই আপনার। মঙ্গলবাবুকে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি। সেই শ্যামসায়রের পাড়ের কলাগাছ, কলার কাঁদি কাটার কথা। বলুন।

কেরানী নৃত্যগোপালের মুখ শুকিয়ে গেল।

মঙ্গলবাবু বললেন—বল গোপাল, বল!

অমরবাবু বললেন—বল। তোমার ভয় নেই।

নৃত্যগোপাল বললে—আমি ওদের ডাকে বেরিয়ে আসতেই পঙ্কা বললে—থার্ড ক্লাসের ছেলে, বামুনডির কমলকে ভুলোয় নিয়ে গেল। বাইরে উঠেছিল, হঠাৎ যাই-যাই বলে ছুটে বেরিয়ে গেল স্যার। আমি চমকে উঠলাম! ভুলো ? নিশি ? সর্ব্বনাশ! নিশির ডাকে চলে যাওয়ার কথা শুনেছি! কি করব ? হেডমাষ্টার মশায় নেই। অন্য কোন মাষ্টারও

নেই। শনিবারে সব বাড়ী গিয়েছেন! পঙ্কা আমার হাত ধরে বললে—স্যার আসুন। দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই। আমরা ছুটে যেতাম এতক্ষণ। কিন্তু আপনার পারমিশন না নিয়ে আর কি করি? শিগগির আসুন। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে ছুটতে লাগল। শ্যামসায়রের পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—ওই দেখুন। ওই যাচ্ছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। ওই! বলে টানলে। আমি ওদের সঙ্গে গেলাম। শ্যামসায়রের পাড়ের মাঝখানে ঘন কলাগাছের ঝাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। আমি বললাম—কই? পঙ্কা হেসে বললে—শুনুন স্যার, কমল ঘরে ঘুমুচ্ছে। আপনাকে মিথ্যে বলে ডেকে এনেছি। নইলে তো আপনি আসতেন না! ছেলেগুলো খিলখিল করে হেসে উঠল। ভয় হ'ল আমার! এরা কি আমাকে মারবে? পঙ্কা একখানা হাঁসুয়া বের করলে। মনে হ'ল আমাকে কাটবে, কেটে জলে পুঁতে দেবে বোধ হয়! আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হ'ল না। পঙ্কা বললে—গিন্নী আমাদের অপমান করেছে। ভয় দেখিয়ে বন্দুক নিয়ে পাহারা বসিয়েছে! আমরা তার শোধ নোব। তুমি মাষ্টার, হেডমাষ্টারের গুপ্তচর, বাবুরা তোমার আপনার লোক, তুমি বোর্ডিঙে আমাদের পাহারাদার। তাই তোমাকে নিয়ে এসেছি আমাদের সঙ্গে। শোন, যদি রাজী থাক তো ভাল, না থাক তো আগে তোমার জিভটি কাটব। তার পর তোমার সামনে এই কলাগাছ কাটব, কলা কাটব, চারাগাছ কাটব। মহাবীর সিং অজ্ঞান। কেউ আসবে না তোমাকে বাঁচাতে।

পঙ্কা হেসে বললে—জিভ আপনার কাটতাম না গোপালবাবু। ভয় দেখিয়েছিলাম। আপনিও ভয় পেয়ে গেলেন।

নৃত্যগোপাল বললে—হ্যাঁ ভয় পেলাম আমি। আমি সত্যি বিশ্বাস করলাম—ওরা আমার জিভ কেটে নেবে। আমি বললাম—তোমরা কাট, আমি চীৎকার করব না। কাউকে বলব না! যে দিব্যি করতে বলবে তাই করছি আমি। পঙ্কা বললে—দিব্যি-ফিব্যি নয় স্যার। আমি ডাঙ্গাপাড়ার চক্কত্তিদের ছেলে। আমার বাবা দাদা আদালতে তামা-তুলসী ছুঁয়ে মিছে এজাহার জবানবন্দী করে আসে। শালগেরামের পুজো করতে করতে মিথ্যে মামলার ফন্দি আঁটে। আমি দিনে দশ-বিশবার কালী দুর্গা নারায়ণের নাম নিয়ে মিছে দিব্যি করি; কিছু হয় না আমার। দিব্যি নয়, আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে, গাছ কাটতে হবে। এখন শুনুন, হয় আপনি এই হাঁসুয়া নেন, আমার কাঁধে চাপুন, চেপে কলার কাঁদিগুলো কাটুন। নয় আসুন আমি আপনার কাঁধে চাপি, চেপে কলা কাটি! এরা কুড়িয়ে জমা করুক। আমি—।

নৃত্যগোপাল চুপ করে গেল। মাথা নিচু করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

পঙ্কার হাসি অনির্বাণ। হা-হা করে হেসে উঠল, বললে—লজ্জা পেলেন মাষ্টার। আমি বলে দিই তা হলে। আমাকে কাঁধে নেওয়ার চেয়ে আমার কাঁধে চাপতেই মনস্থ করলেন। আমি একখানা গামছা দিয়ে বললাম—কাপড় ছাড়ুন স্যার, নইলে কলার রস কাপড়ে লাগলে সাত ধোপেও উঠবে না। মাষ্টারকে গামছা পরিয়ে কাঁধে করে তুললাম। মাষ্টার কলার

কাঁদি কাটলেন। পঁচিশ কাঁদি কলা, কুড়িবাইশটা মোচা; সে রাশীকৃত। কতক দিয়ে এলাম সতীশকে। তার ঘরের উঠোনে পুঁতে রাখলাম। কতক দিয়ে এলাম সেকেণ্ড মাষ্টারকে। পাকা কলা উনি খেতে খুব ভালবাসেন। মাষ্টার কলা পেয়ে ভারী খুশী।

অমরবাবু বললেন—শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম চন্দ্রবাবু।—মৃগাঙ্কবাবু জেনেশুনে খুশী হয়ে নিয়েছিলেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম পঙ্কাকে, সেই রাত্রেই দিয়ে এসেছিলে?

—সেই রাত্রেই বৈকি। সকালবেলা হৈ চৈ হবে। গিন্নীমা জরুর আসবেন খানাতল্লাস করতে। আটটা বাজতে-না-বাজতে হেডমাষ্টার আসবেন। রাত্রেই না সামলালে সময় কোথায়?

অমরবাবু বললেন—এত রাত্রে এত কলা মোচা নিয়ে গেলে, সেকেণ্ডমাষ্টার কিছু বললেন না?

—ওরে বাপরে! এত বড় পণ্ডিতের চোখে ধুলো দেওয়া যায় বাবু? আমরা ডাকতেই জানালা খুলে দেখলেন—ওঁর তো চোর-ডাকাতের ভয়ঙ্কর ভয়; তাই নেমে এসে কলার কাঁদিগুলো দেখে মুচকি হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—বন্দুকধারী পাহারাওয়ালার চোখে ধুলো দিয়ে কাটলি কি করে রে? এঁ্যা? তার পর ইংরিজীতে বললেন—কি বললেন মনে নাই, ইংরিজীতে তো মহাপণ্ডিত আমি, তবে মানেটা শুধিয়েছিলাম গোপালবাবুকে আসবার পথে, গোপালবাবু বললেন—যুদ্ধে যারা গুপ্তচর হয়ে শত্রুপক্ষের তাঁবুতে গিয়ে তাদের জল নষ্ট করে, রসদ নষ্ট করে, তোরা তাদের সমান বাহাদুর! তার পর বললেন—দে—তা হলে উঠোনে গর্ত্ত করে পুঁতে দে। গোলমাল তো হবেই। মিটুক—তার পর তুলে খাওয়া যাবে।

অমরবাবু বললেন—চন্দ্রবাবু, এ ঘটনা আজ দু'বছর আগের। আমি মঙ্গলকে বারণ করেছিলাম, মঙ্গল যেন মৃগাঙ্কবাবুর সম্পর্কে কোন কথা না বলে। এবং সেই দিন থেকেই আমি মৃগাঙ্কবাবুকে বিদায় দেবার কথা ভাবছি। এর পর হঠাৎ একদিন মঙ্গলের মেজ ভাগ্নের একখানা ইংরিজী পরীক্ষার খাতা আমার হাতে পড়ল। আপনি জানেন, ছেলেটির জন্ত আমার আগ্রহ আছে। আমার ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ভাবি। শুনলাম ফার্স্ট হয়েছে,—খাতা দেখেছেন আপনি, নম্বর দেখলাম পঞ্চান্ন—তার সঙ্গে জেনারেল গ্রেস দেখলাম আট নম্বর। পড়ে দেখলাম খাতা আপনি কড়াভাবে আদৌ দেখেন নি। এবং ক্লাসের ফার্স্ট ছেলের খাতা দেখে হতাশ হলাম। ওকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, দেখলাম, ইংরিজীতে সত্যই কাঁচা। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? ছেলেটি বললে—ক্লাসে ভাল পড়া হয় না। বেশী ছেলে ফেল হয় হেডমাষ্টারের হাতে, তাই শেষ গ্রেস দেন হেডমাষ্টার। বললে—ক্লাসে সেকেণ্ড মাষ্টার ইংরিজী পড়ান, উনি ওই একবার রিডিং পড়ে মানে করে দেন, সাবস্ট্যান্স শিখিয়ে দেন। পড়া ধরেন না। তার পর শুধু গল্প করেন। উনি ক্লাসে ঢুকেই ক্লাসের দরজায় খিল দিয়ে দেন। আধ ঘণ্টা পড়িয়ে বাকী সময়টা গল্প করেন, মাংস খাওয়ার গল্প বেশী করেন, আর করেন তর্ক। ওঁর সঙ্গে তর্ক কে করবে? উনিই তর্ক করেন—ঈশ্বর মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, চার্ব্বাক

দর্শন নিয়ে অনর্গল বকে যান থার্ড ফোর্থ ক্লাসের ছেলেদের কাছে। আমি মনে করি চন্দ্রবাবু, এসব আপনি জানেন। আমি শুনেছি এ বিষয়ে আকারে-ইঙ্গিতে ওঁকে সাবধানও বহুবার করেছেন। আমি যদি বলি—এ পর্য্যন্ত আপনার ইস্কুল থেকে স্কলারশিপ না পাওয়ার এটা একটা বড় কারণ; ফোর্থ থার্ড ক্লাস থেকে ইংরিজীতে কাঁচা ছেলেদের আপনি দু'বছরে মনের মত করে, স্কলারশিপের যোগ্য করে তৈরি করতে পারেন না।

অমরবাবু চুপ করলেন। চন্দ্রবাবু মাথা নীচু করে বসে রইলেন। কি বলবেন? কিছু বলবার খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। অমরবাবুর অভিযোগের উত্তর নাই। শুধু মনে পড়ছে মৃগাঙ্কবাবুর সুন্দর মুখখানি। সুপুরুষ মানুষ; অনেক পাণ্ডিত্য; কিন্তু কোথায় কি নাই, অথবা কবে কি করে এই সুন্দর মানুষটির কর্ম্মের মধ্যে কোন এক কীট প্রবেশ করেছে, তাঁর সমস্ত কিছুকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে।

অমরবাবু উত্তরের প্রতীক্ষা করে উত্তর না পেয়ে চন্দ্রবাবুকে ডেকে সচেতন করে দিলেন—চন্দ্রবাবু!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চন্দ্রবাবু বললেন—আমার আর বলবার কিছু নেই অমরবাবু।

—আই নিউ ইট। আমি জানতাম—আপনাকে শেষ পর্য্যন্ত এই কথাই বলতে হবে। কারণ এ ইস্কুল তো আপনার চাকরির ক্ষেত্র নয়। সাধারণ কর্ম্মের ক্ষেত্রও নয়; সাধনার কর্ম্ম-ক্ষেত্র। এ তো আপনার চেয়ে কেউ বেশী জানে না! তাই জেনেই আমি চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য স্কীম করেছি। আপনাকে জানাই নি। যতক্ষণ গবর্ণমেণ্টের ঘরে গ্র্যাণ্টইন-এড বাড়াতে না পেরেছি—ততক্ষণ জানাতে ভরসা পাই নি। চৈতন্যবাবু নেই, মঙ্গল তো নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী এক পয়সা দেবে না।

চন্দ্রবাবু মৃদু স্বরে বললেন—রতনবাবুর সম্পর্কে কিছু বলবার আছে। এমন সৎ সাধু মানুষ!

—আই অ্যাডমিট। কিন্তু ও সম্পর্কে আপনাকে অনুরোধ করব আপনি কিছু বলবেন না। আপনি জানেন না, আমি জেনেছি রতনবাবু রাজদ্রোহীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

—বলেন কি? চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

—রতনবাবুর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ থাকতে পারে না চন্দ্রবাবু।

—কিন্তু আপনার জানার মধ্যে ভুল থাকতে পারে অমরবাবু।

—না চন্দ্রবাবু, ভুল নেই। অবশ্য তাঁর সম্পর্ক গভীর নয় কিন্তু সম্পর্ক আছে। আমার সঙ্গে এক সময়ে সম্পর্ক ছিল, তাই আমার জানা নির্ভুল। চন্দ্রবাবু, এতটা যোগ আপনার সঙ্গেও ছিল না। রতনবাবুর আগে জিতেনবাবু থার্ড মাষ্টার ছিলেন উগ্র স্বদেশী। এখানে তিনি বিলিতী কাপড় পুড়িয়েছিলেন। আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। আপনারা তাঁকে সাবধান করুন, উগ্র বক্তৃতায় ছেলেদের উত্তেজিত করে ফল কি হবে? ইস্কুলকে রাজরোষে পড়তে হবে। ছেলেদের লেখাপড়ায় অমনোযোগ আসবে। আমি ছাত্রদের এবং জনসাধারণের

সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে তাঁকে শক্ত করে কিছু বলতে পারছি না। আপনার মনে আছে আমি লিখেছিলাম ডোণ্ট উয়োরি ; বুকের ঝড় আর মুখের ঝড়ে তফাৎ আছে। মুখ ক্লান্ত হলেই থামবেন। বুকের ঝড় মানুষকে ক্লান্তির মধ্যেও ঘুমুতে দেয় না। আমি অবশ্য জিতেনবাবুকে লিখেছিলাম এবং তিনি সাবধানও হয়েছিলেন। রতনবাবুর ঝড় বুকের ঝড় চন্দ্রবাবু। আমাদের সে দল অনেক দিন ভেঙে গেছে। আমি ও পথের ব্যর্থতা দেখে পথ পরিবর্তন করেছি। আমার ধারণা ছিল রতনবাবুও পথ পালটেছেন। মাসকয়েক আগে বাঙালী রেজিমেন্টে রিক্রুটমেন্টের জন্যে যখন এখানে সভা হ'ল, আমি এলাম। রতনবাবু আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের দলের সাংকেতিক শব্দটি উচ্চারণ করলেন। আমি চমকে উঠলাম ; পিছন ফিরে তাকাতেই রতনবাবু বললেন—'আপনি আসবেন এ আমি ভাবিই নি স্যার। পৃথিবীতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। একেই বলে, 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন।' হি হ্যাজ নট চেঞ্জড। এ্যাণ্ড এ স্টর্ম ইজ এ্যাহেড চন্দ্রবাবু! দে উইল ট্রাই, জীবনমরণ পণ করে চেষ্টা করবে। আপনি রড্যা আর্মস লুটের কথা জানেন, বালাসোরে বাঙালীর ছেলের ট্রেঞ্চ ফাইটের কথা শুনেছেন। এর চেয়েও বড় এ্যাটেম্‌প্ট হবে। আমি কলকাতায় হাই পুলিস অফিসিয়ালের কাছে শুনেছি। আরও শুনেছি একজন বড় রেভ্‌লুশ্যনারী এ্যাবস্কণ্ড করে এই অঞ্চলে এসেছিল, কোথাও ছিল কয়েকদিন। বোলপুর পর্য্যন্ত পুলিস ট্রেস করেছে। তার পর আর পায় নি। তাদের ধারণা শান্তিনিকেতন ওয়াজ দি প্লেস। কিন্তু আমি জানি—আই এ্যাম সিওর—হি পাসড থ্রু শান্তিনিকেতন অন হিজ ওয়ে টু রতনবাবুজ হোম।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রবাবু।

রতনবাবু শান্ত মিষ্টভাষী আধপাগল রতনবাবুর পরিচয় এই! গভীর অন্ধকার রাত্রে দুর্গম পথের প্রবেশমুখে মশাল উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে যে উদাসী, সে উদাসী রতনবাবু! বিপ্লবীদের কথা হলে চন্দ্রবাবু তাদের কর্ম্মপন্থার তীব্র সমালোচনা করেন। ইতিহাস মনে পড়ে যায় তাঁর —ভূগোল মনে পড়ে, মানচিত্র ভেসে ওঠে চোখের সম্মুখে। টেমস নদীর খাত বেয়ে ক্ষুদ্র একটা দ্বীপের বিস্ময়কর শক্তি এসে পড়ছে ইংলিশ চ্যানেলে। তার রক্ত লাল। লাল হয়ে গেল সমুদ্রের নীল জল। সাত সমুদ্র! 'রুল ব্রিটানিয়া, ব্রিটানিয়া রুলস দি ওয়েভস।' ব্যাটল অব ট্রাফালগার, ব্যাটল অব ওয়াটারলু! বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ঁ।—সেই লাল ঢেউয়ের ধাক্কায় বিরাট ঐরাবতের মত ভেসে গিয়ে আছাড় খেয়ে ক্ষুদ্র সিসিলি দ্বীপের বালুকা সৈকতে গড়িয়ে পড়ল নিষ্প্রাণের মত। তার ধাক্কায় দক্ষিণ ভারতে মঁসিয়ে ডুপ্লে, কাউণ্ট লালী কোথায় ভেসে গেল। গঙ্গার মোহানা বেয়ে সে ঢেউ এসে পলাশীতে ভাসিয়ে দিল মুঘল নবাবী আমল। মীরকাশেম ভেসে গেল। বক্সারে গিয়ে সে আঘাত করলে মুঘল সাম্রাজ্যের মাঝবুকে। নবাব অব আউধ। টিপু সুলতান টাইগার অব ইণ্ডিয়া। রণজিৎ সিংহ। এক-চক্ষু শিখবীর ঠিক দেখেছিল সব লাল হো যায়েগা! এত বড় মিউটিনি, বুদ্বুদের মত লাল শক্তির অতলান্তিক গভীরতার মধ্যে কোথায় ফেটে মিলিয়ে গেল। ওঃ, দিল্লীর রাজপথে সম্রাট বাহাদুর শাহের ছেলেদের রক্ত মিশছে ধুলোর সঙ্গে। ভয়ে আতঙ্কে তাঁর সমস্ত শরীরে কাঁটা

দিয়ে ওঠে। তিনি তারস্বরে বলেন—'নো-নো-নো! দিস ইজ ম্যাডনেস। দিস ইজ ম্যাডনেস।' ও পথ নয়। ভুল। ভুল। ভুল!

প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে যান তিনি। শেষ পর্য্যন্ত বলেন—ও কথা আমার ইস্কুলের সীমানায় নয়। প্লিজ! প্লিজ! কিন্তু তার পর যখন একা হন তখন উদাস মনে তাকিয়ে থাকেন সামনের অন্ধকারের দিকে। ভাবেন এই সব উন্মাদদের কথা। তখন ওই ছবিটা ভেসে ওঠে। দূরে বহুদূরে গাঢ় গভীর অন্ধকারের মধ্যে কে যেন উর্ধ্ববাহু হয়ে মশাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটিও তার উর্ধ্বে ওই মশালের শিখার দিকে নিবদ্ধ! মাথায় কপালে উর্ধ্বদৃষ্টি নিষ্পলক চোখে লাল ছটা পড়েছে। মাথার বিশৃঙ্খল বড় বড় চুল বাতাসে উড়ছে। নিচের দিকটা অস্পষ্ট। মশালধরা হাতের মুঠির ছায়া পড়েছে সেখানে। সে মূর্ত্তি রতনবাবুর!

অমরবাবু আবার বললেন—উই মাস্ট সেভ আওয়ার ইনস্টিট্যুশন। ওরা উন্মাদ। আপনি মনে করুন আমরা দু'জনে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় কি সঙ্কল্প করেছিলাম। আলো জ্বালতে হবে। দেশজোড়া কুসংস্কার বিকৃতি আর মূর্খতার কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারকে কাটিয়ে জ্ঞানের সূর্য্যকে ওঠাতে হবে। আপনি সুবর্ণবাবুর ভাঙাভগ্ন মাইনর ইস্কুলে হেডমাস্টারি করেন আর স্বপ্ন দেখেন। আমি চৈতন্যবাবুর চ্যারিটি বয় আগ্রায় প্রফেসারি করি আর স্বপ্ন দেখি। চৈতন্যবাবুর টাকা ছিল—কতবার বলেছি মেসোমশায় একটা হাই-ইস্কুল করুন। তিনি বলতেন—ইচ্ছে আছে অমর, কিন্তু। কিন্তু সুবর্ণের বাপের নামের ইস্কুলটা যে উঠে যাবে! অন্যের কীর্ত্তি লোপ করে কীর্ত্তি করব? তারপর এল সুযোগ। ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন তাঁকে ইস্কুল করতে। আপনি মাইনর ইস্কুলের চাকরি ছাড়লেন, আমি প্রফেসারি ছেড়ে এলাম। দু'জনে একসঙ্গে খেটে ইস্কুল করেছি। সে ইস্কুলকে আমি বিপন্ন করতে পারব না!

চন্দ্রবাবু বললেন—আমি আমার আপত্তি উইদ্‌ড্র করছি অমরবাবু।

অমরবাবু ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করলেন, বোধ করি একটা গতির আবেগ তাঁর অন্তরের মধ্যে বয়লারের বাষ্পশক্তির মত তাঁকে তাঁর অভিপ্রেত পথে সামনের দিকে ঠেলছিল। চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আই অ্যাম গ্ল্যাড। আর আমার কোন সংকোচ নেই। বহু চেষ্টা করে এ সুযোগ পেয়েছি। চৈতন্য ইনস্টিট্যুশনকে আমি ফার্স্ট ক্লাস ইনস্টিট্যুশন হিসেবে দেখতে চাই। নিউ আইডিয়া নিউ আইডিয়াল; নতুন একটা জেনারেশন গড়তে হবে। নতুন শিক্ষক চাই! ইউ উইল হ্যাভ দেম। আপনার এ্যানুয়েল রিপোর্টের আরম্ভের প্যাসেজটা আমার ভারী ভাল লাগে। দেয়ার ওয়াজ ডার্কনেস। ডার্কনেস এভরিহোয়ার। ডার্কনেস অব ইগনোরেন্স, ডার্কনেস অব সুপারস্টিশনস। পিপলস হার্ট ক্রায়েড ফর লাইট। দেন কেম এ ম্যান, এ গডসেন্ট ম্যান···হি কেম উইথ এ টর্চ ইন হ্যাণ্ড! চৈতন্যবাবু সেই মশাল সত্য বলতে আপনার হাতে দিয়ে গেছেন। মশালে ছাই জমেছে। ঝেড়ে ফেলতে দ্বিধা করলে চলবে না চন্দ্রবাবু! আপনার সঙ্গীদের মধ্যে যার হাতে যোগানের তেল ফুরিয়েছে, যার হাতের তেলে ভেজাল মিশেছে, যে সমান তালে চলতে অক্ষম, তাদের মমতাও ছাড়তে হবে। ইউ মাস্ট!

চন্দ্রবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—আই হ্যাভ শেকেন ইট অফ। ঝেড়ে ফেলেছি অমরবাবু। যা করবেন আপনি আমি অমত করব না। তবে বিমর্ষ দেখলে তিরস্কার করবেন না। আজ প্রায় একযুগ দশ বছর একসঙ্গে কাজ করছি। দুঃখ পাব। সহ্য করতে সময় লাগবে। নমস্কার।

প্রতিনমস্কারের প্রতীক্ষা তিনি করলেন না, বেরিয়ে এলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাস তিনেক পরের কথা। গরমের ছুটির পর। চন্দ্রভূষণবাবু ইস্কুল খুলবার চার-পাঁচ দিন আগেই এসেছেন। ছুটির মধ্যেও বারদুয়েক এসেছিলেন। ইস্কুলের ব্যবস্থায় ও বন্দোবস্তে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনে আসতে হয়েছিল। আয়োজন অনেক। স্কুল বোর্ডিঙের চারিদিকে কম্পাউণ্ড ওয়াল তৈরি হচ্ছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে নতুন বাড়ীও তৈরি হচ্ছে, হেডমাষ্টারই হবেন বোর্ডিং সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। আরও কয়েকখানা পাকা ঘরের একটি বোর্ডিং হাউস তৈরি হচ্ছে—তাতে নতুন মাষ্টার যাঁরা আসছেন—তাঁরা থাকবেন। এই সঙ্গে ইস্কুলের বাড়ী, পুরানো বোর্ডিং হাউসের বাড়ীও মেরামত হচ্ছে—চুনকাম হচ্ছে। সেই সবগুলি দেখাশুনা করবার জন্য ছুটির মধ্যে বারদুয়েক তাঁকে আসতে হয়েছিল। কাজকর্ম্ম চৈতন্যবাবুর এষ্টেট থেকেই হচ্ছে, তাঁরাই করাচ্ছেন, তবু দেখেশুনে নেওয়ার ভার তাঁর উপর ছিল। সরকার থেকে এজন্যে টাকা দিয়েছেন—খরচের একটা মোটা অংশ এবং এর জন্যে তাঁরা অনেক নিয়মকানুনেরও কড়াকড়ি করেছেন। ভালোই করেছেন।

গরমের ছুটির বন্ধের দিনই বিদায়ী শিক্ষকেরা অবসর নিয়েছেন—ওই দিনই তাঁদের কার্যকাল শেষ হয়েছে। সেদিন ইস্কুলে একটি বিদায়-অভিনন্দনের সভারও আয়োজন হয়েছিল। অতি সকরুণ বেদনা এবং অকপট অশ্রুজলের মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটেছে। সেকেণ্ড মাষ্টার মৃগাঙ্ক রায়, থার্ড মাষ্টার রামরতন পাল, ফিফথ মাষ্টার যামিনী সিংহ, সিক্সথ মাষ্টার গোপাল সরকার, থার্ড পণ্ডিত যতীন মণ্ডল—বিদায় নিয়েছেন। ওঁরা নিজেরাই রেজিগনেশন দিয়েছিলেন। তবুও, মাথা নত করে চোখের জল ফেলে নিঃশব্দে ভাগ্যহতের মত বিদায় নিয়েছেন তাঁরা। হাসতে হাসতে স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে কথা বলে—অনেক কথা বলে বিদায় নিয়েছেন থার্ড মাষ্টার রামরতনবাবু।

ছেলেরা এই বিদায় সভার জন্য বেশ কিছু টাকা চাঁদা তুলেছিল। তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলেছিল—এখানকার প্রাক্তন ছাত্র-সমিতিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাঁদা তুলে বর্ত্তমান ছাত্রদের হাতে দিয়েছিল; সেই টাকাটাই বেশী টাকা, পরিমাণ অপ্রত্যাশিত, পাঁচশ' টাকা। সবসুদ্ধ প্রায় সাতশ' টাকা হয়েছিল। যে শিক্ষকেরা থেকে গেলেন—তাঁরাও সকলে একশ' টাকা দিয়েছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষককে কাপড়-চাদরের সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও প্রণামী দেওয়া

হয়েছিল। প্রত্যেক শিক্ষককে একটি করে একশ' টাকার তোড়া তারা দিয়েছে। ইস্কুল থেকেও প্রত্যেককে এক এক মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে। তাঁরা নিজে থেকে রিজাইন দিয়ে থাকলেও ম্যানেজিং কমিটি এ বেতনটা বিশেষ বিবেচনা করে মঞ্জুর করেছেন। সকলেরই এতে উপকার হয়েছে। তিন মাস থেকে পাঁচ-ছ' মাসের বেতন পেয়েছেন তাঁরা। নেন্ নি কেবল রামরতনবাবু। ইস্কুলের দেওয়া বেতন প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন—"এ বেতন নিলে বলতে হয়—'ম্যানেজিং কমিটি আমাকে ডিসমিস করছেন'। এ বেতন আমার আত্ম-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে।" ছেলেদের টাকাটা না নিয়ে বলেছিলেন—"আমার আনন্দের আর সীমা নাই। তোমাদের গুরুভক্তি দেখে আমার বুক গর্ব্বে ফুলে উঠেছে। কিন্তু টাকার আমার প্রয়োজন নাই। বাড়ীতে ধানচাল হয়, খাওয়ার কষ্ট হবে না। সংসারে সন্তানের মধ্যে একটি কন্যা। স্ত্রী অনেকদিন মারা গেছেন। নিজের প্রয়োজন আমার যৎসামান্য তা তোমরা জান। আমি জামা গায়ে দিই না, জুতোর দরকার হয় না। তামাক পানও খাই না। সুতরাং টাকাটা তোমরাই রাখ। আমি মাথায় ঠেকিয়ে ফেরত দিচ্ছি। আমাদের মধ্যে যিনি বেশী বিব্রত হবেন—প্রয়োজন যাঁর বেশী, টাকাটা তোমরা তাঁর প্রণামীর সঙ্গেই যোগ করে দাও।"

টাকাটা মৃগাঙ্কবাবুকে দেওয়া হয়েছে। হিসেব করলে মাসিক বেতনের অনুপাতে টাকাটা তিনিই কম পেয়েছিলেন, নিয়েছেনও তিনি।

এটা সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, এ উদ্যোগের মূলে ছিল—হীরেন আর সমর, চৈতন্যবাবুর দৌহিত্র এবং পৌত্রী-জামাতা। দু'জনেই ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র; ওরাই এখানকার প্রাক্তন ছাত্র সমিতির কর্ণধার। এরাই দু'জনে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নূতন মেম্বার হয়েছে; শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি এরাই তৈরি করে কমিটিতে দাখিল করেছে। চন্দ্রভূষণবাবু বুঝেছেন—নিঃসন্দেহে বুঝেছেন যে, এই তরুণ দুটি বয়সের উৎসাহে, তরুণ-মনের সৎসঙ্কল্পের দৃঢ়তায়—বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আন্তরিক বেদনা সত্ত্বেও এ কাজ করেছে। শিক্ষক-দের উপরে তাদের অশ্রদ্ধা বা কোন আক্রোশবশে এ কাজ তারা করে নি, করেছে ইস্কুলের উন্নতিকল্পে—ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার হিসেবে কর্ত্তব্যবোধে। অবশ্য স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর ও আত্মীয় হিসেবে একটু-আধটু মালিকানিবোধের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার হয়ত থাকলেও থাকতে পারে। হয়ত থাকতে পারে কেন—থাকেই, এ ক্ষেত্রেও আছে। তা থাক, সদিচ্ছা পরিমাণে অনেক বেশী, এবং শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বেদনাবোধেরও পরিচয় তারা দিয়েছে। প্রাক্তন ছাত্র-সমিতিও তাদের দু'জনের গড়া প্রতিষ্ঠান। বড় ঘরের ছেলে বড় সমাজের প্রেরণা পায়—সচ্ছলঘরের ছেলেদের দুধের সঙ্গে সর ও মধুর মত; ওদের পক্ষে এই ধরনের কল্পনা করতে পারা স্বাভাবিক। প্রাক্তন ছাত্রসমিতি ইস্কুলের মেধাবী গরীব ছেলেদের সাহায্য করে; মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে, আরও অনেক সৎকাজ করে। এক্ষেত্রেও এই সমিতিই ইস্কুলের ছাত্রদের ডেকে এই বিদায়-অনুষ্ঠান করবার পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়েছে। পাঁচ শ' টাকার মধ্যে হীরেন আর সমর দু'জনে একশ' টাকা করে দু'শ' টাকা দিয়েছে।

কথাটা সকলেই জানে, বিদায়ী শিক্ষকেরাও জানেন। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কোন কথা তোলেন নি, কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নি। রামরতনবাবুও কোন কথা তোলেন নি, শুধু হেসে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সভায় তিনিই বিদায়ী শিক্ষকদের পক্ষ থেকে যা বলবার বলেছিলেন। বলেছিলেন—"পুরনো যায় নতুন আসে—এই তো সংসারের নিয়ম, এই নিয়মেই তো সৃষ্টি চলে। এই যাওয়া-আসার নিয়মের গুণেই পৃথিবীর রং বজায় থাকে। না হলে রং উঠে ফিকে হয়ে, হয়ত সাদা হয়ে যেত, নয় ত ধুলো ময়লা পড়ে ময়লা হয়ে যেত। যা ময়লা তাই কালো। সেই নিয়মেই আমরা যাচ্ছি, তোমাদের ইস্কুলে নতুন মাষ্টার আসছেন, ইস্কুল নতুন হচ্ছে। নতুন মানেই খুশীর কথা। নতুন কাপড় নতুন জামা নতুন বই জীবনে নতুন রস নতুন উৎসাহ আনে। নতুন শিক্ষকেরাও তোমাদের জীবনে নতুন প্রেরণা আনবেন। আমাদেরও তাই। অনেক দিন এক জায়গায় চাকরি একঘেয়ে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। আমরাও নতুনের সন্ধানে চললাম। তোমরা পড়েছ, ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা, ইংরিজী পোয়েট্রি—টেনিসনের লেখা :

Men may come and Men may go
But I go on for ever.

নদী বলছে। এখানেও তাই ; পুরনো ছাত্র যাচ্ছে নতুন ছাত্র আসছে ; পুরনো মাষ্টাররাও যায়, প্রতি বছর যায় না। পাঁচ-সাত বছর পর যায়, দশ বছর পর যায়, যেতে মোটকথা হয়। আমরাও যাচ্ছি। তোমাদের ইস্কুল চলছে নদীর মত। চলুক, ক্রমশঃ প্রসারে বড় হয়ে স্রোতে প্রখর হয়ে চলুক। দেশে মানুষের অবস্থা সগর-সন্তানের মত—তারা উদ্ধার হোক। আমাদের হেডমাষ্টার মশায় ইস্কুলকে তুলনা করেন আলোর সঙ্গে। তাঁর কথাটি বড় ভালো। Darkness, Darkness everywhere ; এই অন্ধকারের মধ্যে এই ইস্কুলটি চণ্ডীমণ্ডপে দশবাতি আলোর মত জেলে দিয়েছেন এখানকারই এক মহাপুরুষ। সেই দশবাতি আলোটি পঞ্চাশ বাতি—একশ' বাতি—হাজার বাতি হয়ে উঠুক। তোমরা যত দলে দলে আসবে—বসবে মণ্ডল করে—তত জোর হবে আলোর। মাষ্টারেরা বাতিবরদার, তেল যোগাবেন চিমনি মুছবেন পলতে কাটবেন। মধ্যে মধ্যে এঁদের বদল হয়, বদল হবে। তা হোক—আলোটি উজ্জ্বল হোক—তার ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বাড়ুক। তোমরা কিন্তু বাবু ভালো করে পড়াশুনা করো, মানুষের মত মানুষ হতে পেরো।"

অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। গোটা অনুষ্ঠানটির ভেতরে ভেতরে শিক্ষক ক'জনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের যে দুঃখ-বেদনা চাপা কান্নার মত বইছিল—একটা গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেটি কাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মাষ্টারেরা হাসতে হাসতেই চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যেও অক্ষমতা বা অযোগ্যতার অপবাদে ছাড়িয়ে দিলে বলে যে অভিমান ক্ষোভ ছিল—তাও কেটে গিয়েছিল। কেবল মৃগাঙ্কবাবু হাসেন নি। সংসারকে তিনি বড় ভয়

করেন—সে ভয় তাঁর কিছুতেই—নিতান্ত করে ওই সময়টির হাসিখুশীর মধ্যেও কাটে নি। একেবারে শেষকালটায়, অর্থাৎ অনুষ্ঠানশেষে চন্দ্রবাবুর বোর্ডিঙের ঘরটার সামনে চাতালে বসে তামাক খেয়ে উঠবার সময় একটা কথায় সবকিছুর উপর যেন কালি ছিটিয়ে কালো করে দিয়েছেন।

তামাক খেয়ে উঠবার সময় নমস্কার করে বলেছিলেন—চলি চন্দ্রবাবু। বলিদান হয়ে গেল—এইবার হোম লাগান—তিলক পরুন, ভোগ লাগান—প্রসাদ পান—দক্ষিণে মোটা হোক; মন খারাপ করবেন না, যে ছাগল-ভেড়াগুলো বলি হ'ল তাদের মরণ-চীৎকার বেশীক্ষণ মনে থাকে না, থাকবেও না। শুধু হুঁশিয়ার থাকবেন, বাস্।

তারপরই খুব হা-হা শব্দে হাসতে চেষ্টা করেছিলেন। হাসিটা ঠিক হয় নি—তাই নিজেই থেমে গিয়েছিলেন, এবং পকেটে হাত দিয়ে একটু চমকে ওঠার ভান করে বলেছিলেন—ওরে বাবা—বলির সময়ের চাল-বেলপাতা ক'টা গেল কোথায়। গরু মেরে জুতো দান ব্রতের জুতো? আজকের দেওয়া টাকা ক'টা? এই আছে।

বলেই হন্‌হন্ করে চলে গিয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু চুপ করে বসে ছিলেন চাতালটিতে দীর্ঘক্ষণ।

রামরতনবাবু গভীর রাত্রে এসে তাঁকে ডেকে বলেছিলেন—উঠুন মাষ্টারমশাই। আপনার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কেষ্ট ক'বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছে। ডাকতে সাহস করে নি। আপনার তো কোন দোষ নেই, সে তো সবাই জানে। মৃগাঙ্কবাবুও জানেন। কিন্তু আজ ওঁর মাথার ঠিক নেই। সামান্য দুঃখে উনি ভগবানকে গাল দেন, এত বড় আঘাতে আপনাকে গাল দিয়েছেন—আপনি ভাগ্যবান ভগবানকে গালাগালির কিছুটা অন্ততঃ আপনি নিতে পেরেছেন।

রামরতনবাবু নিজে সামনে বসে তাঁকে খাইয়েছিলেন। খাওয়ার পর চন্দ্রবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি যা বললেন—তা আপনার অন্তরের কথা তো রতনবাবু?

—আমার অন্তরের অন্তরের।

—আমার কি রেজিগনেশন দেওয়া উচিত ছিল?

—না। ইস্কুলের স্বার্থ সবচেয়ে বড়। ইস্কুলের প্রয়োজন আছে আপনাকে। আপনার চেয়ে বেটার হেডমাষ্টার অবশ্যই পাওয়া যেত—কিন্তু তাঁরা ইস্কুলকে আপনার মত ভালবাসত না। যদি তাও বাসত তবে এখানকার গরীব ছাত্রদের আপনার মত মমতা করতে পারত না, ভালবাসতে পারত না। ইস্কুলের আপনাকে প্রয়োজন আছে। আপনারও অন্য স্থানে চাকরি মিলত কিন্তু সেখানে গিয়ে সে ইস্কুলকে আপনি এত ভালবাসতে পারতেন না।

হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেছিলেন—পরকালে বিচার সকলেরই হয়। আপনার বিচারের সময় যদি প্রশ্ন ওঠে—ইফ দে মেক এনি চার্জ ফর দিস—আমি সাক্ষী দেব।

এবার একটু হেসেছিলেন চন্দ্রবাবু। তামাক খেতে খেতে হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন—

আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কিন্তু সকলের থেকে স্বতন্ত্র।

—আই নো চন্দ্রবাবু। ইয়েস ইট ইজ ট্রু। বিপ্লবীদের আমি জানি। তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। কিছুদিন আগেও একজন বড় বিপ্লবী এ্যাবস্কণ্ডার আমার বাড়ীতে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেছেন।

—ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে আপনি—?

—হ্যাঁ। করেছি বৈকি প্রচার। দিয়েছি বৈকি শিক্ষা। দেশকে স্বাধীন করার মহান্ শিক্ষাই যদি না দিতে পারলাম তো দিলাম কি? দিয়েছি। তবে দুঃখ—খাঁটি মেটাল পাই নি। তলোয়ার তৈরি হয় নি। তবে কতকগুলো ঘোড়ার পায়ের নাল তৈরি হয়েছে। রাস্তা তৈরির জন্যে গাঁইতি-কোদাল হয়েছে। কুড়ুল কাটারী দু'একখানা—দিস মাচ।

ছুটির পর নতুন শিক্ষকেরা আসবেন।

এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার হুগলী জেলার লোক ব্রজবিহারী চ্যাটার্জ্জী বি-এসসি। সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনলাল মুখার্জ্জী বি-এ। দু'জনেই ডিস্টিংশনের সঙ্গে পাস করেছেন। মাখনলাল তাঁর জানা লোক, তাঁর বাড়ীর চার মাইলের মধ্যেই বাড়ী। ভাল ছাত্র। বয়সে নবীন। তা হোক ছেলেটির অনেক সুখ্যাতি শুনেছেন তিনি। ম্যাট্রিকুলেশনে স্কলারশিপ পেয়েছিল। ইংরিজীতে ছেলেটির ভাল দখল। থার্ড মাষ্টার আসছেন হাওড়া থেকে, ওখানকার একটি এম-ই ইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। যামিনীর জায়গায় আসছে গৌর ঘোষ ফিফথ মাষ্টার; সিক্সথ মাষ্টার নবগ্রামেরই ছেলে—এখানকারই ছাত্র; সেকেণ্ড পণ্ডিত আসছেন, তিনিও স্থানীয় লোক—নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক—ড্রিলের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ট্রেনিং এবং সার্টিফিকেট আছে। এদের সঙ্গে আরও এক জন পণ্ডিত বেড়েছে ছোট ছেলেদের ক্লাসের জন্য। সেও নর্ম্যাল পাস, ত্রৈবার্ষিক নয়—দ্বিবার্ষিক।

নতুন মানুষের দল। বয়সে সকলেই নবীন। নতুন রুচি—নতুন দৃষ্টি। নতুনকে মানুষের একটা ভয় আছে, অবিশ্বাস আছে। পুরানো ভাঙা ঘর—মাটির ঘর ছেড়ে নতুন তৈরি প্রাসাদে এসেও মানুষের মন অস্বস্তি বোধ করে, ঘুম হয় না। নতুন পথে—সে রাজপথ হলেও মানুষ নিজেকে অসহায় মনে করে; এরা তো মানুষ।

তিনি জ্যেষ্ঠ তাঁরা কনিষ্ঠ, তিনিই এক্ষেত্রে গৃহস্থ তাঁরা নবাগত, তাঁদের সঙ্গে বনিয়ে চলার দায়িত্বটা তাঁরই বেশী। তাই তিনি চিন্তিত হয়েছেন। এ ছাড়া আরও চিন্তা হয়েছে তাঁর। রতনবাবুই বলে গেছেন তাঁকে। বলে গেছেন—ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এখন টনক নড়েছে, তাদের দৃষ্টি পড়েছে শিক্ষা বিভাগের উপর। ইংরিজী পড়ে এ দেশের ছেলেরা বিপ্লবী হচ্ছে। বিপ্লব চিন্তার জন্মস্থান নতুন কালের ইস্কুল কলেজ। মেকি ফিরিঙ্গী আর ইংরেজের উচ্ছিষ্ট অনুরাগী জাতনাশার দল তৈরি করবার জন্যে যে আয়োজন করেছিল সেই আয়োজন থেকেই এদেশে জন্মাল রামমোহন বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র। বিলিতি শিক্ষার সারের রসে পাঁচ হাজার বছরের উপনিষদ গীতা রামায়ণ মহাভারতের বীজে আশ্চর্য্য ফলন ফলেছে। Your basket

catcher বলে যে বাঙালী বেবুনেরা দালালী করত কোম্পানির আমলে, ফোঁটা-তিলক কেটে যারা ঢাক বাজিয়ে জলন্ত চিতায় মেয়েদের পোড়াত, যারা—'কলিশেষে একচ্ছত্র হইবে যবন' বচন শিরোধার্য্য করে ইংরেজকে বিশ্বজয়ী বলে মেনে নিয়েছিল—তাদের নাতি-পুতিদের এ কি চেহারা? একমুঠো ল্যাঙলেঙে চেহারা—চোখ খারাপ বাঙালীর ছেলে বোমা মেরে ইংরেজ তাড়াবার কল্পনা করে! যার শিল যার নোড়া তারই দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্যে নোড়া শক্ত-পাঞ্জায় পাকড়েছে! কানাইয়ের ফাঁসীর হুকুমের পর তার ওজন বাড়া দেখে প্রথমটা ভেবেছিল নিতান্তই একটা ব্যতিক্রমের ব্যাপার। কিন্তু আর ব্যতিক্রম ভাবতে পারছে না। এই সেদিন বালেশ্বরে যতীন মুখুজ্জের লড়াই দেখে ওদের শঙ্কা হয়েছে। ইস্কুল-কলেজগুলোকে ওরা কঠিন বাঁধনে বাঁধবে।

হেসে রতনবাবু বলেছিলেন—পেডলার সারকুলার মনে আছে মাষ্টার মশাই? পেডলার সারকুলার। ডি-পি-আই আলেকজেণ্ডার পেডলার? ১৯০২ সালের সারকুলার? ইম্মরাল সারাউণ্ডিং সম্পর্কে সারকুলার? এবারও অজুহাত হবে তাই। বোর্ডিঙের চারি পাশে পাঁচিল দেওয়ার অর্ডার দেখে বুঝছেন না? বোর্ডিঙে ছেলেদের কে কোথায় যাচ্ছে তার রেকর্ড রাখার হুকুম দেখে বুঝছেন না? যুক্তি দিয়ে বা কোন মহত্তর আরাধনার পথ দেখাতে না পারার অক্ষমতায় যারা দেবমূর্ত্তি পূজা বন্ধ করতে পারে না—তারাই দেবমূর্ত্তি ভেঙে কলুষে কলুষিত করে দেয় যে, এর পর ফেলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না। ১৯০২।৩ সালে এ অভিযোগ খানিকটা সত্যি ছিল। কিন্তু এখন এ অভিযোগ একটা অজুহাত।

চমকে উঠেছিলেন চন্দ্রবাবু।—তা হলে—আপনি বলছেন—

—অনুমান করেছেন? একটু সাবধান হবেন। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের খোদ ইন্‌পেক্টরের পৃষ্ঠপোষকতা আছে তাঁরা হয় তো—।

এই ভয়ও করছেন চন্দ্রবাবু।

তিনি অবশ্য রতনবাবুর পথের পথিক নন্, এ পথকে তিনি সমর্থনও করেন না, করবার মত সাহস নাই। মনে মনে অনেক প্রশংসা পোষণ করেন—অগাধ বিস্ময় অনুভব করেন। ঋষি-পুত্র নচিকেতার প্রশংসা কে না করে? কিন্তু নিজের ছেলেকে নচিকেতার পথ অনুসরণ করতে কেমন করে দেবেন? তা কি কেউ পারে? মুখেও বলতে পারেন না। তা ছাড়া তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, বোমা পিস্তল মেরে—লড়াই করে ইংরেজকে তাড়ানো যায়! এ অসম্ভব। সুতরাং শিক্ষকদের মধ্যে কেউ সরকারের গোপন অনুচর থাকলেও তাঁর নিজের ভয় নেই। কিন্তু তাঁর ছেলেদের!—এই সব নানান চিন্তায় তিনি বিব্রত হয়ে রয়েছেন।

—চন্দ্র!

রামজয় এসে হাজির হলেন। সেই সাদা কাপড়ের ছাউনি-দেওয়া ছত্র তাঁর মাথায় এবং চাদরখানি তাঁর গলায়, পায়ে চটি।

—এস।

—কি, এখনও স্নান কর নি?

—না। হাসলেন চন্দ্রবাবু।

—কি করছিলে এতক্ষণ?

—ভাবছিলাম।

—ভাবছিলে? কি ভাবছিলে?

—সে অনেক কথা। কিন্তু সে সব শুনে তোমার কাজ নেই।

—কি বলে—কন—কনফিডান—কনফিডান শেয়াল—না কি, তাই বুঝি?

—তাই বটে।

—তবে থাক। শুনে কাজ নাই আমার। কিন্তু তুমি স্নান করে নাও। ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেছে। গিন্নী মাছের ঝোল চড়িয়েছেন আমি দেখে এসেছি।

রামজয় আজ তাঁকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন। ও বেলা খোদ গিন্নীমায়ের বাড়ীতে। কাল থেকে বোর্ডিঙের ঠাকুর আসবে, রান্নাবান্না হবে।

ইস্কুল বোর্ডিঙের সদ্য চুনকাম করা চেহারার দিকে তাকিয়ে রামজয় বললেন—বা বা বা! বা খোলতাই হয়েছে ইস্কুলের! কথায় আছে—কামালে জোমালেই বর আর নিকুলে-চুকুলেই ঘর। কপালে চন্দন আর চোখে কাজল দিলেই কন্যাটিকে বধূর মত লাগে।

চন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন না, মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ইস্কুলের দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

—তোমার কোয়ার্টার কেমন হ'ল? কি বলে—কমপ্লিটং?

—কমপ্লিটং নয়, সংস্কৃতের অনুস্বার নাই। কমপ্লিট। না—এখনও কমপ্লিট হয় নাই। অনেক কাজ বাকী।

—মেয়েছেলে তা হলে আনছ কখন?

—দেখি!

—তাড়াতাড়ি আন। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে দিনকতক কর্ম্মের সঙ্গে সংসারধর্ম্ম কর। স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে ঘর করবার অবসরই হ'ল না তোমার।

কেষ্ট এসে হাজির হ'ল। পোষ্টাপিস থেকে ডাক নিয়ে এল।—একখানা টেলিগেরাপ আছে।

—টেলিগ্রাম?

—হ্যাঁ। মাষ্টারবাবু বললেন।

এখানে টেলিগ্রাফ আপিস নাই, টেলিগ্রাম আসে ডাকের সঙ্গে। আরজেণ্ট টেলিগ্রাম হলে আর মেসেঞ্জার ফি দেওয়া থাকলে এখান থেকে ছ'মাইল দূরের আপিস থেকে লোক এসে বিলি করে যায়। নইলে ওই আপিস পর্য্যন্ত যথারীতি বার্ত্তা তারে এসে ওখান থেকে পত্রের মত পোষ্টাপিসে এসে পত্রের সঙ্গেই বিলি হয়।

কে টেলিগ্রাম করলে। চন্দ্রবাবু বললেন—খোল তো রামজয়, আমার হাতে তেল লেগেছে। কেষ্ট চশমাটা আন ত!

খামটা ছিঁড়ে রামজয় কাগজখানা মেলে ধরলেন। চন্দ্রবাবু পড়লেন—রিচিং বিষগ্রাম সাটারডে মর্নিং। ব্রজবিহারী।

নতুন এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার। শনিবার সকালে আসছেন। অর্থাৎ কাল। আজই শুক্রবার।

—মাখনলাল তো আমাদের রাণীহাটের হেরম্ব মুখুজ্জে মশায়ের নাতি।

—হ্যাঁ।

—এই ব্রজবাবুই অজানা লোক?

—হ্যাঁ ডার্ক হর্স।

—অস্যার্থ? হর্স মানে তো ঘোড়া। যে ঘোড়ায় ঘাস ভক্ষণ করে।

—হ্যাঁ মানে কালো ঘোড়া—আসল অর্থ হ'ল—অজানা ঘোড়া।

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। গরুর গাড়ী থেকে নামলেন ব্রজবাবু। রামজয় চন্দ্রবাবুর হাতে ইশারা দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—ও চন্দ্র! যা বললে তাই যে মিলে গেল। কৃষ্ণাশ্ব! কালো ঘোড়া!

ছ'ফুটের উপর লম্বা—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় একটি মানুষ, চোখে একজোড়া হাই পাওয়ার চশমা। বয়স বড় জোর পঁচিশ। হেসে বললেন—নমস্কার মাষ্টারমশাই! নমস্কার! গলায় চাদর পায়ে চটি পরনে থান—আপনি নিশ্চয় হেডপণ্ডিত মশায়।

কণ্ঠস্বরটি ভরাট জোরালো।

পণ্ডিত বললেন—নমস্কার! আপনি খবর দিয়ে এসেছেন—না দিলেও আমিও অনায়াসে বলতে পারতাম আপনি ব্রজবিহারী।

—আমার রং দেখে?

অট্টহাস্য করে উঠলেন ব্রজবিহারীবাবু। ভরাট জোরাল গলার প্রাণখোলা অট্টহাসি গোটা ইস্কুল বাড়ীটার কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে।

রবিবার পর্য্যন্ত মাষ্টারেরা সবাই এসে গেলেন।

মাখনবাবু চেহারায় ব্রজবাবুর ঠিক বিপরীত। নধর দেহ গৌরকান্তি আয়ত চোখ মিষ্ট কণ্ঠ। ব্রজবাবু বললেন—শিক্ষায়তনে মেয়েদের কথা বাদ দিয়েই কথা বলতে হয়, সুতরাং বিউটি এণ্ড দি বীষ্ট-এর উদাহরণ এখানে সার্থক ভাবে আমি এবং মাখনবাবু।

বলেই সেই হা-হা শব্দে অট্টহাসি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস দুয়েক পর।

ইস্কুল বসবার আগে চিরাচরিত প্রথায় স্তোত্রপাঠ শেষ হয়ে ইস্কুল বসবার প্রথম ঘণ্টা পড়ল। অফিস রুমে মাষ্টারমশাইরা সকলে খাতায় সই করে আপনার-আপনার ক্লাসে বেরিয়ে গেলেন। গেলেন না শুধু ব্রজবিহারীবাবু। ব্রজবিহারীবাবু এই ঘণ্টায় সেকেণ্ড ক্লাসে অঙ্ক কষিয়ে থাকেন। চন্দ্রবাবু বরাবরই ফার্ষ্ট আওয়ারে অফিস-ওয়ার্ক করে থাকেন। চন্দ্রবাবু ব্রজবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। ব্রজবাবু ফার্ষ্ট আওয়ারে যেদিন ক্লাসে না গিয়ে আপিস ঘরে থাকেন সেদিন বুঝতে হবে আজ একটা কিছু ঘটবে।

ব্রজবাবু ডাকলেন—কেষ্ট। থার্ড ক্লাসের কিশোরী আর মুরলীকে ডাক।

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—কিশোরী? সে কি করলে?

এক প্যাকেট রেলওয়ে মার্কা সিগারেট এবং একটা দেশলাই পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখেন ব্রজবাবু। কাল সন্ধ্যাবেলা কিশোরীর পকেট থেকে পেয়েছে।

—কিশোরীর পকেট থেকে?

কিশোরী বিল্বগ্রামেরই গোবিন্দপদবাবুর ছেলে, ভাল ছেলে। থার্ড ক্লাসে দুটি ছেলে আছে শ্যামাবিলাস আর কিশোরী। দুটিই অসাধারণ মেধাবী ছাত্র; চন্দ্রবাবু প্রত্যাশা করেন —দু'জনেই ওরা স্কলারশিপ পেয়ে ইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। এবার ফার্ষ্ট ক্লাসে আছে কিশোরীর দাদা সবিতা, সেও অসাধারণ মেধাবী ছাত্র। শুধু তাই নয়, বিল্বগ্রাম বাবুদের গ্রাম, এ গ্রামে সকলেই প্রায় জমিদার; সকলেই উদ্ধত দাম্ভিক এবং চালচলনে প্রত্যেকেই প্রায় উচ্ছৃঙ্খল। এই সমাজে গোবিন্দপদবাবু সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ, সর্বোপরি চরিত্রবান ব্যক্তি। ছেলেদের তিনি সযত্নে মানুষ করছেন। তাঁর ছেলে কিশোরী এরই মধ্যে সিগারেট খেতে শিখেছে?

মুরলীধর বাবুদের ছেলে। এখানকার জমিদারবাড়ীর দৌহিত্র এবং উত্তরাধিকারী। সে সিগারেট খায়। খেতে পারে। কিন্তু তাকে এ নিয়ে শাসন করাতেও বিপদ আছে। বিশেষ করে শাসনের মাত্রা যদি একটু কঠোর হয় তবে অনেক গণ্ডগোল হবে। ব্রজবাবু নতুন লোক; অবশ্য এর মধ্যেই তিনি এখানকার হালচাল অনেক বুঝেছেন। আশ্চর্য্য বুদ্ধি এবং আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণধী কর্ম্মী। দু'মাসের মধ্যেই ইস্কুলটার চেহারা পাল্টে গিয়েছে। সতরঞ্চির আসনের উপর খেরো-খাতা, শরের কলম, মাটির দোয়াতের সেরেস্তাটা যেন দু'মাসের মধ্যে একেবারে কেতাদুরস্ত চেয়ার টেবিল বাঁধা খাতা ব্লটিং প্যাড, নিবের কলম, লাল কালো দোয়াতযুক্ত— ঘড়ির-কাঁটায়-চলা পাকা হাল-আমলের আপিসে পরিণত হয়েছে এবং নতুন যন্ত্রের মত মসৃণ গতিতে চলেছে।

আজকাল প্রত্যেকটি ছেলে প্রত্যেকটি শিক্ষক ঠিক সাড়ে দশটায় এসে হাজির হয়। কে

চাকর সাড়ে দশটার আগেই প্রতি ক্লাসের এটেণ্ডান্স রেজিষ্টার টেবিলের উপর রেখে আসে। সাড়ে দশটায় ক্লাসের সুরুতেই ছেলেদের 'রোলকল' করা হয়। পাঁচ মিনিটের বেশী দেরি হলেই লেট প্রেজেণ্ট করা হয়। মাসে পনর দিন লেট প্রেজেণ্ট হলে একদিন এবসেণ্ট বলে ধরা হয় এবং এক আনা জরিমানা ধার্য্য হয়। এর পর স্কুল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সব সময়টাই খাতা টেবিলের উপর পড়ে থাকে। প্রতি ঘণ্টায় শিক্ষক এসে মিলিয়ে দেখে নেন কোন্ ছাত্র আছে কোন্ ছাত্র নেই। প্রত্যেক বিষয়ে মাসে একটা করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। রীতিমত পরীক্ষা নয়। প্রত্যেক মাসের হোমটাস্কগুলির উপর নম্বর দিয়ে—সেই নম্বর রেকর্ড করা হয়। বছরের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সে নম্বরগুলিকেও বিবেচনা করা হবে। সবচেয়ে কৃতিত্বের কাজ করেছেন ব্রজবাবু মাইনে আদায়ের ব্যাপারে। মাসের সাত তারিখের মধ্যে মাইনে দিতে হবে। না দিলে তার উপর ফাইন হবে। চন্দ্রবাবু প্রথমটা মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। বলেছিলেন—আপনি শহর থেকে আসছেন ব্রজবাবু, আমাদের গ্রামের লোকের, বিশেষ করে এখানকার লোকের দারিদ্র্যের কথা জানেন না। মাইনের ব্যাপারে এরকম কড়াকড়ি করলে অনেক ছেলের পড়া হবে না।

ব্রজবিহারীবাবু হেসে বলেছিলেন—জানি মাষ্টারমশাই। গ্রামের কথা আমিও জানি। তবে এখানকার গ্রামের কথা জানি না এটা ঠিক। কিন্তু সেখানকার গ্রাম আর এখানকার গ্রামে খুব তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। আমাদের দেশে সবই হয়—সবকিছুর খরচই কোন রকমে জোটে, শুধু ছেলেদের লেখাপড়ার খরচটাই জোটে না। সংসারে সেই জিনিষটাই জোটে না—যেটাকে আমরা দরকারী মনে করি না। আর আদায়ের তাগিদ যেখানে নেই সেখানে আমরা জোটাই না। কড়াকড়ি করুন, দেখবেন—দু'একবার ছেলেদের নাম কাটা গেলেই ছেলেদের পড়ানোটাও দরকারী হয়ে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে জুটিয়েও নেবেন গার্জেনরা। যারা সত্যিই গরীব—তাদের বরং ফ্রিশিপ দিন, হাফ ফ্রিশিপ দিন। কিন্তু মাইনে আদায়ের ব্যাপার ঢিলে যতদিন রাখবেন, ততদিন মাইনে আদায় কখনও হবে না। কিছুদিন আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে দেখুন।

চন্দ্রবাবু অবাক হয়ে গেছেন; ব্রজবিহারীবাবুর কড়া নিয়ম আশ্চর্য্যভাবে কার্য্যকরী হয়ে উঠেছে। ছেলেরা সব—একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বই জন ঠিক সময়ে মাইনে দিতে সুরু করেছে। শুধু তাই নয়—সব দিকেই ইস্কুলে একটা আশ্চর্য্যরকমের শৃঙ্খলা এনেছেন ব্রজবিহারীবাবু। সোয়া ছ'ফুট কালো মানুষটি মোটা লেন্স চশমা পরে ইস্কুলের ভিতরে যখন হেঁটে যান—তখন গোটা ইস্কুলটা যেন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। থমথম করে। লোকটির আশ্চর্য্য গুণ। ছুটির পরই বাইসিকেলে চেপে ছুটবেন খেলার মাঠে। ফুটবল খেলাটা চন্দ্রবাবু খুব বেশী পছন্দ করেন না। শুধু ফুটবল খেলা কেন—বেশী দাপাদাপির কোন খেলাই তাঁর খুব পছন্দসই নয়। কোথায় হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে! মারামারি করবে। তা ছাড়া ঘণ্টাখানেক মাঠে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড়ে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে পড়তে বসেই ঢুলতে সুরু করবে। আর ওই খেলার নেশা একবার পেয়ে বসলে—সে ছেলের হয়ে গেল। পড়াশুনার দফা গয়া। এ ছাড়া

আরও আছে। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখলেন যে, যে ছেলে পড়ায় ভাল, সে ছেলে খেলায় ভাল নয়, আর যে ছেলে খেলায় ভাল, সে ছেলে পড়ায় ভাল নয়। আরও আছে—শুধু পড়াশুনায় মন্দ হয়েই এরা ক্ষান্ত হয় না, রীতিমত উদ্ধত হয়ে ওঠে। একেবারে গুণ্ডা। সারাটা জীবন এই বিল্বগ্রামের বাবুদের বাড়ীর এই ধরণের ছেলেগুলোকে নিয়ে জলে পুড়ে মরেছেন তিনি। অনেক কষ্টে দশ বছরে আয়ত্তে এনেছেন। ঠাণ্ডা হয়েছে। নতুন নিয়মে খেলার উৎসাহ দিতে হবে। না দিয়ে উপায় নেই। ছেলেদের কাছ থেকে বছরের প্রথমেই এক টাকা হিসেবে গেম্‌স্‌-ফি আদায় হচ্ছে। একজন শিক্ষককে গেম্‌স্‌ টিচার হিসেবে রাখতে হয়েছে। নতুন থার্ড মাষ্টার সে ভার নিয়েছেন। তার জন্য তাঁর মাইনের উপরে মাসে আরও দশ টাকা দিতে হয়। তিনি নিজে ছেলেদের সঙ্গে খেলেন, খেলা শেখান। ব্রজবিহারীবাবুও তাদের সঙ্গে জোটেন। চশমা পরে খেলা হয় না। বিনা চশমায় দেখতে পান না, তিনি রেফ্রিইং করেন। ফলে সেখানেও আর মারামারি হয় না। হৈ-হুল্লোড় হয় না। বেটারা, সব খুদে শয়তানেরা ইচ্ছেমত পোঁ-পোঁ করে বার্ডসাই বিড়ি টানতে পায় না।

ব্রজবিহারীবাবু সন্ধ্যায় বেরিয়ে যান। এখানকার থিয়েটার ক্লাবে গিয়ে জোটেন। বিল্বগ্রামের থিয়েটার ক্লাব অনেক দিনের। চৈতন্যবাবুর ছোট ছেলে বর্ত্তমানে ইস্কুলের সেক্রেটারী পবিত্র থিয়েটার ক্লাবের পাণ্ডা। টাকাকড়ি খরচ-খরচা সেই সব করে। নিজে আবার নাটকও লেখে। তাদের আড্ডায় গিয়ে জোটেন ব্রজবিহারীবাবু। এইটি আদৌ ভাল লাগে না চন্দ্রবাবুর। ব্রজবিহারীবাবু শিক্ষক, শিক্ষকের পক্ষে কি ওই রঙ্গরসের আসর ভাল? এবং এদের আসরের কথা তো চন্দ্রবাবু জানেন। ভাল নয়, ভাল নয়, আদৌ ভাল নয় আসরটি। সভ্যেরা অধিকাংশই তাঁর ছাত্র। তাদের তাঁর চেয়ে কে বেশী ভাল জানে? সবাই প্রায় অকালে লেখাপড়া-ছাড়া ছেলের দল। নানারকম অপবাদ এদের নামে। একদিন ব্রজবিহারীবাবুকে তিনি বলেছিলেন—ও সব জায়গায় গিয়ে কাজ কি মাষ্টারমশাই? আমরা সব মাষ্টার-টাষ্টার মানুষ আমাদের ওসব ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা কি ভাল নয়?

এতেও হো-হো করে হেসেছিলেন ব্রজবাবু।

এই হো-হো করে হাসি ব্রজবিহারীর যেন একটা মুদ্রাদোষ।

হেসে বলেছিলেন ব্রজবাবু—আপনি বলছেন আমরা মানে মাষ্টাররা ব্রাহ্মণঘরের শুচিবাই-গ্রস্ত বাল-বিধবা! অতি সহজেই আমরা ছোঁয়াচ পড়ি!

উত্তর খুঁজে পান নি চন্দ্রবাবু।

ব্রজবাবু বলেছিলেন—একটু-আধটু রিক্রিয়েশন ছাড়া বাঁচব কি করে মাষ্টারমশাই! সেই জন্যে যাই। একটু-আধটু প্রম্‌ট করে দিই। চেহারা তো দেখছেন—এতে জহ্লাদ ছাড়া আর কিছু সাজবে না। তাও এক্টিং আমার আসে না। ওই খেলার মতন। ওখানে রেফ্রিইং করি বাঁশী বাজাই, এখানেও প্রম্‌টিং করব আর সিন চেঞ্জের বাঁশী বাজাব। ভাববেন না, আমি ছোঁয়াচ পড়ব না।

কি বলবেন চন্দ্রবাবু? আর কিছু বলেন নি তিনি।

আরও একটা ক্ষেত্রে ব্রজবাবুর সঙ্গে তাঁর অমিল আছে। ব্রজবাবু রেগে গেলে আর রক্ষা থাকে না। তখন তিনি ছেলেদের যে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেন তা তিনি সহ্য করতে পারেন না। সে প্রহার ভীষণ প্রহার। এই দু'মাসের মধ্যেই তিনি মারের চোটে দুটি ছেলেকে ইস্কুল ছাড়িয়েছেন। দুটিই অবশ্য ইস্কুলের মহাপাপ স্বরূপ ছিল। মহাপাপ তিনি দূর করেছেন।

একটি বামনচন্দ্র। ফার্স্ট ক্লাসের শিবনাথের বয়সী, কিন্তু পড়ত ফিফ্‌থ ক্লাসে। ক্লাসের মাষ্টারকে পেটে ঢুঁ মেরে ফেলে দিয়েছিল, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন নতুন ফিফ্‌থ মাষ্টারটি। নিতান্ত ছোকরা মানুষ। নিরীহ লোক। অপরাধের মধ্যে তিনি বামনকে ক্লাসে গোলমাল করতে বারণ করেছিলেন, বামন তাতে গ্রাহ্য তো করেই নি উপরন্তু মুখ ভেংচে বলেছিল—যা-যা-যা! ঢের দেখেছি। বলে হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা শুধায় কত জল?—ফিফ্‌থ মাষ্টার আর থাকতে পারেন নি, বলেছিলেন—ষ্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ। বামন বেঞ্চের উপর উঠে কেষ্ট ঠাকুরের মত বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে বলেছিল—জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে!

ফিফ্‌থ মাষ্টারের নাম রাধানাথ।

ফিফ্‌থ মাষ্টার আর সহ্য করতে পারেন নি, তিনি এবার এসে বামনের কানে ধরেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বামন মাথা দিয়ে ফিফ্‌থ মাষ্টারের পেটে ঢুঁ মেরেছিল। প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ফিফ্‌থ মাষ্টার। খবর শুনেই ব্রজবাবু ফিফ্‌থ ক্লাসে গিয়ে বামনের চুলের মুঠো ধরে টেনে স্কুলের হলে এনে একটা টুলের উপর দাঁড় করিয়ে বেত মেরেছিলেন। পা থেকে পিঠ পর্য্যন্ত ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলেন। বামন সেইদিন যে ইস্কুল থেকে গিয়েছে আর একটি দিনের জন্যও এদিকে পা বাড়ায় নি।

বামনের পর কুড়োরাম চন্দ্র। কুড়োরামের নাম ছিল চিতাবাঘ। ব্রজবাবু তাকে বেতের ঘায়ে তোরা বাঘ করে দিয়ে ইস্কুল থেকে বের করে দিয়ে বলেছিলেন—এ বনে আর ঠাঁই হবে না, বড় বনে যাও তুমি।

আজ পড়েছেন মুরলীধর আর কিশোরীকে নিয়ে। কি কতদূর হবে তিনি বুঝতে পারছেন না।

মুরলীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিশোরী কিন্তু দমে নি।

ব্রজবাবু বললেন—কাল রাত্রে, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা, আমি গ্রাম থেকে ফিরছিলাম যখন—তখন তোমরা দু'জন গ্রামের বাইরে রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে কি করছিলে? এত রাত্রে রেল লাইনের ধারে তোমাদের কি দরকার ছিল?

কিশোরী বললে—আমরা অভয় আর ভৈরবের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম স্যার।

—অভয় আর ভৈরব? কেন? তারা তো বাজারপাড়ার ছেলে। গ্রামের বাইরে লাইনের ধারে কোথা থেকে আসবার কথা তাদের?

—তারা বাউড়ীপাড়ায় হাঁস কিনতে গিয়েছিল স্যার।

—হাঁস কিনতে?

—রাত্রে আমাদের ফিষ্ট করবার কথা ছিল।

—এত রাত্রে ফিষ্ট ?

—বাজী রেখে ভৈরব আর অভয় হেরেছিল, দুটো হাঁসের দাম দেবার কথা ছিল।

—কিসের বাজী ?

চুপ করে রইল কিশোরী। এবার আর কোন উত্তর দিলে না।

ব্রজবাবু বললেন—আমি অনুমান করতে পারি কিসের বাজী। তাসের বাজী। তাসের বাজী নয় ?

—হ্যাঁ স্যার। তাসে ওরা হেরেছিল।

—তাস খেলতে আমি তোমাদের বারণ করেছিলাম না ?

কিশোরী নীরব হয়ে রইল।

—থিয়েটারের রিহারস্যালের ফেরত আমি তোমাদের তাসের আড্ডার বন্ধ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কতদিন বারণ করে এসেছি। বলেছি—এত রাত্রি পর্য্যন্ত তাস খেলে না এবং তাস খেলাটাও উচিত নয় তোমাদের। শোন নি তোমরা ?

—শুনেছি স্যার।

—তবে ? একটু অপেক্ষা করে থেকে ব্রজবাবু আবার বললেন—কিন্তু কৈ আজ ছ'সাত দিন তো তোমাদের আড্ডায় কোন সাড়া পাই নি। আমি ভেবেছিলাম—তোমরা ছেড়েছ তাস খেলা। তা হলে তোমরা আমার নজর এড়াবার জন্য আড্ডা পালটেছ ?

—হ্যাঁ স্যার।

—হুঁ। কিন্তু ভৈরব আর অভয় হাঁসের দামের টাকা কোথায় পেলে ? ওদের মা বাপকে চেয়ে পেয়েছে, না অন্য কোন মন্দ উপায়ে যোগাড় করেছে ?

—সে আমরা জানি না স্যার।

—কেষ্ট, ভৈরব আর অভয়কে ডাক। তারপর—এখন উত্তর দাও, আমি ফিরবার সময় তোমাদের দু'জনকে দেখলাম তোমাদের একজন সিগারেট খাচ্ছিলে। দু'জনে তোমরা এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলে যে কে ঠিক খাচ্ছিলে আমি ধরতে পারি নি। আমাকে দেখেই সিগারেট ফেলে দিয়ে সেটা পা দিয়ে চেপে দিয়েছিলে। কে খাচ্ছিলে সিগারেট ?

কিশোরী ব্রজবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমি খাই নি স্যার—আমি সিগারেট খাই নে।

ব্রজবাবু তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—তাই জানতাম। তোমার কথায় অবিশ্বাস করতেও ইচ্ছা হয় না, কিন্তু তোমার পকেটে সিগারেট-দেশলাই ছিল কেন ?

—আমার গায়ে জামা ছিল, আমার পকেটে রাখতে দিয়েছিল, আমি রেখেছিলাম।

—মুরলীধর ?

—স্যার !

—তুমি রাখতে দিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ স্যার।

—তুমিই সিগারেট খাচ্ছিলে ?

—হ্যাঁ স্যার।

—হুঁ। সিগারেট খেতে তুমি পয়সা কোথায় পাও ? কে দেয় ? বাড়ীর লোকে জানে তুমি সিগারেট খাও ? বল। স্পীক আউট।

—একটু একটু জানে। মা জানে। বাবা জানে না।

—নো। নো। নো। ওই ভাবে কথা বলে না। বল—'মা জানেন, বাবা জানেন না।' মা কি তোমাকে সিগারেট খেতে পয়সা দেন ?

—না। আমি অন্য ছল-ছুতো করে চেয়ে নিই।

—হুঁ। ব্রজবিহারীবাবু একটু চুপ করে রইলেন। ভাবলেন বোধ হয়। তারপর আবার বললেন—

—ভাল। এখন অন্য কথার জবাব দাও। তোমাদের তাসের আড্ডা কোথায় বদলেছ ? কিশোরী।

—নরেনবাবুর বৈঠকখানায়।

—কোথায় সেটা ?

—গলির ভিতরে ভিতরে যেতে হয়। বাড়ীটায় কেউ থাকে না। শিক-দেওয়া ফটক পার হয়ে আমরা সেখানে যাই।

—কি কি হয় সেখানে ? শুধু তাসখেলা ?

—মধ্যে মধ্যে ফিষ্ট হয়।

—আর কিছু ?

—না স্যার।

—আর ক'টি এমন আড্ডা আছে ?

—কুলীনপাড়ায় একটা আছে, শুঁড়ীপাড়ায় একটা আছে—বাজারেও একটা আছে।

কেষ্ট ভৈরব এবং অভয়কে নিয়ে এসে দাঁড়াল। ব্রজবাবু সরাসরি প্রশ্ন করলেন—বাজী রেখে তাসখেলায় হেরে দুটো হাঁস এদের দেবে বলেছিলে ?

অভয় নামেও অভয় কাজেও অভয়, বামন কুঁড়োরামের সমান না হলেও তাদের কাছাকাছি যায়। সে বললে—বলেছিলাম।

—হাঁস কিনবার টাকা কোথায় পেয়েছ ? কে দিয়েছে ? মা না—বাবা ?

—আমি বাবার কাছে দু'চার পয়সা করে নিয়ে জমিয়ে হাঁস কিনে বাউড়ীদের পালতে দিয়েছি। চারটে হাঁস কিনে দিয়েছিলাম এখন দশটা হয়েছে। তা থেকেই দুটো দেব বলে আনতে গিয়েছিলাম।

—হুঁ। ভৈরবের কাছে একটা হাঁসের দাম নিতে না ?

—ও কিছু কিছু করে দোব বলেছিল।

—আমি শুনেছি তুমি আরও অনেক আড্ডায় যাও।

—যাই।

—তুমি এবার প্রমোশন না পেলে তোমাকে ইস্কুল থেকে বের করে দেব আমি। আর শোন, আজ তোমাদের আমি মাফ করলাম। ভবিষ্যতে কঠিন শাস্তি দেব। রাত্রি সাড়ে ন'টার পর এক ঘণ্টা তোমরা তাস খেলতে পারবে। কিন্তু বাজী রাখতে পারবে না। তোমরা জান আমি তোমাদের প্রত্যেকটি খবর রাখি। গ্রামে থিয়েটারের আড্ডায় আমি এই জন্যেই যাই। ফেরবার পথে কে কি করছ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শুনে আসি দেখে আসি। আমাকে ফাঁকি তোমরা দিতে পারবে না। যাও। শুধু মুরলীধর না। ইউ স্টে হিয়ার—

ওরা তিন জন চলে যেতেই ব্রজবাবু বললেন—তোমাকে যে কথাটা বলতে চাই, ওদের সামনে সেটা বলব না বলেই তোমাকে থাকতে বলেছি মুরলী। সিগারেট খেতে আমি বারণ করব না, কিন্তু বাপ-মায়ের পয়সায় সিগারেট খেয়ো না। নিজে উপার্জ্জন করে তবে খাবে। নট নাউ ;—এখন নয় পরে। ভবিষ্যতে ইস্কুলের ছাত্র যতদিন থাকবে তার মধ্যে কোন দিন যদি আর দেখি তোমাকে সিগারেট খেতে তোমাকে আমি মার্জ্জনা করব না। যাও।

মুরলী চলে গেল।

চন্দ্রবাবু এতক্ষণে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—রাত্রে আপনি ওদের আড্ডায় আড্ডায় আড়ি পেতে বেড়ান নাকি?

হো হো করে হেসে উঠলেন ব্রজবিহারীবাবু। বললেন—দিব্যি কালো রঙে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাই!

চন্দ্রবাবুর মনে পড়ল—রতনবাবু থার্ড মাষ্টারের কথা। খোদ ইনস্পেক্টার সাহেব পাঠিয়েছেন ব্রজবাবুকে। ব্রজবাবু কি? স্পাই? সে কি সম্ভব?

নবম পরিচ্ছেদ

চিন্তার আর অবধি ছিল না চন্দ্রভূষণবাবুর। ব্রজবিহারীবাবু কি তবে—? মানুষের মনের অন্তস্তলে আর একটি সত্তা আছে, যে সত্তা সব যুক্তিতর্ক শিক্ষাসংস্কার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধির বাইরে, যা হয় অবুঝ, নয় সকল বুঝের উপরে। চন্দ্রভূষণবাবুর মনের সেই সত্তা এ সন্দেহে বার বার প্রতিবাদ করে ওঠে। না—না—না; এ হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেই তিরস্কার করে ওঠেন। কিন্তু তবুও আশ্বস্ত হতে পারেন না। এতগুলি ছেলের ভালমন্দ যে তাঁদের হাতে। এ সংসারে নিজের দেশকে কে না ভালবাসে? কে না স্বাধীনতা চায়? তার উপর কিশোর কচি মন। কে কোথায় কি বলবে—সে শুধু মুখের কথা—হয়ত বুকের কথাই, কিন্তু তবু সে কথাই, কোন কাজ নয়; দেশকে ভালবাসি বললেই সে বোমা তৈরি

করে পিস্তল সংগ্রহ করে, যুদ্ধ করতে তৈরী হয় তা নয়। সেই মুখের কথার অপরাধে যদি একটি ছাত্রেরও ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় তবে সে তো শুধু আক্ষেপের কথাই হবে না, সে হবে চির-জীবনের গ্লানির কথা, তা থেকে আর নিষ্কৃতি থাকবে না।

রামজয় বলে—পাপ। পাপ ঠিক রামজয় যেভাবে মানে সেভাবে তিনি মানেন না, তবে অবিস্মরণীয় গ্লানিকর কর্ম্মকে যদি পাপ বলে তবে তিনি পাপ মানেন; যে কর্ম্মকে লোকে পুরুষানুক্রমে নিন্দা করবে তাকে পাপ বললে পাপকে তিনি মানেন। এও ঠিক সেই ধরণের কর্ম্ম।

নিজের বাসার বাইরের ঘরে ঠিক দরজার সামনে বসে তিনি তামাক খেতে খেতে কথা-গুলি ভাবছিলেন। নতুন বাসাতে তিনি এসেছেন। বোর্ডিং কম্পাউণ্ডের ফটকের পাশের ঘরখানিও এখনও তাঁরই আছে। সেখানি এখন বোর্ডিঙের আপিস হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে বসেন চন্দ্রবাবু। গ্রামের বা বাইরের ভদ্র লোকজন এলে সেখানেই বসানো হয়, গল্প-গুজব আলোচনা চলে সেই আগেকার কালের মত।

বাসার ভিতর দিকের দরজার মুখে এসে দাঁড়াল চন্দ্রবাবুর মেয়ে দশ বছর বয়সের বঙ্গবালা। উনিশশ' ছয় সনে বঙ্গভঙ্গের বছরে ফাল্গুন মাসে ওর জন্ম বলে চন্দ্রবাবু নাম রেখেছিলেন বঙ্গবালা। চন্দ্রবাবুর স্ত্রী ওকে বেঙী বলে ডাকেন। চন্দ্রবাবু রাগ করেন, বোঝাতে চেষ্টা করেন—কত বড় অপরাধ হয় এতে। কিন্তু চন্দ্রবাবুর স্ত্রী হাসেন; বলেন—বেঙী তো ডাকনাম। বেঙী নামে ডাকলেও বঙ্গবালা বঙ্গবালাই থাকবে। আমি বাপু এত বড় নাম বলতে পারিনে। তবে বাইরে লোকের সামনে বঙ্গবালাই বলব।

বঙ্গবালা বাবাকে ভয় করে। যা দাড়ি-গোঁফ, যা গম্ভীর মানুষ, যা কথাবার্ত্তা বলেন! এখানে, অর্থাৎ ইস্কুলের বাসায় এসে সে ভয় আরও বেড়ে গিয়েছে। ইস্কুলের ছেলেদের কি ভয়!

চন্দ্রবাবু বললেন—কি?

বঙ্গবালা বললে—চুপি চুপি বললে—মা তোমাকে ডাকছে।

—কেন?

—জানি না। বললে, চুপি চুপি বলে আয় আমি ডাকছি।

—যাও, মাকে এখানেই ডেকে দাও।

—মা আসবে এখানে? ওদিকের দরজাটা খোলা রয়েছে—বন্ধ করে দেব?

অর্থাৎ চন্দ্রবাবুর সামনের খোলা দরজাটা।

—না।

বঙ্গবালা বিস্মিত হয়ে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দরজা খোলা থাকবে—অথচ মা এসে বাবার সঙ্গে কথা বলবে! সামনের খোলা জায়গাটায় টিফিনের সময় ছেলেরা ছুটোছুটি করছে; তারা দেখবে যে!

চন্দ্রভূষণবাবু আবার বললেন—ডাক তোমার মাকে।

বঙ্গবালা চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই চন্দ্রবাবুর স্ত্রী আবক্ষ ঘোমটা টেনে বাড়ীর ভিতর দিকের দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন এবং ফিস ফিস করে কি বললেন।

চন্দ্রবাবু বললেন—কি বলছ শুনতে পাচ্ছি না। এতখানি ঘোমটা কেন? ঘোমটা খুলে কথা বল না।

সত্যবতী অল্প খানিকটা ঘোমটা সরিয়ে বললেন—একটু জোরেই ফিস ফিস করে বললেন—বাইরের ঘরে কি দিনের বেলা কথা বলা হয়? ভিতরে এস।

—আঃ, এখানেই বল না বাপু। কি হয়েছে এখানে বলতে?

——সামনে রাজ্যের ছেলেরা রয়েছে।

—থাকলেই বা। ওরাও তো তোমার ছেলে। ওদের সামনে কথা বলতে লজ্জা কি?

—না, সে আমি পারব না। ভিতরে এস তুমি।

বলেই চলে গেলেন সত্যবতী। দরজার ওপাশে গিয়েই তাঁর কণ্ঠস্বর সহজ এবং উচ্চ হয়ে উঠল; যেন এতক্ষণ বোতলে ছিপি এঁটে বন্ধ ছিল—ছিপিটা খুলে গেল। তাঁর সে কণ্ঠস্বর এখন বাসাবাড়ীর সীমানা গণ্ডী পার হয়ে ইস্কুল বোর্ডিং কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, ওদিকে ইস্কুল বিল্ডিঙের দেওয়ালের গায়ে ঠেকে মৃদু প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে। তিনি বলছেন—বাসার সুখে আমার কাজ নাই; এই বয়সে আর লজ্জাসরম ঘুচিয়ে হালফেশানী হতে পারব না। হ্যাঁ!

গভীর চিন্তার গুমোটের মধ্যে কৌতুকবোধের বাতাসের একটি ঝলক বয়ে গেল যেন অকস্মাৎ। চন্দ্রবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি হুঁকো হাতেই উঠে বাড়ীর ভিতরে এলেন—বললেন—এই তো বেশ গলা খুলে গেল। গোটা বোর্ডিংময় শোনা যাচ্ছে।

—যাচ্ছে যাচ্ছে, তাতে আমার কি?

—ছেলেরা বলবে কি?

—কি বলবে? আমি তো দশের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছি না। চারিপাশে পাঁচিলের আড়াল; লোকে কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে?

হেসে চন্দ্রবাবু বললেন—যাক, এত দিনে বুঝলাম ভেড়ারা শেয়াল কি নেকড়ে দেখলে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে কেন।

সত্যবতী হেসে ফেললেন। রাগ করলেন না। রাগ করবার মত মানুষ তিনি নন। বিশেষ করে স্বামীর কথায়। চন্দ্রবাবু তাঁর কাছে সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আর কি গভীর ভালবাসা তাঁর। সত্যবতীর জীবনে এতটুকু অভিযোগ অনুযোগ রাখবার স্থান তিনি রাখেন নি। চন্দ্রবাবুর গ্রামের বাড়ীতে বাইরের বাড়ীর উঠানে শিরীষ গাছে একটি মধুমালতীর লতা জড়িয়ে উঠেছে। ঝড়ঝাপটায় শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে পড়ে, পাতা ছিঁড়ে উড়ে যায়—কিন্তু মালতীলতার ডাল কি পাতা ছিঁড়ে পড়তে কখনও সত্যবতী দেখেন নি। রক্ষা করে ওই শিরীষ। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে উঠে লতাটি মাথা তুলে আলো-বাতাস ভোগ করে, শিরীষগাছটি যেন তাঁর স্বামীর মতই সস্নেহে হেসে তাকে ধরে রাখে, উঁচু করে ধরে

রাখে। শুধু তাই নয়—এ অঞ্চলের মানুষেরা যে শ্রদ্ধা তাঁকে করে—তাঁর সম্পর্ক ধরে তাঁকেও যে শ্রদ্ধাসম্মান করে যায় সে শ্রদ্ধাসম্মান রাণী-মহারাণীরাও পায় না। তাঁরা কায়স্থ, বামুনের ছেলেরাও এসে তাঁকে প্রণাম করে। প্রথম প্রথম সত্যবতী শিউরে উঠতেন—মনে মনে অকল্যাণ আশঙ্কা করে শঙ্কিত হতেন; এখন ক্রমে সেসব সয়ে গিয়েছে। তিনি গুরুমা, এ বোধ তাঁর এসে গিয়েছে মনের মধ্যে। আর চন্দ্রবাবুর কি সুন্দর কথাগুলি। সে কথার যে কত দাম—সে বোধ হয় এক সত্যবতী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। ছেলেরা তাঁর পড়ানোর দাম বোঝে। পড়ানোর কথা আর চন্দ্রবাবুর নিজের কথায় তফাৎ অনেক। কত কথা যে সত্যবতীর মনে গাঁথা হয়ে আছে সে এক সত্যবতীই জানেন। ছোট ছোট ঘটনায়—কাজে মনে পড়ে যায়। সত্যবতীর মনের মধ্যে গৃহস্থবাড়ীর লক্ষ্মীর ঘরের মত একটি পবিত্র ঘর আছে, সেই ঘরে মণিমুক্তার মত থরে থরে স্বামীর কথাগুলি সাজানো আছে। সুখ হোক দুঃখ হোক—কোনকিছু ঘটলেই সে ঘরের দরজা আপনি খুলে যায় এবং চন্দ্রবাবুর কথাগুলি যেন দৈববাণীর মত বেজে ওঠে।

এই তো সেদিন—এ বাসায় এসে প্রথম দিনই বঙ্গবালা আনন্দের আতিশয্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে উঁচু চৌকাঠে হুঁচোট খেয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা তুলে ফেলেছিল; ইস্কুলের চাকর কেষ্ট অত্যন্ত রাগ করেছিল ছুতোরের উপর;—এই চৌকাঠ? এর নাম গড়ন? ঠিকের কাজ, ইস্কুলের কাজ! কে দেখে, কে শোনে! এই এত মোটা চৌকাঠে হুঁচোট লাগবে না?

বকাবকি করেই কেষ্ট ক্ষান্ত হয় নি, পরের দিন সকালেই একজন ছুতোরমিস্ত্রী এনে হাজির করেছিল, সমস্ত চৌকাঠগুলো কেটে চেঁছেছুলে যথাসম্ভব নিচু করে দিতে বলেছিল।

সত্যবতী বলেছিলেন—থাক। বেশ আছে।

—থাকবে? বেশ আছে? কেষ্টর বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না।

চন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সত্যবতীর। অনেক দিন আগের কথা। সত্যবতীর সঙ্গে চন্দ্রবাবুর বিয়ের পরই। অষ্টমঙ্গলার সময়কার কথা। সত্যবতীর বাপের বাড়ীর একটা দরজা খুব ছোট, সত্যবতী মেয়েছেলে, মাথায় একটু খাটোই বলতে হয়, দরজাটা সত্যবতীর মাথার চেয়ে মাত্র আঙুল-দুই উঁচু। চন্দ্রবাবু লম্বামানুষ; সত্যবতীরবোনেরা বাসরঘরে ঠাট্টা করে বলেছিল—তালবৃক্ষ।

সত্যবতীর এক রসিকা ঠাকুমা ছড়া বাঁধতে পারতেন—মজার মজার ছড়া; তিনি ছড়া বেঁধেছিলেন। প্রথমে বলেছিলেন—উঁহু, নিম—নিম। তাল নয়। লম্বা নিম।

"নিম আর বেগুনে—
মজবে ভাল ফাগুনে।"

নাতনীরা বলেছিল—নিমে বেগুনে মজাবার জন্যে, ছড়ায় মেলাবার জন্যে নিম বললে শুনবো না। উনি তালবৃক্ষ। পারো তো তালের সঙ্গে মেলাও। নাহলে ও ছড়া তোমার নাকচ ঠাকুমা।

ঠাকুমা বলেছিলেন—বেশ তালই সই। নাতজামাই তাল—নাতনী আমার তিল।

তালের পাশে তিলের চারা,

ভাদ্র মাসে চড়বে কড়া—
তিলের তেলে তালের বড়া
আসিস খেতে ছুঁড়ি ছোঁড়া।

এমনি এক এক মুহূর্তে জীবনের সরস মুহূর্তগুলি মনে পড়ে সত্যবতীর। সে কথা যাক। চন্দ্রবাবু অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে ওই ছোট দরজাটিতে মাথায় ঠোক্কর খেয়েছিলেন; সে ঠোক্কর বেশ একটু কঠিন ঠোক্কর; এখন চন্দ্রবাবুর মাথায় টাক পড়েছে তখন টাক পড়ে নি, বেশ একমাথা কোঁকড়ানো চুল ছিল; ছিল তাই রক্ষা; তবুও মাথা একটু কেটে গিয়েছিল; রক্ত একটু পড়েছিল। সত্যবতীর মা স্বামীকে যে বকুনিটা সুরু করেছিলেন—তাতে সত্যবতী লজ্জা পেয়েছিলেন। জামাইয়ের সামনে মা কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন? মা অবশ্য মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দরজাটাকে পাল্‌টাতে বলতেন, বাবাও বলতেন—'পাল্‌টাব'—কিন্তু পাল্‌টান নি। সেদিন চন্দ্রবাবুই সকলের ক্ষোভ মিটিয়ে শুধু শান্তই করেন নি, ওই ছোট দরজাটাকে পাল্‌টাবার কথাও চিরদিনের মতই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'না—না—না। ও দরজা কখনও পাল্‌টাবেন না। মাথা নিচু করে চলা তো সহজ শিক্ষা নয়, সেই শিক্ষা দেয় ওই দরজাটি। ছেলেরা মাথা নিচু করে চলতে শিখবে। বড়র কাছে মাথা নিচু করে সবাই, ছোটর কাছে মাথা নিচু করতেই শিখতে হয়; সেই তো আসল বিনয়। আমার বাড়ীতে এমনি একটি ছোট দরজা করব আমি।'

মিথ্যে সান্ত্বনার জন্ত বলেন নি, সত্যসত্যই বাড়ীতে একটি ছোট দরজা করেছেন তিনি।

সেই কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল সত্যবতীর।* কেষ্টর আনা ছুতোরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। থাকুক উঁচু চৌকাঠ, আহ্লাদে আটখানা হয়ে চোখ-না-চেয়ে ছুটে চলার খিঙ্গিপনা থেকে বাঁচবে মেয়েটা—পথ চেয়ে ধীর গমনে চলতে শিখবে। এমন কত কথা।

স্বামীর কথায় রাগ না করে হেসে সত্যবতী বললেন—আমাকে ভেড়া বললে তুমি নিজেও ভেড়া। মেয়ে-ভেড়ার স্বামী পুরুষ-ভেড়া। বড়জোর লড়ুইয়ে ভেড়া হতে পারে। তা মনে রেখো।

হেসে চন্দ্রবাবু বললেন—উঁহু। ও যুক্তি এখানে খাটে না।

—কেন?

—বড় বড় প্রতাপশালী রাজা-জমিদারের নাম শুনেছ তো? শুনেছ তো তাঁদের দাপটে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়? শুনেছ তো?

—তা শুনেছি।

—এও তাই। বিয়েকে বলে বিধাতার লিখন। তিনি তো সব প্রতাপশালীর সেরা প্রতাপশালী? তাঁর দাপটে ভেড়াবুদ্ধি মানুষ—আর মানুষবুদ্ধি মানুষে একসঙ্গে ঘর করে। আর মানুষ কি ভেড়ায় হয়? বুদ্ধিগুণে লোকে কয়। কেউ বা ভেড়া কেউ বা বাঘ, কেউ বা সাপ কেউ বা মানুষ, যার যেমন বুদ্ধি, যার যেমন হুঁশ। এ সত্যি যদি ছেলে পড়াতে তো বুঝতে

পারতে। ওঃ এক-একটা ছেলে গাধারও অধম। কেউ বা উল্লুক, কেউ বা বাঁদর; কেউ বা মোষ। যাক, এখন বলছিলে কি?

—বলছিলাম, এই শনিবারে পূর্ণিমে। প্রথম বাসা—সত্যনারাণ করবার কথা বলে রেখেছি তোমাকে। তা শুভ কাজে দেরি করে কি হবে? এই শনিবারে হোক না? মাষ্টারদিগে খাওয়াবে বলছিলে,—খাওয়ানো হয়ে যাবে।

—না। তা হবে না। সিন্নী দিয়ে সারলে চলবে না।

—ভাল করে সিন্নী কর। লুচি, সুজির পায়েস, মিষ্টি—পাঁচ রকম কর।

—পাঁচ রকমই কর আর দশ-বিশ রকমই কর, আসল রকম সিন্নীতে বাদ। মাছ নইলে এ আমলে খাওয়া—খাওয়াই নয়। তা হোক সত্যনারায়ণ শনিবার দিন; সিন্নী ভাল করেই কর, লুচি, সুজির পায়েস, মিষ্টি, ফলমূল। বোর্ডিঙের ছেলেরা আছে, মাষ্টারমশায়রা আছেন, সকলকে দিতে হবে। তার ফর্দ কর। গ্রামেরও দু'চার জনকে বলতে হবে।

একটু থেমে বললেন—সকলের আগে রামজয়কে জিজ্ঞাসা করি দাঁড়াও। তার আবার খোলসা থাকা চাই। সত্যনারায়ণের পূজা চাই তো। সে তো রামজয় ছাড়া হবে না।

—তাঁকে আমি আগেই খবর পাঠিয়েছি। তিনি এসেছিলেন।

—ওরে বাপ রে। সেসব হয়ে গিয়েছে? কি বলেছে সে? পারবে? কৈ আমাকে তো কিছু বলে নি।

—তিনি বললেন—চন্দ্রকে বলুন, সে বললেই আমি পারব। আমি বললাম—আপনি টিফিনের সময় তা হলে আসবেন। তা তিনি বললেন—সেটা ঠিক হবে না, হাজার হলেও চন্দ্র হেডমাষ্টার আমি হেড হলেও পণ্ডিত।

—তাই বলেছে—রামজয়?

—তাই তো বললেন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চন্দ্রবাবু। রামজয় এই কথা বলেছে?

—তুমি রাগ করলে নাকি তাঁর ওপর?

—নাঃ।

—তবে? এমন করে চুপ করে রয়েছ?

—নাঃ। এবার হেসেই উত্তর দিলেন চন্দ্রবাবু।—নাঃ, রাগ করি নি। রাগের কথা তো নয়। একটু চুপ করে থেকে বললেন—রামজয় আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সে এই কথা বললে, একটু দুঃখ হ'ল।

—তোমাকে দেখে যে ভয় লাগে গো। বাড়ীতে যখন ছিলাম তখন তোমাকে এত ভয় লাগত না, বাসায় এসে—বেশী ভয় লাগছে। তুমি যেন চব্বিশ ঘণ্টাই হেডমাষ্টার।

বাইরে কে গলায় সাড়া দিল। বাইরে কেউ এসেছে।

—কে? যাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চন্দ্রবাবু বাইরের ঘরে বেরিয়ে এলেন।

ফোর্থমাষ্টার কেষ্টবাবু।

কেষ্টবাবু একখানা চটি বই তাঁর হাতে দিলেন—দেখুন।

—কি এখানা? 'শান্তি'! বাংলা ম্যাগাজিন?

—হ্যাঁ। আমাদের শিবনাথ কবিতা লিখেছে!

—শিবনাথ! কেমন লিখেছে? বাংলা কবিতা তো আপনি ভাল বোঝেন!

—লিখেছে ভাল। হাত ওর ভালই বটে। কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেছে—এবার যদি কবিতা নিয়ে মাতে তো ও আর পাস করতেই পারবে না। ওকে একটু সাবধান করে দেবেন আপনি। পড়াশুনা তো ভাল করছে না আজকাল।

—ঠিক বলেছেন। আজই সাবধান করে দেব। কিন্তু—। একটু চুপ করে থেকে বললেন—পড়াশুনা ভাল করছে না?

—হয়ত আপনার ক্লাসের পড়াশোনা ভালই করে, কিন্তু জিয়োগ্রাফী ভাল পড়ে না।

—থার্ডমাষ্টার ভূতনাথবাবু বাড়ীতে থাকেন অথচ পড়ছে না? ভূতনাথবাবুকে বলেছেন?

—না। বলি নি। নতুন লোক, কি মনে করবেন তা তো জানি না। বলতে পারি নি।

নতুন থার্ডমাষ্টার ভূতনাথবাবু। ভূতনাথবাবু আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিল্বগ্রামের অন্যতম অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্র শিবনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। থার্ড-মাষ্টার ভূতনাথবাবুই স্কুলের খেলাধুলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক—গেম্‌স্ টিচার।

—কথাটা আপনার কানে তুলতাম না হয়ত কিন্তু আর একটা ঘটনা ঘটেছে।

—কি হ'ল?

—আমাদের পবিত্রবাবুর সাহিত্যসভার কথা জানেন তো। আমিও ওঁদের মধ্যে আছি। এখন এ মাসে একটা কবিতা দিয়েছে শিবনাথ; কবিতাটি ঠিক সিডিসান্ না হলেও—খুব এক্সাইটিং। আমার তো ভাল লাগছে না। কবিতাটি ভূতনাথবাবু দেখে দিয়েছেন মনে হচ্ছে। শুনলাম—ভূতনাথবাবুই বলছিলেন—আমাদের এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার মশায় তারিফ করেছেন খুব।

চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

—স্যর! এসে দাঁড়াল ধ্রুব ঘোষ; ফার্ষ্ট ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মূর্ত্তির মত দেহ। বয়স ষোল বছরেরও কম। মাথায় খাটো ছেলেটি দেখতে সুশ্রী নয়—কিন্তু শরীরের গঠনসৌষ্ঠবে এবং পেশীর দৃঢ়তায় বৃন্দাবনের রাখালগোষ্ঠীর একটি রাখাল বলে মনে হয়। চাষী সদ্‌গোপের ছেলে, ইস্কুলের চাকর কেষ্ট ঘোষদের জ্ঞাতিঘরের ছেলে; মাইনরে বৃত্তি পেয়ে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনে ভর্ত্তি হয়েছিল চার বছর আগে। প্রতি ক্লাসে প্রতি বিষয়ে ধ্রুব ফার্ষ্ট হয়েছে। রেকর্ড মার্ক পায়। কেবল ইংরিজীতে সে অন্য বিষয়ের তুলনায় একটু নরম। ইস্কুলে ফ্রি, বোর্ডিঙেও ফ্রি। নির্ভীক প্রাণবন্ত ছেলে। তবে মাষ্টারদের দু'একজন বলেন—আর একটু বিনয় থাকলে সোনায় সোহাগা হ'ত। ধ্রুব উদ্ধত নয়, কিন্তু যে বিনয়ে ওর চরিত্রের শোভা ও মহত্ত্ব বাড়ত তার অভাব আছে। কোন বিষয়ে ও কারুর কাছে পিছিয়ে থাকবে না। পড়াশুনা থেকে আরম্ভ করে খেলাধুলা পর্যন্ত। ফুটবল খেলা ধ্রুবর ঠিক আসে

না, কিন্তু তাও সে ছাড়ে নি। আয়ত্ত করেছে একরকম করে। কৌশল এবং খেলার চাতুর্যের অভাব পূরণ করেছে দৈহিক শক্তিতে ও দৃঢ়তায়। বল মারে আঙুলের ডগা দিয়ে, আর ছুটতে পারে তীরের মত, বল ঠিক গোলে পৌঁছয় না, তবে এ মাথায় বল ধরে সেটা নিয়ে তীরবেগে ছুটে ও মাথায় বাউণ্ডারী লাইন পার করে দিয়ে ছাড়ে।

চন্দ্রবাবু বললেন—কি ?

—ফুটবল ম্যাচ হবে সার, প্লেয়ার সিলেকশন হচ্ছে—তা আমাকে নিচ্ছেন না। আমি কারুর চেয়ে খারাপ খেলি না।

ফুটবল ম্যাচ! হ্যাঁ, রামপুরহাট ইস্কুল থেকে একখানা চিঠি এসেছে বটে। কিন্তু এখনও তো 'খেলা হবেই' এমন তো স্থির হয় নি। তিনি ম্যাচ-ট্যাচ পছন্দ করেন না। আদৌ পছন্দ করেন না। খেলাধূলা, ব্যায়ামচর্চ্চা মন্দ জিনিস এমন তিনি বলেন না, কিন্তু ছাত্রজীবনে ওটির প্রভাব ঠিক ভাল করে না। না, করে না; এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলবেন। তাঁর এই বারো-তেরো বৎসরের শিক্ষক-জীবনে যতগুলি ওই ধরনের ছেলেকে দেখলেন—তাদের একটি দুটি ছাড়া আর সবগুলিই লেখাপড়ায় ব্যর্থ হয়েছে; শুধু তাই নয়—কেমন যেন উদ্ধত হয়ে ওঠে। তিনি স্পষ্টই বলেন—গুণ্ডা হয়ে যায়। শাসন করবার সময় দেখেছেন তিনি, তারা গোঁয়ারের মত তাকায়, গোঁয়ারের মত দাঁতে দাঁত টিপে মার খেয়ে যায়, 'আর করব না' এ কথা কিছুতেই বলে না, এক-একটা ছেলে আবার যেন মাষ্টারদের দৈহিক শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়, চুল ধরে টানলে ঘাড়টা শক্ত কাঠের মত অনমনীয় করে রাখে, নোয়াবে না, মাথা নোয়াবে না তারা! এর উপর ফুটবল খেলার একটা নেশা আছে। আশ্চর্য নেশা! খেলে যেন আর আশ মেটে না। এ পর্য্যন্ত রবিবার বা ছুটিছাটার দিন বরাবরই বাড়ী গিয়েছেন—বোর্ডিঙে থাকেন নি, কিন্তু তিনি জানেন—যে ছেলেগুলো ভাল ফুটবল খেলে তারা ছুটির দিন সকাল থেকে ফুটবল বের করে পিটতে থাকে। সেই সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পিটে তবে ক্ষান্ত। সেও আলোর অভাবে। অন্য দিন, চারটে বাজবার আগে থেকেই চুলবুল করে; খেলোয়াড়দের মধ্যে ইসারা চলে। ছুটি হওয়ামাত্র ছুটতে থাকে, বাড়ী বা বোর্ডিঙে গিয়ে বইগুলো ধপ করে ফেলে—দুটো মুড়ি জল দিয়ে ভিজিয়ে গোগ্রাসে গিলে মাঠে ছোটে। পৌনে পাঁচটা-পাঁচটা থেকে আরম্ভ করে সাড়ে ছ'টা-সাতটা পর্য্যন্ত মরণবাঁচন জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে, বল পিটে গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি করে, পা মচকে বা আছাড় খেয়ে হাঁটু ছিঁড়ে, নখ তুলে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরেই ঢক ঢক করে আকণ্ঠ পুরে জল খাবে। তারপর পড়তে বসেই ঢুলতে থাকবে। ওই খেলার মাঠেই ভাল ছেলে মন্দ হয়; সিগারেট খেতে ধরে, অশ্লীল রসিকতা করতে শেখে।

ওই শিবনাথ ছেলেটা! ওটারও এই নেশা আছে। কবিতা নেশার উপর আবার এই নেশা। অবশ্য ছেলেটির বাড়ীর শাসন তরিবৎ ভাল, আর ছেলেটার মেটালও ভাল—তাই সিগারেট খায় না, অশ্লীল রসিকতা ইত্যাদির দিকেও যায় না, কিন্তু লেখাপড়ার দিকটা নষ্ট হতে বসেছে। ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত ফার্স্ট হয়েছে। থার্ড ক্লাসে থার্ড, সেকেণ্ড ক্লাসে ফিফথ, এবার ম্যাট্রিকের বছর, এবারও ওর হুঁশ নাই। একবার তাঁকে না জানিয়ে ও বিবগ্রামের

ভিলেজ টিম থেকে বাইরের ফুটবল দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলেছিল বলে তিনি তার পাঁচ টাকা জরিমানা করেছিলেন।

ফুটবল খেলা তিনি পছন্দ করেন না। না, করেন না।—ওর ফল ভাল নয়। আর ওকি ডাল-ভাত-খেকো বাঙালীর ছেলের খেলা? ইংরেজরা খেলে, ওরা শীতপ্রধান দেশের লোক, ওদের দেশে দুরন্ত শীতে এমনি ছুটোছুটি ভিন্ন রক্ত গরম হয় না, ওরা ষাঁড়ের ডালনা খায়, মদ খায়; এ খেলা ওদের! উপায় নাই, দেশে চলন হয়েছে, ফুটবল টিম রাখা কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেন—তাই রাখতে হয়েছে। এর উপর আবার ম্যাচ কেন? তাও অন্য জায়গায় ছেলেদের সঙ্গে!

চন্দ্রবাবু বললেন—যাও। যাও। খেলে কেউ রাজা হয় না। আর ও ম্যাচ হবে না।

—থার্ডমাষ্টার মশাই যে চ্যালেঞ্জ এ্যাক্সেপ্ট করেছেন!

—যাও। যাও। সে ক্যানসেল হয়ে যাবে।

ধ্রুব চলে গেল।

চন্দ্রবাবু বললেন, খেলা তো বন্ধ করতে হবে কেষ্টবাবু।

রামজয় এসে উপস্থিত হলেন—কেষ্টবাবু রয়েছেন নাকি?

দশম পরিচ্ছেদ

রামজয় পণ্ডিত বললেন—যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে—হরে মুরারে।—ফুটবল ম্যাচের কথায় বললেন কথাটা। অর্থাৎ ওটা বন্ধ করা যাবে না। তারপর হেসে বললেন—শুধু ওটাই কেন, আরও অনেক কিছু রোধ করা যাবে না।

চন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে রইলেন। রামজয়ের মনোভাব তিনি জানেন, বোঝেন। সে সব তিনি বিশ্বাস করেন না। রামজয় মানুষ ভাল কিন্তু শিক্ষায়-দীক্ষায় সেকেলে লোক। শিক্ষা-দীক্ষাকে আয়ত্ত করে যাঁরা তাঁর উর্দ্ধে উঠে চিরকালের শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারেন—তাঁরা ছাড়া সবাই আপন আপন কালের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে—বদ্ধ জলার জীব। কারও জলা বড় কারও ছোট। তিনিও তাই। তিনি এ সত্যটা বোঝেন, কিন্তু চিরকালের শিক্ষা বা সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না। রামজয়ের কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়, কিন্তু যা নতুন আসছে তা যে শুধুই মন্দর জন্য তা তিনি মনে করেন না। কিন্তু এই যে খেলার ব্যাপারে ছেলেদের মাতানো—এটা নিশ্চয় ভাল নয়। রামজয় যে সব ইঙ্গিত দিয়েছে তার মধ্যে শনিবারে ডিবেটিং ক্লাবের কথা রয়েছে। ছেলেদের সাহিত্য-সভায় যোগ দিতে অধিকার দেওয়ার কথা রয়েছে। এবং বোর্ডিঙে খাওয়ার জায়গায় জাতি-ভেদের কড়াকড়ি তুলে দিয়ে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল একসঙ্গে খেতে বসার রেওয়াজ প্রবর্ত্তনের কথাটা

বিশেষ করে রয়েছে। এ তিনটি নতুন প্রবর্ত্তনের প্রথমটি এবং শেষটি—দুটির প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা তাঁর অনেক দিনের। ডিবেটিং ক্লাব ছিল, কিন্তু সেটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একরকম ধর্ম্মসভায়। কি ভাবে তাঁর মনে নেই—তবে পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে বিতর্কই বিতর্কসভায় একমাত্র বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি নিজে শনিবার দিন বাড়ী যেতেন; ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হতে হ'ত তাঁকে; সভা আরম্ভ করে দিয়ে—কোন দিন মৃগাঙ্কবাবুকে, কোন দিন রতনবাবুকে, কোন দিন রামজয়কে সভাপতির আসনে বসিয়ে দিতেন। এই জন্যই পুরাণ বা ধর্ম্মের গণ্ডীর বাইরে যেতে সাহস করতেন না। একবার ঠেকেই তাঁর শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। সে প্রথম আমলের কথা। প্রাণবান পুরুষ অমরবাবু হঠাৎ একদিন শনিবার দিন বিল্বগ্রামে এসে ইস্কুল ভিজিট করেছিলেন। তিনি 'জমিদারী প্রথা' সম্পর্কে ডিবেট শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন। জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধপক্ষে যারা বলেছিল—তারা জমিদারীর নিন্দা করতে গিয়ে এখানকার জমিদারদের গালাগাল করেছিল। এখানে কেউ বড় জমিদার নেই, সকলেই মধ্যবিত্ত লোক; ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবু জমিদারী কিনেছেন কিন্তু আসলে তিনি ব্যবসায়ী। ওই নামেই তিনি খুশী হন। বক্তাদের কেউ কেউ অবান্তর ভাবে জমিদারীর নিন্দা করতে গিয়ে ব্যবসায় পেশার প্রশংসাও করেছিল। ফলে বিল্বগ্রামে আন্দোলনের আর বাকী ছিল না। উপরে দরখাস্তও হয়েছিল। সেই কারণেই পুরাণের বুড়ী ছুঁয়ে থাকাটাই নিরাপদ মনে হয়েছিল। অবশ্য এর একটা ভালর দিকও আছে। পুরাণের মহিমান্বিত চরিত্রগুলি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে চারিত্রিক মহিমার একটা প্রভাব পড়ে ছেলেদের মনে।

ব্রজবিহারীবাবু এসে বিতর্কসভায় নতুন ধারা প্রবর্ত্তন করেছেন। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, অস্পৃশ্যতা এমন কি নতুন করে জমিদারী প্রথা নিয়েও বিতর্ক করিয়েছেন। তাঁর পরিচালনার যোগ্যতা অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্যের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, সেকালের ছেলেদের চেয়ে এ কালের ছেলেদের যোগ্যতাও অনেক বেড়েছে; আরও লক্ষ্য করেছেন যে, কালটাও পাল্‌টেছে। একালে জমিদারীর এবং জমিদারের নিন্দা করলে বিল্বগ্রামের জমিদারেরা তাকে গায়ে পড়ে তাঁদের গালাগাল বলে ধরে নেন নি। তিনি নিজে এতে খুশী হয়েছেন। খুব খুশী হয়েছেন। কিন্তু রামজয় খুশী হন নি। তিনি বলেছেন—এই হ'ল—এইবার একদিন 'ঈশ্বর আছেন কি নাই' বিষয় দিয়ে দেন, ষোলকলা পূর্ণ হয়ে চৌষট্টি কলার গোড়াপত্তন হোক। বাস্! চার পো কলি পূর্ণ হোক; ষণ্ডরূপী ধর্ম্মের কলিতে একটি পা, সে পা-খানি যাক; মুখ থুবড়ে পড়ুক।

ব্রজবিহারী হেসে বলেছিলেন—তাও দোব। কিন্তু আপনি এত দমে যাচ্ছেন কেন? আমাদের পুরাকালেও তো নাস্তিক ছিলেন। কপিলের—

—দোহাই ব্রজবাবু, তাঁর নাম করবেন না, তাঁর দোহাই দেবেন না।

—কেন?

—তবে একটা গল্প বলি শুনুন। দেশে আমাদের চল্‌তি গল্প অবশ্য। আপনাদের হিষ্টিরি নাকি বলে—তা সে হিষ্টিরিতে এ কথা আছে কিনা জানি না। তবে শঙ্করাচার্য্যের কথা-

তো আছে আপনাদের হিষ্টিরিতে, সেই শঙ্করাচার্য্যের গল্প। শুনেছি—শঙ্কর একদিন দাক্ষিণাত্য থেকে যাচ্ছেন কেদারবদরীতে; সঙ্গে একদল শিষ্য। তা শঙ্কর বললেন, দেখ বাপু সকল—আমি তো তোমাদের সঙ্গে পদব্রজে যেতে পারব না, আমি যোগবলে আকাশমার্গে রওনা হলাম; তোমরা পদব্রজে এস। তবে তোমাদের সুবিধার জন্য মধ্যে মধ্যে পথে নামব, নিশানা রেখে যাব। তোমরা সেই পথ ধরে এস। বলে বসলেন তিনি যোগাসনে এবং দেখতে দেখতে আকাশমার্গে উঠে গেলেন। এখন শিষ্যরা পদব্রজে রওনা হ'ল এবং কয়েক মাস পরে কেদার মঠে এসে পৌছুল। গুরুকে প্রণাম করতেই শঙ্কর তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন—পথ ভুল হয় নি? কোন কষ্ট হয় নি? একদল বললে—না প্রভু, কোন কষ্ট হয় নি। আর একদল চুপ করে রইল। শঙ্কর বললেন—কি ব্যাপার বল তো? একই পথে তোমরা এসেছ অথচ একদল বলছ কোন কষ্ট হয় নি, আর একদল চুপ করে রয়েছ। কেন? কারণ কি? উত্তরে যারা কোন কষ্ট হয় নি বলেছিল তারাই বললে—প্রভু, ওরা আপনার মত গুরুকেও সম্পূর্ণরূপে মানতে দ্বিধা করেছে, মানে নি—তাই তারা কষ্ট পেয়েছে। এ ক্লেশ ওদের কর্ম্মফল। আমরা পদব্রজে রওনা হয়ে—দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পথ চলে—পথের ধারে এক নিষাদ-পল্লী পাই, সেখানে প্রশ্ন করি তারা আপনাকে দেখেছে কিনা; কারণ সেই সময়টাই ছিল মধ্যাহ্ন, আপনি বলেছিলেন যেখানে তোমাদের মধ্যাহ্ন হবে—সেইখানে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য পদচিহ্ন রেখে যাব। তারা বললে—হ্যাঁ। এক তেজঃপুঞ্জ গোঁসাই এসেছিলেন। এসে আমাদের বললেন—আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে খেতে দাও। আমরা তাঁকে মাংস রান্না করে খেতে দিলাম। খেয়ে আবার ঠাকুর আকাশে উঠে গেলেন। আমরা তখন সেই নিষাদের ঘরে প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মাংস আহার করলাম। কিন্তু ওরা তা খেলে না। এইভাবে প্রায় সমস্ত পথটাতে আমরা এইসব আরণ্য জাতির সংখ্যা অধিক পেয়েছি। এবং যেখানে যেখানে প্রভু যে আহার গ্রহণ করেছেন—তাই আমরা গ্রহণ করেছি। ওরা তা করে নি। মধ্যে মধ্যে দু'এক স্থলে প্রভু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের গৃহে বা তপস্বীর কুটীরে যেখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সেখানে ছাড়া আহার গ্রহণ না করার ফলে—ওরা কষ্ট পেয়েছে অনেক। কিন্তু এ হ'ল গুরুপদাঙ্ক অবহেলার ফল। আমরা কষ্ট পাই নি—এইটুকু বললেই সব হবে না প্রভু; আমরা সংস্কারবর্জ্জিত হয়ে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে মাংসাহারের গুণে দেহে প্রভূত পরিমাণে বল পেয়েছি। অনুভব করছি যেন আমরা অমৃতের আস্বাদ এবং সন্ধান পেয়েছি। যেহেতু এই মাংস আমাদের কাছে সুস্বাদু মনে হয়েছে এবং সেই নিষাদ-অধ্যুষিত পল্লীর মধ্যেও আমরা স্বর্গসুখ অনুভব করেছি। শঙ্কর হাসলেন, হেসে বললেন—তোমাদের সিদ্ধি তা হলে তো আসন্ন। বলে ওই দেহে দুর্ব্বল শিষ্যগুলির পরিচর্য্যায় মন দিলেন। কয়েকদিন পর ঐ প্রথম দল অর্থাৎ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী শিষ্যদের বললেন—এস তোমাদের সিদ্ধি আর কতদূর দেখে আসি। বলে চলতে শুরু করলেন। পার্ব্বত্য পথের ধারে ধারে ছোট ছোট গ্রাম। এমনি একটি গ্রামপ্রান্তে পথের ধারে একটি কামারের কর্ম্মশালা। কর্ম্মকার হাপরে লোহাকে গরম করে সাঁড়াশী ধরে তুলে নেয়াইয়ের উপর রেখে কি কি যন্ত্র গড়ছে। শঙ্কর

সেই কর্ম্মশালায় ঢুকে পড়লেন—এবং বললেন—কর্ম্মকার—আমি হলাম আচার্য শঙ্কর। আমি ক্ষুধার্ত্ত। তুমি আমাকে অতিথিসৎকার কর। কর্ম্মকার স্তম্ভিত হয়ে গেল প্রথমটা, তারপর মহোল্লাসে উঠে ছুটে বাড়ীর দিকে যেতে উদ্যত হ'ল। গাই দুইয়ে আন—গাই দুইয়ে আন, ফল আহরণ করে আন। ওরে ওরে।

শঙ্কর তাঁর হাত চেপে ধরলেন। না। প্রয়োজন নাই। ওই বস্তু আমাকে দাও।

—কোন্ বস্তু প্রভু?

—ওই যে। প্রভাতসূর্য্যের মত বর্ণ—নবনীতের মত কোমল হয়েছে।

তবু বুঝতে পারলে না কর্ম্মকার। তখন শঙ্কর নিজেই সেই গলন্তপ্রায় লোহার দণ্ডটা তুলে নিয়ে—মহাকালের মত তার খানিকটা গ্রাস করলেন। এবং বললেন, তৃপ্তোঽহং। এই তো সাক্ষাৎ অমৃত।

তারপর শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন—বৎসগণ, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ কর। এই অমৃত ভক্ষণ করলেই তোমরা সিদ্ধিফল পাবে। নাও-নাও-নাও।

তখন শিষ্যদের অবস্থা বুঝতে পারছেন? চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে গোলকে পরিণত হয়েছে। একেবারে গোল, কেষ্টবাবুর পৃথিবীর মত উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা নয়। একেবারে ড্রয়িংমাস্টারের কম্পাসে আঁকা গোলের মত গোলালো।

শঙ্কর তখন হেসে বললেন—বৎসগণ, সাধককে সর্ব্বপ্রথম সাধনায় সিদ্ধি অর্জ্জন করতে হয়, তারপর সিদ্ধ সাধকের জীবনাচরণে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিদূরিত হয়। এবং এই সাধনার কাল—মহা কৃচ্ছ্রসাধনের কাল। সিদ্ধ সাধক শঙ্কর শুধু নিষাদের ঘরে মাংসভক্ষণ করতেই পারেন না, তিনি এই জলন্ত লৌহখণ্ডও ভক্ষণ করতে পারেন।

রামজয় হেসে বলেছিলেন—দোহাই মাস্টার মশাই, আগে-ভাগেই ওদের নিষাদের ঘরে মাংস খাওয়ার অধিকার দেবেন না। তাতে ওরা খাঁটি নিষাদে পরিণত হবে, শঙ্করত্ব ভূত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে। কপিল আগে ঋষিত্ব অর্জ্জন করেছিলেন—তারপর নাস্তিক হয়েছিলেন।

ব্রজবিহারী বিচিত্র মানুষ। মোটা কর্কশ কণ্ঠে হো-হো করে হেসে ঘরখানাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ভয় কি, ওই বেটারা যদি নিষাদই হয় তো তখন সেই মুনির মত করা যাবে। যিনি নাকি নেংটি ইঁদুরের ছানাকে বাঘ করেছিলেন—এবং তাঁরই ঘাড় ভাঙতে উদ্যত দেখে যিনি নাকি 'পুনর্মূষিকোভব' বলে ফের নেংটি ইঁদুর বানিয়ে দিয়েছিলেন। বেটাদের ফের আস্তিক করে তোলা যাবে। দেখাই যাক না, ওদের দৌড় কতটা। একেবারে ইঁদুর। অন্ততঃ বেড়ালটা হতে দিন।

সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনবাবু একটু হেসে বলেছিলেন—কিন্তু তখন ওরা মুনির তোয়াক্কা নাও রাখতে পারে, কি বলেন পণ্ডিত মশায়। ইঁদুর একবার বেড়াল হবার আস্বাদ পেলে মুনির কৃপার ভরসা না রেখে নিজেরা ব্যাঘ্রত্বলাভের তপস্যা জুড়ে দিতে পারে। অন্ততঃ নখ দাঁত শানিয়ে বনবেড়াল সহজেই হতে পারে। বেড়াল বন্য হলেই বনবেড়াল, মানুষের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় ভাঙতে না পারুক, আঁচড়ে কামড়ে সহজেই ঘায়েল করে দিতে পারে।

তবে ভরসা রাখতে পারেন ব্রজবাবুর উপর, উনি মুনি না হোন, পাকা জানোয়ার শাসনকারী বটেন।

চন্দ্রবাবু দু'পক্ষের কথা উপভোগ করেছিলেন। আশঙ্কা তাঁর ছিল না তা নয়, কিন্তু আশঙ্কার সঙ্গে আশাও ছিল তাঁর। এবং অভিপ্রায় বলতে গেলে—এ অভিপ্রায় তাঁর অনেক দিনের। ব্রজবিহারীবাবু প্রথম অধিবেশনেই আশ্চর্য্য ভাবে সফল করে তুলেছিলেন নূতন উদ্যোগটিকে। চন্দ্রবাবু নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন ছেলেগুলির নূতন চেহারা দেখে। পুরাণের চরিত্র নিয়ে আলোচনায় এ চেহারা দেখা যায় নি। সে আলোচনায় দেখা যেত ছেলেদের কে কেমন পুরাণ পড়েছে বুঝেছে সেইটুকু। এতে দেখতে পেলেন ছেলেগুলি মনে মনে কি ভাবে তাই। প্রথম দিনই ছিল জাতিভেদ; জাতিভেদের বিপক্ষে বলেছিল এই ধ্রুব। ধ্রুব তীব্র আক্রমণ করেছিল—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে এবং ব্রাহ্মণদের। তারাই এটার প্রচলন করেছে—তারাই অন্য সকল বর্ণকে দাবিয়ে রেখেছে, জোর করে সকলের ঘাড়ের উপর সিন্ধবাদের নাবিকের মত চেপে আছে। তারা লোভী, চাল-কলাতেও পর্য্যন্ত তাদের লোভ।

জাতিভেদের পক্ষে বলতে বলা হয়েছিল শিবনাথকে। শিবনাথের মনের চেহারা দেখে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু মনের চেহারাই নয়, ওর বলবার ভঙ্গী, বলবার শক্তি আশ্চর্য্য। অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে। শিবনাথের কথাগুলি কানের পাশে এখনও যেন বাজছে। শুরুতেই চমকে উঠেছিলেন। বললে—পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ আছে। সেই তাপই তার জীবন। মধ্যে মধ্যে নানা বিচিত্র কারণে সেই তাপ যখন সমতা হারিয়ে কোথাও কম কোথাও বেশী হয়, তখন স্থানে স্থানে অগ্ন্যুদ্গার ঘটে। তার ফলে স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হয়, যেখানে ভূমিকম্প হয় সেখানে বাড়ীঘর ভাঙে, বিপর্য্যয় হয় কিছুটা। তারপর আবার সমতা ফিরে আসে। আবার বাড়ী ঘর গড়ে ওঠে। আমার বন্ধু ধ্রুব ঘোষের আজকের আগুনের মত গরম বক্তৃতা সেই ধরণের একটি অগ্ন্যুদ্গার। এ নূতন নয়। কর্ম্ম অনুসারে বর্ণাশ্রমের যে জাতিভেদ প্রথা—তা ওই পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপের মত মানুষের সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা। এ থাকবেই। তবে মধ্যে মধ্যে উত্তাপের কম-বেশী হওয়ায় যে অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটে তা হ'ল বিকৃতি। বিকৃত অবস্থার সমালোচনা—সহজ সুস্থ অবস্থাকে স্পর্শ করে না। মূল কর্ম্ম অনুসারে জাতিভেদ আর বিকৃত জাতিভেদ এক নয়। বিকৃতিকে দূর করতে হবে। তার প্রতিকারে আমার বন্ধুবর ডাক্তাররূপে অগ্রসর হলে আমি কম্পাউণ্ডার হয়ে সঙ্গে যাব, ইঞ্জিনীয়াররূপে অগ্রসর হলে রাজমজুর হয়ে সঙ্গে থাকব, কিন্তু সমূলে ধ্বংস করতে—কৈলাস উৎপাটনকারী রাবণের মত অগ্রসর হলে—শিবভৃত্য নন্দীর মত আমি পথরোধ করব এবং বলব তা তিনি পারবেন না, পারবেন না, পারবেন না। তাঁকে বিশ্বামিত্রের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি; তিনি কৃষিজীবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী, বিদ্যা তিনি সহজেই আয়ত্ত করেছেন। করবেনও। আমার মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের চেয়েও বেশী বিদ্যা আয়ত্ত করবেন, কিন্তু তিনি এই মন নিয়ে ব্রাহ্মণত্ব দাবি করলে আমি বশিষ্ঠের মত বলব—বিদ্যা সত্ত্বেও আপনাকে আমি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করব না। এবং ব্রাহ্মণ তিনি হবেন না। আমি

বিদ্যাহীন পাচক বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে পাচকই বলি, বিদ্বান বণিকবৃত্তি-ধারী ব্রাহ্মণকে বণিক বলি, কয়লাওয়ালাকে কয়লাওয়ালা বলি, চামড়াওয়ালাকে চামড়াওয়ালা বলি, ব্রাহ্মণ বলি না। আমার বন্ধু বিদ্যায় এবং মনে যেদিন ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করবেন সেদিন তিনি ব্রাহ্মণই হবেন। সেদিন জন্মসূত্রে তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠী তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবেন, কোনক্রমেই এক থাকবেন না। তাঁর সহোদর যদি কৃষিজীবী থেকে যান তবে একসঙ্গে আহার এবং বাস করেও একজাতি থাকবেন না এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা স্বতন্ত্র হয়ে যাবেন এ ধ্রুব সত্য। কারণ কর্ম্মভেদে জাতিভেদ মানবজীবনে স্বাভাবিক, এ নইলে মানুষের সমাজ এবং জীবন অচল, সামাজিক কোঠায়—উপরতলা নিচের তলা থাকবেই। মাষ্টার এবং ছাত্রের মত, ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডারের মত, ইঞ্জিনীয়ার এবং রাজমজুরের মত বুদ্ধিজীবী এবং কৃষিজীবীর মত, দুধওয়ালা, তেলওয়ালা, মাছওয়ালার মত জাতিভেদ থাকবেই এবং কর্ম্মভেদে প্রকৃতির, বুদ্ধির, বাক্যের, সমাজ প্রতিষ্ঠার তারতম্য হবেই।"

ঠিক এমন ভাবে গুছিয়ে বলতে পারে নি, জায়গায় জায়গায় ভাষার দোষ ঘটেছে, শিবনাথ একটু আধটু খেঁধিয়েছে, সেগুলি তিনি মনে মনে সংশোধন করে নিয়ে স্মরণ করলেন। সেদিন মনে মনে আশ্চর্য্য উল্লাস অনুভব করেছিলেন তিনি। অহঙ্কার হয়েছিল তাঁর।

রামজয় খুশী হন নি। বলেছিলেন—ছোঁড়াটা চালাক বটে। ওর ঠাকুরদা উকীল ছিল। পড়লে শুনলে ভাল উকীল হবে। ধ্রুবকে বাকচাতুরীতে ঠকালে বটে, কিন্তু আসলে তো জাতিভেদকে মানে না বললে। ব্রাহ্মণকুলে না জন্মালে ব্রাহ্মণ হয় না। জাতি জন্মগত—সেদিকে মাড়ালে না। আমি তো বলেছি, এ যা হয়েছে তাতে এগোলেও নির্ব্বংশের বেটা, পিছুলেও নির্ব্বংশের বেটা; এ সেই দক্ষিণদ্বার খুলে দেওয়া হ'ল। যেটুকু আছে অবশিষ্ট সব শেষ করবে। কলিশেষে একাকার, দামোদরের বাঁধ ভাঙল।

এর কিছুদিন পরেই বোধ করি কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যেই বোর্ডিঙে রেওয়াজ হয়ে গেল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তৈলিক, বৈরাগী, উগ্রক্ষত্রিয় সব একসঙ্গে পংক্তিতে বসে খাবে। যারা অবশ্য গোঁড়া—তারা আলাদা খেতে পারে। তেমন ছেলে দেখা গেল আঙুলে গোনা যায়। জন পাঁচেক বামুনের ছেলে, জন আষ্টেক অন্য জাতের ছেলে—তাদের মধ্যে নীচের দিকের জাতের ছেলেই বেশী। তারা অপরাধ হবে ভয়ে এগিয়ে আসে নি। প্রথম দিন শিবনাথ সখ করে বসে গেল ওই জগন্নাথ ক্ষেত্রে। বিল্বগ্রামেরই ছেলে, বাড়ী থেকে খেয়ে ইস্কুল আসে, সেদিন ইস্কুলে এসে ওই নতুন ব্যবস্থা দেখে বসে গেল পাতা পেড়ে, আর একবার খাবে!

রামজয় বলেছিলেন—হুঁ হুঁ আমি জানতাম। ও ছেলে মুষল। কুলনাশ ওর ধর্ম্ম। ওই ছেলেই একদিন ধর্ম্মরূপী ষণ্ডের একটিমাত্র পা-খানি ছাড়িয়ে বিলাতের হোটেলে বসে তিনার ভক্ষণ করবে। আমি জানি যে।

তাতেও চন্দ্রবাবু হেসেছিলেন। রামজয়কে তিনি ভালবাসেন; তার এই ধরনের কথাগুলি শুনে তিনি হাসেন; বেচারী রামজয় চারিদিকেই সর্ব্বনাশ দেখছে।

আজ ম্যাচের কথায় বললেন—যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হয়ে মুরারে!

কথাটি শুনে আজ আর চন্দ্রবাবু হাসলেন না। চুপ করে রইলেন। ব্রজবিহারীবাবু সম্পর্কে তিনি সত্যই চিন্তিত হয়েছেন। ব্রজবাবু যা করেছেন—তাতে ইস্কুলের উন্নতিও হবে। অবনতিও কিছুটা হবে। ভালো আর মন্দ, আলো আর অন্ধকার নিয়েই সৃষ্টি, সব জিনিসের সব ব্যবস্থার দুটো দিক আছে, সে স্বভাবের নিয়ম; কিন্তু পয়োমুখ বিষকুম্ভ কৃত্রিম; সে প্রবঞ্চনা, সে সর্ব্বনাশ!

কেষ্টবাবুকে কথাটা বলি-বলি করেও বলতে পারলেন না। রামজয় এসে গেল। রামজয় তাঁর পরম বন্ধু, কিন্তু স্থূলোদর এই ব্রাহ্মণটি অত্যন্ত অসতর্ক, এদিক দিয়ে একটু অগভীর বললেও অন্যায় হবে না। কোথায় যে কখন কি বলে ফেলবে তার কোন স্থিরতা নেই।

রামজয় থার্ড মাষ্টার কেষ্টবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল, তিনি বসে রইলেন। তাকে সত্য-নারায়ণ করবার কথাটা বলতেও ভুলে গেলেন। তারা চলে যাবার পর কথাটা মনে পড়ল। ওদিকে টিফিনের পর ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ে গেল।

ইস্কুল বসবার পর প্রথম ঘণ্টা এবং টিফিনের পরও প্রথম ঘণ্টা এই দু'ঘণ্টা চন্দ্রবাবুর ক্লাস থাকে না। এ দু' ঘণ্টা তাঁর বিশ্রাম নয়, ইস্কুলের আপিস-ওয়ার্ক এবং ক্লাস ইন্সপেকশনে কাটে এ দু' ঘণ্টা। টিফিনের পরের ঘণ্টাটায় চিঠিপত্রের উত্তর লিখে থাকেন। এ ঘণ্টাটায় ব্রজবাবুরও ক্লাস নেই। দু'জনেই বসে আলোচনা করে উত্তরের খসড়া করেন। ব্রজবাবু একবার গোটা ইস্কুলটা ঘুরে আসেন।

মাষ্টারেরাও একবার এ সময়টায় আপিস-রুমে সমবেত হন এবং পরে যে যার ক্লাসে বই, চক ইত্যাদি নিয়ে চলে যান।

চন্দ্রবাবু টেবিলে কনুই রেখে হাতের উপর কপাল ধরে বসে একখানা চিঠি লিখছিলেন। এটা ওঁর একটা বিশেষ ভঙ্গি। খুব চিন্তিত হয়েছেন তিনি এই কথাটা সহজেই বুঝতে পারে সকলে। হাতের আড়াল থেকেই বারেকের জন্য চোখ তুলে চন্দ্রবাবু বললেন—থার্ড মাষ্টার মশাই, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

থার্ড মাষ্টার একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। অন্য সকলে চলে যেতেই চন্দ্রবাবু ক্লার্ক গোপালকে বললেন—ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের এটেণ্ড্যান্সটা একবার চেক করে এস তো গোপাল! এডিশনাল সাবজেক্টের ক্লাসগুলোও চেক করে আসবে। এডিশনাল ক্লাসগুলি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তাও দেখে আসবে। ছেলেদের জনকয়েক ক্লাস ঠিক এটেণ্ড করে না। ঘর নেই, বোর্ডিঙের বারান্দায় ক্লাস হয়। ঠিক হচ্ছে না।

গোপালবাবু চলে যেতেই, চন্দ্রবাবু মুখ তুললেন—ভূতনাথবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ইট ইজ এবাউট শিবনাথ। সে নাকি কি কবিতা লিখেছে, এণ্ড দেয়ার ইজ এ স্মেল অব সিডিশন ইন ইট? আপনি তার খুব প্রশংসা করেছেন?

—সিডিশন? না-না! তবে হ্যাঁ পেট্রিয়টিজম বটে।

ব্রজবিহারীবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাসিতে ঘরখানা ভরে দিলেন—রজ্জুতে সর্পভ্রম। কে রিপোর্ট করলে আপনার কাছে? আমি তো ছিলাম সভায়। হাইলি ইমোশনাল দেশপ্রেমের সে প্রায় দধিকর্দ্দম। রাজদ্রোহ দূরের কথা রাজার নামগন্ধ নেই। কে বললে আপনাকে? কেষ্টবাবু?

—না। অন্যত্র থেকে সংবাদ পেয়েছি। দেন ইজ ইট নট ট্রু?

—না-না-না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে বন্দেমাতরম্ শব্দটাকেও যদি সিডিশন বলে ধরেন তাহলে বলতে পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা বলি মাষ্টার মশাই—সাহিত্য-সভার কর্ণধার হলেন আমাদের পবিত্রবাবু। তিনি অত্যন্ত রাজভক্ত লোক। আপনি কি বলবেন জানি না, আমার মতে মাত্রাটা যেন একটু বেশী। তিনি থাকতে সিডিশন হবে সাহিত্যসভায়? সে সব কিছু নয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

একটু চুপ করে থেকে চন্দ্রবাবু বললেন—ওকে একটু ভাল করে পড়াশুনা করান ভূতনাথ-বাবু। ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত ষ্যাট বয় ইজ ফার্স্ট ইন এভরি এগ্‌জামিনেশন। ফোর্থ ক্লাস থেকে ওর পতন শুরু হয়েছে—প্রত্যেক ক্লাসে এক এক ধাপ নামছে। আই এক্সপেক্ট মাচ—কিন্তু—।

আবার একটু চুপ করে রইলেন। ঠিক কথাটায় আসতে পারছেন না চন্দ্রবাবু। যেন আটকে যাচ্ছে।

—ওয়েল, কবিতা লেখে—হি রাইটস গুড পোয়েমস; আমি দেখেছি। ষ্যাট্‌স গুড। বলবার কিছু নাই। কিন্তু পড়বার সময় পড়তে হবে। আমার ইচ্ছে ও কবিতা লেখা ছেড়ে দেয় এখন কিছুদিন। এণ্ড হি ইজ ভেরী মাচ ফণ্ড অব ফুটবল প্লেয়িং। আপনারা জানেন না একবার আমি ওর পাঁচ টাকা ফাইন করেছিলাম। তখন গ্রামে ওদের একটা ভিলেজ টিম। ছিল। আমাকে না জানিয়ে ও ম্যাচে চ্যালেঞ্জ করেছিল—বাইরের টিমকে। আমি এর বিপক্ষে। ডেডলি এগেনষ্ট দিস থিং। দিজ ম্যাচেস।

একটু চুপ করলেন। দু'জনের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। ব্রজবাবুর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। চন্দ্রবাবু তা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন—ইয়েস, ইয়েস আমি ভুলেই গিয়েছিলাম—কোথা থেকে যেন একটা চ্যালেঞ্জ লেটার এসেছিল? ভূতনাথবাবুকে দিয়েছিলাম চিঠিখানা।

ভূতনাথবাবু বললেন—রামপুরহাট থেকে।

—এণ্ড উই হ্যাভ এ্যাক্‌সেপ্টেড ইট, আমি লিখে দিয়েছি চিঠি। ব্রজবিহারীবাবু বলে উঠলেন।

—ইউ ডিড নট আস্ক মি এনিথিং?

—ইউ ডোণ্ট লাইক ইট? এটা আমি বুঝতে পারি নি।

—নো। আই ডোণ্ট লাইক দিজ ফুটবল ম্যাচেস। আই ডোণ্ট।

ব্রজবাবু তাঁর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আই এ্যাম রাইটিং টু দেম টু এক্‌সকিউজ আস। উই আর আনএবেল টু গো। আওয়ার হেড মাষ্টার ডাজ নট লাইক ইট। তাঁর অনুমতি আমরা পাচ্ছি না।

কাগজ টেনে নিলেন ব্রজবাবু।

চন্দ্রবাবুও চুপ করে বসে রইলেন মিনিট খানেক। তারপর বললেন—যা লিখবার আমি লিখে দিচ্ছি ব্রজবাবু।

বলে কাগজ টেনে লিখতে শুরু করলেন। লেখা শেষ করে চিঠিখানা ব্রজবাবুর হাতে দিলেন। ব্রজবাবু দেখলেন চন্দ্রবাবু লিখেছেন—রামপুরহাটের হেড মাষ্টারকে। তিনি খেলা বন্ধ করতে চান নি। লিখেছেন—খেলাটা এখানকার মাঠে হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। রামপুরহাটে অনেক ফুটবল ম্যাচ হয়, এখানে হয় না। এখানকার মাষ্টাররা ও লোকেরা দেখতে পেলে খুশী হবে।

—আপনি এ্যাক্সেপ্ট করেছেন। খেলা মন্দ জিনিস বলব না। কিন্তু ছেলেদের বাইরে যেতে আমি দেব না। আপনি যান ভূতনাথবাবু।

ভূতনাথবাবু চলে গেলেন। চন্দ্রবাবু ব্রজবাবুকে বললেন—আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে ব্রজবাবু।

—বলুন।

—এখন নয়। পরে। ইস্কুল আওয়ার্সের পরে।

—বেশ।

হঠাৎ চন্দ্রবাবু বললেন—এ ইস্কুল অনেক কষ্টে গড়ে তুলেছি ব্রজবাবু। অনেক যত্নে। অনেক আশা নিয়ে।

চন্দ্রবাবুর চোখে জল টলমল করছে।

ব্রজবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফুটবল ম্যাচ শেষ পর্য্যন্ত চৈতন্য ইন্‌ষ্টিট্যুশনের মাঠেই খেলা হ'ল। রামপুরহাটের দল এর আগে অনেক ম্যাচ খেলেছে। ওখানে অনেক দিন থেকেই একজন জিমন্যাষ্টিক টিচার আছেন, তিনি পাকা ফুটবল খেলোয়াড়। ছেলেদের হয়ে তিনি ওদিকের ফুলব্যাক হয়ে খেললেন; ভূতনাথবাবুও চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের হয়ে গোলে খেললেন। রেফারী হলেন ব্রজবিহারী বাবু। খেলার দিন দুপুরবেলা থেকেই ঘনঘটা করে মেঘ করে এসেছিল, খেলার শুরু থেকেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। সকলেই ভেবেছিল—রামপুরহাট চার-পাঁচ গোলে বিল্বগ্রামকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ছেলেরা গোড়া থেকেই চমৎকার খেলতে লাগল। বিশেষ করে দোনো ভাইয়ের খেলায় রামপুরহাট বিব্রত হয়ে পড়ল। দোনো ভাই—উমাপদ আর গৌরীপদ, দুই সহোদর, ওরা অবশ্য চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের তৈরী খেলোয়াড় নয়, ওরা দু'জনেই ম্যাট্রিক ফেল করে নতুন সেশনে অর্থাৎ মাসতিনেক আগে এসে ভর্ত্তি হয়েছে। তবে ওদের পৈতৃক বাসভূমি এই বিল্বগ্রামেই। ওদের বাপ উকীল, এই জেলারই

চৌকি আদালতে প্র্যাকটিস করেন, ওরা সেখানেই পড়ত এবং সেইখানেই খেলা শিখেছে। দুই ভাই—দু'দিকের ইন্‌ম্যান হিসেবে খেলছিল। উইংসম্যান খেলছিল—বাঁদিকে শিবনাথ, ডান দিকে ধ্রুব। ধ্রুবর দাবি শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন ভূতনাথবাবু। তবে দু'ভাই ছাড়া ফরওয়ার্ড লাইনে সবাই বাহুল্য হয়ে উঠেছিল। এ বল ধরে ওকে দেয়, ও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে ফের ওকে দেয়—একেবারে উঁচু করে সকলের মাথা পার করে এবং নির্ঘাত গোলের মুখে ফেলে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেণ্টার ফরওয়ার্ডের পায়ের কাছে বল ফেলে দিতেই সে দিলে গোলে ঢুকিয়ে। রামপুরহাটের গেমস্ টিচার পাকা লোক, দুই আর দুই আঙুল গুনে চার হিসেব করতে হয় না তাঁকে খেলার বিষয়ে, চারে উপনীত হন তিনি মুহূর্তে, সেণ্টার ফরওয়ার্ডের পায়ের কাছে বলটা পড়তেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতখানা তুলে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—অ—ফ—সা—ই—ড।

তাঁর মতলব ছিল দুটো। একটা—চীৎকার শুনে সেণ্টার ফরওয়ার্ড বালকটি ভড়কে যাবে। দ্বিতীয়—রেফারী বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বালকটি ভড়কাল না; হুইসিলও পড়ল গোলের সঙ্গে সঙ্গেই। চীৎকার এবং গোল দুটোই একসঙ্গে হয়ে গেল। গেমস্ টিচার তখনও হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি, ব্রজবাবুর চোখে হাই-পাওয়ার চশমা, জল পড়ে সব ঝাপসা হয়ে গেছে তাঁর। তিনি ছুটে এলেন গোলের কাছে, গেমস্ টিচার আবার চীৎকার করে উঠলেন—অ-ফ-সা-ই-ড।

ব্রজবাবুই ভড়কে গেলেন। এবং গোল না দিয়ে দিলেন অফসাইড ফ্রি-কিক। ওদিকে তার প্রতিবাদ করতে ভূতনাথবাবু এলেন গোল ছেড়ে এগিয়ে।—নট অফসাইড। নট অফসাইড। কিন্তু তখন রামপুরহাটের গেমস্ টিচার ফ্রি-কিক মেরে দিয়েছেন। বলটা গিয়ে পড়ল প্রায় এ-পাশের গোলের কাছে। এবং বিস্মিত চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ছেলেরা সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠতে-না-উঠতে গোল হয়ে গেল।

এর পর আর গোল হ'ল না কোন পক্ষেই। চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশন দমে গিয়ে শুরুতে যে উৎসাহে আরম্ভ করেছিল, সে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে আর খেলতে পারলে না।

চন্দ্রবাবু মনে মনে খুশী হলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর ছেলেরা প্রথম গোল দিতেই চমকে উঠেছিলেন তিনি। গুড গড! হ'ল কি? এ বেটারা করলে কি? গোল দিয়ে জিতে গেল? সর্বনাশ! এর পর এদের আটকানো যে দায় হবে! ভাবতে ভাবতেই পাল্টা গোল! তিনি বাঁচলেন। মনের মধ্যে দুঃখও হ'ল। একেবারে দুঃখ হ'ল না বললে আত্মপ্রতারণা করা হবে। বিশেষ করে জিতে হেরে যাওয়া হ'ল যে। ফোর্থ মাস্টার কেষ্টবাবু এবং হেডপণ্ডিত তাঁর পাশেই বসেছিলেন—তাঁরা মনের আবেগে বলে উঠলেন—এটা কি হ'ল? ছি—ছি—ছি! ব্রজবাবু এটা কি করলেন?

রামজয় বললেন—কি হ'ল?

চন্দ্রবাবু বললেন—আমাদের ছেলেরা হারল।

—অন্যার্থ? মিনিংটা কি? ওই বংশখণ্ড দুটির মাঝখান দিয়ে বলটা প্রবেশ করাতে

পারলেই গোল, ইতি প্রবাদ। নাকি গো কেষ্টবাবু?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তবে? আমাদের ছেলেরা তো প্রথম বলটি ওদের গোলে ঢুকিয়ে দিলে। তারপর তো ওরা ঢোকালে। তবে আমরা হারলাম কেন?

—আমাদের ছেলেদের গোলটা গ্রাহ্য হ'ল না।

—কেন? এ তো বিচিত্র ন্যায়শাস্ত্র। বলটা বাঁশদুটোর মধ্য দিয়ে ঢুকে রশিখানেক বেরিয়ে চলে গেল; সকলেই গোল গোল করে সোরগোল তুললে—সেটা কি তা হ'লে বলছেন—মায়া?

—মায়া নয়;—অফসাইড হয়েছে।

—অফসাইড? সেটা কি?

—সেটা হ'ল—গোলটা বেআইনী হয়েছে। যেমন ধরুন, বল পায়ে মারতে হয়, হাতে মারলে বেআইনী হয়, হ্যাণ্ডবল হয়; তেমনি হয়েছে।

—কি বিপদ, তেমনটা কেমন তাই বলুন।

—ঠিক জানি না—তবে শুনেছি যখন বলটা গোলে মারলে আমাদের গোবর্দ্ধন—তখন ওর সামনে ওই গোলকিপার সমেত তিনজন রক্ষক থাকা উচিত ছিল, তিনজনের কম হলেই তখন অফসাইড হবে।

—অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়মভঙ্গ হ'ল; নিরস্ত্র অরাতির প্রতি আক্রমণ গোছের! কিন্তু তিন জনই তো ছিল। আমি তো স্পষ্ট দেখেছি।

—রেফারী দেখতে পান নি।

—ব্রজবাবু!

—হ্যাঁ।

—একে হ্রস্বদৃষ্টি, তার উপর চশমায় জল পড়েছে। ওঁর চোখে তো সব ধোঁয়া।

—তা হলে কি হবে। ওঁর ওই ধোঁয়া দেখাই সত্য।

চন্দ্রবাবু হেসে বললেন—তা বেশ হয়েছে। ওরা ভিজিটর্স। ওদের একটু সম্মান করা ভালই হয়েছে। আমাদের ছেলেরা গোল তো করেছে। সেটা গ্রাহ্য হোক আর না-হোক। তা ছাড়া—।

চুপি চুপি বললেন—ভাল হয়েছে। জিতলে ওরা আর বাগ মানত না। ধরে বসত আরও ম্যাচ খেলব। এখানে যাব, ওখানে যাব। ব্রজবাবুও এতে দমবেন খানিকটা। ভাল হয়েছে।

রাত্রে সেদিন রামপুরহাটের ছেলেরা রইল এবং এখানকার ছেলেদের সঙ্গে প্রায় একটা পর্য্যন্ত হৈচৈ করলে। চন্দ্রবাবু তাঁর বাসার বারান্দায় বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং সজাগ কান পেতে বসে রইলেন। এসব মেলামেশার এই উচ্ছ্বাস-উল্লাসের ভিতরের চেহারা তিনি জানেন। সিদ্ধির নেশা থেকে অনেক কিছু কদর্য্যতা এই উল্লাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি এসব ভালবাসেন না।

অন্ধকারে বসেছিলেন তিনি। কেষ্ট আলো দিতে এসেছিল, কিন্তু তিনি সেটা সরিয়ে নিতে বলেছিলেন।

ব্রজবিহারীবাবুর ঘরে মজলিস বসেছে রামপুরহাটের গেমস্ টিচারকে নিয়ে। গেমস্ টিচারটির নাম এ জেলায় ছেলেদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। ছেলেরা খুব ভালবাসে লোকটিকে। লোকটির অবশ্য সদ্‌গুণ আছে তা স্বীকার করতেই হবে। তিনি অকৃতদার। ঘরবাড়ী আছে, বাপ-মা আছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ খুব নিবিড় নয়। মাইনে যা পান তার অধিকাংশটাই খরচ করেন ছেলেদের জন্যে। ছেলেদের ইস্কুলের মাইনে দেন, জামাকাপড় কিনে দেন, অসুখবিসুখে, চিকিৎসায় খরচ করেন। নিজে একটা মেস করেছেন—নাম দিয়েছেন—রোজভিলা মেস। সেখানে নিজের প্রিয় ছেলেদের নিয়ে থাকেন। যত দুর্দ্দান্ত ছেলে ওঁর প্রিয়। পড়াশুনায় চেয়ে—ডাম্বেল, মুগুর, বারবেল এই সবের সমারোহ বেশী। লোকটি আশ্চর্য্য, এই দিকে আশ্চর্য্য যে, দুর্দ্দান্ত ছেলের সঙ্গে কতকগুলি ভাল ছেলেও ওঁর মেসে থাকে। যাদের পৈতৃক অবস্থা ভাল, যারা বেশী টাকাকড়ি খরচ করে তারাও থাকে, আবার খুব গরীবের ছেলেও থাকে। খুব দুর্দ্দান্ত ক্রীড়াপ্রিয় গুণ্ডাগোছের ছেলেরা থাকে, আবার খুব ভাল ছেলেও থাকে। গরীব যারা তারা মেসের কাজকর্ম্ম করে দেয়, কেউ খাতা রাখে, কেউ বাজার করে, কেউ অন্য কিছু কাজ করে, এতেই তাদের মেসচার্জ্জ হয়ে যায়। আরও কতকগুলি খেয়ালী কাণ্ড আছে ওঁর—মধ্যে মধ্যে দু'তিন দিন ছুটি পেলেই ছেলেদের নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়েন,—সাইকেল নিয়ে দুমকা নয়ত নলহাটি নয়ত তারাপীঠ কি বীরচন্দ্রপুর কি দ্বারকা নদীর ধারে ধারে অনেক দূর ঘুরে আসেন। রামপুরহাটে কারুর বাড়ীতে কঠিন রোগ হলে ছেলেদের নার্সিং করতে পাঠান। কোথাও কোন মেলা হলে ছেলেদের ভলান্টিয়ারি করতে পাঠান। তাতে মধ্যে মধ্যে মারপিটও হয়। এর কিছু ভাল, কিছু মন্দ। চন্দ্রবাবু মনে করেন মন্দটাই বেশী। অধিকারভেদ বোধটা এযুগে উঠে যাচ্ছে। ছেলেরা ছেলে; আগে তাদের ভালত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—তার পরে তাদের ভাল কাজে নিয়োগ করতে হবে। তার আগে ভাল কাজ করতে দিলে তারা যদি ভাল কাজকে মন্দ করে ফেলে তবে সে দোষ অর্শাবে তোমাকে।

রাত্রি একটার সময় চন্দ্রবাবু আর থাকতে পারলেন না। ছেলেরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত্রি যত বাড়ছে ততই যেন ওদের উল্লাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লাস নয় উচ্ছৃঙ্খলতা। বারোটার পর থেকে এখানে-ওখানে সিগারেট বিড়ির আগুন জলতে দেখতে পাচ্ছেন। ওরা ভেবেছে মাষ্টারেরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে তো ভেবেছেই এ কথা। জীবনে কয়েক দিন ছাড়া দশটার বেশী তিনি জেগে থাকেন নি। ওরা জানে তাঁর খুব ভয়। তিনি ভীতু লোক। ওরা বলে ভূতের ভয় তাঁর। ওরা জানে না, ভূতের ভয় তাঁর নেই। সেই যে বাল্যকালে তাঁর বাবা তাঁকে এই বিষগ্রামের মাইনর ইস্কুলে ভর্ত্তি করে মিত্রকুলপুরে বুড়ো মিত্তির-বাড়ীতে দু'বেলা ভাতের জন্য রেখেছিলেন, সেই সময় থেকে ভূতের ভয় তাঁর কেটে গেছে। যে ঘরে তিনি

থাকতেন সেই ঘরের পাশে ছিল মস্ত বটগাছ, লোকে বলত—ভূত আছে; প্রথম প্রথম সামান্য ভয়ে হৃৎকম্প হ'ত তাঁর। সারারাত্রি জেগে বসে থাকতেন। তা থেকেই ভূতের ভয় কেটে গেছে। ভূতের ভয় তাঁর নেই। তবে ভয় তাঁর আছে। ভয়—দুর্দান্ত ছেলেকে ভয়। এখানকার—এই বিল্বগ্রামের পড়ন্ত জমিদারবংশের দুর্দান্ত ছেলেদের নিয়ে প্রথম জীবনে তাঁকে কারবার করতে হয়েছে। সে সব ছেলে মারাত্মক ছেলে। প্রথম বছরকয়েক সে অনেক দৈত্যের দুরন্তপনা থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। তখন তিনি গরমের সময়েও ঘরের জানালা বন্ধ করে শুতেন। কারণ ভয় হ'ত—কোন পাষণ্ড ছাত্র হয়ত জানালা দিয়ে খোঁচা মেরে দিয়ে যাবে। সেই ভয়টাই জীবনে বাসা বেঁধে রয়ে গেল। ছেলেদের মধ্যে তাঁর ভয়ের কথাটা প্রবাদের মত বছরের পর বছর পুরনো ছাত্রের কাছ থেকে নূতন ছাত্রদের কাছে প্রচারিত হচ্ছে।

—বাবা। ঘরের ভিতর থেকে বঙ্গবালা ডাকলে।

—কি বলছ?

—রাত্রি যে অনেক হ'ল বাবা। মা বলছে—।

—চুপ কর।

বঙ্গবালা মায়ের নাম করতেই চন্দ্রবাবু লজ্জা পেলেন। এদের মনে থাকে না এটা নিজের গ্রাম নয়, বাড়ী নয়। এটা ইস্কুল-কম্পাউণ্ডের মধ্যে বাসাবাড়ী। ছি! ছি! ছি! বঙ্গবালা এইটুকুতেই চুপ করে গেল। কিন্তু ভিতর থেকে দরজার শিকলনাড়ার শব্দ উঠতে লাগল। বঙ্গবালার মা ইশারা জানিয়ে ডাকছে। রুষ্টভাবে গলা ঝেড়ে ইশারায় অসন্তোষ জানিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। ছেলেদের আর সাবধান না করলে নয়। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ সহ্য করেছেন শুধু ওই আগন্তুকদের জন্য। ওরা অন্য ইস্কুলের ছেলে। ওদের সঙ্গে ওদের শিক্ষক রয়েছে। তিনি হয়ত অপমান বলে মনে করতে পারেন। বারান্দা থেকে নেমে চন্দ্রবাবু উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—কেষ্ট! কেষ্ট!

তারপরই ডাকলেন—নকুলবাবু!

বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নকুলবাবু। ছেলেরা যাঁকে বলে—ডেভিড হেয়ার।

সাড়া কারুরই পাওয়া গেল না। তবে বোর্ডিং-প্রাঙ্গণের এখানে-ওখানে যে সব সিগারেট বিড়ির আগুন জোনাকির মত জ্বলছিল সেগুলি নিভে গেল। কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। চন্দ্রবাবু এবার ডেকে বললেন—ওয়েল—বয়েজ; অনেক রাত্রি হয়েছে। ওয়ান ও' ক্লক। নো মোর ফান্ প্লীজ! যাও, যাও সব শুয়ে পড়! শুয়ে পড়।

—মাষ্টার মশাই!

ব্রজবিহারীবাবুর কণ্ঠস্বর। ব্রজবিহারীবাবু এখনও জেগে রয়েছেন? আপনার বারান্দা থেকে নেমে এলেন দীর্ঘাকৃতি ব্রজবিহারী। তার সঙ্গে ও কে? ও! রামপুরহাটের গেমস্ টিচার।

—আপনি জেগে আছেন? আমি দেখলাম—ছেলেরা একটু বেশী রকম মেতেছে।

এখানে-ওখানে সিগারেট-বিড়ির আগুন জ্বলছে। সেই জন্যে—

—আজ ওরা একটু বেশী করবে। যে হয় ত সিগারেট খায় না, সেও হয় ত খেয়ে বসবে। বললেন রামপুরহাটের গেমস্ টিচার।

—দ্যাটস ব্যাড!

—থাক না, মনের মধ্যে শাসন করে বেঁধে রাখা মন্দ প্রবৃত্তিগুলো এক রাত্রির উল্লাসের মধ্যে খানিকটা বেরিয়ে যাক না।

চন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কি বলছেন ইনি? মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন, তিনি, তার পর বললেন—ডু ইউ রিয়্যালি মীন ইট?

তার উত্তরে রামপুরহাটের গেমস্ টিচার যে কথা বললেন তাতে চন্দ্রবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। ভদ্রলোক বললেন—যারা সিগারেট খাচ্ছে তারা বেশীর ভাগ আমার ওখানকার ছেলে। ওরা খায় আমি জানি। আমি বারণ করে দিয়েছি ওদের—ওরা যেন আপনার ছেলেদের সিগারেট বিড়ি খেতে অনুরোধ না করে। তবে আপনাদের যারা খায় তাদের সম্পর্কে কি করবে তারা? তারা ঘরে দরজা বন্ধ করে খেত, আজ বাইরে খাচ্ছে। সরস্বতী পুজোর মত।

ব্রজবাবু বললেন—আমি ওদের শুয়ে পড়তে বলছি।—লম্বা পা ফেলে অগ্রসর হলেন ব্রজবিহারীবাবু।

—দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি। ব্রজ!

চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু। 'দাঁড়াও, ব্রজ?' পরস্পরের পরিচিত এঁরা? না আজই এক দিনের আলাপে 'তুমি তুমি' হয়ে গেল পরস্পরের কাছে?

তিনি আর দাঁড়ালেন না। সে কথা ব্রজবাবুকে জিজ্ঞাসা করবার সময় এ নয়। এসে বাসার দরজায় কড়া নেড়ে ডাকলেন—বঙ্গ! বঙ্গবালা!

দরজা খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই স্ত্রী বললেন—আমাদের ছেলেরা ভাল খেলেও হেরে গেল; সবাই বলছে, ব্রজবাবু ভুল করে হারিয়ে দিয়েছে। তোমার খুব দুঃখ হয়েছে নয়?

রূঢ় ভাবে চন্দ্রবাবু বললেন—না। একবিন্দু দুঃখ হয় নি আমার!

—তবে সন্ধ্যেবেলা থেকে এমন করে চুপচাপ অন্ধকারে বসে আছ?

—সে তুমি বুঝবে না। বলবার কথাও নয়।

বলেই তিনি শুয়ে পড়ে পাতলা চাদরখানা গায়ে টেনে নিলেন। সন্ধ্যেবেলা পর্য্যন্ত প্রবল বর্ষণের পর মেঘ কেটেছে কিন্তু হাওয়া বইছে। শেষ রাত্রির আর দেরি কোথায়? দেড়টা বাজে। ছ'টার আগেই ভোর হবে। রাত্রি তিনটেয় রামপুরহাটের দল রওনা হবে।

দিনকয়েক পরের কথা। এক সপ্তাহও পার হয় নি ম্যাচের পর। বুধবার দিন ম্যাচ খেলা হয়েছে তার পর—সোমবার বেলা সাড়ে দশটা। ব্রজবিহারীবাবু শনিবার দিন বাড়ী

গেছেন। দশটার মধ্যেই এসে পড়বেন। স্টেশনেই তাঁর বাই-সাইকেলটা থাকে, ট্রেন থেকে নেমে বাই-সাইকেলে এসে—একেবারে ইস্কুলে ঢোকেন। ইস্কুল বসার ঘণ্টা পড়ছে। ছেলেরা বোর্ডিঙের উঠানে দাঁড়িয়ে স্তোত্রপাঠ করছে—

ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

চন্দ্রবাবু দাঁড়িয়ে আছেন—ইস্কুলের সিঁড়ির উপর তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিতে। এখানকার ইস্কুলে যেদিন থেকে তিনি হেডমাষ্টার হয়েছেন সেইদিন থেকেই তিনি ওই স্থানটিতেই দাঁড়িয়ে আসছেন। কিন্তু মুখখানা তাঁর অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। থমথম করছে যেন।

সব মাষ্টারেরাই সেটা লক্ষ্য করলেন। এবং বিস্মিত হয়েই পরস্পরের দিকে তাকালেন। ব্যাপার কি? কেষ্টবাবু ইশারায় হেডপণ্ডিতমশায়কে বললেন—দেখেছেন? ঘাড় নাড়লেন রামজয় পণ্ডিত—দেখেছি। একটু সরে এসে কেষ্টবাবু বললেন—জিজ্ঞাসা করুন না।

—না। বন্ধু হলেও পদ মেনে চলা ভাল। মেজাজ আমার ভাল ঠেকছে না। সেকেণ্ড মাষ্টারকে বলুন। সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনবাবু সুপুরুষ তরুণ, কিন্তু তরুণ হলেও হাল্কা মানুষ নয়। ওজন আছে। মাখনবাবুও লক্ষ্য করেছিলেন চন্দ্রবাবুর ভাবান্তর। তিনি বললেন—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? উনি দরকার হলে নিজেই বলবেন। না বলেন, বুঝতে হবে ব্যাপারটা ওঁর পারসন্যাল।

ইস্কুল যথারীতি বসল; আপিস-রুমে মাষ্টারমশায়রা হাজিরা বইয়ে সই করে আপন আপন প্রয়োজনীয় বই, খাতা, চক নিয়ে ক্লাসে চলে গেলেন; চন্দ্রবাবু কাউকেই কিছু বললেন না, গম্ভীর ভাবে বসে রইলেন।

ঠিক এই সময়টিতেই সশব্দে বাই-সাইকেলের বেল বাজিয়ে ব্রজবাবু এসে ঢুকলেন ইস্কুল কম্পাউণ্ডে। একেবারে এসে নামলেন আপিস-রুমের সিঁড়িতে।

—গাড়ীটা আজ লেট ছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন ব্রজবিহারীবাবু।

চন্দ্রবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আমি বসে আছি। ভেরী এ্যাংসাস্‌লি ওয়েটিং ফর ইউ।

উৎকণ্ঠিত হলেন ব্রজবিহারীবাবু।—কি ব্যাপার? এনি ব্যাড নিউজ?

—ইয়েস। আপনি স্নান করে খেয়ে আসুন।

ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল ব্রজবাবুর। বললেন—টিফিনের পরের পিরিয়ডে আমার ক্লাস নেই। স্নান খাওয়া তখন করব। ব্যস্ত নই তার জন্য।

চন্দ্রবাবু বিনা ভূমিকায় বললেন—আমি এই সব ম্যাচ খেলার বিরোধী চিরদিন। ছেলেদের ডিসিপ্লিন নষ্ট করে দেয়। মোর দ্যান দ্যাট। সি দ্য রেজাল্ট।

একখানা খামের পত্র তাঁর চাপকানের পকেট থেকে বের করে ফেলে দিলেন। চমৎকার একখানি রঙীন খাম। একটু সুবাসিতও বটে। খামের উপর নাম লেখা রয়েছে কমলেশ মুখোপাধ্যায়ের। কমলেশ সেকেণ্ড ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্য-

বাবুর দৌহিত্র। গিন্নীমায়ের খুব আদরের নাতি। ব্রজবাবুর প্রাইভেট স্টুডেন্টও বটে কমলেশ।

ব্রজবাবু চিঠিখানা বের করলেন। বের করবার সময় একবার তাকালেন চন্দ্রবাবুর দিকে। চন্দ্রবাবু বললেন—আমি খুলেছি। আমার সন্দেহ হয়েছিল।

রামপুরহাটের একটি ছেলে কমলেশকে পত্র লিখেছে। ছেলেটি এখানে খেলতে এসেছিল। কমলেশের সঙ্গে আলাপ করে গেছে। তার পর এই চিঠি। চিঠিখানা প্রায় একখানি গীতিকাব্যের একটি অধ্যায়। প্রিয়তম সম্বোধন করে, বালকটি তার হৃদয়োচ্ছ্বাস ঢেলে পৃষ্ঠা ছয়েক এমন এক পত্র লিখেছে যাকে প্রেমপত্র বলা চলে। সে নাকি এখান থেকে যাওয়ার পর থেকে জীবনে দেউলিয়া হয়ে গেছে। তার সুখ হারিয়েছে, জিহ্বার স্বাদ হারিয়েছে, নয়নের নিদ্রা হারিয়েছে, আরও অনেককিছু হারিয়েছে বুকে তার অনন্ত হাহাকার; সে—"উত্তাল তরঙ্গমালা—অনন্ত হাহাকার,—হু-হু করা বালু-বেলাভূমি"—ইত্যাদি অনেক বাছাই বাছাই সুন্দর শব্দ সাজিয়ে পত্র রচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যের সেকালের খুব নামকরা গদ্যকাব্য "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে"র সেই মুখখানির মতই উচ্ছ্বাসময়।

ব্রজবাবু খিলখিল করে হেসে উঠলেন চিঠিখানা পড়ে। চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—আপনি হাসছেন ব্রজবাবু? আপনি হাসছেন?

ব্রজবাবু অপ্রস্তুত হলেন একটু। হাসি সম্বরণ করে বললেন—হাসব না ত কি করব বলুন? এডোলেসেন্সের পাগলামি—

—আপনি পাগলামি বলছেন?

—তা ছাড়া কি বলব? এর আর কি অর্থ হতে পারে?

হঠাৎ চন্দ্রবাবু চীৎকার করে উঠলেন—ইম্‌ময়্যাল। দিস ইজ ইম্‌ময়্যাল।

চন্দ্রবাবুর এমন আকস্মিক চীৎকারে ব্রজবাবু চমকে উঠে গম্ভীর হয়ে উঠলেন এক মুহূর্তে। এবং গম্ভীর অথচ মৃদু কণ্ঠে বললেন—আপনি আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ মাষ্টার মশাই। আপনার প্রথম এণ্ট্রান্সের ছাত্ররা আমার চেয়ে সিনিয়র, আপনি আমার থেকে অনেক বেশী দেখেছেন। ছেলেবয়সের এই রোমান্টিসিজম একি নতুন? না—চিরকাল আছে? আমি শুনেছি—চৈতন্যবাবুর বাড়ীরই একটি ছেলেকে এই ধরনের রোমান্টিসিজমের জন্য ইস্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। বাট্—ওই রোমান্টিসিজমের জন্যই তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে যায় নি। তিনি কৃতবিদ্য হয়েছেন, আমাদের ইস্কুলের একজন মেম্বার তিনি। ইজ ইট নট?

চন্দ্রবাবু যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলেন—এগুলিকে এত হাল্কা করে দেখছেন আপনি?

—না। হাল্কা নিশ্চয়ই করতে চাই না।

—করছেন। ব্রজবিহারীবাবু আপনি বুঝতে পারছেন না। বেশী বৈজ্ঞানিক, বেশী প্র্যাকটিক্যাল হতে গিয়ে তাই করছেন। যা ইম্‌ময়্যাল তা চিরকাল ইম্‌ময়্যাল—তার কোন কৈফিয়ত নাই।

—নিশ্চয়ই নাই। আপনি ইঙ্গিতে যা বলছেন তা আমি বুঝেছি। প্রথম থেকেই

বুঝেছি। তাকে ইম্‌মর‍্যাল কেন—তাকে আমি পাপ বলি, ভাইস্ বলি। কিন্তু এই পাপ, এই ভাইস্ আপনার ইস্কুলে কি এই নতুন না এই একটিমাত্র? জীবনের আদিকাল থেকে—বোধ করি পৃথিবীর প্রথম ছাত্রাবাস থেকে এ পাপের জের চলে আসছে। এ পাপকে দূর করবার চেষ্টাও হয়ে আসছে। কিন্তু দূর করা যায় নি। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পাপ আছে মাষ্টারমশাই, সেই পাপের সঙ্গে যুদ্ধ অনেক হয়েছে। পাপকে মারলে মরে না। তাকে গলাতে হয়।

আপিস-রুমের দরজায় গলার সাড়া পাওয়া গেল। রামজয় পণ্ডিতের গলার সাড়া। পণ্ডিত এসে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—আমি আর থাকতে পারলাম না মাষ্টারমশাই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। এই পাশের ঘরেই সেকেণ্ড কেলাসে পড়াচ্ছিলাম। বন্ধ জানালার ওপাশ থেকেও কথাগুলো শুনতে পেয়েছি। যে পাপের কথা বলছেন সে পাপ সংস্কৃত শিক্ষার আমলে ছিল না। টোলে এখনও এ পাপ নাই। এ পাপকে সহ্য করলে সর্ব্বনাশ হবে। পুরাণের ব্রহ্মচারী ছাত্রদের কথা পড়েও আপনি এই মন্তব্য করলেন—তারই প্রতিবাদ করছি আমি।

ব্রজবাবু মুচকে মুচকে হাসছিলেন। রামজয় পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—আপনি নাস্তিক!

ব্রজবাবু এবার একটু সশব্দে হেসে উঠলেন, বললেন—নাস্তিক ঠিক নই পণ্ডিতমশাই, তবে আপনার মত আস্তিক নই। সংস্কৃত শিক্ষার আমলে পুরাণের আমলে—ওই পুরাণে যাদের কথা আছে তাদের কথাগুলিকে সার্ব্বজনীন নজীর ধরে নিয়ে যদি বলেন—এ পাপ ছিল না তবে মানব না। যাঁদের কথা আছে তাঁরা নমস্য, তাঁদের মধ্যে পাপ ছিল না এ মানি। এঁরা ত কয়েকজন মাত্র। কত কোটি কোটি ছাত্রের কথা লেখা নেই। তারা সবাই এ পাপে পাপী ছিল তাও বলব না। তবে একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে যে ছিল এতে সন্দেহ নেই। একালে আপনার ওই পুরাণের পুণ্যশ্লোক ছাত্রদের মত ছাত্র কি নেই? নিশ্চয় আছে। আমি দেখেছি।

চন্দ্রবাবু এক বিচিত্র মন নিয়ে ব্রজবিহারীবাবুর কথা শুনছিলেন।

ব্রজবিহারীবাবু বললেন—আমি চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জনকে দেখেছি। তারা আপনার পুরাণের উতঙ্কের চেয়ে কম পবিত্র ব্রহ্মচারী নয়। কম তেজস্বী নয়।

রামজয় প্রশ্ন করলেন—কে তারা? এ সব কি বলছেন আপনি?

—ঠিক বলছি। বালেশ্বরে ইংরেজের পুলিসের সঙ্গে যারা বাঘা যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে মরল তাদের আমি দেখেছি।

তার পর একটু হেসে বললেন—আর এক জনকে সেদিন দেখেছেন। এসেছিলেন। রামপুরহাটের ওই গেমস্ টিচারটি—

—উনি—

—যা ভাবছেন বা ভয় করেছেন তা ঠিক নয়। ওদের দলের লোক ঠিক নন, তবে

একেবারেই যে সংস্রব নেই তাও নয়। জানাশুনো আছে। ভাল ছেলে পেলে তেমন মতি দেখলে ওদের সঙ্গে যোগাযোগও করে দেন। তবে ওঁর মিশন হ'ল—যাদের আমরা মন্দ ছেলে বলি—তাদের ঠেলে না-ফেলে কাছে টেনে নিয়ে ভাল করে তোলা। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল অনেক দিন আগে। দীর্ঘদিন পর দেখা হ'ল। দেখা হওয়ার পর পরস্পরকে চিনতে পারলাম।

রামজয় পণ্ডিত হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন, শুধু বলে গেলেন—চললাম মাষ্টারমশাই। কেলাসে বাপধনেরা চালকহীন জন্তুর মত গুঁতোগুঁতি করছে। জানালার ধারে সব ভিড় করে এসে শুনছে কান পেতে।

ব্রজবিহারীবাবু বললেন—রাগ করলেন আমার উপর?

—উহুঁ। তবে শক্ত কথা বলেছেন, পরিপাক না করে এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে বেকুব হয়ে যাব। শক্ত কথা বলেছেন।

রামজয় চলে যেতেই ব্রজবাবু বললেন—জীবনবাবুর কাছে শুনলাম এমনি ছেলে একটি আপনার এখানে বারকয়েক এসেছিল। আপনার ইস্কুল খুঁজে গিয়েছে। তার নাম নলিনী বাগচী। এই সেদিন সে ঢাকায় মারা গেছে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। উত্তেজিত হয়ে হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিল, পুলিস নানা প্রলোভন দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার নামটা বল। ভারতবর্ষ ত স্বাধীন হবে, তোমার নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। সে শুধু বলেছিল—ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি প্লীজ। লেট মি ডাই ইন পীস। লেট মি ডাই।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন চন্দ্রবাবু।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—ব্রজবাবু, আপনিও কি—

—না। সে সাধ্য কোথা? তবে শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি এই পর্য্যন্ত।

—আমার একটা সন্দেহ ছিল—

—জানি। সেটা অবশ্য স্পাই বলে।

চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

—কি করে জানলেন আপনি?

—আমাকে রতনবাবুই বলেছেন। কেষ্টবাবুদের বাড়ী গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে। পরিচয় হতেই পরস্পরের জানা এমন লোকের নাম বেরিয়ে পড়ল যে পরস্পরের অন্তরঙ্গ হতে বিলম্ব হ'ল না। তিনিই বললেন—অজান্তে হয় ত আপনাদের অনিষ্ট করে এসেছি ব্রজবাবু। চন্দ্রবাবুকে আমি বলে এসেছি এই সব কথা।

হাসতে লাগলেন তিনি।

প্রসন্ন হাসিতে চন্দ্রবাবুর মুখ ভরে উঠল। তাঁর বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল। একটু পর হঠাৎ বললেন—আপনি বলছেন এ নিয়ে কমলেশকে কিছু বলব না? বলা উচিত নয়?

—আপনি যদি বলেন—তবে আমি তাকে বলব। কমলেশ লেখাপড়ায় ভাল ছেলে—

তার মধ্যে ভাল অনেক কিছু আছে। সেই জন্যেই প্রকাশ্যে তাকে আমি শাসন করে তাকে লজ্জিত করতে চাই না। তাতে ফল খারাপ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। নইলে আপনি ত জানেন—আমার বেতমারা ত দেখেছেন। ছেলে যেখানে পচে গেছে বা জানব যে নিশ্চয় পচবে—সেখানে আমি নির্দ্দয়। এই ত সেদিন মুরলীকে যে ভাবে কথা বলেছি সিগারেট খাওয়ার জন্য—শুনেছেন, দেখেছেন।

—বেশ আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম।

উঠলেন চন্দ্রবাবু এতক্ষণে। সহজ প্রসন্ন মুখে ক্লাস থেকে ক্লাসে ঘুরতে লাগলেন। ইস্কুলে কিন্তু এর মধ্যেই একটা গুঞ্জন উঠেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কমলেশের শাস্তিটা কিন্তু চাপাই পড়ে রইল কয়েক দিন। ব্রজবাবুই তার ভার নিয়েছেন। ইতিমধ্যে এসে পড়ল পূর্ণিমা। পূর্ণিমায় চন্দ্রবাবুর বাসায় সত্যনারায়ণ সেবা হ'ল।

সমারোহ করেই সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন চন্দ্রবাবু। নতুন বাসায় প্রথম একটি সামাজিক আয়োজন। একটু ভাল করে না করলে হবে কেন? তাঁর চেয়েও উৎসাহ বেশী সত্যবতীর। তাঁর জীবনে বাসায় বাস করার কল্পনা তিনি করেন নি কোনদিন। ছোট্ট পল্লীগ্রামটির মধ্যে একঘেয়ে জীবন চলে যাচ্ছিল একটি শীর্ণকায়া নদীর মত, তাতে তাঁর আক্ষেপও অবশ্য ছিল না। বাসা যখন হ'ল তখন প্রথমটায় শঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাসায় এসে উৎসাহিত হয়েছেন প্রথম দিন থেকেই। এখানকার তিনি যেন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সে কর্ত্তৃত্ব করবার পথ তিনি আবিষ্কার করলেন রামজয় পণ্ডিতের দেওয়া পরামর্শের মধ্যে। সব মাষ্টারেরা আসবেন, মাষ্টারদের মধ্যে যাঁরা এখানকার লোক তাঁদের স্ত্রীরা আসবেন, ছেলেরা সব আসবে, তাঁর আঙিনায় আনন্দ করবে, প্রসাদ নেবে, তাঁকে মা বলে ডেকে যাবে, প্রণাম সবাই করতে আসবে কিন্তু ব্রাহ্মণ বৈদ্য ছেলেদের প্রণাম তিনি নেবেন না, বাকী কায়স্থ থেকে সুরু করে আর সকলেরই প্রণাম তিনি নেবেন, আশীর্ব্বাদ করবেন। সেই উৎসাহে চন্দ্রবাবুর আয়োজনের ফর্দ্দ তিনি বাড়িয়ে দিলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও বেড়ে বেড়ে শেষ পর্য্যন্ত দেড় শ' ছাড়িয়ে গেল। আমের সময় চলে গেছে, কাঁঠালটা তখনও আছে; চন্দ্রবাবুর গ্রাম অঞ্চলে কাঁঠাল বেশ ভালই হয়, ভাল খাজা কাঁঠাল আনালেন, তার সঙ্গে দুধ কলা, মিষ্টি এবং ময়দা গুলে উপাদেয় আটার প্রসাদ তৈরি হ'ল। তার সঙ্গে লুচি, সুজির পায়েস, তালের বড়া এবং এর উপর একটা করে খাস বালুসাই আর ছানাবড়া।

বোর্ডিঙে ছেলের সংখ্যা আশীর উপর, মাষ্টারমশায়েরা এগার জন, এ ছাড়া বিষগ্রামের যে সব ছেলে ইস্কুলে পড়ে, বোর্ডিঙে থাকে না, তারাও তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন; গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোককেও বলা হয়েছিল।

রামজয় স্ত্রী এবং কন্যাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছেন। রামজয়ের স্ত্রী এবং কন্যা সত্যবতীর পরিচিত। পাশাপাশি গ্রামের লোক, এবং চন্দ্রভূষণ ও রামজয় বাল্যবন্ধু। তবে রামজয় অনেককাল আগে থেকেই বিল্বগ্রামে বাসা করে রয়েছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, বোর্ডিঙের এই জগন্নাথ-ক্ষেত্রে আহার তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়, নিজেই বা হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাবেন কত? রামজয় বরাবরই বলেন—'যিনি খান চিনি তার চিনি যোগান চিন্তামণি'। ওই চিন্তামণিই তাঁর ব্যবস্থা করেছিলেন, চৈতন্যবাবু তাঁকে বাসা দিয়েছিলেন গ্রামের মধ্যে। তাঁর বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে নিত্যই যে রামজয়কে তাঁর গৃহিণীর প্রয়োজন। রামজয়ের স্ত্রী বিল্বগ্রামের ভদ্রসমাজে খুবই পরিচিত, বলতে গেলে ওঁদেরই একজন হয়ে গেছেন; মেয়ে বীণা বিল্বগ্রামের পাড়াবেড়ানো মেয়েদের সর্দারনী। আট দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত লোকে বলত পণ্ডিতমশায়ের মেয়েটা দজ্জালের একশেষ। কেউ কেউ বলত—গেছো মেয়ে। বীণা সত্যই গাছে চড়ে পেয়ারা আম জাম খেয়ে বেড়াত সে সময়। এখন অবশ্য বীণা বড় হয়েছে। শুধু বড়ই নয়, এরই মধ্যে ওর জীবনের চার অঙ্ক শেষ হয়ে এক অতি সুদীর্ঘ শেষ অঙ্কটির যবনিকা সদ্য উত্তোলিত হয়েছে। রামজয় বীণার বিয়ে দিয়েছিলেন বার বছর বয়সে। পনের বছরে একটি সন্তান গর্ভে নিয়ে বীণা বিধবা হয়ে রামজয়ের বাড়ী ফিরে এসেছে। বীণার বয়স এখন মাত্র সতের।

সত্যনারায়ণ পূজার আসরে বীণাই সত্যবতীর প্রতিনিধির কাজ করলে। সত্যবতীর উৎসাহ অনেক—এই ছেলেদের এবং মাষ্টারদের সামনে বের হবেন, নিজে প্রসাদ বিতরণ করবেন, কথা বলবেন, কিন্তু কাজের বেলা এতকালের অভ্যাস-করা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনখানি খাটো করতে পারলেন না, চাপা গলার কণ্ঠস্বর এতটুকু উঁচুতে তুলে স্পষ্ট করতে পারলেন না। প্রথমটায় চেষ্টা করলেন; রামজয় যখন শালগ্রাম শিলা নিয়ে এলেন তখন আসন পাতা, গঙ্গাজল ছিটানো থেকে উচ্চ কণ্ঠে বঙ্গবালা এবং কেষ্টকে কয়েকটা বরাতও করেছিলেন। রামজয়কে পিছনে রেখে তাঁর স্ত্রী হরিমতীকে এবং বীণাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বেশ সরস কৌতুকও করেছিলেন কয়েকটা। বলেছিলেন—

—ধন্যি বাবা। খুব যা হোক! বামুনের মেয়ে বামুনের গিন্নী কিনা, বিনা নেমন্তন্নে আসতে পারলে না। ভাগ্যে সত্যিনারাণ সেবা করলাম—তাই ত এলে!

বীণা বাপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—বাবাকে বল খুড়ীমা। আমি সেই প্রথম দিনই আসতে চেয়েছিলাম। তা বাবা বলেছিল—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব কাল। নিত্যি কালের মরণ নাই, বাবার সে কাল আর হ'ল না। বেলগাঁয়ে আমার সঙ্গে আবার লোক লাগে! মা বলে—লাগে। মেয়েরা নাকি অবলা অসহায়; কেউ কোন কথা বললে মরে যাবি। হরিবোল, হরিবোল! বীণা অবলা, বীণা অসহায়। আমাকে কথা বলবে লোকে? খপ করে চুলের মুঠো ধরে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় লাগিয়ে দোব না? কিন্তু কি করব, বাবার কথা ত অমান্যি করতে পারি না!

ঠিক এই সময়েই এসে ঢুকলেন চন্দ্রবাবুর সঙ্গে ব্রজবাবু, মাখনবাবু আর কেষ্টবাবু। ব্রজ-

বাবুই ভারী গলায় বললেন—কি? কতদূর কি হ'ল পণ্ডিতমশায়? সওদাগরী নৌকো ভাসিয়ে দিন শীগগির করে। সফর সেরে সত্যনারায়ণ প্রভুর মহিমা প্রকট হতে হতে তালের বড়াগুলি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মাখনবাবু সায় দিলেন—হ্যাঁ; গন্ধ যা ছুটেছে!

কেষ্টবাবু বললেন—তেলটি বড় ভাল। চমৎকার গন্ধটা ওই তেলের।

এরই মধ্যে সত্যবতীর সব সাহস, সব সঙ্কল্প ভেসে গেল। ওরা ঘরে ঢুকতেই ঘোমটাটা খানিকটা বাড়িয়েছিলেন—তার পর আবার খানিকটা আবার খানিকটা করে ঘোমটাটাকে পুরো এক হাত করে টেনে ফিস্ ফিস্ করে বীণাকে বললেন—বল পূজোর জন্যে তাড়া দিতে হবে না, যথাসময়ে হবে। সুস্থির হয়ে বসতে বল। ভোগের জন্যে বড়া তুলে রেখে—ওঁদের জন্যে ভেজে দিচ্ছে।

বলেই গিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং সমস্ত কাজ চুকে না-যাওয়া পর্য্যন্ত আর বাইরে বের হলেন না। গ্রামের বাসিন্দা কয়েক জন মহিলা এসেছিলেন—তাঁদের সঙ্গেই পূজোর আসনের সামনে গলায় আঁচল জড়িয়ে হাত জোড় করে বসে রইলেন। যা করবার—সে সবই করলে বীণা আর বঙ্গবালা। তাদের সঙ্গে বোর্ডিঙের ঠাকুর আর জনকয়েক ছেলে।

সত্যনারায়ণ পূজা এবং পাঁচালীপাঠ প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় কেষ্ট একখানা চিঠি এনে চন্দ্রবাবুর হাতে দিলে। চিঠিখানা পড়ে চন্দ্রবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন; তার পর চিঠিখানা ব্রজবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—পড়ুন।

মৌলভী জিয়াউদ্দিনের চিঠি। জিয়াউদ্দিন সাহেব লিখেছেন—বোর্ডিঙের ছাত্রদের অর্থাৎ মুসলমান বোর্ডিঙের ছাত্রদের মধ্যে সন্ধ্যা থেকেই একটা ফিসফিসানি সুরু হয়েছে। তার দু'এক টুকরো তাঁর কানে এসেছে। হিন্দু হেডমাষ্টারের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা-সেবায় গিয়ে সিন্নী প্রসাদ খেলে তারা মৌলভীকে নিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকাবে বলে ষড়যন্ত্র করেছে। সুতরাং অনেক চিন্তা ভাবনা করেই তিনি না আসাই স্থির করেছেন। এর জন্য চন্দ্রভাই যেন কিছু মনে না করে। তবে কাল টিফিনের সময় তিনি চন্দ্রভাইয়ের বাসায় নিশ্চয় আসবেন এবং তালের বড়া ও মিষ্টান্ন সহযোগে টিফিন করবেন।

সমস্ত চুকে গেলে চন্দ্রবাবু হেসে সত্যবতীকে বললেন—চমৎকার হ'ল। এমন সুন্দর হবে আমি আশা করি নি। তালের বড়া ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে।

সত্যবতী মুখ টিপে হেসে বললেন—হবে না? কেষ্টকে পাঠিয়ে তেলিবাড়ী থেকে তিল পিড়িয়ে এনেছি।

—তিলের তেল?

—হুঁ।

তালের পাশে তিলের চারা
ভাদ্র মাসে চড়বে কড়া
তিলের তেলে তালের বড়া
মজবে খেয়ে ছুঁড়ি ছোঁড়া।

এত তালের বড়া ভাজা হবে, ঘি অনেক লাগবে, মনে মনে ভাবছিলাম। হঠাৎ ঠাকুমায়ের বাসরঘরের ছড়াটা মনে পড়ে গেল। বাড়ী থেকে আসবার সময় আধ মণ তিল এনেছিলাম। বর্ষার সময়—কে জানে—তরকারিপাতির অভাব-টভাব পড়ে। তিলটা পড়েই ছিল। কেষ্টকে পাঠিয়ে দিলাম তিল দিয়ে, বললাম দাঁড়িয়ে থেকে ঘানি পিড়িয়ে আনতে। সেই তেল। ফার্স্টো কেলাস হবে না?

চন্দ্রবাবু হাসতে লাগলেন মৃদু মৃদু।

সত্যবতী বললেন—একটু ভাল করেই হাস বাপু। কি রকম মানুষ তুমি, চব্বিশ ঘণ্টাই গম্ভীর।

কথাটা সত্যবতী মিথ্যে বলেন নি। অল্পবয়স থেকে হেডমাষ্টারি করে চন্দ্রবাবু সশব্দে হাসতেই যেন ভুলে গেছেন। দাড়িতে হাত দিলেন চন্দ্রবাবু। দাড়ি রেখেছেনও এই হেডমাষ্টারী করবার জন্য। শীর্ণ দীর্ঘকায় মানুষটি তরুণ বয়সে যতবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখতেন ততবারই ভাবতেন—বড় হাল্‌কা দেখাচ্ছে। দাড়ির ওজন বাটখারায় ধরা পড়ে না কিন্তু আয়নায় ধরা পড়েছিল তাঁর কাছে। ভেবে চিন্তে দাড়ি রেখেছিলেন।

সস্নেহে সত্যবতীর পিঠে হাতখানি রেখে চন্দ্রবাবু সমাদর জানিয়ে বললেন—কথাটা মিথ্যে বল নি তুমি; সত্য সত্যই হাসতে যেন ভুলেই গিয়েছি।

বঙ্গবালা অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মেয়েটা আজ খুব খেটেছে। চন্দ্রবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি ভাবতাম বঙ্গু কাজকর্ম্মে খুব পোক্ত হবে না। যে তোমার আদর! কিন্তু বঙ্গু ত খুব কাজ করতে পারে! চরকির মত ঘুরল সারা সন্ধ্যেটা।

—খেটেছে পণ্ডিত বটঠাকুরের মেয়ে বীণা। খুব কাজের মেয়ে। কি বন্দোবস্ত! অনেক জিনিষ বেঁচেছে। তো করলে কি জান? বড় ডালায় ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে রেখে গেল, বলে গেল—কাল সকালে এসে জনকয়েক ছেলেকে দিয়ে বাড়ী বাড়ী পেসাদ পাঠিয়ে দোব। তা গিন্নীমায়ের বাড়ী পাঠাব কিনা বল ত? ঠিক হবে?

—গিন্নীমায়ের বাড়ী? দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভেবে নিয়ে চন্দ্রবাবু বললেন—তা ক্ষতি কি? তবে বাসি লুচি মিষ্টি না পাঠিয়ে কিছু কাঁচা মিষ্টি কিছু গোটা ফল পাঠিয়ে দিও বরং।

—বঙ্গুকে সঙ্গে নিয়ে বীণা নিজেই নিয়ে যাবে বলেছে।

—সেই ভাল।

—বীণাকে নাকি গিন্নীমা খুব ভালবাসেন।

—তা বাসেন। হাসলেন চন্দ্রবাবু। হেসেই কথার জের টেনে বললেন—ছেলেবেলায় বীণা গিন্নীমায়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করত। রামজয় এখানে যখন এল, অনেক বলে কয়ে আমিই আনলাম, টোলের চাকরি ইস্কুলের চাকরি—ওদের বাড়ীর পূজাপার্ব্বণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করবে, ওঁরা ওঁদের ঠাকুরবাড়ীর কাছাকাছি ওদের বাসা দিলেন, বাড়ীটার উঠানে একটা ভাল কলমের আমগাছ ছিল। গাছটি খোদ কর্ত্তার হাতের লাগানো। আমের সময় গিন্নীমা নিজে দেখতে যেতেন। নিজে দাঁড়িয়ে আম পাড়াতেন। বীণা তখন ছেলেমানুষ, পাঁচ সাত

বছরের মেয়ে। সে একটা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়াত; যুক্তি হ'ল, আমরা এ বাড়ীতে আছি বাড়ী আমাদের, গাছ বাড়ীতে আছে আমরা জল দি, গাছ আমাদের আমও আমাদের। কিছুতেই দোব না। মাথা ফাটিয়ে দোব। গিন্নীমা যে গিন্নীমা তিনি থ' মেরে গিয়েছিলেন, রামজয় বাড়ী ছিল না, রামজয়ের স্ত্রী ভালমানুষ লোক, তার উপর গিন্নীমায়ের সামনেও ঘোমটা দিয়ে থাকত তখন, কথা কইত না, সে বেচারা ভয়ে লজ্জায় ঘেমে সারা। গিন্নীমা অবাক! ও বাবা, পণ্ডিতের এ মেয়ে যে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার! সওয়াল করে দেখ! শুধু ব্যারিষ্টার নয় তার উপরে গোরা পল্টন। লাঠি হাতে লড়াই করবে। তুই ত খুব পণ্ডিতের মেয়ে দেখি।

বীণা বলেছিল—ও তুমি ত খুব বড়লোক—খুব গিন্নীমা দেখি! জোর করে আমাদের আমগুলো পেড়ে নেবে। আর পণ্ডিতের মেয়ে বলে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখব। শেষ পর্য্যন্ত গিন্নীমা ফিরে গেলেন। রামজয়ের স্ত্রী মেয়েকে খুব তিরস্কার, শেষ প্রহার। রামজয় বাড়ী ফিরে সমস্ত শুনে মহাবিব্রত। বীণাকে ঘুম পাড়িয়ে আম পেড়ে গিন্নীমায়ের বাড়ী দিয়ে আসে। গিন্নীমা একধামা আম দিয়েছিলেন। বীণা ঘুম থেকে উঠে গাছে আম না-দেখে কাউকে কিছু না-বলে গিন্নীমা'র বাড়ীতে গিয়ে হাজির। বলে—তুমি আমার আম পাড়িয়ে এনেছ। ঘর খানাতল্লাস করব আমি। সে এক মহাকাণ্ড। শেষ পর্য্যন্ত কত্তার কানে উঠল। কত্তা বললেন—গাছ তোমারই হ'ল মা। তুমি যতদিন বাড়ীতে থাকবে ততদিন তোমার। গিন্নীমা ওর নাম দিয়েছিলেন পণ্ডিতের সেপাই। বলতেন—শাশুড়ীর নাক কাটবি তুই। বীণা বলত—তা কাটব কেন? আমার শাশুড়ীর নাক কেন কাটব আমি? তোমার শাশুড়ীর নাক কাটব। গিন্নীমা মধ্যে মধ্যে রামজয়ের বাড়ী যেতেন—বীণার সঙ্গে ঝগড়া করতে। বলতেন—কৈ পণ্ডিতের সেপাই কৈ? তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে এলাম। কৈ একটু ঝগড়া কর দেখি। বীণা বলত—কিছু ক্ষেতি কর তবে ত ঝগড়া করব। শুধু কি ঝগড়া হয়! বলেই বলত—তুমি ভারি কুঁদুলী, কোঁদল ছাড়া থাকতে পার না! বাড়ী বয়ে আমার সঙ্গে কোঁদল করতে এসেছ। বাড়ী যাও। নইলে গরমের সময় সাত কুঁদুলীর নাম করবার সময় তোমার নামটি প্রথম করব আর বলব—'সাত কুঁদুলীর মাথা খেয়ে বাতাস দে রে ফুরফুরিয়ে'। বড়লোক বলে খাতির করব না। হ্যাঁ।

আজকের এই সামাজিক অনুষ্ঠানটির সার্থকতা যে আনন্দ এবং উল্লাস তাদের নতুন সংসারে সঞ্চারিত করেছে, তাই উপলক্ষ করে চন্দ্রবাবুর জীবনে সরসতার ছোঁয়াচ লেগেছে। অনেককাল চন্দ্রবাবু এমন ভাবে সত্যবতীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন নি। সত্যবতীও এমন ভাবে অনেক কাল মুখর হয়ে উঠবার অবকাশ পান নি।

চন্দ্রবাবু আবার বললেন—গিন্নীমায়ের বাড়ী পাঠাবার সময় বহুকে যেন একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ো।

—তা দেব। কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি?

—সাজানো ত শুধু হয় না। ওর আছে কি, কি দিয়ে সাজাব?

—এই দেখ। সে সাজানো আমি বলি নি। বেশ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিও—একখানা ফরসা শাড়ী-টাড়ী পরিও। এই আর কি।

—শাড়ী! শাড়ীই কি একখানা ভাল আছে নাকি?

—তোমার একখানা কালাপাড় ফরাসডাঙ্গা শাড়ী পরিয়ে দিও। বঙ্গু তো তোমার মত বেঁটেখাটো নয়, এরই মধ্যে তোমার মাথার সমান সমান হয়েছে। দিব্যি হবে তোমার শাড়ী।

—হ্যাঁ তা হবে। তবে অন্য দিকেও যে নোটিশ দিয়েছে। বিয়ের ভাবনা ভাব।

—বিয়ের? দূর দূর। এর মধ্যে বিয়ে কি?

—নিজেই ত বললে—মাথায় আমার সমান হয়েছে।

—তাতে কি হয়েছে? বিয়ের বয়স হোক তার পর। তা ছাড়া—

—কি? তা ছাড়া আবার কি?

—আমার ইচ্ছে আছে ওকে লেখাপড়া শেখাব।

—লেখাপড়া শেখাবে? মানে পাস করাবে? বি-এ, এম-এ?

—ক্ষতি কি? সে যদি পারে তবে ত সে আমার ভাগ্য বলে মানব।

—না বাপু। সে ভাল নয়। মেয়েছেলে—সময়ে বিয়ে হবে, শ্বশুরবাড়ী যাবে, ঘরকন্না করবে, ছেলেপুলে হবে। রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেওর, কৌশল্যার মত শাশুড়ী হবে—সীতার মত সতী হবে। এই ত জানি। সীতা যদি বি-এ, এম-এ পাস করত তবে হ'ত রামায়ণ? না না, ও সব বুদ্ধি ভাল নয়।

কি বলবেন চন্দ্রবাবু? সত্যবতীকে একথা বোঝানো সোজা নয় সে তিনি জানেন। সত্যবতীকে পড়াতে কি তিনি কম চেষ্টা করেছেন? কিন্তু হয় নি। অবশ্য তার কারণ আছে। সত্যবতীর সঙ্গে সপ্তাহে দেখা হ'ত—শনিবারের রাত্রি, বারো ঘণ্টা, রবিবার দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা মোট ছত্রিশ ঘণ্টা, দেড় দিন। মাসে ছ'দিন মাত্র। এর মধ্যেও চন্দ্রবাবুকে জমিজমা চাষবাস দেখতে হ'ত, গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভদ্রজনদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হ'ত; তার মধ্যে আর সত্যবতীকে পড়ান সম্ভবপর হয় নি। ইস্কুলের এই নবকলেবর, নতুন ব্যবস্থা হওয়ার আগে পর্য্যন্ত বঙ্গবালা সম্পর্কেও এমন চিন্তা করতে পারেন নি। ওখানকার পাঠশালায় বঙ্গুকে পড়তে দিয়েছিলেন; ইস্কুলের এই নতুন ব্যবস্থায় বোর্ডিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে এই কোয়ার্টারে বাসা না করতে হলে ওখানেই বঙ্গুর পড়া শেষ করতে হ'ত। কোথাও কোন বোর্ডিঙে রেখে মেয়েকে পড়াবার কল্পনা তিনি করতে পারেন নি। এখানে বাসা হওয়ার পর থেকেই কথাটা মনের মধ্যে উঁকি মারতে সুরু করেছে। চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশন স্থাপনের সময় যুবক ছিলেন তিনি; অমরবাবুর সঙ্গে সেকালে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গত দশ বৎসরে সে স্বপ্ন স্তিমিত হয়েই আসছিল। নতুন ইস্কুলের বাড়ীঘর বছরে বছরে পুরনো হয়ে আসছিল; স্থানীয় জনসাধারণের মনেও খুব বেশী শিক্ষার আগ্রহ জাগে নি,

তাঁদের নিজেদের উৎসাহে ভাঁটা না পড়ুক, জীবনে যেন ক্লান্তি আসছিল; বিশেষ করে উনিশ শ' চৌদ্দ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে বাস্তব সংসার জীবনকে চারিদিক থেকে নিষ্ঠুর পেষণ শুরু করেছিল। পঁয়তাল্লিশ টাকায় হেডমাষ্টারি আরম্ভ করেছিলেন—কয়েক মাস অর্থাৎ এই নবপর্য্যায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেড়ে হয়েছিল ষাট টাকা; অর্থাৎ দশ বছরে পনের টাকা, বছরে দেড় টাকা মাইনে বেড়েছিল। এ থেকেই বহু কষ্টে তিল তিল করে সঞ্চয় করে পৈতৃক ঋণ শোধ করেছেন। বাপের আমলে কুঠিয়ালদের অত্যাচারে যে জমিগুলি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল সেগুলির কিছু কিছু ফিরিয়েছেন। একখানি কোঠাঘর তৈরি করিয়েছেন। বাস করবার মত ঘর পর্য্যন্ত ছিল না। এর মধ্যে বঙ্গবালাকে পড়িয়ে বি-এ এম-এ পাস করাবার কল্পনা করতে পারেন নি। বরং তার বিয়ের কথাই ভেবেছিলেন। উনিশ শ' এগার সালে বাড়ীখানা তৈরি করার পর বঙ্গবালার বিয়ের জন্ত পোস্ট আপিসে একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলেছেন; তাতে মাসে পাঁচ টাকা হিসেবে জমা রেখে আসছেন। বছরে ষাট টাকা হিসেবে আজ ছ' বছরে প্রায় শ' চারেক টাকা জমেছেও। উনিশ শ' চৌদ্দ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে মাসে এই পাঁচ টাকা জমা দিতেও যে কষ্ট পেতে হয়েছে তাঁকে সে শুধু তিনিই জানেন; সত্যবতীও জানেন না। কিন্তু ইস্কুলের এই নতুন আমল হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে কল্পনাটা উঁকি মারতে আরম্ভ করেছে।

তাঁর আয় এখন মাসে দেড় শ' টাকা। অবশ্য সংসার-খরচ কিছু বেড়েছে। গ্রামে সত্যবতী বঙ্গবালাকে নিয়ে যে ভাবে থাকতেন বা থাকতে পারতেন এখানে ঠিক সে ভাবে থাকা যায় না। কাপড়-চোপড় থেকে চালে চলনে সব দিক দিয়েই খরচ বেড়েছে। চাল আলু তরিতরকারি অবশ্য তিনি বাড়ী থেকেই আনছেন, তবুও পঞ্চাশটা টাকা খরচ। জমার দিক এখন ভারী। অন্ততঃপক্ষে আশী টাকা বাঁচাতে তিনি পারবেন। এ ছাড়া বাড়ীর ধান চাল চাষের ফসল থেকে যা জমবার তা জমবে। সব নিয়ে এক শ' সোয়া শ' টাকা বটে। আজ মনে হচ্ছে বঙ্গুকে পড়ানো অসম্ভব নয়। বঙ্গু তাঁর একমাত্র মেয়েই নয়, একমাত্র সন্তান। তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে একজন মানুষের মত মানুষ করতে তাঁর বড় সাধ। সত্যবতীর কাছে কথাটা প্রকাশ করেন না, পাছে তিনি মনে দুঃখ পান। এই এত সব ছেলে তাঁর কাছে থেকে পড়ছে, মানুষ হচ্ছে, পাস যারা করছে, চলে যাচ্ছে; যাবার সময় প্রণাম করে সম্বন্ধ চুকিয়ে চলে যায়, তিনি তাদের হাসিমুখেই বিদায় দেন, কিন্তু চলে যাওয়ার পর বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। ভাবেন এরা কেউ বি-এ পাস করবে এম-এ পাস করবে, উকীল হবে, ডাক্তার হবে, ডেপুটি হবে, মুনসেফ হবে—তাঁকে দেখলে গুরু শিক্ষক হিসেবে প্রণাম-নমস্কার অবশ্যই করবে, তিনিও অহঙ্কার করে বলবেন—আমার ছাত্র। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। ওরা নমস্কার করে শ্রদ্ধাভক্তিও যেমন দেখাবে তেমনি কত স্থানে কত জনের কাছে তাঁর কত ভুল কত ত্রুটির উল্লেখ করবে, সমালোচনা করবে, হয়ত-বা কটু কথাও বলবে; কিন্তু যে সন্তান—যে পুত্র—যে আত্মজ তাঁর ভুল ত্রুটি তার মনকে স্পর্শই করবে না। শুধু তাঁর স্নেহের কথা, তাঁর গৌরবের কথাগুলিই স্মরণ করবে, নিজের ছেলেদের কাছে বলবে।

এরা শুধু ছাত্র, এদের কৃতী জীবনের উপর তাঁর কতটুকু অধিকার? শুধু মুখের কথার অধিকার। একটা নমস্কার শুধু পাওনা। ছেলের উপর অধিকার সে যে পৃথিবীর উপর ভগবানের অধিকার, সৃষ্টির উপর স্রষ্টার অধিকার। তার দেহের উপর অধিকার—তার মনের উপর অধিকার, তার গৌরবে ষোল আনা অধিকার, তার উপার্জ্জনে ষোল আনা অধিকার। তার গৌরবে তাঁর বৈকুণ্ঠের সুখ, তার কৃতিত্বের পুণ্যে তিনি পাবেন স্বর্গ-সিংহাসন।

বন্ধুর বিয়ে দিলে—তার ছেলে হবে—সে হবে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; সে শাস্ত্রমত পিণ্ড দিলে তা তিনি পাবেন। কিন্তু তার গৌরব—সে হবে তার পিতার পিতামহের। কিন্তু বন্ধু যদি নিজে বি-এ, এম-এ পাস করে, তবে সে গৌরব হবে তাঁর নিজস্ব। ওই ছেলের গৌরবের মতই নিজস্ব। কিন্তু তার গুরুত্ব হবে অনেক বেশী। গৌরব করবার মত ছেলে অনেকের আছে, অনেকের হয়েছে। সতী মেয়ের গৌরব, সহনশীলা গুণবতী মেয়ের গৌরবও অনেকের হয়েছে কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ের গৌরব কার আছে এ অঞ্চলে? এ জেলায়? তাই তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে, মনের মধ্যে মাটির তলায় অঙ্কুরিত বীজের মত জাগছে—বন্ধুকে তিনি পড়াবেন।

রামজয়ের মেয়েটার দিক চেয়ে ভাবেন—বন্ধু যদি অমনি অকালে বিধবা হয়? কিন্তু বিপদও আছে। বোর্ডিঙে এই এত সব ছেলের মধ্যে বন্ধুকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তোলা সহজ কথা নয়। মনে পড়ল কমলেশের পত্রের কথা। মনে পড়ল সেদিনের কথা। ব্রজবিহারীবাবুর সঙ্গে ইস্কুলের পর ওই কমলেশের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ওই আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্রজবাবু অনেক পুরনো কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—"এটাকে কিশোর বয়সের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ রঙীন বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী ভাবছেন কেন? অন্ততঃ এখনও ভাববার কারণ ঘটে নি। এ সব চিরকাল ঘটে। ভেবে দেখুন না, কালে কালে কত অধ্যাপক-কন্যা কত পিতৃশিষ্যের প্রেমে পড়েছে। বিবাহ হয়েছে, বিবাহ হয় নি; এমন ঘটনা অসংখ্য। আরে মশায়, কচ-দেবযানীর কথা ভাবুন না। ওটা না ঘটালে মহাভারতই অন্য রকম হ'ত।" ছেলেদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। বন্ধু যদি কাউকে ভালবেসে ফেলে!

—কি ভাবছ তুমি? সত্যবতী প্রশ্ন করলেন। অবাক হয়ে তিনি স্বামীর স্তব্ধ চিন্তাকুল মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন।

—নাঃ। কিছু না। একটু হাসলেন চন্দ্রবাবু।

—কিছু না? বলবে না তাই বল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে মানুষ যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেল।

—বলব, পরে বলব। বলেই তিনি উঠে পড়লেন। আজ সন্ধ্যা থেকে বোর্ডিং ঘুরে দেখা হয় নি। একবার ঘুরে আসতে হবে। কে এখনও ঘুমোয় নি, হয়ত শরীর খারাপ হয়েছে, হয়ত বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে, হয়ত লুকিয়ে নভেল পড়ছে, কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা জ্ঞানপিপাসায় রাত্রির গভীরতা ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ছে। তাদের ডেকে বলতে

হবে—ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে পড়, রাত্রি হয়েছে। শেষের ধরনের ছেলে খুব কম। এ ধরনের ছেলে দু'চারটের বেশী হয় না। ওই একটা আছে ধ্রুব আর আছে শম্ভু মণ্ডল—এই দুটো। সব ক্লাসের ফার্স্ট-সেকেণ্ড ছেলেরা খানিকটা খানিকটা এই ধরনেরই বটে—তারা কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু ধ্রুব ঘোষের মত ছেলে দুর্লভ। আরও একটা-দুটো ছেলে থাকে যারা অনর্গল পড়ে, ধ্রুব ঘোষের মতই পরিশ্রম করে কিন্তু আশ্চর্য্য তাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। রাত্রে পড়ে, সকালে ভুলে যায়। কেউ বলে মস্তিষ্কের দোষ, বুদ্ধি কম, ধারণশক্তির অভাব। উঁহু, উঁহু! চন্দ্রবাবু আপন মনেই ঘাড় নাড়লেন। এরা মন দিয়ে পড়ে না, এরা মুখে পড়ে, মনে মনে অন্য কথা ভাবে। আশ্চর্য্যভাবে এই ধরনের দুমুখী একটা শক্তি জন্মে যায়। এরা চেঁচিয়ে পাড়া জানিয়ে পড়ে; মনে মনে ভাবে। আরও একটা কারণ আছে, এদের গোড়া কাঁচা হয়। গোড়া কাঁচা হলেই সর্ব্বনাশ। কমলেশের সঙ্গে পড়ে নিত্যকৃষ্ণ, ঠিক এই ধরনের ছেলে। হ্যাঁ নিত্যকৃষ্ণ এখনও পড়ছে, গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু কি পড়ছে একবিন্দু বোঝা যাচ্ছে না; একটা লাইনই পনের মিনিট ধরে ব্যাড়র ব্যাড়র করে অস্পষ্ট উচ্চারণে জড়িয়ে পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। মনে মনে হিসেব করছে কার কাছে কত পাবে, কত সুদ হয়েছে। নিত্যকৃষ্ণ বাপের পাঠানো খরচের টাকা বাঁচিয়ে বোর্ডিঙে ছেলেদের চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। বাপ বড়লোক নয়, মধ্যবিত্ত চাষী গৃহস্থ, টাকা অল্পই পাঠায়, মাসে দশ বারো টাকা মাত্র। নিত্যকৃষ্ণ ও থেকেই মাসে এক টাকা থেকে দু টাকা পর্য্যন্ত বাঁচাবেই এবং টাকায় চার পয়সা সুদে ছেলেদের ধার দেবে। গরীব ছেলেদের দেয় না, বাবুদের ছেলেদের দেয়। এখানে আজ বছরচারেক সে পড়ছে, এর মধ্যেই সে প্রায় দেড় শ' টাকা পোষ্টাপিসে জমিয়ে ফেলেছে।

—মাষ্টার মশাই?

—ব্রজবিহারীবাবু?

ওদিক থেকে ব্রজবিহারীবাবু এগিয়ে আসছেন।

—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম আমি।

—আমার কাছে? কেন?

—একটু গণ্ডগোল হয়েছে।

—গণ্ডগোল? কি গণ্ডগোল?

—শম্ভু মণ্ডল সেকেণ্ড ক্লাসের, সিদ্ধি খেয়ে বেশ একটু ঘায়েল হয়ে পড়েছে।

—ঘায়েল হয়ে পড়েছে? শম্ভু মণ্ডল? সেকেণ্ড ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ধ্রুব ঘোষের পরই যে ইস্কুলের ভরসাস্থল? শান্তশিষ্ট শম্ভু মণ্ডল।

—হ্যাঁ। আবোলতাবোল বকছে। গান করছে। চীৎকার করছে। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো মনে হচ্ছে।

—ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু রয়েছেন। আপনাকে খবর দেওয়া দরকার মনে করলাম। মানে

সিদ্ধির সঙ্গে আরও কিছু খেয়েছে বোধ হচ্ছে। ডাক্তার বলছেন—জটিল দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা।

ব্যাপারটা সত্যই জটিল।

বোর্ডিঙের ঘর থেকে শম্ভুকে সরিয়ে এনে ইস্কুলের একটা ঘরে রাখা হয়েছে। ছেলেপিলের ভিড় থেকে বাঁচাবার জন্যও বটে, প্রশস্ত স্থানের জন্যও বটে। শম্ভুকে ডাক্তার ইতিমধ্যে বমিও কয়েক বার করিয়েছেন। সমস্ত ঘরটা জলে ভিজে গেছে। মাথায় জলও ঢালা হয়েছে অনেক। সন্ত বমি করে শম্ভু শুয়েছিল তখন, ধ্রুবই ওর মাথায় বাতাস দিচ্ছে। শম্ভু জানালার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনে আঙুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে। চন্দ্রবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। হতভাগা ছেলে, শয়তান কোথাকার! উঃ। অথচ ছেলেটার উপর কত বড় ভরসা তাঁর! মা-বাপের কত বড় আশার আশ্রয় ও। গরীব তৈলব্যবসায়ীর ঘরের ছেলে, ছাত্রবৃত্তিতে বৃত্তি পেয়েছিল, ওই বৃত্তির উপর নির্ভর করে হুগলীতে গিয়েছিল নর্ম্যাল ইস্কুলে পড়তে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে এখানে এসে ভর্ত্তি হয়েছে ফোর্থ ক্লাসে। অঙ্ক, সংস্কৃত, বাংলা এ সবে সে ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেদের চেয়ে ভাল। শুধু জানত না ইংরিজী। তাও এই তিন বছরে সে চমৎকার আয়ত্ত করেছে। তাঁদের সকলের আশা শম্ভু কম্পিট করে পাস করবে ম্যাট্রিকুলেশন। এমন হয়েছে অনেকবার যে, নীচের ক্লাসে কোন পণ্ডিতমশায় আসেন নি, ছেলেরা গোলমাল করছে, তিনি শম্ভুকে ডেকে বলেছেন —ক্লাসটায় তুমি গিয়ে পড়িয়ে এস। সেই ছেলে—! চন্দ্রবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, ক্রুদ্ধস্বরে ডাকলেন—ইউ—শম্ভু! ইউ!

শম্ভু চমকে উঠল, আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়েই হি-হি করে হাসতে সুরু করে দিলে। হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি। তার পর হঠাৎ নিজেই নিজের মুখটা চেপে ধরলে। কিন্তু তার মধ্য থেকেও অদম্য অবাধ্য হাসি মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসছিল—হি-হি-হি।

চন্দ্রবাবু ধমক দিয়ে বললেন—হোয়াই ডু ইউ লাফ? হোয়াটস দি ম্যাটার?

শম্ভু মুখের হাত ছেড়ে দিয়ে জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে—দ্যাট লিট্‌ল্ ব্রাইট স্টার। ওই নীল-উজল তারাটি, স্যার।

—হোয়াট?

—টুইঙ্কল্ টুইঙ্কল্ লিট্‌ল্ স্টার। তারপরই সে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল।

ডাক্তার এসে চন্দ্রবাবুর বাহুস্পর্শ করে মৃদু স্বরে বললে—বাইরে চলুন। ওকে এখন ত উত্তেজিত করে লাভ নেই। ও ত এখন প্রায় বদ্ধ পাগল!

বদ্ধ পাগল!

—তা বৈ কি! শুনলাম ও সিদ্ধির সঙ্গে অনেক রকম জিনিস মিশিয়ে খেয়েছে। ওদের একটা দল আছে, তারা সিদ্ধি প্রায় নিয়মিতই খায়। ছেলে বয়সের একটা ব্র্যাভেডো আছে

—খেয়ে নেশা হয় না বলা। তা ছাড়া বেশী দিন কোন নেশা করলেই তাতে আর নেশা হয় না। শম্ভুও তাই বলত। আজ আপনার বাসায় সত্যনারায়ণ সেবা গেল, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল। সিদ্ধি-টিদ্ধির নেশায় একটা ফল্‌স এপিটাইট অনুভব করা যায়। বেশী করে খাবার জন্তে আজ নানা রকম জিনিস মিশিয়ে তরিবৎ করে সিদ্ধি খেয়েছে। শম্ভুর এই অবস্থা। বাকী সব প্রায় অজ্ঞানের মত বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে।

—বলেন কি? এরা সুস্থ হবে কতক্ষণে?

—বলতে পারি নে। দু'তিন দিন ত লাগবেই। সিদ্ধির নেশার তুল্য এই দিক দিয়ে পাজী নেশা আর নেই। তবে, শম্ভুর সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।

—আশঙ্কা? আর আশঙ্কা কি? হার্ট টার্ট—

—না। ওর মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

—মাথা খারাপ? ইউ মীন—পাগল?

—বিচিত্র নয়।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন চন্দ্রবাবু। তাঁর চীৎকার করতে ইচ্ছে করছে—তার চেয়ে শম্ভু মরে যাক। শম্ভুর সম্পর্কে তিনি কল্পনা করেন—শম্ভু অধ্যাপক হয়েছে, শম্ভু হাইকোর্টের জজ হয়েছে। সেই শম্ভু গায়ে ধুলো মেখে—কাদা মেখে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াবে—।

শম্ভু ভিতরে আবার হাসতে সুরু করেছে।—হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি!

দ্যাট লিট্‌ল্ ব্রাইট ব্লু স্টার! ওই নীল উজল তারাটি!

হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি!

ওই হাসির মধ্যে শম্ভু হারিয়ে যাচ্ছে। ওঃ, শম্ভু তার চেয়ে মরে যাক! মরে যাক! চোখ থেকে তাঁর জল গড়িয়ে এসেছে।

ব্রজবিহারীবাবু বুঝতে পেরেছেন তাঁর মনের আবেগের কথা। তিনি বললেন—চলুন আপনি। গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি রয়েছি। ভাববেন না আপনি। যা করবার আমি করব।

সত্যই শম্ভুর মাথা খারাপ হয়ে গেল। দু'দিন দু'রাত্রির পর ডাক্তার বললেন, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন। সেবা-শুশ্রূষা যাতে ভাল হয় সেটা প্রয়োজন, আর বিশ্রাম। কমপ্লিট রেষ্ট চাই।

শম্ভু এখনও আকাশে খুঁজছে—নীল উজল তারাটি! হাসিটা কম পড়েছে। বোর্ডিঙের চার জন শক্ত সবল ছেলে শম্ভুকে নিয়ে রওনা হ'ল শম্ভুর গ্রামের দিকে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রবাবুর ইচ্ছে হ'ল চাকরি ছেড়ে দেন।

ইস্কুলে তিনি সমস্ত দিন কোন কাজ করতে পারলেন না, আপিসের কাজ, ক্লাস নেওয়া, ক্লাস ইন্‌স্‌পেকশন—কোন কাজ করলেন না, আপিসে বসে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

ওই শম্ভু গড়াঞী পাগল হয়ে যাওয়ার দিন তিনেক পর।

সিদ্ধি খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়েছেন তিনি। তিনি নিজে এই ব্যাপারের দায়ে আংশিক ভাবে দায়ী হয়ে পড়েছেন। তদন্ত করেছিলেন তিনি এবং ব্রজবিহারীবাবু। চন্দ্রবাবু সঙ্কল্প করেছিলেন—এই ঘটনার নায়ক যে বা যে-যে ছাত্র একজন বা দু'জন—তাকে বা তাদের তিনি ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন। রাস্টিকেট করবেন না, সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করবেন। এবং এতে ইস্কুলের বা বোর্ডিঙের চাকর-ঠাকুর যারা যুক্ত থাকবে—তাদের তাড়িয়ে দেবেন। যে ছেলেরা সিদ্ধি খেয়েছে তাদের প্রত্যেকের জরিমানা করবেন।

নিজেকে তিনি জানেন। ছেলেরা তাঁকে যতটা ভয় করে ততটা ভয়ের পাত্র তিনি নন। তাঁর হাতে বেত আজ পর্য্যন্ত ভাঙে নি। তিনি ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করেন খুব কিন্তু বেত মারবার সময় তাঁর হাত ঠিক ওঠে না। যতটাও ওঠে—তার উপযুক্ত বেগে পড়ে না। তাঁর কেমন ভয় হয়। কোথায় কোনখানে মারাত্মক হয়ে যাবে। এবং মার খেয়ে কখন কোন্ ছেলে কোণঠাসা বেড়ালের মত নখ-দাঁত বের করে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে—সে ভয়ও তাঁর হয়। এ সব তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই বিল্বগ্রামে ইস্কুল হয়েছে বারো বছর—এক যুগ। এই যুগটির মধ্যে এমন অনেক ছেলেকে নিয়ে তাঁকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। ওঃ সে সব ছেলে এক-একটি দৈত্য। রামজয় বলত—ষণ্ডমার্কের দল। অবশ্য একটা যুগ চলে গেছে, যুগান্তর হয়েছে, সে শুধু কাল বা বৎসরের হিসাবেই নয়—সব হিসাবেই। এখনকার ছেলেরা তখনকার ছেলেদের চেয়ে অনেক শিষ্ট হয়েছে। দেশটাও পালটেছে। সেকালে পড়ত শুধু বিল্বগ্রাম এবং আশপাশের অবস্থাপন্ন বিষয়ী ঘরের ছেলেরা। তিনি বলতেন—বাবুর বেটা বাবুরা। তাদের ছিল—পড়লেও ঘরের ভাত, না পড়লেও ঘরের ভাত। না পড়লে লোকে মুখ্যু বলবে, ইংরিজী না শিখলে সভ্য সমাজে অচল হবে, ভাল ঘরে বিয়ে হবে না—তাই পড়ত। যারা একটু বিশিষ্ট ঘরের ছেলে—তারা পড়ত সাহেবসুবোর সঙ্গে ইংরিজীতে দু'চারটে কথা বলতে হবে বলে। এরা—নানা ছাঁদে টেরী কাটত, পকেটে বার্ডশাই রাখত, বাড়ীতে গড়গড়ায় তামাক খেত, দু'চার জন চরস খেত, গাঁজাও এক-আধ জন খেত। এদের শাসন করতে গেলে এরা প্রথম কয়েক মিনিট গোঁ ধরে চুপ করে থাকত; তার পরই উত্তর করতে শুরু করত, তার পর বেত দু'ঘায়ের পর উদ্যত হলেই খপ করে চেপে ধরত। সে উপেক্ষা করেও বেত চালাতে গেলে বেত কেড়ে নিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করত। এবং শেষ

পর্য্যন্ত চৈতন্যবাবুর স্ত্রী—গিন্নীমায়ের কাছে নালিশ করত। মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন শক্ত সমর্থ জেদী শিক্ষক এসেছেন—তাঁরা দু'এক জনকে প্রহার করেছেন—ভয় করেন নি, কিন্তু পরিণাম ভাল হয় নি।

বঙ্কিম ঘোষাল—বেত মেরেছিলেন ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলে কিশোরকে। এক সপ্তাহের মধ্যে বঙ্কিম ঘোষাল তার ফল পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি গ্রামে প্রাইভেট পড়াতে যেতেন, একদিন পড়ানো শেষ করে ফেরার পথে কোন অজ্ঞাত লক্ষ্যভেদীর ঢেলার লক্ষ্য হলেন; ঢেলার আঘাতে প্রথমেই হাতের লণ্ঠনটি ভেঙে নিবে গেল, তার পর কানের পাশ দিয়ে বন বন শব্দে ঢেলা ছুটল। প্রাণভয়ে চীৎকার করতে করতে তিনি কোন রকমে বোর্ডিঙে এসে পৌঁছুলেন এবং পরের দিনই চাকরিতে জবাব দিয়ে চলে গেলেন।

আর একজন—বনবিহারীবাবু। তিনিও এমনি একটি দুর্দ্দান্ত ছেলেকে শাসন করেছিলেন। কিছুদিন পরই একদিন ক্লাসে একটি ছেলেকে গালে একটি চড় মারতেই সে অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে গেল, এবং ক্লাসের একদল ছেলে তাকে ঘিরে এমনই হৈচৈ শুরু করে দিলে যে ছেলেটির অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সত্য কিনা যাচাই করবার অবকাশ কেউ পেলে না। ছেলেরা চীৎকার করলে, কাঁদলে, ঘটি ঘটি জল এনে তার মাথায় ঢাললে—সে ভিজে বেড়ালের মত মিট মিট করে চোখ মেলে বললে—মাথাটা কেমন করছে। কথাটা গিন্নীঠাকরুণের দরবার পর্য্যন্ত গেল। বনবিহারী কাজ ছেড়ে চলে গেলেন।

আরও একটা কারণ আছে। সেটা তাঁর নিজের স্মৃতি। ছেলেদের মারতে গেলেই তাঁর বাবার মারের কথা মনে পড়ে। নিষ্ঠুর ভাবে মারতেন তিনি। সে যন্ত্রণা—সে দুঃখের স্মৃতি তাঁর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বাবা তাঁকে অনেক দিন পর্য্যন্ত মেরেছেন, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন যখন তখনও মেরেছেন। একদিন তাঁর আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছিল, কতদিন ঘর থেকে পালাবার সঙ্কল্প করেছিলেন—সে সব তাঁর মনে পড়ে যায়।

পারেন না, ঠিক যতখানি কঠোর হওয়া প্রয়োজন—ততখানি কঠোর হতে তিনি পারেন না। ভয় হয়, মমতা হয়, দুই-ই হয়। ছেলেরা তাঁকে ভীতুই মনে করে, সে তিনি জানেন। ছেলেরা—শাসনের দুর্ব্বলতা নিয়ে—তাঁর ভয় নিয়ে রহস্য করে হয়ত ব্যঙ্গও করে—তাও তিনি শুনেছেন। নূতন ছেলেদের—পুরনো ছেলেরা বলে দেয়—গর্জ্জায় খুব কিন্তু বর্ষায় না। ডাকে জোরে কিন্তু বাজ পড়ে না। বেত উঠবে আকাশে—লক লক করে নাচবে কিন্তু পিঠে পড়বার সময় ঠুক করে। শুধু চীৎকারে না ভড়কালেই হ'ল। খুব হিন্দী আর ইংরিজী বলবে। নিকালো—আভি নিকালো—হামারা ইস্কুলসে আভি নিকালো, নেহি মাংতা হ্যায়। গেট আউট—গেট আউট—দিস ভেরি মোমেণ্ট—ই-মি-ডিয়েটলি—ইউ গেট আউট। গলায় হাত দিয়ে ধাক্কাও মারবে, কিন্তু দোর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ব্যস! এ সব তিনি জানেন।

এই কারণেই ব্রজবাবুকে এই তদন্তের মধ্যে নিয়েছেন তিনি। ব্রজবাবু শাসন করতে পারেন এবং ব্রজবাবুর আকর্ষণ বিচিত্র। মার খেয়েও ছেলেরা মর্ম্মান্তিক আঘাতে মর্ম্মে আহত

হয় না। তদন্ত চলছে আজ এই ক'দিন ধরে। সব সত্য প্রকাশিত হয়েছে—নায়ক দু'জন; তারা ধরা পড়েছে। সিদ্ধি দোকান থেকে তারাই নিয়ে এসেছিল। তাঁর ভয় ছিল—হয়ত কেষ্ট এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কেষ্ট জড়ায় নি—জড়িয়ে পড়েছেন তিনি নিজে। সিদ্ধি খেয়েছিল এরা কচুরী তৈরি করে। কচুরীগুলি তৈরি হয়েছিল তাঁর বাড়ীতে; সেদিন যে কড়াইয়ে সত্যনারায়ণের সেবা উপলক্ষে লুচি এবং ডালের বড়া তৈরি হয়েছিল—সেই কড়াইয়ে ভাজা হয়েছিল এবং তার জন্য ঠাকুরকে দায়ী করতে পারা যায় না; ঠাকুর বলছে—বীণাদিদি দাঁড়িয়ে থেকে ভাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামজয়ের মেয়ে বীণা। তার সঙ্গে ছিল বঙ্গবালা তাঁর কন্যা। ভাল করে সন্ধান করেছেন তিনি। বীণাও দায়ী নয়। সিদ্ধি এনেছিল বঙ্গবালা। সেই বীণাকে অনুরোধ করেছিল—তুমি করিয়ে দাও বীণাদিদি।

বঙ্গবালাকে প্রশ্ন করবার জন্য তিনি ডেকেছিলেন—বঙ্গবালা!

কঠিন কণ্ঠস্বরে ডেকেছিলেন। বঙ্গবালা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের দরজাটি ধরে এবং পরমুহূর্তেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ব্রজবিহারীবাবু ছুটে গিয়ে তাকে তুলে এনে শুশ্রূষা করে চেতনা ফিরিয়েছিলেন। এবং তাঁকে বলেছিলেন—আপনি এখন সামনে থাকবেন না মাষ্টারমশাই।

বঙ্গবালার জ্ঞান হওয়ার পর তিনি তাঁকে বলেছেন—আর না মাষ্টারমশাই। এইখানেই ক্ষান্ত হোন। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।

তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—সে কি উচিত হবে ব্রজবাবু?

—হবে। আমি বলছি।

—কেন একথা বলছেন? এত বড় একটা ব্যাপার। বঙ্গ অবশ্য সিদ্ধি এনে দিয়েছে—কিন্তু কে তাকে দিয়েছে, তার নাম জানতে হবে। বঙ্গ ছেলেমানুষ, এগার বছরের মেয়ে—তাকে ভোলানো এমন কি ব্যাপার? আমি তাকে আমি তাকে—

তাঁর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

—আমি তাকে রাষ্টিকেট করব। আমি তাকে সিভিয়ার পানিশমেণ্ট দেব। এক্সাম্‌প্লারি পানিশমেণ্ট।

শান্ত স্বরে ব্রজবিহারী বলেছেন—না। এইখানেই শেষ করতে হবে ব্যাপারটা।

—কেন? দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করেছিলেন চন্দ্রবাবু।

—আপনি আমার কথা রাখুন। পরে বলব আপনাকে। পরে। কাল সকালে।

আজ সকালে সমস্ত শুনে তাঁর মনে হ'ল—সমস্ত আঘাতটা ফিরে এসে তাঁর মাথার উপর পড়ল। না—। মনে হ'ল, বিষধর সাপে তাঁকে তাঁর অজ্ঞাতসারে দংশন করেছিল—বিষটা এই মুহূর্তে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, মাথা তিনি আর তুলতে পারছেন না।

ব্রজবাবুর আগেই কথাটা আজ ভোরে তাঁকে শোনালেন তাঁর স্ত্রী সত্যবতী। কাল এই

ঘটনার পর সত্যবতী বঙ্গবালাকে নিয়ে রাত্রে আলাদা ঘরে শুয়েছিলেন। ভোরবেলা সত্যবতী উঠে তাঁর ঘরে এসে তাঁর দুটি পায়ে ধরে বলেছেন—সব অপরাধ আমার। যে শাস্তি আমাকে দেবে, দাও। বঙ্গকে আর কিছু বল না। এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করো না।

সত্যবতী অকপটে বলেছেন—এখানে এসে তাঁর দৃষ্টি ঘুরে বেড়াত সম্পন্ন কায়স্থঘরের সুন্দর একটি ছেলের সন্ধানে। বঙ্গুর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। সম্পন্ন ঘরের ছেলে, সুন্দর ছেলে, ভাল ছেলে। হেডমাষ্টারের মেয়ে—তাকে অবশ্যই আদর করে নেবে।

সে ছেলে মিলল। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, মল্লিকপুরের সিংহবাড়ীর রবি সিংহ। সুন্দর ছেলেটি, তেমনি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম, পোষাক-পরিচ্ছদে সম্পন্ন ঘরের ছাপ; কেষ্ট বলেছিল—পড়াশুনায় একটু মাঠো। অঙ্ক সংস্কৃততে কাঁচা খানিক। তা—পাস ঠিক করবে। মাষ্টাররা বলে—ম্যাট্রিকের ধাক্কা পার হলে উদিকে গড়গড় করে চলে যাবে। গান জানে। ভারী মিষ্টি গলা। বাড়ীর অবস্থা বলতে নাই। সে একেবারে উরি চৌরী দক্ষিণ দুয়োরি; মা লক্ষ্মী মড়মড় করছেন—বাখারে বাখারে, ঘরের সিন্দুকে ঝমঝম করছেন।

সত্যবতীর অন্তরের কল্পনা অনুমান করতে কেষ্টর বিলম্ব হয় নি। সে বলেছিল—তা আমাদের বঙ্গর সঙ্গে বিয়ে হলে কিন্তু খুব ভাল হয়।

সত্যবতী বলেছিলেন—তা তো হয়। কিন্তু ওরা কি—? সে ভাগ্যি কি—?

—দেখেন দেখি। চন্দ্রমাষ্টারের মেয়ে, সে কেলনা নাকি। মাষ্টারকে বলেন কথাটা পেড়ে দেখতে। দেখবেন—একেবারে কেতাত্ত হয়ে যাবে।

সত্যবতী বলেছিলেন—ছেলে এমন সুন্দর, বঙ্গু তো আমার সুন্দর নয়, পাঁচপাঁচি। পছন্দ না করে যদি?

কেষ্ট বলেছিল—দেখছি দাঁড়ান। ওই ওদের কেলাসের কামু মুখুজ্জে আছে। সে ভারি মাতব্বর—লোকও ভাল। তাকে বলছি। বুঝেছেন?

সত্যবতী বারণ করেছিলেন—না কেষ্ট, কাজ নেই।

কেষ্ট বলেছিল—কিছু ভাববেন না। কেউ জানতে পারবে না।

কেষ্ট বলেছিল—কামদেবকে। কামদেব বলেছিল রবিকে। রবি সাগ্রহে মত দিয়েছিল। সত্যবতী কথাটা এক দিন তাঁকেও বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—এখন অন্তত দু'বছর ও কথা নয়। ছেলেটা আগে পাস করুক। মূর্খ জামাই আমি করব না।

এরই মধ্যে কথাটা গিয়ে বঙ্গর কানে পৌঁছেছিল। এগার বছরের বঙ্গ সলজ্জ এবং স্বপ্নালু হয়ে উঠেছিল। কথাটা চাপা পড়লেও রবিকে দেখে বঙ্গুর লজ্জা পাওয়ায় ছেদ পড়ল না। সে দিন দিন বেশী লজ্জা পেতে শুরু করলে। রবিকেও তার ছোঁয়াচ লাগল। ফুল ফুটতে লাগল—একটি ষোল বছরের ছেলে ও একটি এগার বছরের মেয়ের মনের আকাশে। ক্রমে কথাটা আর গোপন রইল না। রবির কয়েকজন অন্তরঙ্গ জানল। তার মধ্যে কামদেব এবং ওই শম্ভু গড়াঞী প্রধান। নর্ম্যাল পাস শম্ভুর কাছে বঙ্গবালা মধ্যে মধ্যে পড়া বুঝিয়ে নিতে যেত।

চন্দ্রবাবু এ ভারটা দিয়েছিলেন বৃদ্ধ এসিষ্ট্যাণ্ট বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নকুলবাবুকে, ছেলেরা যাকে বলে মিষ্টার ডেভিড হেয়ার। নকুল ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত; বঙ্গবালা মেয়েটি বুদ্ধিমতী, বাপের কল্যাণে নানান বই পড়েছে অনেক। পড়াতে গিয়ে ঘোষ একটু আধটু বেগ পেতেন। বঙ্গবালার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না। নকুল ঘোষই শম্ভুকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন—বঙ্গুর পড়াটা একটু করে দেখে দিও তুমি। বুঝেছ?

শম্ভুর কাছে পড়ে বঙ্গবালা খুশী হয়েছিল। শম্ভু শুধু ভাল পড়াতই নয়, এই বিয়ের কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে ব্যাপারটিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিল, যেন আকাশ-কুসুমে মালা গাঁথবার জন্য সূচ-সুতো যুগিয়ে দিত।

সত্যনারায়ণ সেবার দিনে কামদেব এবং শম্ভু এরা দু'জনেই সিদ্ধি এনে বঙ্গর হাতে দিয়েছিল। রোট ভাজিয়ে এনে দিতে হবে।

বঙ্গর মুখে দ্বিধার ভাব দেখা গিয়েছিল, বঙ্গ সত্যই ভয় পেয়েছিল, বলেছিল—বাবা যদি জানতে পারেন?

—কিছু জানতে পারবেন না।

—না।

—তা হলে যা বলতে হয় তুমি রবিকে বল। ওই পাঠালে। দেখ—দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যই কুয়োর ধারে রবি দাঁড়িয়ে ছিল। সে ও দলের অন্যতম পাণ্ডা, বঙ্গবালার দিকেই তাকিয়ে ছিল। এর পর আর বঙ্গ আপত্তি করে নি। সে এসে ধরেছিল বীণাদিদিকে। বীণা দীর্ঘকাল বাপের শিক্ষকজীবনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। টোলের ছাত্রদের খাদ্যাখাদ্যে গোপন সাধের সঙ্গে তার পরিচয় আছে; তারাও কখনও-সখনও সিদ্ধি খায়, সে-সবও সে জানে। ভাইয়ের সাধে বোনের সাহায্য করার মত সাহায্যও করে। ইস্কুল বোর্ডিঙের ছেলেদের সঙ্গেও সহযোগিতা করে। পরীক্ষার পর গোপনে নম্বর জেনে দেয়; ছেলেদের ফিষ্টি হলে তাদের দেওয়া মাছ-মিষ্টি বাপের অজ্ঞাতসারে সে-ই নেয়; কত ছেলে এল কত ছেলে গেল, বালিকা বীণা ক্রমে ক্রমে যুবতী হ'ল, ছেলের মা হ'ল, বীণা থেকে বীণাদিদি হ'ল—কিন্তু ছেলেদের সহযোগিতায় সে চিরকালের সেই এক বীণা রয়ে গেছে। বাটা সিদ্ধি নিয়ে নিজে ময়দার সঙ্গে মেখে বেলে দাঁড়িয়ে থেকে সে রোট তৈরি করিয়ে দিয়েছে এবং একখানা নিয়ে সে নিজে খেয়েছে। বঙ্গবালাকেও আধখানা খাইয়েছিল। এ রোটে কিছু ছিল না; দ্বিতীয়বার আবার রোট ভাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শম্ভু এবং কামদেব। এবার তারা সিদ্ধিমাখা ময়দা থেকে আটখানা কাঁচা কচুরি তৈরি করে এনে বঙ্গর হাতে দিয়েছিল এবং সাবধান করে দিয়েছিল—খবরদার, একটুকরো যেন কম না পড়ে। রবির দিব্বি রইল—হাঁ। বঙ্গবালাই সে সিদ্ধির রোট ভাজিয়ে নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিল।

সত্যবতী বললেন—বঙ্গু ভাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী। তাকে আর কিছু বল না। সে ভয়ে মরে গিয়েছে। কেবলই কাঁদছে। সারারাত ঘুমোয় নি। এই ভোরবেলা একটু ঘুমাল। আমি তোমার কাছে এসেছি।

চন্দ্রবাবু মাথায় হাত দিয়েছেন তখন থেকে।

সত্যবতী এর পর আরও শোনালেন—আরও একটা কথা তোমার কাছে গোপন করব না। পাগল হয়ে শম্ভু যে শুধুই বলেছে—'ওই নীল উজল তারাটি', ওটা একটা গান; রবি ওই গানটা গায় বঙ্গবালাকে লক্ষ্য করে। বঙ্গকে রবি এই বলেই ডাকে।

চন্দ্রবাবু সেই মুহূর্তে স্থির করলেন—চাকরি ছেড়ে দেবেন তিনি। তিনি অযোগ্য। তাঁর কন্যা থেকেই এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। শম্ভু হয়ত নিজেই রোট খেয়েছে—তার জন্য দায়ী হয়ত সে নিজে। কিন্তু বঙ্গবালা সমস্ত কিছুর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। তিনি বঙ্গবালার বাপ, বঙ্গবালার সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েছেন। বিচারকের আসন থেকে তিনি কন্যার টানে অপরাধীর স্থানে নেমে এসেছেন। শাস্তি তাঁর নেওয়া উচিত। নিজে শাস্তি না নিয়ে কাউকে তিনি শাস্তি দেবেন কি করে?

তখনই তিনি ব্রজবিহারীবাবুর কাছে গেলেন। সকল কথা অকপটে বলে ফেললেন—বলুন, আমি কি করব?

ব্রজবাবু বললেন—এত বিবরণ আমি জানতাম না। তবে মোটামুটি জেনেছিলাম।

চন্দ্রবাবু অধীর ভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন—আমার কর্ত্তব্য কি বলুন?

—আপনার কর্ত্তব্য বলতে আপনি কি বলছেন?

—হয় আমাকে বঙ্গকে শাস্তি দিতে হয়—

—বঙ্গ আপনার মেয়ে, তাকে শাস্তি দিলে আমরা কি বলতে পারি? সে আপনি বাপ হিসেবে করবেন। হেড মাষ্টার হিসেবে কর্ত্তব্য হলে—এ নিয়ে আপনাকে থানায় যেতে হয় মাষ্টারমশায়। গাঁজার দোকানের ভেণ্ডার থেকে অনেক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হয়। বঙ্গকে আপনি শাস্তি দিতে যাবেন কি বলে?

—আমি ভাবছিলাম—আমি রিজাইন দেব। আপনি আমার চেয়ে অনেক যোগ্য ব্যক্তি ব্রজবাবু। আপনি হেড মাষ্টার হোন।

—আপনি এ নিয়ে বড় বেশী চঞ্চল হয়েছেন।

—চঞ্চল হব না? বলেন কি মাষ্টারমশাই? আমার মেয়ে—

—আপনার মেয়ে? বঙ্গবালা দশ-এগার বছরের মেয়ে; সে ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছে। তার উপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? না—না। এসব করবেন না। আরও একটা খবর আপনাকে দিই। ধুতুরার বীজ ঝুল—আরও কি কি মিশিয়ে শেষের সিদ্ধিটা শম্ভু নিজে বেঁটে তৈরি করেছিল। তকরার হয়েছিল ওদের মধ্যে—এই রোট যে খেয়ে সহ্য করতে পারবে সে পঁচিশ টাকা বাজী জিতবে। শম্ভুর পাগল হওয়ার জন্য দায়ী শম্ভু নিজে।

ব্রজবাবুর কথা অস্বীকার করতে পারেন নি চন্দ্রবাবু। কিন্তু বঙ্গবালার দায়িত্ব নেই এ কথাও মানতে পারেন নি। বাড়ী ফিরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিলেন সারাক্ষণ। কোনক্রমে স্নান-খাওয়া সেরে স্তোত্রপাঠের আসর থেকে আপিস-ঘরে এসে চেয়ারে মাথায়

হাত দিয়ে বসে রইলেন।

কি তাঁর কর্ত্তব্য? তাঁর কর্ত্তব্য একটা আছে। নিশ্চয় আছে, কি করলে তাঁর মনের এ গ্লানি কেটে যায়? হঠাৎ একটা পথ যেন তিনি পেলেন। ইস্কুলের শেষ ঘণ্টা। ব্রজবাবু সেকেণ্ড ক্লাসে এডিশনাল ম্যাথামেটিকস করাচ্ছেন, তাঁর নিজের ক্লাস ফার্ষ্ট ক্লাস। ব্রজবাবুই বলেছেন—তিনি ফার্ষ্ট ক্লাসে একটা ট্রানস্লেসন টাস্ক দেবেন। ক্লাস দুটো পাশাপাশি, মাঝের দরজা খুলে রেখেছেন।

চন্দ্রবাবু হন্‌হন করে এসে ক্লাসের দরজায় দাঁড়ালেন।

ব্রজবাবু বেরিয়ে এলেন—অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি এলেন কেন? আমাকে ডাকলেই তো পারতেন।

—আমি একটা উপায় পেয়েছি ব্রজবাবু। হোয়াট ডু ইউ সে?

—কি বলুন।

—শম্ভুর সমস্ত চিকিৎসার খরচ আমি বহন করব।

—চলুন, এখানে নয়। দ্য বয়েজ আর ওভারহিয়ারিং। আপিসে এসে ব্রজবাবু বললেন—শম্ভু গরীব ছাত্র, ভাল ছাত্র। তার চিকিৎসার খরচ আপনি বহন করেন, সে ভাল কথা। কিন্তু দায় বলে গ্রহণ করলে আপত্তি করব। আর শম্ভুর খরচ সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা করে দিতে চাচ্ছে। তাদের আমি বলেছি।

—আমি অর্দ্ধেক দেব।

—ভাল। ওকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। ওর বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। আর একটা কথা।

—বলুন।

—গোপালবাবু, আপনি বাইরে যান একটু।

কেরানী গোপালবাবু বাইরে চলে গেলেন।

—রবি সিংহের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন?

—বঙ্গবালার?

—হ্যাঁ।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন চন্দ্রবাবু। কি উত্তর দেবেন? উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তাঁর কল্পনা ছিল বঙ্গকে লেখাপড়া শেখাবেন। সেই হবে এ অঞ্চলের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। সে এখানে মেয়েদের মধ্যে নতুন জীবন আনবে। কিন্তু—কি হয়ে গেল—।

ঢং ঢং শব্দে ছুটির ঘণ্টা পড়ছে।

ব্রজবাবু বললেন—স্থির করুন। বিয়ে যদি দেন তো ভাল। সে মত যদি না থাকে তবে রবি সিং মাস্ট গো ফ্রম হিয়ার। ওকে যেতে হবে।

দল বেঁধে মাষ্টাররা এসে ঢুকলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সাত বৎসর পর।

চন্দ্রভূষণবাবু টেলিগ্রাফ পিওনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

রাজামিয়া ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ পিওন। সে বেশ উৎসাহিত কণ্ঠে ডাকলে—টেলিগেরাপ—মাষ্টারবাবু।—চন্দ্রভূষণবাবু বুঝেছেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ালেন আপিসের দরজায়।

—বকশিশ চাই হুজুর!

—নিশ্চয়! পাবি বই কি!

টেলিগ্রামখানা খুলে ফেললেন চন্দ্রভূষণবাবু।

টেলিগ্রাম করেছেন ব্রজবিহারীবাবু। দীর্ঘ টেলিগ্রাম। বঙ্গবালা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছে। বিধু ইউনিভারসিটিতে ফার্ষ্ট ষ্ট্যাণ্ড করেছে। ভুবন ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছে। অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ব্রজবিহারী।

মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশে বাতাসে যেন হাজার রঙের ফানুষ ভেসে উঠল। চন্দ্রবাবু দরজার বাজুটা চেপে ধরলেন। সারাটা জীবনে এমন বিপুল আনন্দের আকস্মিক আবির্ভাব তাঁকে এক মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করে নাই। মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

—ভূপতি! রাজাকে একটা টাকা বকশিশ দাও। ভূপতি ইস্কুলের নতুন ক্লার্ক। কেষ্ট! কেষ্ট!

কেষ্ট আপিসের পাশের ঘরে বসে ঢুলছিল। চন্দ্রবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের ডাক শুনে সে ধড়মড় করে উঠে এল—আজ্ঞে!

—মাষ্টার মশায়দের ডাক। এখ্খুনি!

—আজ্ঞে!

—বিধু ইউনিভারসিটিতে ফার্ষ্ট হয়েছে, ভুবন পনের টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে। যাও! যাও।—হাঁ। আর বাসায় যাবে একবার। বঙ্গ পাস করেছে ফার্ষ্ট ডিভিশনে, সব আগে শম্ভুকে খবর দাও।

শম্ভু অর্থাৎ শম্ভু গড়াঞী। সাত বছর আগে সিদ্ধি খেয়ে যার মাথা খারাপ হয়েছিল। সুস্থ হতে শম্ভুর লেগেছিল একটি বছর। এক বছর পর শম্ভু আবার এসে ভর্ত্তি হয়েছিল। কিন্তু স্মৃতি ও মেধার সে দীপ্তি আর ফিরে পায় নি। নর্ম্মাল পাস করা ছেলে—অঙ্ক-সংস্কৃতে পণ্ডিত, ইংরিজীতেও সে কাঁচা ছিল না; সকলেই প্রত্যাশা করেছিলেন শম্ভু স্কলারশিপ পাবে। কিন্তু ওই ঘটনার পর শম্ভু কেমন যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল। শম্ভু ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাসই করেছিল, স্কলারশিপ পায় নি। অর্থাভাবে পড়ার সঙ্গতি ছিল না, তার উপর শম্ভুর আর দুটি ভাই—তারাও এই ইস্কুলেই পড়ছিল। সেই কারণে শম্ভুর সঙ্গে সঙ্গেই উপার্জ্জন করার প্রয়োজন ছিল। চন্দ্রবাবু নিজেই শম্ভুকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন। এখানকার ফিস্থ

মাষ্টার এখন সে। বিধু শম্ভু গড়াঞীরই সব ছোট ভাই। বিধু সত্যই চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের কপালের অক্ষয় চাঁদ! এ চাঁদ কলায় কলায় ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়ে পূর্ণচন্দ্র হোক।

আক্ষেপ হচ্ছে—শম্ভুর আর ভাই নাই।

অদ্ভুত মেধাবীর বংশ। বিধুর বড় শম্ভুর ছোট শিবু—সেও দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল। স্কলারশিপ পাওয়ার দিক থেকে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ভাগ্য ভাল নয়। তাঁর ভাগ্য ইস্কুলের ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানো। ধ্রুবর মত ভাল ছেলে, সে স্কলারশিপ পায় নি। শম্ভুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আর একটি ভাল ছেলে—কালী, সে দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল। তার পর কয়েক বছরের মধ্যে ওই শিবু পেয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ, একটি মুসলমান ছেলে এবং আর একটি তপশীলী জাতির ছেলে পেয়েছে বিশেষ বৃত্তি। বাকী বৎসরগুলি বন্ধ্যা গিয়েছে।

এ বৎসর অভূতপূর্ব্ব ভাগ্য। বিধু ফার্ষ্ট হয়েছে ইউনিভারসিটিতে। ভুবন ডিভিশনে ফার্ষ্ট হয়েছে। তার সঙ্গে বহু পাস করেছে।

সাত বৎসর পর এ তাঁর যেন সপ্তম স্বর্গ।

সাত বৎসরে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন, ব্রজবিহারীবাবু এখান থেকে ভাল চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছেন। জয় হোক ব্রজবিহারীবাবুর, দিন দিন তাঁর উন্নতি হোক, ভাগ্য তাঁর প্রসন্ন থেকে প্রসন্নতর হোক, তিনি চন্দ্রভূষণবাবুর কাছে অবিস্মরণীয়; চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনে তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রয়েছে এবং থাকবে। পুরনো কাল চলে যায়, নতুন কাল আসে—পুরনো কালের সঙ্গে যা পুরনো হয় তাকে পুরনো কালের সঙ্গেই যেতে হয়, নতুন কালে তার স্থান নাই—স্থান হয় না। যে নতুন কালের সঙ্গে জীর্ণতা বর্জ্জন করে নবীনত্ব অর্জ্জন করতে পারে, সে-ই থাকে। ব্রজবিহারীবাবু চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনকে নবীনত্বের মন্ত্র দিয়ে গেছেন। কালের সঙ্গে নবীন হয়ে হয়ে সে সগৌরবে চলেছে। আজ এ কি আকস্মিক প্রকাশ তার! ব্রজবিহারীবাবুই বঙ্গবালার পড়ার ভার নিয়েছিলেন। গত বছর পর্য্যন্ত পড়িয়ে গেছেন তিনি। সাত বছর আগে ওই শম্ভু যখন সিদ্ধি খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে চলে গেল তখন বিচিত্র ভাবে বঙ্গবালার প্রশ্ন এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। রবি সিংহ বলে সেই ছেলেটিকে নিয়ে সে কি সমস্যা!

ব্রজবাবুই বলেছিলেন স্থির করুন। ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন তো ভাল। সে মত যদি না থাকে তবে রবি সিং মাস্ট গো। ওকে যেতে হবে।

মাষ্টারেরা ঠিক সেই সময়টিতেই দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আর কথা হয় নি এবং তখনই উত্তর দেবার মত মানসিক অবস্থাও তাঁর ছিল না।

ব্রজবাবু বলেছিলেন—আচ্ছা—সেকথা পরে হবে।

মন ঠিক করতে লেগেছিল এক মাস। সুযোগও হয়েছিল—সামনেই ছিল পুজোর ছুটি। রবি বাড়ী গিয়েছিল। তিনিও বঙ্গবালাকে নিয়ে বাড়ী গিয়েছিলেন। সত্যবতী বলেছিল—দোষ কি? ঘর ভাল। ছেলেটি দেখতে যেন রাজপুত্তুর। পড়াতেও খারাপ নয়। দাও

না বিয়ে।

রামজয় বলেছিল—শুভস্য শীঘ্রং।

—কিন্তু এত অল্প বয়সে—

—অল্প বয়স? ওহে অষ্টম বর্ষে গৌরীদান সেদিন পর্য্যন্ত চলিত ছিল। এই তো বাবুদের বাড়ীতে দেখ না, বড়বাবুর মেয়ের দশ বছরে বিয়ে হ'ল। ওই কমলেশের বোনের এগার বছরে—

—ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ আছে রামজয়। আমার ইচ্ছে—

—কি তোমার ইচ্ছে?

—আমার ইচ্ছে রামজয়—বঙ্গবালা লেখাপড়া শেখে।

—বেশ তো শিখুক না। ঘরে পড়াও।

—সে পড়া নয় রামজয়।

—তবে? একটু চমকে উঠেছিল রামজয়।

—আমার ইচ্ছে—বঙ্গবালাকে আমি ইস্কুল-কলেজে পড়াই। অন্ততঃ বাড়ীতে পড়িয়েও পরীক্ষা দেওয়াই। বঙ্গবালা এখানকার প্রথম মেয়ে গ্রাজুয়েট হবে। আমার ছেলে নেই; আমি এখানে প্রথম হাই ইস্কুল করেছি—বঙ্গবালা এখানে প্রথম মেয়েদের হাই ইস্কুল করবে—এই আমার ইচ্ছে।

—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

—কেন রামজয়?

—গোবিন্দকে ডাকব না তো কাকে ডাকব বল? মেয়ে তোমার পাস করবে মাষ্টার হবে, ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে সাদা সিঁথি টেনে ইস্কুল করবে আর ওদিকে তোমার চৌদ্দপুরুষ বংশলোপের সঙ্গে নরকস্থ হবে। এ মতি তোমাকে কে দিলে বল তো? ব্রজবাবু?

—না। তাঁকে দোষ দিও না। এ আমার নিজের ইচ্ছে।

এর পর রামজয় আর বসে থাকে নি, উঠে চলে গিয়েছিল এবং গোটা পুজোর ছুটিটাই আর আসে নি। তিনিই একদিন রামজয়ের কাছে গিয়েছিলেন।

—রাগ করেছ?

—না। লজ্জা পেয়েছি নিজের কাছেই।

হেসেছিলেন চন্দ্রবাবু। রামজয় বলেছিল—লজ্জায় আমিই যেতে পারি নি। নিত্যই যাব ভেবেছি কিন্তু লজ্জা পেয়েছি।

তামাক সেজে কায়স্থের হুকোর মাথায় চাপিয়ে চন্দ্রভূষণের হাতে দিয়ে বলেছিল—খাও।

আর একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তুমি যখন পড়াবে ঠিক করেছ বঙ্গবালাকে—তখন পড়াও। আমার মত আমি পরিবর্ত্তন করেছি। তবে সংস্কৃত পড়িও।

—হঠাৎ?

রামজয় বলেছিল—গিয়েছিলাম মোহনপুর; বর্দ্ধমানের উকীল সন্তোষবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধে।

খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক নিমন্ত্রিত ছিল। সেখানে চন্দ্র—ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা—ব্রাহ্মণদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করলে সন্তোষবাবুর মেয়ে। বছর পঁচিশেক বয়স হে; অবাক হয়ে গেলাম। ওহে, সভায় বসে আমাদের সব প্রশ্ন করলে। শুনলাম—মেয়েটি সংস্কৃতে এম-এ পাস। সন্তোষবাবু বললেন—মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন বাল্যকালে, বছরখানেক পর বিধবা হয়। প্রথম ইচ্ছা করেছিলাম—বিবাহ দেব। কিন্তু মা রাজী হন নি—আমার স্ত্রীও না, সবচেয়ে আপত্তি হয়েছিল মেয়ের। ও বলেছিল—আমাকে পড়ান বাবা, আমি পড়ব। তা ওর বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠাও অপরিসীম। পাস করে গেল একটার পর একটা। এম-এতে তো ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। ওর জন্ত আমি নিশ্চিন্ত। গল্প করলেন—এদিকে দেখছেন শান্ত শিষ্ট কিন্তু এই এবার মায়ের অসুখের সময় আমার আগেই ওরা এল এখানে। সেকেণ্ড ক্লাসে আসছে। পথে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠলেন সদলবলে। সাহেবের ক'জন চেলাচামুণ্ডা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে মেয়েছেলেদের রক্ষকহীন দেখে চ্যাঙড়াপনা করেছিল। মেয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডা-মূর্ত্তি ধারণ করেছিল। সমানে তর্ক জুড়েই ক্ষান্ত নয়, শেষ একটা ষ্টেশনে নেমে পাশের গাড়ীতে সাহেবের কাছে হাজির। চোস্ত ইংরিজীতে সাহেবকে বলেছিল—তোমরা নিজেদের খুব সভ্য বল, কিন্তু তোমাদের চেলারা এত অসভ্য কেন? মেয়েদের সম্মান করা দূরে থাক—অপমান করে? সাহেব অবশ্য লোক ভাল—সে নিজে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে অসভ্য চেলা দুটিকে কামরা থেকে নামিয়ে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছে। বলেছিল—আমি ওদের কঠিন শাস্তি দেব। তা ওর মায়া-মমতাও আছে—বলেছে তা করবেন না সাহেব, কারণ ওরা তো আমার দেশের লোক, আমরাই তো ওদের মা। আমাদের কাছেই তো প্রথম শিক্ষা। কে জানে—ওই অসভ্যতা আমাদের দোষেই ওরা শিখেছে কিনা!

গল্প শেষ করে রামজয় বলেছিল—বঙ্গবালাকে এমনই একটি মেয়ে যদি করতে পার তবে সত্যিই আনন্দের হবে। আর—

আর একটি মেয়ের কথা বলেছিল—রামজয়ের এক জ্ঞাতিকন্যার কথা। মেয়েটির ভাল বিবাহ হয়েছিল। পাত্রপক্ষের অবস্থা ভাল—ছেলেটিও ভাল। কিন্তু মেয়ের সন্তান হ'ল না বলে তারা ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির অবশ্য দোষ একটু আছে, সে বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে—সে সতীন নিয়ে ঘর করতে পারলে না। বাপের বাড়ী এল। বাপ তিরস্কার করলে, ভাই ভাজ অসন্তুষ্ট হ'ল। মেয়েটা অভিমানে ঘর থেকে একবস্ত্রে চলে গেল মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতেই বা ও মেয়ে থাকবে কি করে? সে এখন ভাত রান্না করছে এক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাড়ীতে। বলে খেটে খাবে।—তুমি শেখাও। ওকে লেখাপড়া শেখাও;—আমার বীণা—

রামজয়ের বিধবা মুখরা মেয়ে বীণা।

—ওকে যদি লেখাপড়া শেখাতাম চন্দ্র, আর কিছু না পারুক গ্রামে পাঠশালা করত। ওতে মনের একটা জোর হয়, পাড়াকুঁদুলী হয় না। সেদিন রাগ করা আমার অন্যায়

হয়েছিল।

চন্দ্রভূষণ মনে জোর পেয়েছিলেন। স্থির করেছিলেন—বঙ্গকে লেখাপড়াই শেখাবেন। গ্রাজুয়েট। শ্রীমতী বঙ্গবালা ঘোষ, বি-এ। ডটার অব চন্দ্রভূষণ ঘোষ, বি-এ। হেডমিস্ট্রেস—বিল্বগ্রাম গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল।

ছুটির পর এসে ব্রজবাবুকে বলেছিলেন—মনস্থির করেছি ব্রজবাবু। বঙ্গবালাকে আমি পড়াব—রীতিমত পড়াব। বিয়ের কথা এখন ভাবব না। যদি পড়াশুনা না হয়—

হা-হা করে হেসেছিলেন ব্রজবাবু। আপনার মেয়ের লেখাপড়া হবে না?

—তা হয় না! পণ্ডিত বাপের মূর্খ ছেলের অভাব নেই। অনেক।

—সে পণ্ডিত লোকেরা বাপ হিসেবে মূর্খ বলে। আপনার বঙ্গবালার পড়ার ভার আমি নেব। আমার স্ত্রী এখন ওকে পড়াবে, আমি তদ্বির করব। তার পর বছরতিনেক পর ফোর্থ ক্লাস থেকে আমি পড়াব।

ব্রজবাবু সেই বারই বাসা করেছিলেন। মেয়েটি শহরের মেয়ে, ম্যাট্রিক পাস। বিয়ের পর বাড়ীতে ব্রজবাবুর কাছেই আই-এ পড়ছিল। চমৎকার মেয়ে। তাঁর কাছে বঙ্গ শুধু লেখাপড়াই শেখে নি—একটা আদর্শ পেয়েছিল তাঁর মধ্যে।

ব্রজবাবু বলেছিলেন—আপনাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। বছরে চারটে পরীক্ষা নিতে হবে। রীতিমত কোশ্চেন পেপার করে এগজামিনেশন।

রবি সিং সেই বছর ক্লাস প্রমোশনের পর এখান থেকে ট্রানসফার নিয়ে চলে গেল।

সাত বছর পর বঙ্গবালা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলে।

আর বিধু গোটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট হয়েছে। ভুবন ডিভিশনে ফার্স্ট হয়েছে। এ আনন্দ তিনি রাখবেন কোথায়? এমন দিন তাঁর জীবনে আর কখনও আসে নি, হয়ত কখনও আসবে না। না আসবে—আসতে পারে। দু'বছর পর বঙ্গ যখন আই-এ দেবে, সেবার—তাঁর ইস্কুলের—সেবার কান্তি বলে ভাল ছেলেটি সে—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হতে পারে।

—মাষ্টারমশায়—

—ও শম্ভু! টেলিগ্রামখানা বাড়িয়ে ধরলেন চন্দ্রবাবু—পড়! বিধু ফার্স্ট হয়েছে।

শম্ভুর চোখ দুটি চিরকালের জন্য কেমন লালচে হয়ে গেছে; দৃষ্টির একটা অস্বচ্ছতা যেন চব্বিশ ঘণ্টা ফুটে থাকে। মধ্যে মধ্যে অর্থহীন ভাবে হাসে। শম্ভু হাসছে।

—সে আমি জানি। একটি আঙুল তুলে বললে—এটা আমিও জানি, বিধুও জানে। খুক খুক করে সকৌতুকে হাসছে শম্ভু।—শিবুও হ'ত—ফার্স্ট-সেকেণ্ড একটা হ'ত। কিন্তু সে একটা খারাপ কাজ হয়ে গেল। আমি জানি আর শিবু জানে।

—চন্দ্র!

আজ চন্দ্র বলে আহ্বান করে রামজয় এসে ঢুকলেন।

—এস রামজয়! আজকের মত শুভ দিন আমার জীবনে আর আসে নি।

—বঙ্গবালা পাস করেছে। ফার্স্ট ডিভিশনে। এই যে! আয়—আয়—আয় মা।

বঙ্গবালা ছুটে এসেছে খবর পেয়ে। বঙ্গবালা আজ সলজ্জ কিশোরী। সে প্রণাম করতে লাগল সকলকে।

এদিকে ক্লাসে ক্লাসে কলরব উঠেছে। ছেলেরা হৈ-চৈ সুরু করেছে।

—ছুটি দাও চন্দ্র।

—নিশ্চয়!

—কেষ্ট! কেষ্ট! না, দাঁড়াও। ভূপতি! ইস্কুলের হলে সমস্ত ছেলেদের জড়ো হতে বল। আমি ওদের কিছু বলব। হ্যাঁ কিছু বলা দরকার। তার পর ছুটি। শুধু আজকের মত নয়। কাল ফুল হলিডে। ফুল হলিডে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দিন পনের পর।

সে দিন তিথিতে পূর্ণিমা। এদিকে মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে ইস্কুলের ছুটি। পর পর দু'দিন ইস্কুল বন্ধ। শনিবার ছুটি, রবিবার যথানিয়মে ইস্কুল বন্ধ। চন্দ্রবাবুর বাসায় সেদিন প্রায় মহোৎসব। অনেক কাল পর আবার তাঁর বাড়ীতে সত্যনারায়ণ সেবার আয়োজন হয়েছে। সেই প্রথম বাসা পত্তনের পর সেই যে সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল—যার আয়োজনের মধ্যে ছেলেরা সিদ্ধির কচুরী ভেজে খেয়েছিল—শম্ভু পাগল হয়ে গিয়েছিল—সেই সত্যনারায়ণ সেবার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন সমারোহ তাঁর বাসায় তিনি করেন নি। ছোট সংসার, বঙ্গবালা ছাড়া সন্তানও নেই; সংসারে একমাত্র অবশ্য পালনীয় পর্ব্বের মধ্যে পিতৃ ও মাতৃশ্রাদ্ধ। সেও তিনি আগে ঠিক করতেন না, এখন করেন। সে উপলক্ষেও ইস্কুলের শিক্ষক কয়েক জন ছাড়া আর কাউকে নিমন্ত্রণ করেন না এবং তাতে কোন ঘটাও তিনি করেন না। মধ্যে একবার সত্যবতীর ব্রত প্রতিষ্ঠা গিয়েছে। ভাদ্র মাসে অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত প্রতিষ্ঠা। রামজয় বলেও ছিলেন—চন্দ্র, এতকাল এখানে রয়েছ—এখানকার সমাজে সকলের বাড়ীতেই তোমার নেমন্তন্ন হয়, বহুজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছে, এই উপলক্ষে দশ জনকে তুমি একদিন নেমন্তন্ন কর না কেন? খেয়েই থাকবে চিরদিন?

চন্দ্রবাবু হেসে বলেছিলেন—আমি তো সামান্য লোক রামজয়, মাষ্টার পণ্ডিত মানুষ, আমার কি সাধ্য বল? সত্য বলতে আমি তো গরীব সামান্য লোক।

রামজয় বলেছিলেন—চন্দ্র, কথাটা ঠিক হ'ল না ভাই। এ অঞ্চলে যত বড়লোক সব তোমার ছাত্র না-হয় ছাত্রের বাপ। তোমার বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হলে তুমি কাকের মুখে বার্ত্তা দিলে দশটা যজ্ঞের আয়োজন ভারীর কাঁধে চাপিয়ে তোমার ঘরে তুলে দেবে।

চন্দ্রবাবুর মুখ স্মিতহাস্যে ভরে উঠেছিল। বলেছিলেন—কথাটা ষোল আনা সত্য না হলেও আট আনা সত্য বটে। ভাবতে ভালই লাগে। কিন্তু চাইতে আমি ঠিক পারব না।

—আমি চেয়ে আনব। ও ভারটা আমার হাতে দাও। আমি বামুন মানুষ। আমার অভ্যেস আছে।

তা আছে। রামজয় গৃহস্থ হিসাবে আদৌ অভাবী নয়, সচ্ছল গৃহস্থ। এমন কি সামান্য বেতন এবং চাষবাসের আয় থেকে সংসার চালিয়ে যা সঞ্চয় করে পোস্ট আপিসের খাতায় জমা করে বিধবা কন্যার জন্য। তার অভাব নাই। তবুও সে নানা উপলক্ষে নানা স্থান থেকে ভিক্ষে করে আনে। ছাত্র আছে, শিষ্য-সেবক আছে, অবস্থাপন্ন লোক আছে যারা শিষ্যও নয়, ছাত্রও নয়, তাদের কাছে গিয়ে রামজয়ের হাত পাততে কোন সঙ্কোচ নেই। মাটির ঘর হচ্ছে—রামজয় কারও কাছে গিয়ে দুটো তালগাছ, কারও কাছে জামগাছ, কারও কাছে অর্জ্জুন গাছ চেয়ে সংগ্রহ করে আনে। বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হলে কারও কাছে মাছ, কারও কাছে কাঠ চেয়ে নেবে। এমন কি খড়, সাবুই এসবও চাইতে তার দ্বিধা নাই। যেসব ছাত্র কলকাতায় থাকে তাদের কাছে পালা করে পত্রযোগে বরাত পাঠায়। 'আমার জন্য এক জোড়া তালতলার চটি আনিবে।' 'গতবার তুমি যে চমৎকার ধূপ-শলাকা আনিয়া দিয়াছিলে তাহার গন্ধে দেবতা সন্তুষ্ট হন। অতএব ঐ ধূপশলাকা এবারও কিছু আনিবে।' 'আমার পুজোর সময় পরিধানের পট্টবস্ত্র ছিঁড়িয়া কষ্ট পাইতেছি; একখানি মটকার ধুতি তোমার নিকট দাবী করিতেছি। অবশ্য অবশ্য লইয়া আসিবে। ঐ ধুতি পরিয়া পূজার্চ্চনা করিব এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।' 'এবার শীতকালে আমার শীতবস্ত্র নাই। দীর্ঘদিনের বাসনা একখানি বালাপোষ গায়ে দিই। তুমি বহরমপুরে আছ। মুরশিদাবাদ উৎকৃষ্ট বালাপোষের জন্য বিখ্যাত। তোমার নিকট হইতে একখানি বালাপোষ চাহিতেছি। আতর ইত্যাদির গন্ধে প্রয়োজন নাই। তবে বেশ 'ফাইন' হওয়া চাই। তোমার নিকট হইতে খেলো দ্রব্য আমি লইব না।"

এ নিয়ে অনেক বার অনেক কথাই উঠেছে ইস্কুলে।

রামজয় অকপটে অসঙ্কোচে স্বীকার করেছে, বলেছে—হ্যাঁ চেয়েছি। দিয়েছে। নিয়েছি। কিন্তু এরা তো প্রাক্তন ছাত্র—'এক্‌সো ষ্টুডেণ্ট'। ওদিকে তো খাতা দেখার সময় পারশিয়ালিটি করে অধিক মার্ক দেবার সম্ভাবনা নাই। ওরা সব কৃতী ছাত্র, কেউ চাকরি করে, কেউ পড়ে, কত বাজে খরচ করে সেখানে। যে বিদ্যার জোরে করে তার কিছুটা আমি শিখিয়েছি, অকৃপণ ভাবে শিখিয়েছি। পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতন পাই। দৈনিক তা হলে দেড় টাকা। আজকাল যারা ঘরামির কাজ করে, যারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে তারা পায় পাঁচ সিকে দেড় টাকা। তাতে আপত্তি করি না। কারণ সারাটা জীবন ছেলেদের প্রণাম পাই, মনে মনে জানি অভাব হোক, অভিযোগ হোক ওরা আমার পূরণ করে দেবে। আগেকার কালে দিয়েছে—একালেও দেবে। যেদিন জানব দেবে না, সেদিন আর চাইব না, ইস্কুলেও চাকরি করব না। দেখুন, আগেকার কালে জমির আল ভেঙে গেলে বেটাদের কোদাল নিয়ে ছুটতে

হ'ত। জল বাঁধ না মানলে পিঠ দিয়ে শুতে হ'ত। গরু চরাতে হ'ত গুরুর। সেকাল অবিশ্যি নেই। কিন্তু একখানা বালাপোষ পনের-ষোল টাকা দাম, একখানা মটকার ধুতি—দশ-বারো টাকা দাম—আট আনার ধূপশলাকা, দেড় টাকা পাঁচ সিকের তালতলার চটি—এ চাইবার অধিকার আমার আছে মশায়।

কথাটা বলেছিলেন নতুন এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার সৌরীনবাবুকে। ব্রজবিহারীবাবু চলে যাবার পর এসেছেন সৌরীন্দ্র ঘোষ। কলকাতার লোক। আধাবয়সী মানুষটি একটু কেমন খটরোগা মানুষ। ডিসপেপ্‌সিয়ার রোগী—অন্যথায় লোক মন্দ নন। মাথনবাবু সেকেণ্ড মাষ্টারও চলে গেছেন। এখান থেকে এম-এ পাস করে এই জেলারই এক শহরের ইস্কুলে হেডমাষ্টার হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় চন্দ্রবাবু বেছে নিয়েছেন বসন্তকে। এই ইস্কুলেরই ছাত্র বসন্ত। এখানকারই ছেলে। শান্ত মেধাবী গরীবের ছেলে। বেচারীর মা অনেক কষ্টে ছেলেটিকে বি-এসসি পাস করার খরচ যুগিয়েছে। চরিত্রবান মিষ্ট স্বভাবের ছেলেটির উপর চন্দ্রবাবুর সস্নেহ দৃষ্টি অনেক দিনের। অজাতশত্রু ছেলে বসন্ত। চন্দ্রবাবু বসন্তকে ডেকে বলেছিলেন—পাস করলে, এবার কি করবে?

ছাত্র ইস্কুলের পড়া পাস করেই হোক আর ফেল করে তিক্ত হয়েই হোক ছেড়ে বাইরে গেলেই চন্দ্রবাবু তাকে আর তুই-তুকারি করেন না—তুমি বলে থাকেন।

বসন্ত উত্তর দিতে পারে নাই। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। আশাআকাঙ্ক্ষা তো অনেক। আবার দরিদ্র পল্লী যুবকটির ভীরুতারও অন্ত নাই। ইচ্ছা হয় আরও পড়ে, বিলাত যায়, আই-সি-এস হয়ে আসে—জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়, ইচ্ছা হয় ব্যারিষ্টার হয়ে আসে; ইচ্ছা হয় ব্যবসা করে—ওই চৈতন্য বাবুদের মত বিশাল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ইচ্ছা হয় ওই রকম ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা সেলসম্যান ওই রকম একটা কিছু হয়; আরও অনেক আকাঙ্ক্ষা হয়। কখনও উত্তেজনার মুহূর্তে চকিতের মত মনে হয় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের পন্থা অনুসরণ করে দেশনেতা হয়ে ওঠে। কিন্তু ভয় হয়। নিদারুণ একটা ভয়। কিছুক্ষণ ভাবতে ভাবতেই অন্তরাত্মা যেন জলমগ্নের মত হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় এই সব বিশাল বিস্তীর্ণ জীবন সমুদ্রের মত দিশাহীন—তলহীন; এর কূল নাই কিনারা নাই, আছে শুধু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, মুহূর্ত্তে গ্রাস করে নেয়, সে তার মধ্যে ডুবে যাবে, তলহীন অনন্ত গভীরতার মধ্যে। সে গরীব ঘরের ছেলে, তার মা তাকে বাল্যকাল থেকে শিখিয়েছে—ওই সব বড় ঘরের ছেলেদের কথা আলাদা বাবা, ওদের ভাগ্য আলাদা। ওদের ওপর ভগবানের দয়া আলাদা। ওদের সঙ্গে সঙ্গ করো না।

গল্প বলত মা; বলত—বাবা, এক রাজার ছেলে আর এক গরীবের ছেলে একই লগ্নে একই রাশিচক্র নিয়ে জন্মেছিল। দু'জনেরই পাঁচ বছর বয়সে স্বর্ণপ্রাপ্তি যোগ ছিল। পাঁচ বছর বয়সে একদিন দু'জনেই খেলা করছে। রাজার ছেলে রাজার বাগানে আর গরীবের ছেলে তাদের বাড়ীর পাশে—শুকনো ডোবার ধারে। রাজার ছেলে মাটির তলা থেকে পেলে একটা হলুদ-বরণ মাটির ঢেলার মত ঢেলা; সেটা হ'ল সোনার একটা বাট; কোন কালে

হয়তো ওই রাজবাড়ীরই কেউ বাগানে হারিয়েছিল। আর গরীবের ছেলেও পেলে মাটির তলা থেকে হলুদ-বরণ একটা কি। সেটা হ'ল—মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া একটা সোনা ব্যাঙ।

এই গল্প এবং মায়ের ওই ভীরু সযত্ন পক্ষপুট আচ্ছাদনের প্রভাব তার জীবনের সাহস এবং উদ্যমকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। নইলে তারই চোখের সামনে এই ইস্কুলের ছাত্র এই বিল্বগ্রামের ছেলে শ্যামাপদ ফেল করে করে কোনমতে বি-এ পাস করে বড় ব্যবসায়ী হয়েছে; দেশনেতা না হোক এই অঞ্চলের একজন নেতা হয়েছে। একজন এম-এস্‌সি পাস করে সরকারী হিসাব বিভাগের পরীক্ষা পাস করে বড় চাকুরে হয়েছে; যারা কোন পাসই করে নি, তারাও বংশ-প্রতিষ্ঠার গৌরবে প্রতাপশালী এবং অনেক কিছু। ভীরু বসন্তের অন্তরতম গোপনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষাই উঁকি মারুক—তারা কোন দিন প্রকাশ্যে মাথা তুলতে পারে নি; তার সচেতন প্রকাশ্য অন্তরের আশা ছিল স্বল্প সচ্ছল আয়, অনুদ্ধত খানিকটা প্রতিষ্ঠা; আশার মধ্যে যেটুকু ছিল বৃহৎ—যেটুকু ছিল মহৎ—সে হ'ল লোকের স্নেহ এবং প্রশংসা। সে দিক দিয়ে শিক্ষক-জীবন তার পক্ষে আদর্শ জীবন। কিন্তু চন্দ্রবাবু নিজে ডেকে তাকে যখন প্রশ্ন করলেন—কি করবে এখন, তখন তার জবাবেও সে ইস্কুলে কোন চাকরির কথা বলতে পারে নি। চন্দ্রবাবুই নিজে বলেছিলেন—সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনবাবু চলে গেলেন, লোক চাই; মাষ্টারী করবে?

সেই পুরাতন কালের ছাত্রের মত ঢোঁক গিলেই সে বলেছিল—করব স্যার্।

—কাল থেকেই এস তা হলে। পরে ম্যানেজিং কমিটিতে তোমাকে পারমেনেণ্ট করে নেব।

ষাট টাকা মাইনে। বসন্ত সেদিন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। বসন্ত এখন সেকেণ্ড মাষ্টার। মাখনবাবুর পর গেছেন ব্রজবিহারীবাবু। এসেছেন সৌরীনবাবু। সর্ব্বাগ্রে গেছেন ভূতনাথ-বাবু থার্ড মাষ্টার, মোক্তারি পাস করে চলে গেছেন। বাকী মাষ্টারদের সবই চন্দ্রবাবু ও রামজয় পণ্ডিতের ছাত্র। সেই কারণেই রামজয় এখন প্রায় অকুতোভয়। সৌরীনবাবুর কথার জবাবে বেশ রসালো এবং ঝাঁঝালো করে কথাগুলি বলতে আদৌ ভয় পায় না। এবং চন্দ্রবাবুকেও এমনই কোন উপলক্ষ্য করে অধিকতর প্রবলপ্রতাপ হতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু চন্দ্রবাবু তাতে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। স্ত্রীর ব্রতপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে মাছ কাঠ চাল তরিতরকারী নিয়ে বিল্বগ্রামে সমারোহ করে খাওনদাওনের প্রস্তাবেও তাই তিনি রাজী হন নি। রামজয়কে বলেছিলেন—না রামজয়, তা হয় না।

রামজয় বলেছিলেন—কেন? ঘুষ না হোক উপঢৌকন নেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে?

হেসে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—দেখ রামজয়, যে বৃত্তি নিয়েছি সে বৃত্তি ব্রাহ্মণের। শিক্ষাদান গুরুর কাজ, ব্রাহ্মণের কাজ। তুমি নিজে এ কাজ করছ।

—নিশ্চয়। প্রমোশন তো তোমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রমোশন পেয়ে তার মত

কাজ করতে হবে তো। তাই তো করতে বলেছি। ভিক্ষের ঝুলিটা কাঁধে নাও। কানের কলম—কায়স্থের চিহ্নটা সরাও, হিসেবনিকেশটা ভোল।

—সেই তো। সেই তো বলছি। আমার কাছে লেখাপড়া শিখে পরীক্ষা পাস করে, কিন্তু তোমার কাছে কানে মন্ত্র নেওয়ার মত মন্ত্র তো নেয় না; সে দেবার তো অধিকারও হয় না, সে হেডমাষ্টারই হই আর প্রফেসরই হই। তখন ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নেবার কি দক্ষিণে নেবার অধিকার আমাদের কি করে হয় বল?. তাই, সংসারে সব জিনিসটা কুণ্ঠাহীন অপরাধ-বোধহীন মনে করবার ক্ষমতাই আসল ক্ষমতা। সেটা তোমাদের আছে আমাদের নাই।

—তা নাই। হেসেছিলেন রামজয়।—তোমরা বামুনদের যতই ছোট আর যতই হীন ভাবতে চেষ্টা কর, আমাদের গায়ে দাগ লাগে না হে। তোমরা চাও না—থাকার গৌরবে, আমরা চাই না-থাকার গৌরবে।

এতকাল পরে চন্দ্রবাবু রামজয়কে ডেকে বলেছিলেন—এবার একদিন ভাল করে সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা কর রামজয়। খুব ভাল করে। মানে এখানকার স্থানীয় ভদ্রলোকদেরও খাওয়াতে চাই। শুধু একটা ভাবনা—

—কি?

—সত্যনারায়ণ সেবায় মাছ করব কি করে? আর মাছ না হলে খাওয়া-দাওয়াই বা ভাল করে কি করে হয়? বাঙালীর খাওন-দাওন তো।

—তার আর কি? সত্যনারায়ণের সঙ্গে মা-কালী মা-চণ্ডী জুড়ে দাও। বঙ্গবালা পাস করেছে, ইস্কুলের ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট; পূর্ণিমার দিন মা-চণ্ডীর স্থানে পুজো দাও। শুধু মাছ কেন—মাছ-মাংস দুই হোক; তার সঙ্গে রাধাবল্লভী—মালপো—। সে একেবারে ষোড়শোপচারে ভোজন; মধু গুড় একসঙ্গে।

ব্রাহ্মণ রামজয়ের এইসব বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই। পরমুহূর্তেই বলেছিলেন—এই তো পূর্ণিমেতে মুসলমানদেরও কি পরব আছে। তাও খানিকটা জুড়ে-টুড়ে দাও। ওদের মসজেদে কি কি সব পাঠাতে হয় পাঠিয়ে দাও। জেয়াউদ্দিনকে ডাক। ব্যস্, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হয়ে যাবে। চণ্ডীতলায় পুজো দাও, পুরুত ওঝা আমাদের ছাত্র, সে দেখবে মায়ের স্থানে ঝপাঝপ দুটো মানতের পাঁঠা যা জমা আছে—কেটে কেলে পাঠিয়ে দেবে। মসজেদে পুজো-ভেট পাঠাও, ওরাও শোনপাপড়ি ফলমূল পাঠিয়ে দেবে, মেজাদের বিলায়েৎ-এনায়েৎ দুই আমাদের ছাত্র। যদি একবার ঘাড় নেড়ে ইসারা দাও তো দুটো খাসিও পাঠিয়ে দেবে কোরবাণী করে। আর যদি বল—তাই তো এনায়েৎ-বিলায়েৎ—জনকয়েক যে আবার বলে বিরিয়ানী পোলাও খাব—কি বলে তার সঙ্গে পক্ষীমাংস খাব তা হলে তো দিলদরিয়া খুসী হয়ে সব তরিবৎ করে রেঁধে বেড়ে পাঠিয়ে দেবে। দেখবে সত্যনারায়ণের সেবায় লুচি, সুজির পায়েস, আটা, রাধাবল্লভী বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। কেউ খাবে না। ওই আমি আর শম্ভু চাটুজ্জে। ওই তো বসন্তকে জিজ্ঞেস কর না। কি বাবা বসন্ত—কি খাবে তুমি? এনায়েতের বাড়ী পাকানো—পলাণ্ডু রসুন সুরভিত পোলাও এবং পক্ষীমাংসের সুরুয়া অথবা

মা-চণ্ডীর প্রসাদী মাংসের ঝোল—মৎস্যের অম্বল অথবা সত্যনারায়ণের প্রসাদী নিরামিষ লুচি পায়েস আটা রাধাবল্লভী?—কিসে রুচি? অকপটে কহ। একে মিথ্যা কথা বলা পাপ। তদুপরি গুরুর সম্মুখে—ডবল গুরু। বল!

বসন্ত মৃদু হেসে বললে—সত্যি বলতে যখন বলছেন তখন পণ্ডিতমশায় বলি—ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় যখন হচ্ছে—তখন তাই হয়ে যাক। অল্প-অল্প করে সবই খাওয়া যাবে।

সকলেই হেসে উঠল কিন্তু চন্দ্রবাবু কি যেন গভীর চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

সমারোহ করে সেই উৎসব। হাসি-তামাসা করে রামজয় যা বলেছিলেন—চন্দ্রবাবু তার একটিও বাদ দেন নি। কথাগুলি তাঁর মনে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। ইদানীং তিনি দিন দিন অনুভব করছিলেন যে, মুসলমান ছাত্রেরা যেন ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে। উনিশশ' একুশ সনে একটা আশা জেগেছিল—হয়ত-বা হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদটা এইবার যাবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক যে একটি বিচিত্র ব্যক্তি ভারতবর্ষের জীবনক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁকে তিনি খুব প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি; লোকটির ধারণা-কল্পনাও তাঁর বিচারে ভ্রান্ত—পুরাপুরি পদার্থহীন—কোন মূল্য নাই। বিশ্ববিজয়ী—কূটবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়—রাজনীতি বিজ্ঞানে ধুরন্ধর—ইংরেজের সঙ্গে অহিংসা আর অসহযোগ অবলম্বন করে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে জয়ের প্রত্যাশা! এর চেয়ে ভ্রান্তি আর কি হতে পারে? তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আজ গোটা দেশটাকে নিরুৎসাহিত অবসন্ন করে ফেলেছে। ব্যর্থ হয়ে গেছে সে আন্দোলন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম বয়কট করে কি ফল হয়েছে? ফল হয়েছে—সব মন্দ, সব মন্দ, সব মন্দ! সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ফল হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে—ছেলেদের রাজনৈতিক আন্দোলনে টেনে দেশের শিক্ষার ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশ করা হয়েছে!

অমরবাবু একদিন উনিশশ' একুশ সনে কাউন্সিল ইলেকশনের সময় এখানে এসেছিলেন—আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—বানিয়াটা দেশের সর্ব্বনাশ করে দিলে! দেশের লোক সব ইডিয়ট। নইলে দেশের লোকেই ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিত।

অমরবাবু তখন কাউন্সিলে নির্ব্বাচনপ্রার্থী। মহাযুদ্ধের বাজারে প্রচুর উপার্জ্জন করেছেন। দেশে কীর্ত্তির পর কীর্ত্তি করে যাচ্ছেন। সরকারের ঘরে বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিটি কাজে সরকার সহযোগিতা করেন। তাঁর কথার ভঙ্গী তখন ওই রকমই হওয়ার কথা। ও ভঙ্গীটা তাঁর ভাল লাগে নি কিন্তু বক্তব্যের মোটামুটি অর্থটার একাংশ তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করেছিলেন। সর্ব্বনাশই হ'ল দেশের। শুধু একস্থানে আশা জেগেছিল, মনে হয়েছিল এইবার বোধ হয় হিন্দু মুসলমান এক হবে। কিন্তু তাও হ'ল না। বাংলাদেশের চীফ মিনিস্টার হলেন ফজলুল হক সাহেব। ওদিকে খিলাফৎ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল। মুসলমানেরা আবার সরে গেল এবং যাচ্ছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। পূর্ব্ববঙ্গে ওরা সংখ্যায় বেশী, এ অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম—এতকাল পর্য্যন্ত সত্যকথা বলতে ওরাই একঘরের মত থেকেছে। বিশেষ করে এই বিল্বগ্রাম অঞ্চলটিতে মুসলমানেরা সংখ্যাতে শুধু কমই নয়—

অবস্থাতেও ওরা এখানকার দরিদ্র। এখানকার জমিদারী, জোতদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হিন্দুদের হাতে। কয়েকঘর অবস্থাপন্ন চাষী ছাড়া অধিকাংশ মুসলমানই দৈহিক পরিশ্রমে দিন আনে, দিন খায়। ভাড়ার গাড়ী বয়, ইট পোড়ার কাজ করে, মাটি কাটে, রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, কিছু আছে লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক—তারা জমিদার-জোতদারের ঘরে পাইকের কাজ করে, আর করে এ অঞ্চলের চাষীমজুরের কাজ। এখানকার জমিজমার অধিকাংশই হিন্দুদের মালিকানা হলেও সে জমি কৃষাণ হিসাবে চাষ করে এই মুসলমানেরা। চাষী তারা ভাল, সত্যকারের ভাল চাষী। সেই সূত্রে প্রায় সকল হিন্দুবাড়ীতেই ওদের যাওয়া-আসা রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু সেখানে ওরা প্রায় অস্পৃশ্য। প্রায় কেন—পুরাপুরিই তাই। ওদের হাতে জিনিস দেয় আলগোছে। ওদের হাতের জিনিস আলগোছেও নেয় না, ওরা নামিয়ে দেয় সে জিনিস জল দিয়ে ধুয়ে ঘরে তোলে। ছোঁয়া পড়লে নিষ্ঠাবানেরা স্নান করে। মুসলমানেরা অবশ্য হিন্দুদের বাড়ীতে খায় না, হিন্দুদের উৎসব-পার্ব্বণ পরিহার করে, অন্ততঃ করতে চেষ্টা করে, মসজিদেও উঠতে দেয় না, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সম্পদ-সমৃদ্ধ হিন্দুসমাজ তার কোন কিছুই অনুভব করে না। অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই এতকাল পর্য্যন্ত এসব চলিত আচার-আইন প্রকৃতপক্ষে কোন দলকেই স্পর্শ করত না। সয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই সয়ে নেওয়ার কালটা চলে গেল। মুসলমানেরা আর সইবে না। তারা উঠে দাঁড়াচ্ছে। তবে একটা দোষ ওদের ছিল—সেটা আজও আছে, এবং সেটা যেন বাড়ছে। হিন্দুদের ধর্ম্মকে ওরা সুযোগ পেলেই আঘাত করেছে, সেই আঘাতের স্পৃহা ওদের বাড়ছে। এরা স্পর্শদোষের সৃষ্টি করে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছে—ওরা সেটা ঘুচিয়ে আক্রমণ করতে আগেও চেয়েছে এখন বেশী করে চাইছে। হিন্দুকে মুসলমান ওরা অনেক ক্ষেত্রে জোর করে করেছে। আরও একটি মারাত্মক অপরাধের বোঝা ওদের ঘাড়ে চেপে আছে। সেটা অবশ্য কোন সম্প্রদায় বা কোন ধর্ম্মের দোষ নয়, সেটা দুষ্ট প্রকৃতির লোকের স্বভাবগত দোষ। সে দোষ নিজেদের সমাজ ও ধর্ম্মকে পীড়ন করেই ক্ষান্ত থাকে না, অপর সমাজেও হানা দেয়। সেই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নাকি সরকারী তথ্য অনুযায়ী ওদের সমাজে বেশী। সেটি নারীঘটিত অপরাধ। রামজয়েরা ওই কথাটাই ওদের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। কিন্তু এখানে সে অপরাধের সংখ্যা বেশী নয় এবং যাও দু'চারটি ঘটে থাকে—তারও অধিকাংশের পিছনেই আছে প্রথম হিন্দুর অপরাধ। ছলে-বলে হিন্দুদের ব্যভিচারী অবস্থাপন্ন যুবকেরা যে সব অসহায়া হিন্দুনারীকে পথভ্রষ্ট করে—বিপথে টেনে শেষ পর্য্যন্ত সমাজের বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়—সেই অসহায়াদের ওরা সুবিধা পেলেই ওদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করে নেয়। জোরজবরদস্তির ঘটনাও আছে। আজ এই উঠে দাঁড়ানোর প্রথম কালে—ওরা সব দোষগুণ নিয়েই উদ্ধত ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইস্কুলের মধ্যে চন্দ্রবাবু নিত্য তার উত্তাপ অনুভব করছেন। প্রায়ই তাঁকে অনুযোগ শুনতে হয়—কোন মুসলমান ছেলে হিন্দুদের গ্লাসে জল খেয়েছে। তিনি ডেকে তিরস্কার করেন—তারা প্রশ্ন করে—ও-ও মানুষ আমিও মানুষ; ও গ্লাসে জল খেলাম তো হয়েছে কি? আমাদের গ্লাসটা অপরিষ্কার ছিল তাই খেয়েছি এবং

ধুয়েই তো রেখে দিয়েছি।

—ওরা তো তোমাদের গ্রাসে খায় না। তা যখন খায় না, সেই যখন ওরা মানে, তখন সেটা মানতে তোমাদের ক্ষতি কি? পরস্পরের রীতিনীতির প্রতি সহনশীলতা থাকা ভাল নয় কি?

এ কথার জবাব ওরা দেয় না কিন্তু এ সহনশীলতা ওদের নেই—সে ওরা মানবে না। এই গত বছরেই বিজয়ার দিনে—বিল্বগ্রামে লাঠি নিয়ে ওরা দাঁড়িয়েছিল; সদর রাস্তার ধারে একটা আমগাছের তলায় পীরতলা হয়েছে নূতন, সেখান দিয়ে বাজনা বাজিয়ে প্রতিমা নিয়ে যেতে দেবে না।

সমস্ত কিছুর আঁচ ইস্কুলে এসে নিত্যই লাগছে। নিত্যই একটা-না-একটা ঘটনা ঘটে থাকে। তবু জেয়াউদ্দিন এখনও মৌলবী আছে বলেই এই ঘটনাগুলি প্রশ্রয় পেয়ে ফুঁ দিয়ে জ্বালানো আগুনের মত জ্বলে উঠতে পায় না। কিন্তু এর জন্য মুসলমান ছাত্র এবং অভিভাবক দুই তরফেরই মনে মনে অভিযোগের সীমা নাই। মধ্যে মধ্যে বেনামী দরখাস্ত হচ্ছে জিয়াউদ্দিনের বিরুদ্ধে। জিয়াউদ্দিন এখানকার মুসলমানদের মধ্যে সম্মানিত বংশের দৌহিত্র এবং গুরুর শ্রদ্ধার অধিকারী। এখনও ঈদের নমাজ প্রভৃতি ইসলামী পর্ব্বে-পার্ব্বণে তার নেতৃত্ব অবিসম্বাদী। তাই তার বিরুদ্ধে ইসলামবিরোধী বলে দরখাস্ত হয় না, দরখাস্ত হয়—তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি ইংরেজী জানেন না বলে। মুসলমানেরা এখন এখনকার কালের কোন নতুন ইংরেজী ও ফার্সী-জানা মৌলবী চায়। হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধিতা করে তাদের উঠে দাঁড়াবার পথে সে তাকে সাহায্য করতে পারবে। এই সময়ে রামজয় পরিহাস করে কথাটা বললেও চন্দ্রবাবু কথাটাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ভয়ও হয়েছিল। যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব অঘটন ঘটে! বলা তো যায় না! তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখেছিলেন ব্রজবিহারীবাবুকে। এবং তাঁকে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। "আপনাকে আসতেই হবে। বঙ্গবালা আমার কন্যা কিন্তু বঙ্গবালার গুরু আপনি। আপনি তাকে পথ দেখিয়েছেন—তার পথ মুক্ত করে দিয়েছেন। আপনি না এলে এ আয়োজনের কোন সার্থকতাই নেই আমার কাছে।" তারপর এই সঙ্কল্পের কথা লিখে প্রশ্ন করেছিলেন—"এ কি ঠিক হবে? আপনার মত না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি সঙ্কল্প স্থির করতে পারছি না।"

ব্রজবিহারীবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি নিশ্চয় যাব। যে সঙ্কল্প করেছেন সে সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকুন। এর সুফল হয়তো কিছু পাবেন না, তবে কুফলের ফলন কিছু কম হলেও হতে পারে। কিন্তু নিজেদের কাছে জবাবদিহি করা হবে। শেষ পর্য্যন্ত যত সর্ব্বনাশই হোক সে সময় নিজের কাছে বলতে পারবেন—সর্ব্বনাশ যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করেছিলেন।—কিন্তু ব্যাপারটা নিজস্ব করে তুলবেন কেন? ইস্কুলের উৎসব করতে ক্ষতি কি ছিল? ইস্কুলের এত বড় রেজাল্ট হ'ল—উৎসব করারই তো কথা। তাতে এর মূল্যটা অনেক বড় হ'ত। হ'ত না?"

তা হ'ত। সে কথাও চন্দ্রবাবুর মনে হয়েছিল। কিন্তু সাহস করেন নি। হিন্দুপ্রধান

বিল্বগ্রাম বাইরে থেকে জামায়-কাপড়ে ফ্যাশনে বাক্যে খুবই প্রগতিশীল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার বিপরীত। এখানে সায়েবসুবোর সঙ্গে মেলামেশায় তাদের সঙ্গে ডিনার লাঞ্চ চা খাওয়ায় খুব উৎসাহ। বক্তৃতায় বড় বড় কথা বলে। কিছুদিন আগে ইস্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন মিটিঙে সস্ত্রীক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জজসাহেব এসেছিলেন। ওঁদের মহলে পবিত্রবাবুর খুব খাতির। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর নারীকল্যাণে খুব উৎসাহ, সমিতি গড়ে বেড়ান। স্ত্রীস্বাধীনতার জন্ম মিটিং করেন। তাঁর উপস্থিতিতে, চৈতন্যবাবুর বাড়ীরই একজন—ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটিরও সভ্য—সভায় মহিলাদের অনুপস্থিতি নিয়ে ওজস্বিনী ভাষায় আক্ষেপ করে বক্তৃতা করেছিলেন—"আমরা স্ত্রীকে বলি সহধর্ম্মিণী। যিনি সহধর্ম্মিণী, আজকের এই ধর্ম্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা যখন এখানে রয়েছি তখন তাঁরা এখানে নেই কেন?" হাততালি নিজে দিয়েছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট-সহধর্ম্মিণী, প্রতিধ্বনিও উঠেছিল সভা জুড়ে। কিন্তু চন্দ্রবাবু মনে মনে হেসেছিলেন। কারণ এই যুবকটি বছরদুয়েক আগে একটি দশ বৎসরের ধনীকন্যার পাণিগ্রহণ করে তার বালিকা বিদ্যালয়ে পড়া বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তার পাড়ায় বালিকাসুলভ স্বভাবে ও আগ্রহে ঘোমটা খুলে বের হওয়ার পথেও পাহারা বসিয়েছিল। নিজের ঘরের জানালায় পর্দা টানিয়েছে। গ্রামে সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিল্বগ্রামে এখনও অনেক কড়াকড়ি। তিনি কায়স্থ, মাষ্টারদের মধ্যে আরও অনেক জাতি আছে, বোর্ডিঙে তো আছেই নানান জাতের ছেলে; গ্রামে কোন বাড়ীতে তাঁদের নিমন্ত্রণ হলে—তাঁদের বসবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হয়, কারণ তাঁরা বোর্ডিঙে জাতিবিচারটা বিশেষ মেনে চলেন না। এক রামজয় সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে বসে। এঁরা সাহেবদের সঙ্গে বাগানপার্টিতে খেলেও মুসলমানদের সঙ্গে একসঙ্গে কখনও খান না—খাবেনও না। তবুও ইস্কুলের সেক্রেটারী পবিত্রকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বল? ইস্কুল থেকে করলে হয় না?

পবিত্র চৈতন্যবাবুর মত ধনীর সন্তান হয়েও বিনয়ী, মিষ্ট মধুর স্বভাবের লোক, কিন্তু দুর্ব্বল, ভীরু প্রকৃতির লোক, সে বলেছিল—আপত্তি হবে মাষ্টার মশায়।

শুধু তাই নয়, বলেছিল—আপনাকেও বারণ করছি। আপনি নিজে করবেন—এই প্রথম করবেন—তখন কোন বাধাবিপত্তির আশঙ্কা জোর করে টেনে আনছেন কেন? কি গোলমাল হয়, কে করে তার ঠিক কি?

চন্দ্রবাবু বিব্রত বোধ করেছিলেন।—বন্ধ করে দিতে বলছ?

—না, তা বলি না। তবে হিন্দু মুসলমান জড়িয়ে এ সব করে কাজ কি? একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—আপনি হিন্দু, আপনার সমাজ নিয়ে করুন। না হয়—। না হয় পৃথক পৃথক করুন। একদিন সব হিন্দু, একদিন সব মুসলমান।

ব্রজবিহারীবাবুর পত্র পেয়ে চন্দ্রবাবু সঙ্কল্পে দৃঢ় হলেন। একদিনেই সব করবেন এবং মাছ মাংস পোলাও ভাত এ সব উঠিয়ে দিলেন। পুজো সর্ব্বত্রই দিলেন। মহাপীঠে-মসজিদে পাঠালেন পুজো—সে সবই ফুলফল মিষ্টান্ন ধূপ ইত্যাদির উপচারে।

বঙ্গবালা সতের বছরে পা দিয়েছে। বাপের মতই সে মাথায় একটু চেঙা হয়ে উঠেছে।

তবে বেমানান ঠিক দেখায় না। দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে যেন ভালই দেখায়। চোখ দুটি ডাগর, মাথায় প্রচুর চুল, সাদা জমির কালা-পেড়ে শাড়ী পরে মুখে সলজ্জ স্মিত হাসি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রবাবু তাকে বলেছেন—লজ্জা করে ঘরে চুপ করে বসে থাকলে হবে না বঙ্গু। তোমাকে বেরিয়ে সকলকে প্রণাম করতে হবে, নমস্কার করতে হবে—অভ্যর্থনা করতে হবে। আজ তোমার ভবিষ্যতের পত্তন হয়ে যাক। এখানে আমি ছেলেদের হাইস্কুল করেছি। তুমি বি-এ পাস করে এখানে গার্লস হাই ইস্কুল করবে। পারবে তো?

বঙ্গবালা হেসে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—পারব বাবা।

ঠিক এই সময়েই ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ব্রজবিহারীবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কই মাষ্টারমশায়! বঙ্গবালা কই?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বঙ্গবালা ভূমিষ্ঠ হয়ে ব্রজবাবুর পায়ে প্রায় লুটিয়ে পড়ল।

ব্রজবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—ও কি? খানিকটা পিছিয়ে গেলেন তিনি।

বঙ্গ একটু হাসল। তখন তার প্রণাম সারা হয়ে গেছে।

—এই বুঝি শিক্ষার ফল হচ্ছে!

ব্রজবাবু বঙ্গবালাকে শিখিয়েছেন—এক বাবা আর মা ছাড়া আর কারও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে না। কারও পায়ে হাত দেবে না। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে আমাদের জাতটার সঙ্গে দেশটার মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। নমস্কার করবে।

বঙ্গ প্রথম দিন বলেছিল—রামজয় জ্যাঠামশাইকে নমস্কার করলে ক্ষেপে যাবেন উনি।

ব্রজবাবু হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা ওঁকে প্রণাম করবে।

—আর আপনাকে?

—খবরদার। কখ্খনো না।

আজ বঙ্গবালা অতর্কিতে প্রণাম সেরে উঠে হাসতে হাসতে চলে গেল। বলে গেল—আজ শুনব না আপনার কথা। আমি চা নিয়ে আসছি।

চন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাসছিলেন। উপভোগ করছিলেন তিনি গুরু ও শিষ্যার ওই মধুর আলাপটুকু।

ব্রজবাবু বললেন—আমি যে একটি কাজ করে এসেছি মাষ্টারমশাই। দুটি নূতন নিমন্ত্রণ করে এসেছি আপনাদের হয়ে।

—দু'জন কেন? দশজন করলেই বা কি হ'ত? আজকের এ আনন্দ এ সাকসেস এ তো আপনার জন্যই। বঙ্গবালাই হোক—আর বিধুই হোক এদের এই সাকসেসের পিছনে আপনি যে কতখানি সে তো সকলেই জানে। কিন্তু কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করেছেন?

আমি কি আবার লোক পাঠাব ?

ব্রজবাবু বললেন—পাঠানো উচিত। ষ্টেশনে রয়েছেন।

—ষ্টেশনে ?

—হ্যাঁ। আমাদের ছাত্র ছিল—রবি সিং।

—রবি সিং ? চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু। সেই রবি সিং। ব্রজবাবুই তাকে ফার্স্ট ক্লাসে প্রমোশনের পর এখান থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করেছিলেন। বঙ্গবালার মা যে প্রিয়দর্শন অবস্থাপন্ন স্বজাতির ছেলেটিকে দেখে বঙ্গবালার সঙ্গে বিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। কথাটা ওদিকে পৌঁছেছিল রবির কানে এদিকে বঙ্গবালার কানে। যার ফলে—

ব্রজবাবু বললেন—জানেন নিশ্চয় রবি গত বৎসর এম-এস্‌সিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে!

তাও জানেন চন্দ্রবাবু। নিশ্চয় জানেন। রবি সিং এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে রামপুরহাট গিয়েছিল। ব্রজবাবুই পাঠিয়েছিলেন। সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করেও তিনিই তাকে সস্নেহে বলেছিলেন—তুমি রামপুরহাটে যাও। ওখানকার গেমসটিচার বড় ভাল লোক —আমার বন্ধু।

রামপুরহাট থেকে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছিল। আই-এসসি পাস করেছিল বহরমপুর থেকে সেও ফার্স্ট ডিভিসনে। বি-এসসি কলকাতার সেণ্টজেভিয়ার্স থেকে। ম্যাথামেটিকসে অনার্স নিয়ে পাস করেছিল। স্কলারশিপও পেয়েছিল। গত বৎসর এম-এসসিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। জানেন বৈকি। তিনি জানেন—ইস্কুলের মাষ্টারেরা জানে—বঙ্গবালার মা—বঙ্গবালা এরাও জানে। এখানকার ছেলেরাও জানে। সম্প্রতি নাকি মস্ত বড়লোকের ঘরে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে তাও শুনেছেন। বিয়ের পর বিলেত যাবে।

ব্রজবাবু বললেন—ট্রেনে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কলকাতা থেকে বাড়ী আসছে। আমাকে দেখে আমার গাড়ীতেই এসে উঠল। আমি নিমন্ত্রণ করলাম। চল। মাষ্টার মশায়ের বাসায় আজ—সেই সত্যনারায়ণের পর এই প্রথম উৎসব। আমি নিমন্ত্রণ করছি। হয়তো রাজী হ'ত না। নানারকম ছুতো তুলছিল—বাড়ীতে বাবা মা আজই রাত্রে পৌঁছতে বলেছেন। স্টেশনে গাড়ী আসবে। না গেলে ভাববেন। কিন্তু শিবনাথ ওর সব আপত্তি প্রায় হেসে উড়িয়ে দিলে। না বলতে পারলে না। শিবনাথকেও বলেছি।

—শিবনাথ!

—হ্যাঁ। শিবনাথ হোম ইনটার্নড হয়ে এল। বর্দ্ধমানে উঠল ট্রেনে।

বিল্বগ্রামের শিবনাথ! দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে চৈতন্য ইন্‌ষ্টিট্যুশনের পাঠানো প্রথম সৈনিক। রতনবাবুর হাতেগড়া সেই শ্যামবর্ণ ছেলেটি! সেই পড়াশুনার চেয়ে কবিতা লেখায় অনুরাগী শিবনাথ। সে ফিরল।

কিন্তু খুব খুশী হয়ে উঠলেন না চন্দ্রবাবু। একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা হলে শম্ভুকে পাঠিয়ে দিই। শম্ভু রবির সঙ্গে পড়ত, শিবনাথের সঙ্গে ওর বেশ আলাপ আছে। ও-ই যাক।—কেষ্ট! শম্ভুবাবুকে পাঠিয়ে দাও তো একবার!

ব্রজবাবু বললেন—আপনি কি খুব খুশী হলেন না মাষ্টারমশাই?

—না-না-না। সে কথা কেন বলছেন?

—আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ—তা একটু—। ম্লান হেসে চন্দ্রবাবু বললেন—মনের কথা আপনাকে লুকোব না। মন বিচিত্র ব্রজবাবু। খবর শুনে খুশী হই নি তা নয়, হয়েছি, সত্যই হয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আশ্চর্য্য ভাবে উল্টো রকমের চিন্তা মনে জেগে উঠছে। কি করব? রবি সিঙের কথায় মনে হচ্ছে—আজ বঙ্গ কি ভাববে? বঙ্গ হয়তো ভাববে—এর সঙ্গে তো আমার বিয়ে হতে পারত। বাবা দেন নি। বিয়ের কথাটা তার মনের মধ্যে নতুন করে বাসা গাড়বে। নিজেও ভাবছি, মেয়েকে পড়াব—এম-এ পাস হয়তো করাবো, কিন্তু ওকে তো সংসারী দেখে যাব না। নিজের ঘরদোর স্বামী পুত্র সংসার—এ সাধ যে জন্মগত। বিশেষ করে মেয়েদের।

ব্রজবাবু বললেন—আমি রবিকে কিন্তু ঠিক সেইজন্যই নিমন্ত্রণ জানালাম মাষ্টারমশাই। কথায় কথায় রবিকে বললাম, রবি সে সময় যদি মাষ্টারমশায়ের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ত তা হলে কিন্তু তুমিও এম-এস্‌সিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে না, হয়তো এম-এ পর্য্যন্ত পড়তেই না। এত দিনে দুটি-তিনটি পুত্রকন্যার বাপ হয়ে হয় ঘরে বসে তোমার সচ্ছল সংসার দেখতে, পাইক পেয়াদা নিয়ে সুদ আদায় করতে, পাওনাগণ্ডার হিসেবনিকেশ করতে। আর বঙ্গও ম্যাট্রিক পাস করত না। সিংহীবাড়ীর বউ গিন্নী হয়ে ঠাকুরবাড়ী থেকে বাড়ীর কানাচ পর্য্যন্ত অনাচার ইনসপেকশন করে বেড়াত। বাইরের বাড়ীতে মাটির হাঁড়িতে তোমাকে মুরগী রান্না করে খেতে হ'ত লোভ-টোভ হলে। হাসতে লাগল। বললাম—চল—তুমি এম-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ, বঙ্গ ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করেছে—বাড়ীতে পড়ে সেটা কম গৌরব নয় তার; ম্যাট্রিকে তুমি যা রেজাল্ট করেছিলে সেই রেজাল্টই সে করেছে। চল দেখা করে আসবে। কংগ্র্যাচুলেট করে আসবে তাকে। চুপ করে রইল। মিথ্যে কথা আমিও বলব না। আমি নিয়ে এলাম ওকে ওই জন্যই। অবশ্য বাল্যপ্রেমের খুব মূল্য আমি দিই না। কারণ বিশেষজ্ঞেরা বলেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অল্পবয়সের প্রেম যাকে বলে, যাতে এমন দেখা যায় যে, বাধা পেলে তারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়, আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাতেও যদি তাদের নব্বই দিন দেখাশুনো হতে না দিয়ে পৃথক করে রাখা যায় তা হলে সে মোহ তাদের কেটে যায়। ওদের যদি কেটে না থাকে তা হলে ওই দেখা হওয়া থেকে বিয়ের নতুন সুযোগ আসবে মাষ্টারমশাই।

—রবির খুব বড় ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ব্রজবাবু। আপনি জানেন না। চন্দ্রবাবু গভীর চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন কথা শুনতে শুনতে। উত্তরে শঙ্কিত স্বরেই কথাগুলি বললেন—মেয়ে শুনেছি সুন্দরী। বিলেত যাবার খরচ দেবে তারা। এক্ষেত্রে অনিষ্ট হলে বঙ্গবালারই হবে।

—ভাববেন না আপনি তার জন্য। আমি শুধু রবির মনটা বুঝে নেব। বঙ্গবালাকে ওর কাছে একবার ছাড়া আসতে দেব না। ইউ ডিপেণ্ড অন মি। বঙ্গবালা আপনার মেয়ে কিন্তু ওকে আপনার চেয়ে আমি বেশী বুঝি। ওর ভেতরে খুব একটি শক্ত মেয়ে আছে। তাকে আমি আমার স্ত্রী দু'জনে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছি।

শম্ভু গড়াঞী এসে দাঁড়াল।—আমাকে ডেকেছিলেন? আপনি সার ভাল আছেন? ব্রজবাবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে শম্ভু।

—তোমরা আর আমার শিক্ষাটা নিলে না। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা আর ছাড়লে না। এখন বিধুর অভিনন্দনটা তুমিই নাও। কারণ এটা আসলে তোমারই প্রাপ্য। এ রেজাল্ট তোমারই করার কথা, কিন্তু সিদ্ধি-সাধনা করেই ভোম্বল বাবাজী হয়ে গেলে তুমি। এখন যাও দেখি একবার ষ্টেশনে। আমাদের রবি সিং—তোমাদের সঙ্গে পড়ত, সে নেমেছে আমার সঙ্গে। তাকে মাষ্টারমশায়ের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এস এখানে। আর গ্রামে গিয়ে শিবনাথকেও নিমন্ত্রণ করে আসবে। সেও আজ বাড়ী এসেছে হোম ইনটার্নড হয়ে।

বঙ্গবালা চা আর রেকাবীতে খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল।

—ও ভাবনা আমার পরের ভাবনা ব্রজবাবু। আপনি রবির কথা আগে বললেন আমিও ওই কথার জবাবটাই আগে দিলাম। আমার আগের ভাবনা রবির জন্য নয়—শিবনাথের জন্য।

—ইনটার্নড বলে বলছেন? না। সে ভাবনা বিশেষ নেই। তাকে পুরোপুরি ছেড়েই দেবে—তার আগে বাড়ীতে পাঠিয়েছে। ঠিক হোম ইনটার্নমেণ্টও নয়, ওকে বেঙ্গলের অন্য জেলাগুলি থেকে এক্সটার্ন করে—এই জেলাতে এক রকম ছেড়ে দিয়েছে। জেলার মধ্যে কোথাও যেতে আসতে কোন বাধানিষেধ নেই। শুধু সপ্তাহে একবার থানায় গিয়ে হাজরে দিয়ে আসতে হবে।

—কিন্তু—। কুণ্ঠিত ভাবেই বললেন চন্দ্রবাবু—আমার দায়িত্বের কথাটা ভেবে দেখেছেন ব্রজবাবু? এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ পুরুষের দায়িত্ব। শিবনাথ এখানে এল—এ তার বাড়ী—বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেলে, আনন্দের কথা। তার মায়ের মুখে হাসি ফুটল। আমি তার শিক্ষক—আমারও অনেক আনন্দ। তবু আমার দায়িত্বের কথা ভেবে আমি ভয় পাচ্ছি। আমি আজকের কথা ভাবছিও না। বড় জোর আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবে—"তুমি নিমন্ত্রণ করেছিলে?" আমি বলব—"আমার ছাত্র—এককালে আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। আজ যখন গ্রামের সকল ভদ্রজনকে নিমন্ত্রণ করেছি তখন তাকে কি করে বাদ দেব? করেছি নিমন্ত্রণ।" আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথা। এখানকার ছেলেরা ওর কাছে ছুটে যাবে। বারণ শুনবে না। রাজনীতির বীজ ওদের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে। সে যে কি আকার নিয়ে বের হবে সে তো কেউ জানে না। প্রকাণ্ড প্রাসাদ তার একটি চুলের মত ফাটল—সেখানে গিয়ে পড়ে একটি বটের বীজ। চারা গজায়; একটু বাড়তে পেলে আর রক্ষা থাকে না। কেটে ফেলে—আবার গজায়। আবার কাটে আবার গজায়।

তখন আর সে গাছ শাখা-প্রশাখায় পাতায় পল্লবে বাড়ে না, বাড়ে ভিতরে ভিতরে শিকড়ে শিকড়ে। সে রাজপ্রাসাদ যত বিরাটই হোক তাকে ফাটিয়ে ছেড়ে দেয়। ভেঙে পড়ে যায়। বাস হয় সরীসৃপের। এও তাই হবে ব্রজবাবু। এ একবার ঢুকলে আর রক্ষা থাকবে না। এর শেষ নেই। আমি অনেক কষ্টে চৈতন্য ইন্‌ষ্টিট্যুশন গড়ে তুলেছি। শিবনাথ বটের বীজের মত এর কোন ফাটলে পড়ে আজ পাতা মেলে বেরিয়েছে। একে একদিন শেষ করে দেবে। শিক্ষা পবিত্র জিনিস। জ্ঞান—তার মূল্য শুধুই জ্ঞান। কোন স্বার্থের সংস্পর্শই তার সহ্য হয় না। চাকরির স্বার্থেই শিক্ষার চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছেন। রাজনীতি অতি উগ্র বিষ, ও বিষ ঢুকলে আর রক্ষা থাকবে না। আমি তাই ভাবছি।

হেসে ব্রজবিহারীবাবু বললেন—আপনি একটু বেশী ভাবছেন মাষ্টারমশাই। ভেবেও তো আপনি এর গতিরোধ করতে পারবেন না। এ কালের গতি।

—হ্যাঁ। কালস্য কুটিলা গতি। ও রোধ করা মানুষের সাধ্য নয়।

কণ্ঠস্বর রামজয় পণ্ডিতের। কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ব্রজবাবু চন্দ্রবাবু জানতে পারেন নি।

—পণ্ডিতমশাই ?

—হ্যাঁ। কুশল আপনার ?

—হ্যাঁ। আপনি।

—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ হবিষ্যান্ন খাই—মাসে তিন-চারটে উপবাস করি, অসুখ হবার উপায় কি ? কিন্তু আর ও আলোচনা করবেন না। শিবনাথ এসে হাজির হয়েছে। শিবনাথের সঙ্গে রবি সিং। ওই আসছে।

রবি সিং এবং শিবনাথ এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রবাবু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন রবি সিঙের দিকে। রবি সিং ছেলেবেলায় রূপবান ছেলেই ছিল। সুকুমারকান্তি কিশোর। পরিপূর্ণ যৌবনে সে হয়ে উঠেছে অপরূপ সুন্দর।

চন্দ্রবাবুর সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রামজয় একটু হেসে চলে গেলেন সেখান থেকে। তিনি মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন কালই তিনি রবির বাড়ী গিয়ে তার বাপের কাছে ধর্না দেবেন।

—ভাল আছেন স্যার !

প্রণাম করলে শিবনাথ; তার পরে রবি।

—তোমরা ভাল আছ ? আমি খুব খুশী হয়েছি, তোমরা এসেছ। বস। বস। রবি তোমার উন্নতিতে আমি অত্যন্ত সুখী। অত্যন্ত সুখী। এ ইস্কুল থেকে তুমি পাস না কর, তবু আমার ইস্কুলেরই ছাত্র তুমি। তুমি এম-এসসিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ এ আমার গৌরবের কথা। উই আর প্রাউড অব ইউ।

রবি লজ্জিত হ'ল, লজ্জিত ভাবেই সে চুপ করেই রইল। উত্তর দিলে শিবনাথ—রবি বিলেত যাচ্ছে—আই-সি-এস হতে, না হলে শেষ ব্যারিষ্টারি। আমি বললাম—সে কি ?

ম্যাথামেটিকসেই হায়ার ষ্টাডি করে এস। তোমার মত ছেলে চাকরির জন্ত পড়বে কি? পড়ার জন্ত পড়। আপনারা ওকে বলুন। বিলেত না গিয়ে ও বরং জার্ম্মানী চলে যাক। পোষ্টওয়ার জার্ম্মানীর দুর্দ্দশা অনেক। কিন্তু সত্যিকারের সায়েন্টিস্ট থাকে তো জার্ম্মানীতেই আছে।

—শিবনাথ ভাল কথা বলেছে রবি। ব্রজবাবু বললেন—আর বিয়ে করে সেই টাকায় বিলেত যাওয়াটাও তোমার ঠিক হচ্ছে না।

—তবে স্যার বিয়ের টাকায় বিদেশে যাক বা না-যাক, বিয়ে করে যাওয়াটা ভাল।

—কিন্তু তুমি এখন কি করবে শিবনাথ? গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন চন্দ্রবাবু।—দেশের স্বাধীনতার জন্তে যুদ্ধ করা অবশ্যই গৌরবের কথা। কিন্তু আজ এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে যুদ্ধে আমরা হেরেছি। এখনও ইংরেজের শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আমরা অর্জ্জন করতে পারি নি।

শিবনাথ একটু হেসে বললে—ভাবছি এখানে চরখা তাঁত নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তুলব।

—ইউ মীন—দোজ টিপিক্যাল আশ্রমস? যার উপরটায় ওগুলো নেহাতই একটা আইওয়াশ ভিতরটায় শুধু পলিটিক্স। ইনোসেণ্ট ভাল ছেলেগুলিকে ধরবার একটা ট্র্যাপ? বোমা পিস্তল নিয়ে—

—না স্যার। আমি হিংসায় বিশ্বাস করি না। আমি গান্ধীজীর অহিংসায় বিশ্বাসী। মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ওই পথেই আমাদের স্বাধীনতা আসবে। বিশ্বাস করি বিশ্বজগতের দরবারে ওই অহিংসায় বিশ্বাস নিয়েই আমাদের যেতে হবে—আমরা যাব—পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হবে এই অহিংসা।

শিবনাথের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। চন্দ্রবাবু শাঙ্কিত হয়ে বললেন—থাক ওসব কথা শিবনাথ। লোকজন আসছেন সব, ছেলেরা ঘুরছে চারিদিকে, এসে সব জমে জটলা পাকাবে। ও সব কথা থাক।

—বসুন ব্রজবাবু—আমি দেখি কে কে যেন এলো মনে হচ্ছে।

উঠে পড়লেন চন্দ্রবাবু।

ব্রজবাবু মৃদু স্বরে বললেন—তুমি এখানে আশ্রম তৈরি করবে শুনে উনি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—ইস্কুলের জন্ত।

—জানি স্যার। সেই এন্টি-ম্যালেরিয়েল ওয়ার্কের কথা আমার মনে আছে। একটু হাসলে শিবনাথ।

—কিন্তু তুমি যেন ওঁকে ভুল বুঝো না। তুমি বোধ হয় জান না। কথাটা তোমাকে বলি। তোমার জানা দরকার।

পুরনো কথা। শিবনাথ এখান থেকে পাস করে কলকাতায় পড়তে গিয়ে প্রথম বৎসরই সন্দেহভাজন হিসেবে ভারতরক্ষা আইনে ধরা পড়েছিল। পুলিস ওকে সেবার

নজরবন্দী করে রেখেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর ইনটার্নমেণ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে শিবনাথ এখানেই সমাজসেবার কাজ সুরু করে। সেবাধর্ম্মই তার মধ্যে প্রধান। কলেরা এপিডেমিক থেকে সূত্রপাত। তার পর করেছিল একটি ফায়ার ব্রিগেড। তার পর ধরেছিল ম্যালেরিয়া নিবারণী কাজ। রবিবার রবিবার তার কর্ম্মীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে গ্রামে গ্রামে কেরোসিন তেল দিয়ে পাঠাত, খানায় ডোবায় তারা কেরোসিন ছড়িয়ে আসত। ছেলেরা দলে দলে তার সমিতিতে এসে জুটতে চেয়েছিল। কিন্তু হেডমাষ্টার আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে বোর্ডিঙের ছেলেদের কঠোর নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন না যায়। শিবনাথ ব্রজবাবুর কাছে এসেছিল। ব্রজবাবু ম্লান হেসে বলেছিলেন—বোর্ডিঙের ছেলেদের বাদ দিয়েই তুমি কাজ কর শিবনাথ। মাষ্টারমশাই ওদের যেতে দেবেন না। গ্রামের ছেলেরা অনেকটা স্বাধীন, অন্ততঃ তারা নিজেদের অভিভাবকদের অধীন। তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না উনি। কিন্তু বোর্ডিঙের ছেলেদের উনিই অভিভাবক। উনি যেতে দেবেন না। তুমি তো জান উনি পলিটিক্সকে কি রকম ভয় করেন। শিবনাথ বোর্ডিঙের ছেলেদের বাদ দিয়েই কাজ করত। এর কিছু দিন পর দেশে ইউনিয়ন বোর্ড হ'ল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হলেন পবিত্রবাবু। ওদিকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ছেলেরা চঞ্চল হ'ল। শিবনাথকে দ্বিতীয়বার পুলিস রাউলাট আইনে ধরে নিয়ে গেল। তখন ছেলেদের ওদিক থেকে ফেরাবার জন্য সরকারী পরামর্শে পবিত্রবাবু ইউনিয়ন বোর্ড থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণী কাজ সুরু করলেন। চন্দ্রবাবু তখন ছেলেদের অনুমতি দিলেন সে কাজে যোগ দিতে। ব্রজবাবু তখন মৃদু অনুযোগ জানিয়ে বলেছিলেন, ভাল কাজ সব সময়েই ভাল কাজ মাষ্টারমশাই। আজ ছেলেদের সে কাজ করতে অনুমতি দিলেন, আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু শিবনাথ যখন বলেছিল তখন অনুমতি দিলে আরও খুশী হতাম। সে আমাদের ছাত্র। আদর্শবাদী—

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—সমস্ত সত্ত্বেও আমি ওকে পছন্দ করি না ব্রজবাবু। শিবনাথ আমাকে নিরাশ করেছি। ওকে আমি আরও বড় দেখতে প্রত্যাশা করেছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ! ব্রজবাবু এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি বিশ্বাস করি না। এতে কিছু হবে না। দেশকে আগে শিক্ষিত করতে হবে। তার পর। তার পর। তার আগে নয়। শিবনাথ লেখাপড়া শেষ করে যদি এ আন্দোলনে যোগ দিত আমি তাকে প্রশংসা করতাম আশীর্ব্বাদ করতাম। কিন্তু লেখাপড়ার বয়সে—সেই বয়সের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে যে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করলে তার নিজের জীবন ব্যর্থ এবং যে পরধর্ম্ম সে পালন করতে গেল তাও ব্যর্থ। ও অনেক বড় হতে পারত। ও ছাত্রজীবনে লিখত। পদ্য লিখত। ও বড় কবি হতে পারত। সে সম্ভাবনাও নষ্ট হয়েছে। আমি পড়ার সময় পদ্য লেখার জন্য তিরস্কার করেছি, সে পড়াশোনায় অবহেলার জন্য। নইলে প্রত্যাশা করতাম বৈকি ও একজন বড় কবি হবে। ওর সম্পর্কে আলোচনা যখন হবে তখন তাতে লিখতে হবে তার শিক্ষা হ'ল চন্দ্রভূষণ হেডমাষ্টারের কাছে। সে শিক্ষা নিয়েছিল এই চৈতন্য ইন্‌ষ্টিট্যুশনে। সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি ওকে পছন্দ করি না।

ব্রজবাবু বললেন—ওঁর সে মুখ চোখের চেহারা আজও ভুলতে পারি নি শিবনাথ। দু'চোখ ভরে জল টলমল করে উঠেছিল। উনি চট করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। তুমি যেন ওঁকে ভুল বুঝো না।—এই বিচিত্র মানুষটিকে চেনা সহজ নয়—অত্যন্ত কঠিন শিবনাথ। ছাত্র অবস্থায় তোমরা চিনবে কি—তোমাদের বয়স অল্প তার উপর লেখাপড়া নিয়ে পুরোপুরি রুলত আর রুলার-এর সম্বন্ধ।

একটু হেসে বললেন—প্রথম যখন স্বদেশী বক্তৃতা করতে তখন বিদেশী শাসকদের উল্লেখ করবার সময় পুলিস দারোগা আর মাষ্টারদের মূর্ত্তিই ভেসে উঠত তোমার চোখে।

শিবনাথ হেসে উঠল—না স্যার! ওকথা বললে আমার উপর একটু অবিচারই করা হবে।

ব্রজবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—সেটা অবশ্য খুবই ভাল কথা। আশীর্ব্বাদ করব তোমাকে আর এক দফা। তবে ভেসে উঠে থাকলে দোষ দোব না।

তার পর গম্ভীর হয়ে বললেন—আমারই চিনতে অনেক দিন লেগেছে। তোমরা বোধ হয় জান না বঙ্গবালার বিয়ে না দিয়ে ম্যাট্রিক পড়ানোর কারণ বাল্যবিবাহে আপত্তি নয়; উনি চান বঙ্গবালা বিয়ে না করে লেখাপড়া শিখে ওঁর ব্রত গ্রহণ করে। ছেলে নেই। একটি মেয়ে। মেয়েকে দিয়েই সাধ মেটাতে চান। এম-এ পাস করাবেন বঙ্গবালাকে। কল্পনা করেন সে ফার্স্ট ক্লাস পাবে। প্রফেসরী করবে। ফার্স্ট ক্লাস না পায় বি-টি পাস করিয়ে এখানে বঙ্গবালাকে দিয়ে গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল করবেন। বঙ্গবালা পাস করার জন্তে এই কারণেই ওঁর এত উৎসাহ, এত সমারোহ করছেন উনি।

হঠাৎ শম্ভু গড়াঞী ব্যস্ত হয়ে এসে ডাকলে—মাষ্টারমশাই!

—কি? ব্যাপার কি শম্ভু?

—গণ্ডগোল পাকিয়ে গেল, স্যার।

—গণ্ডগোল? কোথায়?

—চায়ের আসরে! হিন্দু-মুসলমানের আলাদা খাওয়ার জায়গা হয়েছে তো। তা সবাই অবশ্য ঠিক ঠিক বসেছে, শুধু গোলাম হোসেন চৌধুরী হিন্দুদের টেবিলে একখানা চেয়ারে বসে গেছে। কেউ কিছু বলতেও পারছে না। মুখ তাকাচ্ছে এ ওর। মাষ্টারমশাই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। উনি আপনাকে ডাকছেন।

—চলুন, স্যার। আমিও যাই। শিবনাথ ব্রজবিহারীবাবুর আগেই উঠে পড়ল।

বসে রইল শুধু রবি।

ব্রজবাবুর শেষ কথাগুলি তার মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় এর মধ্যে কয়েকবারই যেন সে হেডমাষ্টারের বাসার ভিতর থেকে কারও অস্পষ্ট ইঙ্গিত অনুভব করেছে। দু'বার যেন বাইরের জানালাটি খুলেছে, বন্ধ হয়েছে। কে যেন একবার কাকে বলেছে—কেউ নেই যে এঁদের চা দিয়ে পাঠাই। ওঁরা কখন থেকে বসে আছেন। কি বিপদ বল দেখি কণ্ঠস্বর! চেনা তবু তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। একবার খিল খিল হাসি কানে

এসেছে।

রবি বসেই রইল। তার বুকের মধ্যে হৃৎস্পন্দন উল্লাসে বা বেদনায় বা কামনায় বা দ্বন্দ্বের তাড়নায় প্রবল গতিতে ছুটে চলছে, যেন মাথা কুটছে। তার যেন উঠবার শক্তি নাই। নাই। অবসন্ন হয়ে গেছে।

ওদিকে বোধ করি চায়ের আসরেই কলরব উঠছে, প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

হঠাৎ চন্দ্রবাবুর বাসার সামনের ঘরের দরজার পর্দাটি খুলে গেল। ঘরের ভিতরের আলো পিছনে রেখে বেরিয়ে এল দুটি মূর্ত্তি। নারী মূর্ত্তি।

দীর্ঘাঙ্গী তরুণী একটি। শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে দেখে আজকের সকালে দেখা সূর্য্যালোকিত একখানি জলভরা মেঘের শ্যাম লাবণ্যের কথা তার মনে পড়ে গেল। মেঘখানির চারি পাশের সাদা মেঘ রোদের ছটায় ঝলমল করছিল এই মেয়েটির সাদা ধবধবে কাপড়খানির মত। এই তো বঙ্গবালা! এমন অপরূপা হয়েছে বঙ্গবালা! সঙ্গে কে?

সঙ্গে বাসার ঝি। ঝিয়ের হাতে একখানি থালার উপর চায়ের কাপ ও ডিসে জলখাবার সাজিয়ে বঙ্গবালা এসে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল রবি।

—আপনি একা বসে আছেন? মাষ্টারমশাই, শিবনাথদা এঁরা কোথায় গেলেন?

—ওঁরা, ওদিকে গেছেন। কি জানি যেন একটা গণ্ডগোলের উপক্রম হয়েছে।

—আপনি চা খান।

এক কাপ চা এক ডিস জলখাবার সে নিজের হাতে তুলে বাড়িয়ে ধরলে।

—তুমি ভাল আছ? মা ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। আপনারা?

—ভালো আছি। কিন্তু তুমি কত বড় হয়ে গেছ!

হাসলে বঙ্গবালা। বললে—বাঁচলেই বয়স বাড়ে, বড় হয়, আবার বুড়ো হয়! তুমি খাবার জল নিয়ে এস চিত্ত। আর এগুলি নিয়ে যাও।

চিত্ত ঝি চলে গেল।

রবি বললে—তুমি ম্যাট্রিক পাস করেছ, ভারী খুশী হয়েছি।

—আপনি তো এম-এস্‌সিতে ফার্স্ট হয়েছেন—বিলেত যাচ্ছেন!

—তা হয়েছি। তবে বিলেত যাচ্ছি কি যাচ্ছি না সে ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু তুমি তো আমাকে অভিনন্দন জানাও নি। আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার পাসের আনন্দভোজে বিনা নিমন্ত্রণে ছুটে এসেছি। তোমাকে আমি ভুলি নি। তুমি আমাকে ভুলে গেছ।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল বঙ্গবালা। তার পর মৃদু স্বরে বললে—কেন যান নি জানি না। ভুলেই যাবেন আমাকে।

তার পর সে শান্ত ধীর পদক্ষেপে বাসার দিকে চলে গেল।

—বঙ্গ।

—কারা সব আসছেন।

বলতে বলতে সে পর্দার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ব্রজবিহারীবাবু এসে যা দেখলেন—তাতে শঙ্কিত না হয়ে পারলেন না। সমস্ত আসরটা যেন থম্ থম্ করছে। একটা বিস্ফোরণ যেন আসন্ন। সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ মাঝখানকার সবচেয়ে বড় টেবিলটার উপর। খানকয়েক হাইবেঞ্চ জুড়ে টেবিলটি সাজানো হয়েছিল। অন্ততঃ জনচল্লিশেক অতিথির বসবার ব্যবস্থা টেবিলটিতে। নবগ্রামের বিশিষ্ট হিন্দুরা ওখানে বসবেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। কয়েকজন বৈদ্য কায়স্থও আছেন। নিতান্ত গোঁড়া যাঁরা—যাঁরা স্বজাতি ছাড়া উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক, কারুর সঙ্গেই এক পংক্তিতে বা টেবিলে খাবেন না—তাঁদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ওপাশে মুসলমানদের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। সাজানো-গোছানোতে কোন তারতম্যই নেই। তবুও গোলাম এসে এই মাঝের টেবিলে বসেছে।

মৌলবী জিয়াউদ্দিন সাহেব গোলামকে বলেছিলেন—ইদিকে গোলাম। আমাদের জায়গা ইদিকে।

গোলাম হেসে বলেছে—আপনাদের মোল্লা-মৌলবী গোঁড়ামি আমার নাই মৌলবী সাহেব। আমি এইখানে সবার সঙ্গে বসব। ইখানে তো দেখি বামুন-বদ্যি কায়েত সব একসঙ্গে বসেছে। মুর্গীর কোর্মার সঙ্গে চচ্চড়ি, পোলাওয়ের উপর লুচি—ইখানে তবল ব্যবস্থা।

মৌলবী বলেছিলেন—কালীথানের কাটা পাঁঠার সুরুয়াও পড়বে। তাও খাবি তুই?

—তা খাব। আপনি ইখান থেকে সরে থাকবেন, দেখবেন না—তা হলেই হবে। দেশের নতুন হালচাল মৌলবী সাহেব—এখন আর উসব কথা তুলবেন না।

—কিন্তু উঁয়াদের মধ্যে যদি কারুর আপত্তি থাকে—

—বলুন সে কথা। উঠে যাই।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। কেউ কিছু বলে কিনা তার প্রতীক্ষা করেছিল। বলতে কেউ কিছু পারে নি, কিন্তু মুখ সকলেরই থমথমে হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড একটা ক্ষোভের আভাস ছিল সেই থমথমে ভাবের মধ্যে। শুধু যেন গতি-হীন হয়ে আছে। কালবৈশাখীর অপরাহ্ণের পশ্চিম আকাশের মেঘের মত। শুধু ঝড়ের অভাবে গতিহীন-স্থির, ঝড় উঠলেই বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করে আকাশ ছেয়ে ফেলবে।

গোলাম আবার বলেছিল—এই দেখুন সব চুপ করে আছেন। কেউ না বলেন না।

সেই বঙ্গবিভাগের কাল থেকে ওঁরা বলে আসছেন—হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই। সে কি মিছা বলেছেন ওঁরা! না, কি বলছেন ছোটবাবু।

ছোটবাবু অর্থে ইস্কুলের সেক্রেটারী পবিত্রবাবু।

পবিত্রবাবু এদিক দিয়ে উদার লোক, জাতিভেদের কোন সংকীর্ণ সংস্কারই তাঁর নেই। সায়েব-সুবার সঙ্গে প্রকাশ্যেই তিনি একরকম খাওয়া-দাওয়া করে থাকেন। কিন্তু আর একটা ভেদ তিনি মানেন। সে ভেদটা পদস্থতার ভেদ। তিনি খ্রীষ্টান-মুসলমান রাজকর্মচারীর সঙ্গে একসঙ্গে খান, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সিডিউল কাস্টের এম-এল-সির সঙ্গে খান, কিন্তু তাই বলে তাঁর প্রজা—এবং উদ্ধতচরিত্র এই গোলাম হোসেনের সঙ্গে খেতে পারেন না। সিডিউল কাস্টের কোন সাধারণ জনের সঙ্গে খাবেন না। শিক্ষায় সম্মানে পদস্থতায় যিনি তাঁর সমশ্রেণী তাঁর সঙ্গে খাবেন তিনি—অন্য কারুর সঙ্গে নয়। স্বজাতি সমবর্ণ বলে তিনি তাঁর বাড়ীর রাঁধুনী-বামুন বা গোমস্তার সঙ্গে খাবেন না। পবিত্রবাবু ছাড়া আরও যাঁরা ছিলেন—তাঁদের মনোভাব তাই। তা ছাড়াও এক্ষেত্রে আরও একটু কিছু ছিল। এটি ঠিক পার্টি নয়, ডিনারও নয়, এটিতে সামাজিক সংস্পর্শ যেন একটু বেশী রয়েছে পার্টির চেয়ে।

পবিত্রবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন—গোলামের বাচালতায়।

গোলাম কিন্তু ঠিক বাচালতা করে নাই। বেশী কথা সে বলেছে এটা ঠিক, প্রগল্‌ভতাও ছিল—তাও সত্য, তবু ঠিক বাচালতা সে করে নাই। জীবনে সে অভ্যুদয়ের স্বাদ পেয়েছে। সে স্বাদের নেশায় এবং পুষ্টিতে সে সবল ভাবে মাথা তুলতে চায় স্বাভাবিক ভাবেই। সকলের সঙ্গে সমান হয়ে এই জাগরণের ক্ষণে একসঙ্গে পথ চলার আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাও তার ছিল।

ব্রজবিহারী ভাবছিলেন—তিনি গিয়ে গোলাম হোসেনকে অনুরোধ করবেন কিনা। এদিকে হিন্দুমহলে গুঞ্জন উঠতে সুরু হয়েছে।

এ কি অন্যায়?

ওদিকে মুসলমানদের চোখের দৃষ্টিও যেন আসন্ন অপমানের আশঙ্কায় নির্নিমেষ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময়টিতেই পিছন দিকে শিবনাথের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন ব্রজবিহারীবাবু।

"—আপনাদের সকলের কাছে আজকের অপূর্ব্ব এই প্রীতি সম্মেলনে আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

শিবনাথ একখানা চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আবার সে বললে—পুনরাবৃত্তি করলে কথাটি। বারদুয়েক তার কণ্ঠস্বর—বক্তব্য সমবেত জনতার গুঞ্জনের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু শিবনাথ থামলে না। তৃতীয় বারেই সকলের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হ'ল। তার পরই একটি মুহূর্ত্ত এল, স্তব্ধতার মুহূর্ত্ত।

শিবনাথ সেই মুহূর্ত্তে আরম্ভ করলে জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ধর্ম্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা। দীর্ঘ সে করলে না, তীব্রও কিছু বললে না। বললে—এ অন্যায়, এ গত শেষ

মনোভাব। সে যুগ পার হয়েছি আমরা। সকলে পারি নি। কতক পারি নি—কতক পেরেছি। আসুন, আমরা যাঁরা, হিন্দু মুসলমান ইহুদী খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ পারসীক, ধর্মভেদে মানুষে মানুষে ভেদ আছে বলে মানি নে, যাঁরা ধর্ম এবং জীবন-বিশ্বাসকে কাচের বাসনের মত ভঙ্গুর বলে মনে করি নে—তাঁরা সকলে মিলে আসুন একটি আলাদা খাবার আসর পাতি। বিরোধ আমরা চাই নে। যাঁরা যা মানেন মানুন। আমরা যা মানি সে মেনেই চলি। আমাদের আসরে হোস্ট হবেন আমাদের পূজনীয় আগেকার এসিস্টাণ্ট হেডমাষ্টার ব্রজবিহারীবাবু এবং চীফ গেস্ট হবেন—শম্ভু গড়াঞী, যে ছাত্রটি এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইউনিভারসিটিতে ফার্ষ্ট হয়েছে তার দাদা। আর স্পেশাল গেস্ট হবেন আমাদের বন্ধু গোলাম হোসেন।

তার পরই সে গোলামকে উদ্দেশ করে বললে—

—এস গোলাম, স্পেশাল গেস্ট বলে তোমার বসে থাকলে চলবে না। এস, সাহায্য কর আমাকে। আমাদের টেবিল-চেয়ার আমরাই পেতে নেব। এস।

গোলাম প্রসন্ন চিত্তেই ও টেবিল থেকে উঠে এল।

শিবনাথের বলার ভঙ্গি এবং বক্তব্যের মধ্যে আশ্চর্য্য একটি প্রসন্ন অথচ দীপ্ত হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। সে স্পর্শটি আকস্মিক সমাগত কোন স্নিগ্ধ শীতল বাতাসের ঝলকের মত কালবৈশাখীর বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জকে শান্ত এবং ক্ষান্ত করে দিয়ে আসন্ন বিপর্য্যয়টাকে দূরে সরিয়ে দিলে; এবং উল্টে দিগন্তের সন্ধ্যা-সূর্য্যের শেষ রাঙা আলোকে নিজের বুকে প্রতিফলিত করে একটি রক্ত-সন্ধ্যার বাসর সাজিয়ে দিলে।

ব্রজবিহারীবাবু অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শিবনাথকে বললেন—আমি প্রার্থনা করছি যেন তোমরা এমনি করেই সকলে মিলে সকল দ্বন্দ্ব এবং বাধাবন্ধ অতিক্রম করে নতুন দিনের সমাজ গড়ে তুলতে পার।

সুর সকল জনের মনেই লেগেছিল। পবিত্রবাবু খেলেন ও টেবিলে বসে, কিন্তু খাওয়ার পরে এসে এই টেবিলে ব্রজবাবুর পাশে একখানা চেয়ার নিয়ে বসে বললেন, শিবনাথ,—তুমি আবৃত্তি কর। ওই কবিতাটি আবৃত্তি কর—হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে।

শিবনাথ ছেলেবেলা থেকেই ভাল আবৃত্তি করে।

শিবনাথের আপত্তি নাই কিছুতে। সে দাঁড়িয়ে উঠল।

আবৃত্তি শেষ করে বসে সে বললে—রবি একটা ইংরেজী আবৃত্তি করুক। বলুন ওকে।

রবি কখন এসে বসেছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

পবিত্রবাবু প্রশ্ন করলেন—রবি?

—আমাদের এখানে পড়ত। এবার এম-এস্‌সিতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে। অঙ্কে অবশ্য ও ভালই বটে, কিন্তু ইংরেজীতেও কম ভাল নয়। আর অভিনয় করতে পারে সবচেয়ে ভাল। বিশেষ করে ইংরেজী নাটকে অভিনয় করবার ঝোঁক খুব।

হেসে বললে—তার উপর ওর ওই সুন্দর চেহারা। ইউরোপ-আমেরিকা হলে ও চলে

যেত স্টেজে কিংবা ফিল্মে। কিন্তু আমাদের দেশে তা তো হবে না। অভিনয় করতে গেলেই বদনাম। এ যুগে শিশিরবাবু, নরেশবাবু, তিনকড়িবাবু, অহীনবাবু, দুর্গাদাসবাবু থিয়েটারে নেমেও এখনও জাতে তুলতে পারেন নি। নাও রবি, তুমি একটা আবৃত্তি কর।

রবি সারাক্ষণটাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। সে যেন মুহ্যমান হয়ে গেছে। মৃদু স্বরে সে বললে—শরীরটা আমার ভাল লাগছে না ভাই।

শিবনাথ বললে—তা না হয় একটু কষ্ট হ'ল তোমার। আমরা তো আনন্দ পাব! ওঠ ওঠ। তুমি সেই রোমিওর পার্ট করেছিলে স্কটিশে—রোমিওর সেই জায়গাটা—

It is the east and Juliet is the Sun—

রবি একটু চুপ করে থেকে বললে—না, ও জায়গাটা নয়, আমি অন্য জায়গা থেকে আবৃত্তি করছি। লাস্ট সিন রোমিওর—লাস্ট পিস—How oft when men are at the point of death—ওখান থেকে শুরু করছি।

রবি সত্যই সুন্দর আবৃত্তি করে। তার কণ্ঠস্বর ভরাট—তার সঙ্গে মাধুর্য্য আছে। উচ্চারণও চমৎকার। আকাশের দিকে মুখ তুলে উদাস কণ্ঠস্বরে সে আবৃত্তি আরম্ভ করলে।

Have they been merry!
Which their keepers call
A lightning before death. O, how may I
Call this a lightning.
O my love my wife
Death, that hath suck'd the
honey of thy breath,

শ্রাবণ-রাত্রির বাতাসের মধ্যে সজল স্পর্শের মত একটি বেদনার্ত্ততা ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতার চিত্ত বেদনায় সকরুণ হয়ে ওঠে। যারা ইংরেজী জানে না, কম জানে অর্থবোধ না হওয়া সত্ত্বেও তারাও অভিভূত হয়ে গেল। চারি পাশে ভিড় জমে উঠল। টেবিলের ধারে সর্ব্বাগ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রবাবু। তাঁর চোখ দুটি আনন্দের দীপ্তিতে ঝলমল করছে। তাঁর ছাত্র এমন আবৃত্তি করছে? তা ছাড়া সেক্সপীয়রের কাব্যামৃতধারা পানের আনন্দ! এ শুনলে জীবনে যেন ঝঙ্কার ওঠে। সঙ্গীতঝঙ্কার!

রবির আবৃত্তি শেষ হতেই চন্দ্রবাবু গিয়ে তার পিঠে হাত দিলেন। মুখ তাঁর হাসিতে ভরে উঠেছে। বললেন—তুমি আর একবার এম-এ এগজামিনেশন দাও—ইংরেজীতে।

রবি একটু হাসলে। কোন উত্তর দিলে না।

ব্রজবিহারীবাবু বললেন—তাই তো বাংলা ইংরেজী দুই হ'ল—সংস্কৃত আবৃত্তি কেউ করতে পারে না? কৈ হেড পণ্ডিতমশাই কৈ? ছেলেরা যদি না পারে তো পণ্ডিতমশাই কিছু শোনান আমাদের। কৈ পণ্ডিতমশাই?

পবিত্রবাবু বললেন—মন্দ হয় না। পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত আর মৌলবী সাহেব ফারসী। কালিদাস আর হাফেজের বয়েৎ।

—ডাক, ডাক পণ্ডিতমশায় আর মৌলবী সাহেবকে ডাক—শিবনাথ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললে।

ছেলের দল উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দানুষ্ঠানের আস্বাদন তারা সচরাচর পায় না। তার উপর শিবনাথ বলেছে। দেশসেবক শিবনাথ তাদের গোপন মনে অনেক আগে থেকেই গুরুর আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কয়েকজনেই ছুটে চলে গেল।

—পণ্ডিতমশাই! মৌলবী সাহেব!

ব্রজবাবু বললেন—ওঁরা আসতে আসতে শিবনাথ কিংবা রবি তোমাদের কেউ আর একটা আবৃত্তি কর।

শিবনাথই আবৃত্তি করলে—ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর। এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

ছেলেরা ফিরে এসেছিল আবৃত্তির মধ্যেই; তারা পণ্ডিতমশাইকে পায় নি। আবৃত্তি শেষ হতেই বললে—পণ্ডিতমশাই চলে গেছেন।

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হলেন—চলে গেছে? কখন? কৈ তাঁকে তো কিছু বলেন নি! এই তো গণ্ডগোলের সূচনার সময়েও রামজয় ছিলেন। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন রামজয়; বলেছিলেন, এই সর্ব্বনাশের ভয়েই আমি তোমাকে বারণ করেছিলাম চন্দ্র। একসঙ্গে একদিনে এক আসরে খাবার ব্যবস্থা করো না। করো না।

শিবনাথের বক্তৃতার সময়েও ছিল। সেই সময়েই চন্দ্রবাবু আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রায় পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে এসেছিলেন রামজয়কে পিছনে ফেলে। তার পর আর রামজয়ের খোঁজ করেন নি। ভুলে গিয়েছিলেন। বিচিত্র ভাবে আসন্ন বিপর্য্যয় ক্ষান্ত হয়ে এমনই মনোরম মাধুর্য্যময় একটি পরিবেশের আবির্ভাবে তিনি আনন্দে ভুলে গিয়েছিলেন রামজয়ের কথা। সে চলে গিয়েছে। নিশ্চয় সে খেয়েও যায় নি। হয়ত বা নিজের বিশ্বাসে আঘাত খেয়ে মর্ম্মাহত হয়ে চলে গিয়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন চন্দ্রবাবু। তার পরই হঠাৎ বললেন—তা হলে এখানেই থাক মাষ্টারমশাই। রাত্রি কম হয় নি। শিবনাথ তুমি একটু দাঁড়াও।

শিবনাথকে ডেকে বললেন—তুমি আজ যা করেছ তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।

শিবনাথ একটু হেসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

চন্দ্রবাবু বললেন—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তোমাকে কিছু বলতে চাই আমি।

—কাল আসব আমি।

—না, আমি যাব। আমি যাব তোমার ওখানে। তোমার স্কুল-বোর্ডিঙে আসাটা ঠিক হবে না। পুলিশের এখন বড় কড়াকড়ি। আমি যাব।

রবি সিং এসে দাঁড়াল।

—রবি! কিছু বলবে?

চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করে রবি বললে—আমি এইবার যাব, স্যার।

—যাবে? এই রাত্রে কোথায় যাবে? না-না। তোমার শোবার ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েছে। যতদূর জানি—শম্ভু তার নিজের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছে।

—আমি শিবনাথের বাড়ীতে যাচ্ছি। ওখানেই আমার গাড়ী রয়েছে। ভোরবেলা রওনা হয়ে যাব। আর শিবনাথ রাজী হলে এই রাত্রেই গাড়ী ছেড়ে দেব, রাত্রে রাত্রে দিব্যি চলে যাব।

ভোরবেলা ব্রজবিহারীবাবু শিবনাথের বাড়ী এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকলেন—শিবনাথ! শিবনাথ! শিবনাথ তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। প্রায় সমস্ত রাত্রিটাই রবির সঙ্গে গল্প করেছে। প্রায় রাত্রি তিনটের সময় রবি তার গাড়ী ছেড়েছে। ক্রোশ তিনেক পথ, সাতটা বেলা হতে হতে সে বাড়ী পৌঁছে যাবে। সে আর শোয় নি।

শিবনাথকে ডেকে দিলেন তার মা।

—শিবনাথ বেরিয়ে এল। কি স্যার! এই ভোরবেলা? ও—এই ভোরের ট্রেনে চলে যাচ্ছেন বুঝি?

—না। কিন্তু রবি কোথায়?

—রবি? সে তো চলে গেছে স্যার। সমস্ত রাত্রিই আমরা গল্প করেছি। রাত্রি তিনটের সময় আমি শোবার জন্যে উঠলাম—ও বললে আমি আর শোব না ভাই, গাড়ীতেই শুই—গাড়ী চলুক, সাতটা নাগাদ বাড়ী পৌঁছে যাব।

—চলে গেছে রবি?—ব্রজবিহারীবাবুর কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটে উঠল।

শিবনাথ বললে—মাষ্টারমশাইকে বঙ্গবালার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে রাজী করুন স্যার। রবি বঙ্গবালাকে বিয়ে করতে চায়, সত্যি ভালবাসে। সমস্ত রাত্রি আমার সঙ্গে ওই কথাই বলেছে। এত তাড়াতাড়ি চলে গেল ওই জন্যেই। ওর বাবা মাকে বলবে, রাজী করবে, লোক পাঠাবে স্যারের কাছে। স্যার যেন ফিরিয়ে না দেন।

ব্রজবাবু স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। শিবনাথের কথা শেষ হয়ে গেল, তবুও স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

শিবনাথ বিস্মিত হ'ল এবার। ব্রজবিহারীবাবুর মুখে-চোখে যেন অপরিসীম বেদনার ছায়া পড়েছে। সে বেদনা যেন ফেটে পড়তে চাচ্ছে; প্রাণপণে তিনি আত্মসম্বরণ করে রয়েছেন। কিন্তু তাও পারছেন না; দুই চোখের কোণ থেকে দুটি জলধারা নেমে আসছে। এসেছে আগেই, হাই-পাওয়ার চশমাও সীমারেখা পার হওয়ার পর শিবনাথ দেখতে পেলে। সে এবার উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে-স্যার? স্যার?

—বঙ্গবালা—

—কি স্যার ?

—সে বিষ খেয়েছে শিবনাথ।

—বিষ খেয়েছে ?

—হ্যাঁ। কষ্টে ফুলের বীজ। একটু চুপ করে থেকে আত্মসম্বরণ করে বললেন—কাল রাত্রে তোমরা সকলে চলে এলে—আমি মাষ্টার মশাইয়ের ওখানে গেলাম। ওই কথাটাই বলতে গেলাম। রবির ওই আবৃত্তি শুনে আমার মনে হয়েছিল—ওগুলি ওরই প্রাণের কথা। নইলে দুঃখের এমন সুর ফুটে উঠত না। আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম বঙ্গবালা কোথায় ? কারণ ওর সামনে বা ওকে শুনিয়ে এ আলোচনা করতে আমি চাই নি। শুনলাম—সে শুয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালবেলা পায়ের আঙুলে হুঁচোট খেয়ে নখ উঠে গিয়েছিল, সন্ধ্যেবেলা থেকে সেটাতে খুব বেদনা হয়।

চুপ করলেন ব্রজবিহারীবাবু। তার পর বিষণ্ণ হেসে বললেন—ওটা তার ছুতো। মাষ্টার-মশায়ের স্ত্রী ভালমানুষ লোক, কিছু সন্দেহ করেন নি। বললেন—বঙ্গবালার গায়ে হাত দিয়ে মনে হয়েছিল তাঁর যে, যেন কপালটা একটু গরমও ঠেকছে। নইলে আমরা যখন চা খেলাম—বঙ্গবালা যখন আমাদের পরিবেশন করলে তখনও তো তাকে এতটুকু খোঁড়াতে দেখি নি। ওটা বঙ্গবালা বোধ হয় কাঁদবার জন্যেই অজুহাত তৈরি করেছিল। রবিকে ভালবাসা সেও ভুলতে পারে নি। যাই হোক—বঙ্গবালা ঘুমিয়েছে জেনে আমি মাষ্টারমশায়ের কাছে কথাটা পেড়েছিলাম। মাষ্টারমশায় বললেন,—ও কথাটা ভুলে যাওয়াই ভাল ব্রজবাবু আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি বঙ্গবালাকেও জিজ্ঞাসা করেছি। সেও হাসিমুখে বলেছে আমাকে। আমার ছেলে নেই, ওই আমার ড্রিম—আমার স্বপ্ন সফল করবে। ওকে আমি এম-এ পাস করাব। প্রফেসরী করবে। না হয় তো—বি-এ পাস করে এখানে গার্লস হাই স্কুল করবে। আমি এখানে প্রথম হাই স্কুল করেছি—ফর দি বয়েজ। আমার মেয়ে করবে হাই স্কুল ফর দি গার্লস। দিস ইজ মাই ড্রিম। তা ছাড়া—আরও একটা কথা তিনি বললেন। কথাটা আমি একেবারে ফেলে দিতে পারলাম না শিবনাথ।

—উনি বললেন—দেখুন ব্রজবিহারীবাবু, রবির মত ছেলের সঙ্গে বঙ্গবালার মত মেয়ের বিয়ে হওয়াও উচিত নয়। রবি রাজী হলেও দেওয়া উচিত নয়। রবি রূপবান ছেলে—গুণবান ছেলে, অবস্থাও ওদের ভাল। বঙ্গবালা আমার কালো মেয়ে। আমি গরীব শিক্ষক। আজ হয় তো একটা ইমোশনের বশে রবি বঙ্গবালাকে বিয়ে করতে চাইলেও চাইতে পারে। চাইবে না বা চায় না বলেই আমার ধারণা। আপনি যেটা বলছেন সেটা আপনার অনুমান মাত্র। আবৃত্তি ভাল যারা করে তারা হাসির কথায় হাসায়, দুঃখের কথায় কাঁদায়। ওর আবৃত্তি আবৃত্তিই শুধু। যদি আপনি যা বলছেন তাই হয়—তবে সেটা একটা সাময়িক ব্যাপার—টেম্পোরারী ইমোশন। এখন সেইটের বশে বিয়েও হয়তো করতে পারে রবি। কিন্তু এর পর—সমস্ত জীবনটা পড়ে থাকবে। রবি বিলেত যাবে। হয়তো ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। কিংবা একটা বড় চাকরে। হয় তো আই-সি-এস। তার পর বঙ্গবালার কালো

চেহারার জন্যে ও লজ্জিত হবে অন্য সব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। হয়তো এমন একজন কৃতী পুরুষ রূপবান ইয়ং-ম্যানকে দেখে অন্য মেয়েদেরও মন চঞ্চল হবে। এসব সোসাইটির অনেক কথাই তো শোনা যায়! তখন? তখন ব্রজবিহারীবাবু—ওর অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন! বললেন—ব্রজবাবু, আই হ্যাড মাই স্যাড এক্সপিরিয়েন্স। আমার ইস্কুল-জীবনে আদর্শ ছিল—আমার এক বন্ধু। সে বলত—তার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ। গীতা ছিল তার কণ্ঠস্থ। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন সে করত। আমাদের আমলের ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। আমাদের আমল কেন—সকল আমলের ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেদের একজন সে। তাকে দেখলাম—ইংরেজ প্রোফেসরের মেয়েকে দেখে পাগল হ'ল। ক্রীশ্চান হয়ে বিলেত গেল। বাপ ছাড়লে মা ছাড়লে জাত ছাড়লে। আই-সি-এস হয়েছে। এ সব ছেলেকে আমি ভয় করি ব্রজবিহারীবাবু। রবিকে আমার আরও ভয়—সে রূপবান। এ কথা ভুলে যান। এ কথা না তোলাই ভাল। বিয়ে দিলে—সেকালেই দেওয়া উচিত ছিল। রবি এখন আমাদের নাগালের বাইরে। রবি নিজে উপযাচক হয়ে বললেও এ বিয়ে আমি দেব না।

—ফিরে ঘুরে আবার বললেন—বাপের কাছে ছেলেরা অনেক কিছু—ব্রজবাবু। বঙ্গবালা আমার ছেলের মত। না হয় আমার জন্যে কষ্ট করবে। আমি উঠে চলে গেলাম। শুলাম। সকলেই শুলেন। এর মধ্যে বঙ্গবালা কখন উঠেছে, বাসার পাশেই কল্কে ফুলের গাছ আছে—সেখান থেকে ফল পেড়ে সেই গাছতলাতেই ভেঙে বীজের ভিতরের শাঁসগুলো বের করে তেল মেখে—ঘরে এসে—'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' বলে একখানা চিঠি লিখে—আর একখানা বাবাকে লিখে—শুয়ে পড়েছে। ভোরবেলা গোঙানি শুনে মাষ্টারমশায়ের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়, তিনি মাষ্টারমশাইকে ডেকে তোলেন। তার পর দরজা ভেঙে দেখা গেল সব। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। চেষ্টাও চলছে। কিন্তু অবস্থা দেখে আমার ভাল লাগল না। বাঁচবে না। বাপকে চিঠি লিখেছে, "বাবা আমি আপনার অযোগ্য কন্যা। আপনার স্বপ্ন সফল করবার শক্তি যে আমার নাই, এ কথা কোন্ মুখে—কেমন করে আমি বলব? অথচ তাকে নইলেও আমি বাঁচব না। তাই আমি বিষ খেলাম। এ আমার বড় লজ্জা। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।" তাই আমি ছুটে এলাম। রবিকে যদি পাই।

ম্লান হেসে বললেন—তাকে পেয়ে কী হবে জানি না, তবে ছুটে এলাম। সে চলে গেছে!

—মাষ্টারমশাই?—শিবনাথ প্রশ্ন করলে—তিনি?

—পাথর। পাথর হয়ে গেছেন চন্দ্রবাবু।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তার পর চলে গেল অনেক দিন।

অনেক সংঘাত অনেক সংঘর্ষ অনেক ঝড় অনেক প্লাবন অনেক ভাঙাগড়া—অনেক বৎসর

মাস। প্রায় পঁচিশ বৎসর। দুটো যুগ। বারো বছরে নাকি একটা যুগ। কিন্তু যুগান্তর বললে ভুল হবে। যুগান্তর তো বারো বছরে অনেক হয়েছে, কিন্তু বহু যুগান্তরেও এত বড় পরিবর্ত্তন হয় নি। কালান্তর হয়ে গেল। একটা বিস্ময়কর কালের সূর্য্যোদয় হ'ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল।

বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। দেশ ভাগ হ'ল। ভারতবর্ষ পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেলে। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনির মধ্যে, জীর্ণদেহ শীর্ণকায় কোটি কোটি মানুষের আনন্দ-কলরোলের মধ্যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ল।

চৈতন্য ইন্‌ষ্টিট্যুশনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সে পরিবর্ত্তন ভাঙার দিকে নয়, গড়ে গড়ে সে বড় হয়েছে। অনেক বড়। বড় বড় বাড়ী হয়েছে; ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কত শিক্ষক এসেছেন—চলে গেছেন। পুরনো কালের শিক্ষক আর কেউ নেই—থাকবার মধ্যে আছেন চন্দ্রবাবু। সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ চন্দ্রভূষণবাবু। মাথায় চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। তবু তাঁর দেহ এখনও সমর্থ আছে। তবে তিনি আর এখন হেডমাষ্টার নন—তিনি চৈতন্য ইন্‌ষ্টিট্যুশনের সুপারিণ্টেডেণ্ট। ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে এক ঘণ্টা করে ইংরেজী পড়ান, আর ইস্কুলের পরিচালনার দিকটা দেখেন। ঠিক সেই সাড়ে দশটায় এসে সিঁড়ির উপর দাঁড়ান। সামনে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছেলেরা এসে দাঁড়ায়। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে সুর করে স্তোত্রপাঠ করে—

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণঃ—

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম্॥

পাঁচ শ'র কাছাকাছি ছেলের সংখ্যা। সমবেত কণ্ঠ আকাশ স্পর্শ করে। প্রার্থনার শেষে ক্লাস আরম্ভ হয়—চন্দ্রভূষণবাবু সেই প্রাচীন নিয়মমত একবার সকল ক্লাস ঘুরে আসেন। সঙ্গে থাকেন নতুন হেডমাষ্টার। নতুন হেডমাষ্টার এখন বসন্তবাবু। চন্দ্রবাবুর কাছে সে বসন্ত। এই ইস্কুলেরই ছাত্র। বিবগ্রামের পাশের গ্রামেই বাড়ী। মাখনবাবু সেকেণ্ড মাষ্টার চলে যাবার পর সে সেকেণ্ড মাষ্টার হয়ে ঢুকেছিল। এখানে চাকরি করতে করতেই সে এম-এসসি এবং বি-টি পাস করেছে। সেকেণ্ড মাষ্টার থেকে হয়েছিল এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার—তার পর হেডমাষ্টার হয়েছে। ইস্কুলের ক্লাসগুলি দেখে আসার পর চন্দ্রবাবু ইস্কুলের হিসেব-নিকেশ, চিঠিপত্র এবং ইস্কুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন। আপনার মনে কাজ করে যান। জেয়াউদ্দিন চলে গেছে। রামজয় চলে গেছে। সঙ্গী নাই, সাথী নাই। চন্দ্রবাবু একা। থাকবার মধ্যে আছে জীবনের সাথী ইস্কুল—চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশন।

দুপুরবেলা বারোটার পর তিনি বাসায় যান। শূন্য ঘর—বউ নাই। বঙ্গবালার মৃত্যুর পর সত্যবতী বেশী দিন বাঁচেন নি। বছর দুয়েক বেঁচে ছিলেন; তাও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চুপচাপ বসে থাকতেন। শুধু কুমারী বয়স্কা মেয়ে দেখলেই অধীর অস্থির হয়ে

উঠতেন। বলতেন—বিয়ে হয় নি কেন? হ্যাঁ গো মা বিয়ে কর না কেন? অভিভাবিকা সঙ্গে থাকলে তাদের কাউকে মিনতি করতেন—বিয়ে দাও মা, মেয়ের বিয়ে দাও। দেরি করো না। দেরি করো না। কাউকে কটুকাটব্য করতেন—স্বার্থপর, লজ্জা নাই; ঘেন্না, ঘেন্না, ঘেন্না। বেরিয়ে যাও।—তোমাদের মুখ দেখলে পাপ—মুখ দেখলে পাপ।

ভাগ্য ভাল সত্যবতীর—দু'বছরের বেশী যন্ত্রণা সইতে হয় নি। চন্দ্রবাবু তাঁর মৃত্যুশয্যায় বসে মনে মনে প্রার্থনা করতেন—মুক্তি দাও—ভগবান—সত্যবতীকে তুমি মুক্তি দাও।

নিঃসঙ্গ ঘরে এসে স্নান সেরে তিনি পূজায় বসেন।

সে পূজা তাঁর নিজস্ব মতের পূজা। ওই বঙ্গবালার মৃত্যুর পর থেকে তিনি পূজা করছেন। বঙ্গবালার মৃত্যুর দিন রাত্রে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন ইস্কুলের সিঁড়ির উপর। রাত্রি তখন অনেক। সমস্ত বোর্ডিং স্তব্ধ। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাষ্টার ক'জন শুধু অসহায়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না পারছেন কাছে এসে বসতে, না পারছেন ঘরে গিয়ে শুতে। কাছে বসেছিলেন শুধু ব্রজবিহারীবাবু। তাঁর মত লোকও কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একা কথা বলছিলেন শুধু চন্দ্রবাবু। সে কথা শুধু ইস্কুলের কথা। ইস্কুলের নতুন একখানি বাড়ী হবার কথা হচ্ছিল তখন। চন্দ্রবাবু সেই নতুন বাড়ীর কথা বলে যাচ্ছিলেন।

বাড়ীখানা পূর্ব্বদ্বারী হলে কিন্তু আয়তনে কিছু ছোট হবে। না ব্রজবিহারীবাবু? মানে এবার যে রেজাল্ট হয়েছে—তাতে ছেলে আমাদের বাড়বে। যে প্ল্যান করেছিলাম, আমার বিবেচনায় সে প্ল্যান বদলে বড় করা উচিত।

কি বলবেন ব্রজবাবু? কি উত্তর দেবেন?

চন্দ্রবাবু উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নি। বলেই চলেছিলেন—আর ওই খড়ের চাল বোর্ডিংটা। ওটার অবস্থা বড় খারাপ হয়েছে। ওটাকে ভেঙে—মাটির দেওয়াল—পাকা মেঝে আর রাণীগঞ্জ টাইলের ছাদ—বাংলো টাইপের একটা বোর্ডিং। এখন একোমোডেশন ওতে পঁচিশ-ছাব্বিশ জনের—ওটাকে পঞ্চাশ জনের একোমোডেশন করে করলে—ব্যস—এখনকার মত নিশ্চিন্ত। কি বলেন?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন—হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। মনে হচ্ছিল—চন্দ্রবাবু জলে ডুবে যাচ্ছেন—তিনি তাঁকে উদ্ধার করতে এসে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তিনিও জলে ডুবে যাচ্ছেন। তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না। পঙ্গু হয়ে গেছেন।

তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন রামজয় পণ্ডিত। পণ্ডিত শ্মশানে গিয়েছিলেন—সেখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন বাড়ী কিন্তু বাড়ীতে থাকতে পারেন নি, থাকতে চেষ্টা করেও পারেন নি—এই প্রায় মধ্যরাত্রে উঠে এসেছেন চন্দ্রকে দেখতে।

রামজয় এসে পাশে বসে চন্দ্রভূষণের পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন—চন্দ্র—চিতা মৃতকে ভস্ম করে, আমরা কলসীর জলে বন্যার চিন্তা নিভিয়ে এসেছি; চিন্তা—শোক—জীবন্তকে দগ্ধ করে, অন্য জলে নেভে না, ওকে চোখের জলে নেভাতে হয়। তুমি একটু কাঁদ

চন্দ্র।

ব্রজবিহারীবাবু সুযোগ পেয়ে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কান্না তো আসছে না রামজয়! আর আমি কি কাঁদতে পারি? মৃত্যু অনিবার্য্য, শোক মিথ্যা; আমি শিক্ষক, আমি জ্ঞানের তপস্বী, আমি কি করে কাঁদব—এই এত ছেলে যারা আমার কাছে শিক্ষা পেতে এসেছে, এরা ভবিষ্যতে শোকে দুঃখে যে তা হলে বানের মুখে কুটোর মত ভেসে যাবে। আর—

কথা বন্ধ করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন—কান্না নাই। কান্না আসছে না।

রামজয়ও এবার স্তব্ধ হয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—অগস্ত্য ঋষির গল্প বল তুমি। রামজয়, জ্ঞান আমার চোখের জলের সমুদ্র অগস্ত্যের মত নিঃশেষে পান করে নিয়েছে।

রামজয় বলেছিলেন—তুমি দীক্ষা নাও চন্দ্র।

—দীক্ষা?

—হ্যাঁ। হিন্দুর সন্তান, দীক্ষা নাও। তুমি পাবে।

—পাব? মানে বলছ—

—ভগবানের দয়া।

উত্তর দেন নি চন্দ্রবাবু। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে বসে থাকতে থাকতে বলেছিলেন—ওঃ কালপুরুষ নক্ষত্রের পিছনে লুব্ধকটা জ্বলছে দেখ! ডগ-স্টার!

তার পর বলেছিলেন—ওই হ'ল কর্কট। দাঁড়াটা দেখছ? ওরই পাশে সিংহ। ওই তুলা।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—রাত্রির আকাশের দিকে তাকালে ঈশ্বরকে না মেনে উপায় থাকে না।

এর পর তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। মহাকবির কাছে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন—আমি শোকার্ত্ত। আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। বিশ্বসংসার শূন্য। সান্ত্বনা কিসে আমাকে বলুন।

মহাকবি তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—আনন্দের ধ্যানে।

—আনন্দের ধ্যানে? কিন্তু আনন্দকেই যে আমি হারিয়েছি।

মহাকবি বলেছিলেন—যাঁর সৃষ্টিতে রূপ রস সঙ্গীত কোমলতা মিষ্টতার শেষ নাই—তিনিই আনন্দ। তাঁর ধ্যানেই শোকও মধুর হয়ে ওঠে, শূন্য পূর্ণ হয়।

ওখানেই উপাসনা-মন্দিরে তিনি মহাকবির উপাসনা শুনে এসেছিলেন। গান শুনেছিলেন—

মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হ'ল শেষ।

আর শুনেছিলেন—

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু!

ফিরে আসবার সময় মহাকবিকে প্রণাম করে বলেছিলেন—আমি পেয়েছি।

মহাকবি বলেছিলেন—তাঁকে ধ্যান কর। সব বেদনা ওই ধ্যানেই বিগলিত হয়ে আনন্দে পরিণত হবে। পাহাড়ের মাথায়—বরফ হিমশীতল; মৃত্যুর স্পর্শ তাতে। সেই বরফ গলে জলধারা হয়ে নামে, সে তখন সাক্ষাৎ জীবন। নিজের বেদনাকে আনন্দের ধ্যানে বিগলিত করো।

ফিরে এসে সেই দিন থেকে তিনি এই পূজা করেন। উপচার নেন না, উপকরণ নেন না। শুধু বসে ধ্যান করেন। মনে মনে বলেন—

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু!

পূজা শেষ করে আহারান্তে আবার যান ইস্কুলে।

সন্ধ্যায় নিজে বসে উপাসনার আসর পরিচালনা করেন। তারপর বোর্ডিঙের প্রতি ঘরে ছাত্রদের কাছে গিয়ে হেসে বলেন—কি অনুপপত্তি বল!

ছেলেদের 'অনুপপত্তি'র গল্প জানতে বাকী নেই। চন্দ্রবাবুই বলেন—প্রায়ই মধ্যে মধ্যে 'বুনো রামনাথের' কথা বলেন।

ছেলেরা মিলিয়ে পায় ওই গল্পের সঙ্গে চন্দ্রবাবুর জীবন।

চন্দ্রবাবু মাইনের সব টাকাই ছাত্রকল্যাণে ব্যয় করেন। নিজের জন্য বরাদ্দ মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা।

হঠাৎ সেদিন।

১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাস। সেদিন শনিবার। চন্দ্রবাবু ডাকলেন—রমণ।

রমণ—রাধারমণ ইস্কুলের চাকর। কেষ্ট চলে গেছে। তার জায়গায় রমণ এসেছে। রমণ এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রবাবু বললেন—যাও, এই নোটিশ সব ক্লাসে ঘুরিয়ে নিয়ে এস।

ইস্কুলের ছুটির শেষে সব ছাত্রকে হলে সমবেত হতে হবে। চন্দ্রবাবু কিছু বলবেন।

চন্দ্রবাবুর মুখ থমথম করছে। এ তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না, এ তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না—ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে।

দরখাস্ত করেছে—বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে তারা বিজ্ঞানবাদে বিশ্বাসী। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চন্দ্রবাবু ইস্কুলের হিতাকাঙ্ক্ষী স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি হলেও সেকালের মানুষ। একদিকে তিনি গোঁড়া ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্মিক—অন্য দিকে তিনি প্রায় ডিক্টেটারের মত অটোক্র্যাট। প্রতিটি ছাত্রকে তিনি ইস্কুলের প্রথমেই হিন্দুমতে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠে বাধ্য করেন। কেউ আপত্তি জানালে তাকে শাস্তির ভয় দেখান। তাঁর ভয়ে আমরা আমাদের বিশ্বাসমত চলতে পারি না। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে ধর্ম্মের এই কঠোর অনুশাসন অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। অতএব আমাদের প্রার্থনা—ইস্কুলের প্রারম্ভে

প্রার্থনা-সভায় যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় এই নির্দ্দেশ দেওয়া হউক।

এ দরখাস্তের ভাষা তাঁর পরিচিত। লেখক কে তা তিনি জানেন।

সীতেশ এ দরখাস্তের লেখক। সীতেশ তাঁরই ছাত্র। এখান থেকে কিছু দূরে তার বাড়ী। সীতেশ কৃতী ছাত্র। এখন এখানকার এসিস্টাণ্ট হেডমাষ্টার। তিনিই তাকে এখানে এনেছেন। কিছুদিন আগেও তিনিই তাকে রাজনৈতিক আবর্ত্তের সংঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি জানেন। সীতেশই যে ছেলেদের মধ্যে এই নিরীশ্বরবাদের প্রবর্ত্তক তা তিনি জানেন। ছেলেদের নিয়ে সে ছুটির পর আজ এখানে কাল ওখানে সভা করে বেড়ায়—তা তাঁর অবিদিত নয়। এই সংগঠনের নাম ময়দান ক্লাব।

এই ময়দান ক্লাব যখন সীতেশ প্রথম তৈরি করে তখন তিনি এটা কল্পনা করেন নি; তিনি উৎসাহিত করেছিলেন।

হঠাৎ সব প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সেদিন—এই দিন পনের আগে রামজয় তাঁকে বলে গিয়েছিলেন। রামজয় অনেক দিন ইস্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন। তবু মধ্যে মধ্যে রামজয় আসেন। ইস্কুলের বর্ত্তমান হেড পণ্ডিত রামনাথ সেও এখানকার ছাত্র; বি-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ—রামজয়ের ভক্ত এবং দীক্ষায় তাঁর শিষ্যও বটে। রামজয় পুত্রহীন, তাঁর দৌহিত্রেরা যজমানদের সাধারণ কাজগুলি চালায় বটে কিন্তু বিশেষ ক্রিয়া তাদের দিয়ে হয় না; তখন রামজয় নিজে যান। বেশী দূরের জায়গা হলে রামনাথকে পাঠান। রামনাথ রামজয়ের কাজ করে আসে, রামজয় রামনাথের ইস্কুলের কাজ চালিয়ে যান। গতবার রামনাথ কঠিন রোগে প্রায় ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিল, রামজয় ছয় মাস তার কাজ করে দিয়েছিলেন। পনের দিন আগে রামজয়ের এক শিষ্যের বাড়ীতে বিশেষ একটি ক্রিয়াতে রামজয় রামনাথকে পাঠিয়ে নিজে দিনতিনেক পড়িয়ে গেছেন। শেষ দিন বলে গেলেন—আমি আর আসব না চন্দ্র। তুমিও এবার সর। মানে মানে সরে পড়। আমার কথা শোন।

হেসে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কেন?

—মানে ভগবানের রাজ্য গেল এইবার ভূতের রাজ্য হ'ল—ভূত নয় চন্দ্র প্রেত। সরে পড়। সরে পড়। আমি এই আজই সরলাম—আর কোনদিন আসব না হে। রামনাথের সাহায্য নিয়ে যজমানি চালাতে হলে আসতে হবে। সুতরাং যজমানিও শেষ।

—কি হ'ল?

—সীতেশকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার প্রিয় ছাত্রকে।

বলেই রামজয় চলে গিয়েছিলেন। সীতেশকে ডাকতে হয় নি; সীতেশ নিজেই এসেছিল—চারটি ছাত্র নিয়ে। মিণ্টু, জীবেন, সরোজ, দিগেন। তাদের হাতে এক দরখাস্ত।

—এরা এসেছে সার একটা দরখাস্ত নিয়ে।

—কিসের দরখাস্ত?

—পণ্ডিতমশায়ের সম্বন্ধে এরা কিছু বলতে চায়।

—রামজয় সম্পর্কে ?

—হ্যাঁ। ওদের যাচ্ছেতাই বলেছেন। জীবেন একটা কবিতা লিখেছিল—তাই পড়ে—

জীবেনের খাতায় সংস্কৃতের টাস্ক দেখতে গিয়ে পণ্ডিত কবিতাটি পেয়েছিলেন। কবিতাটি পড়ে বলেছিলেন—অ বাবা গোপাল—অ মানিক, জীবেনচন্দ্র—

—আমাকে বলছেন স্যার ?

—বলছি আমার চোদ্দপুরুষের ছেরাদ্দ করে—তোমার ছাপ্পায় পুরুষের মুখে ছাই দিয়ে—হ্যাঁ বাবা বরাহগোপাল এ কোন্ পচা বিলের শালুক তুলেছ বাবা ? এ্যাঁ ? এ কি ? বলে নিজেই পড়েছিলেন—

জারুজালেম মক্কা কাশীর মন্দিরচূড়া
গির্জের চূড়া মসজিদের মাথা
কাঁপছে—থর থর কাঁপছে—
মানুষ জেগেছে—মাতন লেগেছে
তারা হৈ হৈ করে চাপছে
ও চূড়ার মাথায়।
ভাঙবে—চুরমার করে ভাঙবে—
ওগুলোর ভিতরের কদর্য্য অনাচার
ভণ্ডামি আর বিশ্বের সেরা মিথ্যা—
ঈশ্বর—যার অস্তিত্ব
ওগুলোর অন্ধকারের ছায়াবাজিতে
সে উড়ে যাবে—উপে যাবে।
বাজাও দামামা। পোড়াও ক্রশ।
ভাঙো, চুরমার কর পুতুল।
ফুঁ দিয়ে ওড়াও মিথ্যে।

আর তিনি পড়তে পারেন নি। রাগে অধীর হয়ে খাতাখানা আছড়ে ফেলে দিয়ে জীবেনকে যা মুখে এসেছে তাই বলেছেন।

জীবেনের প্রপিতামহ করত গুরুগিরি। পিতামহ করত পুরুতগিরি। বাবা পুরুতগিরিও করে, চাকরিও করে। জীবনের বাপও রামজয়ের ছাত্র। তাই বাপ-পিতামহ প্রপিতামহ তুলে বলেছেন—ওরে বেটা—ওই ভণ্ডামি, ওই মিথ্যাচারের অন্নেই যে তোর পেট ভরে রে বরাহ।

জীবেন বলেছিল—তাই তো আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না ভেতরের কথা।

রামজয় আর একবার গালিগালাজ করে উঠে চলে এসেছেন। হাত ধুয়ে লাইব্রেরী হয়ে ইস্কুল থেকে চলে গেছেন। এখন ছেলেদের দরখাস্ত—রামজয় পণ্ডিত যেন আর এ ভাবে ইস্কুলে না আসেন। তিনি অক্ষম বৃদ্ধ, পড়াতে পারেন না। তার উপর তিনি পড়ান না, শুধু গল্প করেন।

দরখাস্তখানা পড়ে চন্দ্রবাবুর ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফেটে যাবে বলে মনে হ'ল। বঙ্গবালার মৃত্যুর পর ক্রোধ তাঁর হয় নি। এই প্রথম।

চন্দ্রবাবু দরখাস্তখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

—যাও। তোমরা যাও।

ছেলেরা চলে গিয়েছিল। সীতেশ ছিল।

—সীতেশ!

—স্যার!

—এ দরখাস্ত তোমার লেখা?

—হ্যাঁ স্যার। ওরা আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ করেছিল। আমি উচিত মনে করেছিলাম। কারণ ছেলেদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। আপনার জানা উচিত।

তার পরদিন থেকেই তিনি লক্ষ্য করছেন জীবেনদের দল স্তোত্রপাঠের সময় থাকে না। স্তোত্রপাঠ শেষ হবার পর ইস্কুলে ঢোকে।

দিনতিনেক পর তিনি ওদের ডেকেছিলেন। আসতেই প্রশ্ন করেছিলেন—তোমরা দেখি স্তোত্রপাঠের সময় থাক না, কেন জীবেন?

—আসতে দেরি হয়ে যায়, স্যার।

—সকলেরই? এবং আগে হ'ত না—হঠাৎ হতে লাগল?

চুপ করে ছিল সকলে। ঠিক এই সময়ে সীতেশ পাশের ভূগোলের ম্যাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিল—স্পীক আউট! সত্য কথা বল!

জীবেন এবার বলেছিল—ভাল লাগে না।

—ভাল লাগে না? —হোয়াট?

—আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। ধর্মেও না।

—কিন্তু এ ইস্কুলে স্তোত্রপাঠের নিয়ম কম্পালসারি। ইংরেজ আমলেও বন্ধ করতে পারে নি।

—ইংরেজের সে অধিকার ছিল না। আমাদের আছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রবাবু।

সীতেশ বলেছিল—বেশ তো তোমরা এস, ইচ্ছে হলে চুপ করে থেকো। নয়তো ক্লাসে বসে থেকো।

—নো। স্তোত্রপাঠ না করলে এ ইস্কুলে পড়া হবে না। দিস ইজ মাই লাস্ট

ওয়ার্ড। গো।

ছেলেরা চলে যেতেই তিনি সীতেশকে বলেছিলেন—তোমার ময়দান ক্লাব তুমি বন্ধ কর।

—বন্ধ করব?

—হ্যাঁ।

—না স্যার তা আমি করব না।

সীতেশ চলে গিয়েছিল।

তার পর এই দরখাস্ত। উপর থেকে দরখাস্তখানি পাঠানো হয়েছে তাঁর মতামতের জন্ত। না—কৈফিয়তের জন্ত।

এ দরখাস্তও সীতেশের লেখা। এতেও লেখা আছে—চন্দ্রবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি গোঁড়া ধার্মিক। ইস্কুলের কোন ছেলেই প্রার্থনা-সভায় যেতে চায় না। কিন্তু তাঁর কঠোর শাসন ডিক্টেটরশিপের নামান্তর।

রমণের হাতে নোটিশ দিয়ে মাথা ধরে তিনি বসে রইলেন।

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

টক্‌টক্ শব্দে ঘড়িটা চলছে।

ঢং শব্দে একটা বাজল।

—মাষ্টারমশাই।

—কে?

—আমি স্যার বসন্ত।

—বসন্ত!

—হ্যাঁ স্যার। আপনি এখনও স্নান করেন নি, খান নি!

—আজ ছুটির পরই ছেলেদের ডেকেছি। আজ দেড়টায় ছুটি।

—আজ থাক স্যার।

—থাকবে? কেন?

—হ্যাঁ স্যার। মনে হচ্ছে গোলমাল হবে।

—গোলমাল?

—হ্যাঁ স্যার। আমার অনুরোধ আজ থাক।

—না। থাকবে না বসন্ত।

—স্যার।

—না—না—না। তুমি বলছ ওরা আমার কথা শুনবে না?

সীতেশ ঘরে ঢুকল।

—না স্যার। ওরা আপনার কথা শুনবে না। ওরা স্ট্রাইক করবে।

—অলরাইট।

উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রবাবু। দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে এসে হলে দাঁড়ালেন—তার পর চলতে শুরু করলেন—সঙ্গে সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন—গুড বাই বয়েজ, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। আই সাবমিট মাই রেজিগনেশন। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমি ঈশ্বর মানি—তোমরা ঈশ্বর মানো না—তোমাদের শিক্ষা দেবার শক্তি আমার নেই। গুড বাই। গুড বাই। টলছেন তিনি, গলা কাঁপছে।

গোটা ইস্কুলটা স্তম্ভিত।

সীতেশ যেন কেমন হয়ে গেল।

বসন্ত নির্ব্বাক। যখন তার কথা সে খুঁজে পেলে তখন সে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে ডাকলে—মাষ্টারমশাই!

দীর্ঘ পদক্ষেপে টলতে টলতে চন্দ্রবাবু তখন পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। সামনের দিকে।

—মাষ্টারমশাই! মাষ্টারমশাই!

পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন চন্দ্রবাবু। কর্ম্ম তাঁর শেষ হয়েছে। বিড়বিড় করে কি বললেন—যেন বললেন—

—বঙ্গু মা! বঙ্গবালা!